শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

৪২শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৯৬ { ১ম সংখ্যা



শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠে সেবিত
শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ
কার্য্যালয়ঃ—
শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ফোন : ৫৫-৭২২৭
২৮, হালদার বাগান লেন : কলিকাতা-৭০০০০৪

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞানকেশবগোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ
পণ্ডিত শ্রীযুত চৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

(ত্রিদণ্ডিস্বামী) শ্রীভক্তিবেদান্ত আচার্য্য (মহারাজ)-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

দ্বিচত্বারিশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

(শ্রীগৌরাব্দ ৫০৪ বিষ্ণু হইতে ৫০৪ গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৯৬ ফাল্গুন হইতে ১৩৯৭ মাঘ,
খৃষ্টাব্দ ১৯৯০ মার্চ্চ হইতে ১৯৯১ ফেব্রুয়ারী।)

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

আজীবন সদস্যগণের তালিকা

১। শ্রীহিরণ্যগর্ভ দাসাধিকারী, ২২ এস. এল. চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট, পোঃ নিমতা, কলিকাতা-৪৯।

২। শ্রীরবীন্দ্রনাথ হালদার, সাটিদহ, পোঃ শঙ্করপুর (হুগলী)।

৩। শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী, ৮/২ বি, প্রভুরাম সরকার লেন, টেংরা, কলিকাতা-১৫।

৪। শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ৭১, ডক্টর লেন, চুঁচুঁড়া (হুগলী)।

৫। শ্রীগদাধর দাসাধিকারী, সৎপুর, পোঃ মহলন্দপুর, (২৪ পরগণা উত্তর)।

৬। শ্রীযুক্তা কল্যাণী বিশ্বাস, মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)।

৭। শ্রীযুক্তা রেণুকা ঘোষ, নবীন সেন রোড, শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)।

৮। শ্রীরাধামাধব দাসাধিকারী, ৮৪, গোয়াল-টুলি রোড, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)।

৯। শ্রীযুক্তা উষারাণী দেবী সিন্‌হা, বৈঁচিগ্রাম (হুগলী)।

১০। শ্রীযুক্তা উমারাণী দেবী, কলেজ রোড, চুঁচুঁড়া (হুগলী)।

১১। শ্রীযুক্তা আরতি ভট্টাচার্য্য, রেলি গোলা, উকিলপাড়া, পোঃ রায়গঞ্জ (পশ্চিমদিনাজপুর)।

১২। শ্রীশৈলেনগোবর্দ্ধন দাসাধিকারী, চাঁদনগর (২৪ পরগণা দক্ষিণ)।

১৩। ডাঃ সঞ্জীব কুমার দে, ৩৯১/২, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)।

১৪। শ্রীতরুণ কুমার পান্তি, ১৪৪/১, শ্যামনগর রোড, কলিকাতা-৫৫।

আজীবন সদস্য হইতে ইচ্ছুক গ্রাহকগণকে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা অফিসের সহিত যোগাযোগ করিয়া গ্রাহক মূল্য জমা দিয়া পাকা রসিদ লইতে অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

বিনীত নিবেদক—
কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

দ্বিচত্বারিংশ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধাদির সূচীপত্র

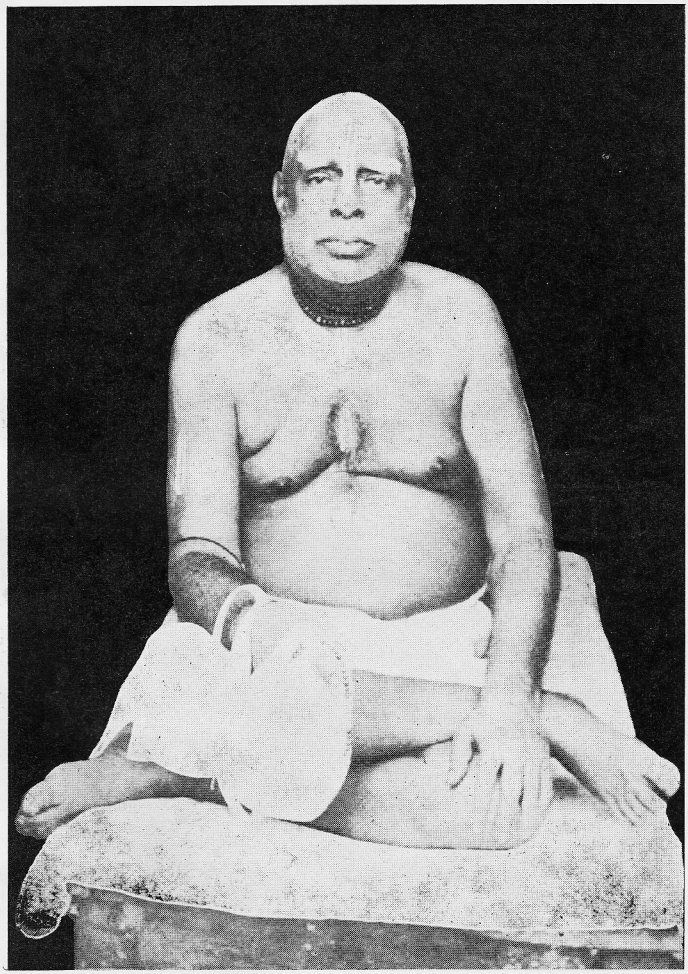
প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
অষ্টগ্রহ-সমাবেশরূপ বিপদাপদেও ভক্তগণের হরিকীর্ত্তনমুখে হরিভজন কর্ত্তব্য [পত্র]	১।৯
অবতারবাদ	১।২৩
অনধিকারীর নির্জ্জন-ভজনের ছলনা—ইন্দ্রিয়-তর্পণপর ও হরিভজন-বিরোধী	৪।১২৯
"অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্ শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যম্"	৬।২২৭
অনাত্ম জ্ঞান	৭।২৪৮
অভিধেয় তত্ত্ব	১০।৩৭৭, ১১।৪২১
আর্ত্তি কুসুমাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে	২।৬১
"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্"	৪।১৩৭
আশ্রমীয় অনুশাসন মানিয়া লওয়াই শিষ্টাচার [পত্র]	১০।৩৭১
উদ্দীপন [কবিতা] শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথিপূজায়	৯।৩৫৩
এক অঙ্গে দুই রূপ	১।৩৫
কুটীনাটী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৩।৮৪
কৃষ্ণ-স্তবাষ্টকম্—শ্রী	১।১
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাসকৃতং শ্রীবলদেব স্তোত্রম্—শ্রী	২।৪১
কৃষ্ণ-বন্দনা—শ্রী [কবিতা]	৬।২৪০
কৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন	৯।৩৩৭
গণসহ শ্রীরাধাবির্ভাব [কবিতা]	১০।৩৯৩
গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা—শ্রীল [শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ, শিলিগুড়িতে প্রদত্ত]	১।৩৬, ২।৭৩, ৩।১০৬, ৪।১৪৭, ৫।১৮৩
গুরু-মহারাজের উত্তরবঙ্গ ও আসামে শ্রীহরিকথা প্রচার—শ্রীল	৩।১১৬

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল [শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত]	৬।২২১, ৭।২৬৮, ৮।৩০৫, ৯।৩৪৭, ১০।৩৮২, ১১।৪৩২, ১২।৪৫৯
গুরুপাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তি—শ্রী [কবিতা] শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে	১১।৪১৭
গুরু-পূজারই নামান্তর—শ্রীব্যাসপূজা—শ্রী	১১।৪১৮, ১২।৪৫৪
গুরু-চরণে প্রার্থনা-প্রসূনাঞ্জলি—শ্রী [কবিতা] শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে	১১।৪৩১
গুরুপূজা-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	১১।৪৩৬
গুরুদেবে নিবেদন—শ্রী [কবিতা]	১১।৪৩৬
গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি ?	১২।৪৫৩
গোপীগণ-দ্বিজবর-কৃতং শ্রীকৃষ্ণ-রক্ষাকবচম্	৫।১৬১
গৌড়ীয়-পত্রিকা—শ্রী [কবিতা]	১।২৯
গৌড়ীয়-পত্রিকা-প্রশস্তি—শ্রী [পত্র]	১।৩১
গৌড়ীয়ের দ্বিচত্বারিংশ-বর্ষ	১।৪০(৩)
গৌর-ভজন—শ্রী [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৫।১৬৯
গৌরাঙ্গ-মহিমা—শ্রী [কবিতা]	৮।৩১১
চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মকৃতং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলস্তোত্রম্—শ্রী	৭।২৪১
চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মকৃতা শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তুতিঃ—শ্রী	৯।৩২১, ১০।৩৬১, ১১।৪০১, ১২।৪৪১
চৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য—শ্রী [বিজ্ঞাপন]	২।৬৮
চৈতন্যে মর্ত্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ—শ্রী [প্রতিবাদ]	৫।১৯৮, ৬।২৩১, ৭।২৭৪, ৮।৩১৫, ৯।৩৫৪, ১০।৩৯৬, ১২।৪৬৩
জন্মান্তরবাদ	২।৫৭, ৩।৯৫
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৩।১১৯
জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দের আদলে	৯।৩৪২, ১০।৩৭১
ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাদর আহ্বান—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৪।১৫৯
তৃতীয় জন্ম [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৯।৩২৭
দীক্ষা-বিধান [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	২।৪৭

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
দীক্ষাগুরু-শিক্ষাগুরুবর্গের নিকট কৃপা প্রার্থনা [পত্র]	৬।২৩৮
দীনের বিজ্ঞপ্তি [কবিতা]	১২।৪৫১
দুর্ব্বাসামুনিকৃতং শ্রীশ্রীনন্দনন্দন-স্তোত্রম্	৮।২৮১
ধর্ম্ম কি ? সকল ধর্ম্ম কি সমান ?	২।৬৯
ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান	১০।৩৮৯, ১১।৪২৬
ধান্য ও শ্যামা [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১০।৩৬৮
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ]	২।৭৯
নর-তনু ভজনের মূল	৩।১০০
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	১১।৪৩৯
নামাশ্রয়ের ফল [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৯।৩২৫
নিগম ও আগম [শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ]	১।৭
নিষ্ঠার সহিত চাতুর্ম্মাস্যাদি ব্রতপালন ও কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট হইবার উপদেশ [পত্র]	৩।৮৯
নির্য্যাণ	৩।১১৮
নিজ পরিচয় [শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ]	৮।২৮৫
নিষ্ঠাবান্ শুদ্ধবৈষ্ণবের পক্ষে সংস্কারবিহীন অদীক্ষিত ব্যক্তির পাচিত অন্নগ্রহণ অনুচিত ; শিষ্যের পক্ষে গুরুপাদপদ্মের বিচারধারা গ্রহণ ও তদনুকূল আচরণ কর্ত্তব্য [পত্র]	৮।২৮৭
নিঃসর্ত্তে নির্গুণ-দানস্থলেই মঠ-মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা [পত্র]	৯।৩৩০
নিবেদন-কুসুমাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসবে	৯।৩৪১
পত্রে প্রশ্ন ও তদুত্তর [পত্র]	৫।১৭৫
পঞ্চরস সেবা-শিখাদ্বারা গৌড়ীয়ের আরতি	৬।২১৮
পরমার্থী কে ? [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৮।২৮৩
প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর দোষ-ত্রুটী ও তৎসংশোধন-প্রচেষ্টা	১,২৭
প্রাত্যহিক জীবন	৩।১১১, ৪।১৫৪
বর্ষারম্ভে নিবেদন	১।১৬
বর্ণান্তর [শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ]	৩।৮৬, ৪।১২৬
বসুদেব-দেবকীকৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্—শ্রী	৪।১২১

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
বলদেব-নিত্যানন্দের সহিত শ্রীমতী রাধারাণীর একই সিংহাসনে অবস্থিতি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-সম্মত কিনা ?—শ্রী	৫।১৭৪
বর্ষ-পরীক্ষা [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১২।৪৪৬
বন্দনা [কবিতা] শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে	১২।৪৬৬
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি [পত্রিকার ভিক্ষাবৃদ্ধির বিজ্ঞাপন]	২।৭২
বিহ্বল প্রতাপরুদ্র [কবিতা]	২।৭৮
বিজ্ঞপ্তি [শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিজ্ঞাপন]	৫।১৮২
বৃন্দাবনবাসী পদে প্রার্থনা--শ্রী [কবিতা]	৩।১১৫
ব্যবহার [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১১।৪০৯
ব্যাসপূজা—শ্রীশ্রী	১।৪০(১), ২।৬৩
ব্যাসপূজা কাহাকে বলে ? —শ্রী	৪।১৩০
ব্যাসপূজা—শ্রী	৭।২৫৩, ৮।২৯২
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	১০।৪০০
ব্রহ্ম-মহেশ্বরাদি-দেবগণকৃতং শ্রীদেবকী-গর্ভস্তোত্রম্—শ্রী	৩।৮১
ব্রজমণ্ডলে বৈষ্ণবানুগমনে—শ্রী	৬।২১৫, ৮।২৯০
ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১০।৩৬৪
ভগবান্ আচার্য্য—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১।৪
ভগবৎপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব	১২।৪৬৭
ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল [শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিতে প্রদত্ত]	১।১২, ২।৫৩, ৩।৯০, ৪।১৩২
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব—শ্রীমদ্ [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৭।২৭৯
ভাগবত শ্রবণ [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৬।২০৬
ভোগী, দেহারামী, অলস ও ক্রোধীব্যক্তি মঠবাস ও হরিসেবার অনধিকারী [পত্র]	৬।২১০
ভ্রম-সংশোধন	৬।২৪০, ১১।৪৩৫
মহাপ্রভু-দর্শনে—শ্রীমন্ [কবিতা]	১।১০
মহাপ্রসাদে বিতর্ক—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	২।৪৩
মহাপ্রভুর কথা প্রচারই বাস্তব বদান্যতা ও জীবে দয়া—শ্রীমন্ [পত্র]	২।৫২

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
মহাপ্রভুর আলোকে রথযাত্রা—শ্রীমন্	৪।১৪১, ৫।১৯৩
মহামুনি-গর্গাচার্য্যকৃতং শ্রীবলরাম-কৃষ্ণনামকরণম্	৬।২০১
মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১২।৪৫৮
মনুষ্য-সমাজ ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৫।১৬৪, ৬।২০৪, ৭।২৪৪
মর্ম্মভেদী কান্না	৯।৩৫৮
মাৎসর্য্য [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১২।৪৪৩
মুষ্টি-ভিক্ষা [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৪।১২৩
মেঘালয় গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	৮।৩১৩
রামানন্দ রায়-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাধ্য-সাধন রসকথা প্রচার—শ্রীল	৭।২৫৮, ৮।৩০০
রাধারাণীর ও শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে তুলসী-প্রদান সম্বন্ধে প্রশ্নদ্বয়—শ্রী [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব]	১২।৪৪৮
রূপ ও সৌন্দর্য্য	৭।২৬৪
শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে বৈষ্ণবগণের চাষ-আবাদ অবৈধ নহে [পত্র]	৭।২৪৯
শ্রদ্ধাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ প্রকট-বাসরে	১।৩৯
শ্রদ্ধাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজায়	১০।৩৭৬
শ্রীক্ষেত্র দর্শন [কবিতা]	৪।১৫৭, ৫।১৯০, ৬।২১১, ৭।২৫০
সম্বন্ধ-তত্ত্ব	৯।৩৩০
সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব]	১১।৪১২
সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা [বিজ্ঞাপন]	১১।৪৩০
সাধু-সঙ্গের প্রণালী-বিচার [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১১।৪০৪
Statement about Shri Goudiya-Patrika	১।৪০(৮)



ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে সেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪২শ বর্ষ | ৩ বিষ্ণু, অনিরুদ্ধ, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ
২৯শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৯৬, ইং ১৪।৩।৯০ | ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীকৃষ্ণ-স্তবাষ্টকম্

বিষ্ণু-ব্রহ্মা-মহেশ্বরকৃতম্

[শ্রীমদ্‌গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে শ্রীনারদ-বহুলাশ্বসংবাদে তৃতীয়েঽধ্যায়ে]

শ্রীদেবা উচুঃ,—

১। কৃষ্ণায় পূর্ণপুরুষায় পরাৎপরায়
যজ্ঞেশ্বরায় পরকারণ-কারণায়।
রাধাবরায় পরিপূর্ণতমায় সাক্ষাদ্-
গোলোকধাম-ধিষণায় নমঃ পরস্মৈ॥ ১৫॥

[দেবগণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতম জানিতে পারিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন এবং সকলেই তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন,—]

দেবগণ বলিলেন,—পূর্ণপুরুষ পরাৎপর যজ্ঞেশ্বর পরমকারণকারণ রাধাপতি সাক্ষাদ্ গোলোকপতি পরিপূর্ণতম পরমপুরুষ কৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ১৫ ॥

২। যোগেশ্বরাঃ কিল বদন্তি মহঃ পরং ত্বাং
তত্রৈব সাত্বতমনাঃ কৃতবিগ্রহঞ্চ।
অস্মাভিরদ্য বিদিতং যদদোঽদ্বয়ন্তে
তস্মৈ নমোঽস্তু মহসাং পতয়ে পরস্মৈ ॥ ১৬ ॥

যোগেশ্বরগণ আপনাকে পরম তেজোরূপ বলেন, স্বাত্বত-মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ আপনাকে দেহধারী বলিয়া থাকেন, আমরা আজ আপনাকে যে অদ্বয়রূপে জানিতে পারিলাম, সেই পরম তেজোরূপী আপনাকে নমস্কার ॥ ১৬ ॥

৩। ব্যঙ্গেন বা ন নহি লক্ষণয়া কদাপি
স্ফোটেন যচ্চ কবয়ো ন বিশন্তি মুখ্যাঃ।
নির্দ্দেশ্যভাব-রহিতং প্রকৃতেঃ পরঞ্চ
ত্বাং ব্রহ্ম নির্গুণমলং শরণং ব্রজামঃ ॥ ১৭ ॥

হে ব্রহ্মন্! মুখ্য মুখ্য কবিগণ ব্যঞ্জনা বা লক্ষণা আরোপ কিংবা স্ফোট অর্থাৎ শব্দের সূক্ষ্ম শক্তিদ্বারা আপনার প্রকৃত রূপ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন না; আপনি অনির্ব্বচনীয় ও মায়ারহিত; অতএব পূর্ণব্রহ্ম; আমরা আপনার শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ১৭ ॥

৪। ত্বাং ব্রহ্ম কেচিদ্ বদন্তি পরে চ কালং
কেচিৎ প্রশান্তমপরে ভুবি কর্ম্মরূপম্।
পূর্ব্বে চ যোগমপরে কিল কর্ত্তৃভাব-
মন্যোক্তিভির্ন বিদিতং শরণং গতাঃ স্ম ॥ ১৮ ॥

কেহ আপনাকে বলেন ব্রহ্ম, কেহ বলেন কাল, কেহ বলেন প্রশান্তরূপ, কেহ বলেন পৃথিবীর কর্ম্মরূপী, কেহ বলেন যোগরূপ, কেহ বলেন কর্ত্তা,—এইরূপ বিভিন্ন বিরুদ্ধ উক্তি-পরম্পরাদ্বারা আপনার স্বরূপ নির্ণয় অসম্ভব; অতএব আমরা আপনার শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ১৮ ॥

৫। শ্রেয়স্করীং ভগবতস্তব পাদসেবাং
হিত্বাথ তীর্থ-যজনাদি তপশ্চরন্তি।
জ্ঞানেন যে চ বিদিতা বহুবিঘ্নসঙ্ঘৈঃ
সন্তাড়িতাঃ কিল ভবন্তি ন তে কৃতার্থাঃ ॥ ১৯ ॥

হে ভগবন্! সর্ব্বশ্রেয়স্করী আপনার পাদসেবা পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা তীর্থ-যজনাদি তপশ্চরণ করেন, কিংবা কেবল জ্ঞানদ্বারা আপনাকে বিদিত হইতে যত্ন করেন, তাঁহারা বহু বিঘ্নরাশিদ্বারা সন্তাড়িত হইয়া কৃতার্থ হইতে সমর্থ হন না ॥ ১৯ ॥

৬। বিজ্ঞাপ্যমদ্য কিমু দেব অশেষসাক্ষী
যঃ সর্ব্বভূত-হৃদয়েষু বিরাজমানঃ।
দেবৈর্নমদ্ভিরমলাশয়-মুক্তদেহৈ-
স্তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায় ॥ ২০ ॥

হে দেব! সম্প্রতি আপনার নিকট আমাদের কি আর বিজ্ঞাপনযোগ্য আছে? আপনি সর্ব্বভূত-হৃদয়বাসী ও অশেষ-সাক্ষী; শুদ্ধহৃদয়, পরম মুক্তজন এবং দেবগণও আপনার উদ্দেশে কেবল প্রণামই করিতে সমর্থ। হে ভগবন্! আমরা আপনার সেই পুরুষোত্তমরূপকে প্রণাম করি ॥ ২০ ॥

৭। যো রাধিকাহৃদয়-সুন্দর চন্দ্রহারঃ
শ্রীগোপিকা-নয়নজীবন-মূলহারঃ।
গোলোকধাম-ধিষণধ্বজ আদিদেবঃ
স ত্বং বিপৎসু বিবুধান্ পরিপাহি পাহি ॥ ২১ ॥

আপনি রাধিকা-হৃদয়ের সুন্দর চন্দ্রহার। গোপীগণের নয়ন ও জীবনের মূলহার এবং গোলোকধামের গৃহচূড়া। হে আদিদেব! আপনি দেবগণকে বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ২১ ॥

৮। বৃন্দাবনেশ গিরিরাজপতে ব্রজেশ
গোপালবেশ কৃতনিত্য-বিহারলীল।
রাধাপতে শ্রুতিধরাধিপতে ধরাং ত্বং
গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ উদ্ধর ধর্ম্মধারাম্ ॥ ২২ ॥

হে রাধেশ! হে বৃন্দাবনেশ! আপনি গিরিরাজ গোবর্দ্ধনপতি ও ব্রজপতিরূপে গোপালবেশে নিত্য লীলাবিহার করিয়া থাকেন। হে শ্রুতি-ধরাধীশ! আপনি গোবর্দ্ধনধারী, এক্ষণে ক্ষিতিকে উদ্ধারপূর্ব্বক ধর্ম্মরক্ষা করুন ॥ ২২ ॥

[গোকুলেশ্বর সাক্ষাদ্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রণত দেবগণকর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া মেঘগম্ভীরবাক্যে বলিতে লাগিলেন,—যুগে যুগে যখন পাষণ্ডগণ যজ্ঞ-দয়াদি ধর্ম্ম পণ্ড করে, তখন স্বয়ং আমিই ভূতলে অবতার পরিগ্রহ করিয়া থাকি।]

শ্রীভগবান্ আচার্য্য

শ্রীচৈতন্যপ্রিয় ভগবান্ আচার্য্যের জন্ম, শিক্ষা ও পূর্ব্বজীবন

অনন্ত সংহিতায়াং :—

"আচার্য্য শ্রীল ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-প্রিয়াংশভাক্"।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়াংশ-স্বরূপ শ্রীশ্রীভগবান্ আচার্য্য নবদ্বীপ ধামে শ্রীকর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্যাকরণাদি শাস্ত্রাধ্যয়নানন্তর ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিয়া 'ন্যায়াচার্য্য' নামে বিখ্যাত হন। বাল্যকালে তাঁহার শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। সেই সময় নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া বিষয়েতে ও কদর্য্য বামাচারাদিতে বিষম বিমুখ জীবসকলকে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নির্ম্মল প্রেমভক্তিদ্বারা কৃতার্থ করিতে লাগিলেন। এবং জীবশিক্ষার নিমিত্ত বৈরাগ্য-পথাবলম্বন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

আচার্য্যের বিবাহ, বৈরাগ্য ও স্ত্রী-বঞ্চনা

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস দেখিয়া আচার্য্যের কিঞ্চিদ্ বৈরাগ্যোদয় হইতে লাগিল। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় আর সংসারে মনোনিবেশ করেন না। সর্ব্বদাই মহাপ্রভুর সঙ্গ করিতে উৎসুক। এই সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া ঘোর বিষয়ী পিতা শ্রীশতানন্দ খান নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীমধুসূদন ঘটকের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইল। ইতিমধ্যেই গঙ্গার প্রবাহে তাঁহার, চন্দ্রশেখর আচার্য্যের ও মধুসূদন ঘটকের বাটী ভগ্ন হইয়া জলসাৎ হইলে, সর্ব্বাগ্রে মধুসূদন 'দ্বারবাসিনী'-নিবাসী দ্বারপাল নামক শূদ্র রাজার মালঞ্চ (যাহার নাম এক্ষণে শ্রীপাট মালীপাড়া) গ্রামে কেদারমতী নদীর দ্বীপে আসিয়া বাস করেন। কিন্তু ভগবানের বৈরাগ্য ও চৈতন্যদর্শনেচ্ছা বলবতী হওয়াতে তিনি স্বীয় পত্নীকে চন্দ্রশেখরের নিকট রাখিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনচ্ছলে পুরুষোত্তমে প্রস্থান করিলেন।

আচার্য্যপত্নীর 'জুলকুলে' আগমন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বরলাভ

যৎকালে মহাপ্রভু শ্রীপাট কুলীন গ্রামে আগমন করেন, সেই সময় তিনি জগদীশ পণ্ডিতের সহিত 'জুলকুলে' আসিয়া চন্দ্রশেখর আচার্য্যের সহ ও ভগবান্ আচার্য্যের পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আচার্য্যের পত্নী প্রভুকে

প্রণাম করিলেন ; প্রভু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—"তুমি পুত্রবতী হও।" ইহা শ্রবণ করিয়া আচার্য্যের পত্নী বলিলেন,—"প্রভো! কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে? আমার পতি একপ্রকার বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া পুরুষোত্তমে আছেন।" প্রভু কহিলেন,—আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। আমি পুরুষোত্তমে যাইয়া আচার্য্যকে পাঠাইয়া দিব; আর তোমার পুত্র হইলে জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য করিয়া দিবে।"—এইরূপ আদেশ করিয়া প্রভু চলিয়া গেলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে আচার্য্যের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন এবং মালঞ্চে অবস্থান

কিছুদিন পরে মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে যাইয়া নিজ প্রিয় আচার্য্যকে নানা-প্রকার প্রবোধবাক্যদ্বারা সান্ত্বনা করিয়া স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। আচার্য্য-প্রভুর আদেশানুসারে "জুলকুলে" আসিয়া পৌঁছিলেন। পরন্তু তাঁহাদিগের বাসের অসুবিধা হওয়াতে তাঁহারা উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখরের শিষ্য দ্বারবাসিনী-নিবাসী 'দ্বারপাল' নামক শূদ্র-রাজার পূর্ব্বোক্ত মালঞ্চে আসিয়া বাস করিলেন। ঐ গ্রামের নাম সেই হইতে মালীপল্লী অর্থাৎ মালীপাড়া হইল। প্রথমে তাঁহারা যে-পাড়াতে বাস করিয়াছিলেন, অদ্যাপি সেই পাড়া 'আচার্য্যপাড়া'-নামে বিখ্যাত। কিছুদিন পরে ভগবান্ আচার্য্যের দুই পুত্র হয়। একের নাম রঘুনাথ, অপরের নাম রমানাথ আচার্য্য। দুই জনেই জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য।

আচার্য্যের গৃহ-ত্যাগ ও পুরীতে প্রভুর সহিত সখ্যভাবে স্থিতি

তদনন্তর ভগবান্ আচার্য্য তাঁহার শিষ্য মধুসূদন ঘটকের পুত্রের নিকটে পুত্রদ্বয়ের সহিত পত্নীকে রাখিয়া পুনর্ব্বার পুরুষোত্তমে গিয়া যাবজ্জীবন বাস করিলেন।

পুরুষোত্তমে প্রভুপাশে ভগবান্ আচার্য্য।
পরম বৈষ্ণব তিঁহ সুপণ্ডিত আর্য্য॥
সখ্যতা আক্রান্তচিত্ত গোপ অবতার।
স্বরূপ গোঁসাই সহ সখ্য ব্যবহার॥
একান্তভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য-চরণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুরে তিঁহ করে নিমন্ত্রণ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

আচার্য্যের বংশাবলী

তাঁহার যে দুই পুত্র ছিল, তন্মধ্যে **রমানাথ আচার্য্য** অপুত্রক। তিনি জগদীশ পণ্ডিতের "শ্রীপাট যশোড়া"-নামক স্থানের গদি প্রাপ্ত হন।

জ্যেষ্ঠ **রঘুনাথ আচার্য্য** পৈত্রিক ধাতুময় শ্রীবিগ্রহ কেশব রায় জীউকে লইয়া মালীপাড়ায় বাস করিলেন। তাঁহার প্রথম পত্নীর গর্ভে দুই পুত্র হয়। একের নাম—শ্রীগোপীজনবল্লভ, অপরের নাম—শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রথম পত্নীর বিয়োগ হইলে রঘুনাথ আচার্য্য পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহ করেন। সেই পত্নীর গর্ভে রামদাস, শ্যামদাস ও কৃষ্ণদাস নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। কেবল কৃষ্ণদাসই মালীপাড়ায় রহিলেন। তিনি শিষ্যের নিকট হইতে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত-নামক শ্রীবিগ্রহ লইয়া স্বয়ং প্রকাশ করেন।

আচার্য্যের পুত্র রঘুনাথ ও তাঁহার পুত্র শ্রীবল্লভের পরিচয়

রঘুনাথ আচার্য্যের প্রথম পত্নীর গর্ভজাত দ্বিতীয় পুত্রের শ্রীবল্লভ নামক এক সন্তান হয়। কালে শ্রীবল্লভ অত্যন্ত সাধক হইয়া উঠিলেন। তিনি শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ নামক শ্রীবিগ্রহের-সেবা প্রকাশ করেন। পরে কোন পরম-হংস প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমদনগোপাল নামক শ্রীমূর্ত্তি তাঁহার হস্তগত হয়। তদ্বিবরণ বাহুল্য-বিধায় লিখিলাম না। শ্রীবল্লভের তিরোভাব উপলক্ষে মালীপাড়ায় ক্রমান্বয়ে চৈত্রমাসে তিনটী মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রথমটী শ্রীরামনবমীতে, দ্বিতীয়টী শ্রীরামনবমীর পর শুক্লা একাদশীতে আরম্ভ হইয়া সপ্তাহ-কাল হয়। তৃতীয়টী কোন্ তিথিতে হয়, তাহা আমরা জানি না।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

"যাহাদের আত্মবিৎএর নিকট নিজেদের ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ উদিত হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গ যতই প্রীতিপ্রদ হউক না কেন, উহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।"

"যাঁহারা সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া বুঝিতে না পারেন, তাঁহারা পুনরায় জগতের উন্নতি, সুখ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে গিয়া পরিশেষে নিষ্ফলতা লাভ করেন।"

—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ

নিগম ও আগম

'নিগম'-শব্দে বেদশাস্ত্রকে বুঝায়। নিগমে বেদমন্ত্রসমূহ বর্ত্তমান। আগম'-শব্দে মন্ত্রবিধি-শাস্ত্রকে বুঝায়। শ্রীজীবপাদ ভক্তিসন্দর্ভ ২০৭ সংখ্যায় ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কেহ কেহ মনে করেন, আগম বেদানুগ শাস্ত্র নহে, উহা নিগমের প্রতিযোগী হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা নহে। নিগম শাস্ত্রে মন্ত্রসমূহ বর্ত্তমান থাকিলেও সূত্র প্রভৃতিই তাহার পরিচালক বা বিধি-শাস্ত্র। সূত্র—শ্রৌত ও গৃহ্যভেদে দ্বিবিধ। এই সূত্রের কার্য্যই পুরাণ ও আগমাদিতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। সুতরাং পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদিকে বেদমূলক ব্যাখ্যাশাস্ত্র বলিতে দোষ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ নিগম-কল্পতরুর গলিত ফল। শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের শ্রীব্যাসকৃত ভাষ্য-গ্রন্থ। ব্রহ্মসূত্র বিস্তৃত বেদশাস্ত্রের বিভিন্ন মন্ত্রের সামঞ্জস্য-বিধায়ক সংক্ষিপ্ত সূত্র। আর শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—শ্রীমদ্ভাগবত ও পঞ্চরাত্র ভক্তির একই লক্ষণ গান করিয়াছেন। এজন্য পঞ্চরাত্র বা আগমকে কর্ম্মকাণ্ডীয় ন্যায় বেদ-প্রতিকূল শাস্ত্র বলিতে নাই। মূঢ়ের বিচারে ভ্রম হইলেই আগমকে বেদ-শাস্ত্রের প্রতিকূল তাৎপর্য্যবিশিষ্ট গ্রন্থ মনে হয়। শ্রীজীবপাদ ভক্তিসন্দর্ভ ২৯৮ সংখ্যায় 'স্মৃত্যর্থসার' এবং পদ্মপুরাণ হইতে যে শ্লোক উদ্ধার করিয়া অর্চ্চনাধিকারী নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতেও আমরা দেখিতে পাই—

সর্ব্বে চাগম-মার্গেণ কুর্য্যুর্বেদানুসারিণা।

অর্থাৎ সকলেই—পরমহংস, ত্রিবর্ণ এবং স্ত্রী-শূদ্রাদি পর্য্যন্ত সকল বর্ণই বেদানুসারি পঞ্চরাত্র-বিধানানুসারে ভগবানের অর্চ্চন করিবেন। অবৈষ্ণবগণ দীক্ষাবিধানের অভাবপ্রযুক্ত দ্বিজ না হওয়ায় তাঁহাদের অর্চ্চনাধিকার নাই। বৈষ্ণবগণের দীক্ষাবিধানক্রমেই দ্বিজত্ব বা ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ। অবৈষ্ণবের তাদৃশ বর্ণান্তরতার সম্ভাবনা নাই। বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবোপাসক সকাম হওয়ায় তাহাদের ইহজন্মে পাপ প্রশমিত হইবার উপায় না থাকায় তাহারা দ্বিজ হইবার সুযোগ লাভ করে না। তাহাদের বৈদিক সংস্কারে ইহজীবনে যোগ্যতা হয় না। অনন্য-বিষ্ণুভক্তের ইহজন্মেই দীক্ষাপ্রভাবে শিষ্টাচার বলেই ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ এবং বৈদিক সংস্কারসমূহই পঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার পরবর্ত্তিনী ক্রিয়া। বৈদিক সংস্কারাভাবে পঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার সম্পূর্ণতা হয় না।

অবৈষ্ণব স্মার্ত্তগণ যে মনগড়া মন্ত্র শূদ্রাদিকে প্রদান করিয়া দীক্ষাদাতা বলিয়া অভিমান করেন, তাহাতে বৈদিক সংস্কার-যোগ্যতা না থাকায় তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তার্হ হন মাত্র। স্মার্ত্তের পাতিত্যের ন্যায় বৈষ্ণবাচার্য্যের পাতিত্য-সম্ভাবনা নাই। বৈষ্ণবাচার্য্য গুরুদেবের নিকট যে মন্ত্র লাভ করেন, তাহাই অনধিকারীকে সম্পূর্ণভাবে প্রদান করিয়া তাহাকে নিজসদৃশ উন্নত করেন। অবৈষ্ণব গুরুর কার্য্য করিতে যাওয়ায় তিনি গুরুর নিকট হইতে যে মন্ত্র লাভ করিয়াছেন, তাহাতে স্বাহা ও প্রণবাদি থাকায় অবৈষ্ণবকে মন্ত্র-প্রদানে তাঁহার অনধিকার হইতেছে। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যের মন্ত্র কল্পিত না হওয়ায় তাঁহার পাতিত্য হয় না।

মূঢ় অবৈষ্ণবগণ মনে করেন, বৈষ্ণবগণ বৈদিক সংস্কার গ্রহণ না করিয়া পঞ্চরাত্রিক সংস্কারমাত্র স্বীকার করেন, সুতরাং বৈদিক সংস্কার কেবলমাত্র মূর্খ অবৈষ্ণবগণেরই স্বায়ত্তীকৃত বিষয়। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। মূল কথা এই যে, বৈদিক সংস্কারসমূহ কলিহত ব্রাহ্মণকুমারগণের প্রাপ্য নহে, এই বিচারের হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই পাঞ্চরাত্র দীক্ষার অন্তর্গত বৈদিক সংস্কারের আবশ্যকতা—এ কথাই বৈষ্ণবাচার্য্য শাস্ত্রপ্রমাণমূলে শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু অবৈষ্ণবগণ বলেন যে,—বৈষ্ণবের যজ্ঞসূত্রে পঞ্চরাত্রিক স্বতন্ত্র চিহ্ন থাকা আবশ্যক। বৈষ্ণবাচার্য্য বলেন,—বৈদিক সংস্কারে চিহ্নান্তর-গ্রহণ শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিরুদ্ধ এবং তাহা বেদবিরুদ্ধ। পঞ্চরাত্রিক অধিকার ব্যতীত স্বতন্ত্র বৈদিক সংস্কার-বিষয়েই যে আপত্তিসমূহ বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ বলিতেছেন, তদ্দ্বারাই অবৈষ্ণবগণের বৈদিক সংস্কারাধিকার বিপন্ন হইয়াছে মাত্র। এই বিপদ হইতে অর্থাৎ শূদ্রতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই আগম-মার্গের ব্যবস্থা পূর্ব্বাচার্য্যগণ শাস্ত্রপ্রমাণমূলে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের অধস্তন হইয়া সেই পূর্ব্ব পরিচয় অন্যায়পূর্ব্বক দিয়া যদি কেহ বৈদিক সংস্কারমাত্র গ্রহণ করিবার পক্ষপাত দোষ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পূর্ব্বাচার্য্যের বিচারবিরোধী গুর্ব্ববজ্ঞাকারী অপরাধীজ্ঞানে শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজ পরিবর্জ্জন করিবেন মাত্র। বৈষ্ণবগণ অবৈষ্ণবের গলদেশস্থ সূত্র ও কণ্ঠী অপনয়ন করাইয়া তাহাকে শূদ্র বলিয়া জানিবেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

———

অষ্টগ্রহ-সমাবেশরূপ বিপদাপদেও ভক্তগণের হরিকীর্ত্তনমুখে হরিভজন কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা
পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)
ইং ৩।১।১৯৬২

স্নেহাস্পদেষু—

* * *! * * * নামীয় তোমার ইন্‌ল্যাণ্ড লেটার দেখিলাম। অষ্টগ্রহের সমাবেশে বৈকুণ্ঠবাসীর কিছু আসে যায় না। তবে **সাধক জীবমাত্রেরই সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন বিধেয়।** তন্মধ্যে কোন একটা উপলক্ষ আসিয়া হাজির হইলে তখন হরিকীর্ত্তনের সুযোগ উপস্থিত হইল মনে করিয়া প্রচুর আনন্দের সহিত হরিকীর্ত্তন ও হরিভজন করিতে হইবে।

পৃথিবীর লোক চিরদিনই হরিকীর্ত্তন-বিরোধী। ভগবদিচ্ছাক্রমে গ্রহ-উপগ্রহসকল তাহাদের হরিবিরোধিতার জন্য—শাসন করিবার জন্য ভীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। পাপী ও অপরাধী ব্যক্তিগণ ভগবৎ-শাসন এড়াইবার জন্য ভগবানের আনুগত্য প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করে। মঙ্গলময় ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণের অভিসম্পাত হইতে রক্ষা করেন। ইহা তাহাদের রক্ষাকবচ হইলেও এইরূপ দুর্ঘটনা পুনঃ সংঘটিত হইলেই হরিপ্রীতিমূলক কার্য্যে স্বায়ীচেষ্টা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

আমরা হরিবিরোধী কার্য্য দেখিয়া মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ি। সুতরাং স্বয়ং ভগবান্ আমাদের ক্ষুণ্ণ মনে শান্তি দিবার জন্য জগতে বিপদ-আপদ প্রেরণ করেন। তাহাতে বিশ্ববাসী কর্ম্মি-জ্ঞানি-সম্প্রদায় বিপদভঞ্জন হরির ভজনচেষ্টা প্রদর্শন করে। সেই সুযোগে কর্ম্ম-জ্ঞানের চেষ্টা হ্রাস পাইলে ভগবদ্ভক্তগণের সেবাচেষ্টার সুযোগ ঘটে।

বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের পক্ষে যাহা বিপদ, অন্তর্ম্মুখ ব্যক্তিগণের পক্ষে তাহাই সম্পদ। সুতরাং গ্রহ-সমাবেশের দ্বারা ভগবদ্ভক্তগণের সেবা-সুযোগ মিলিয়া থাকে। স্মার্ত্ত বহির্ম্মুখগণও 'ভগবান্ মধুসূদন ব্যতীত অন্য কেহ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার নাই' জানিয়া ভগবদ্ভজনের চেষ্টা

করে। তখন প্রতীপজনেরও অনুকূল চেষ্টা লক্ষ্য করিয়া ভগবদ্ভক্তগণ মহানন্দে নামযজ্ঞ বা হরিকীর্ত্তনযজ্ঞ করিয়া থাকেন। আমরা তাহাই করিব।

ওখানকার সকল ভক্তগণকে এই পত্র পড়িয়া শুনাইবে ও তদনুসারে কার্য্য করিতে উপদেশ দিবে। আমি আগামীকল্য মথুরা যাইতেছি। তথা হইতে জয়পুর হইয়া ২৪শে জানুয়ারী নবদ্বীপ ফিরিব। তোমাদের কুশল দিবে।

ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রীমায়াপুরে জন্ম-মহোৎসবে

শ্রীমন্মহাপ্রভু-দর্শনে

আজি কি মধুর ভাব হয়েছে এখানে,
এসেছে ভক্তগণ গোরা দরশনে,
মধুর চাঁদনি রাতি, মধুর সাজের ভাতি,
মধুর মৃদঙ্গরোল বাজিছে কেমনে,
চারিদিকে হরিধ্বনি হয় ঘনে ঘনে।

দেখ জগন্নাথ-গৃহে শচীর কোলেতে,
বিরাজিছে ভগবান্ পুত্র-স্বরূপেতে,
এসেছি আমরা ভাই, বহুদূর হ'তে তাই,
শচীর নন্দনে আজি দেখিবার তরে,
ফাল্গুনী-পূর্ণিমা দিনে এই মায়াপুরে।

দয়াল গৌরাঙ্গচাঁদ দয়া করি মোরে,
যুগল চরণ তব দাও মোর শিরে,
তুমি দয়া না করিলে, প্রেমভক্তি কোথা মিলে,
জগতজনেরে তুমি প্রেম বিতরিলে,
শুধু কি আমার প্রতি বিমুখ হইলে!

সংসার-যাতনা প্রভো বড়ই ভীষণ,
কৃষ্ণ-বিমুখের দণ্ড—বিষয়ি-জীবন।
আজি এই মায়াপুরে,　　তোমা দেখিবার তরে,
কেমনে আসিব বলে কতই ভেবেছি,
তব দয়া হ'ল তাই আসিতে পেরেছি।

জড় কাজে মত্ত হ'তে হবে পুনরায়,
রসংসা-বাগুরা মাঝে ঊর্ণনাভি প্রায়,
আবার সংসার পেলে,　　তোমারে রহিব ভুলে,
থেকো তুমি দয়াময় স্মরণে আমার,
সদাই করিব সেবা চরণ তোমার।

আজি এই মায়াপুরে সব ভক্তগণে,
তোমা সাথে হেরি প্রভু আনন্দিতপ্রাণে,
কি যে পুলকিত আমি,　　হয়েছি জগত স্বামী,
কেমনে করিব ব্যক্ত না পারি বলিতে,
পারিব না হেন দিন জীবনে ভুলিতে।

সেবাসুখ-লাভ আশা থাকে যদি মনে,
এস শোকদগ্ধ জীব এই দিব্যস্থানে,
শান্তির আধার ওই,　　বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ যেই,
মায়াপুরে যোগপীঠে কর দরশন,
তাঁহার চরণে সঁপি জুড়াও জীবন।

আরো দেখ সম্মুখেতে শ্রীরাধামাধব,
জীবে দয়া বিস্তারিতে প্রকট বিভব,
ভাগীরথী স্নান করি,　　দরশন করি হরি,
পাইয়া প্রসাদ-মালা গাও ভক্ত সবে,
হরিনাম বিনা আর কি আছে এ ভবে॥

—শ্রীমতী শ্যাম সরোজিনী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিতে

শ্রীল ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা

শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ, পুরী (উড়িষ্যা), তাং ২১।১২।১৯৮৯

আগন্তুক শ্রোতৃমণ্ডলী! আমার স্নেহের নন্দনন্দন গতকাল আমাকে গিয়ে বলল যে, মহারাজ! আগামীকাল তার গুরুদেবের আবির্ভাব-তিথি। আপনি অসুস্থ, তথাপিও যদি গিয়ে কিছু হরিকথা পরিবেশন করেন, তাহলে আমরা খুব খুশী হব। তাই আমি আজ এখানে এসেছি। বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্য—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ। আমি যতটা জানি—যদিও সেখানে প্রত্যক্ষ আমি ছিলাম না, যখন শ্রীল কেশব মহারাজ অসুস্থ লীলাভিনয়কালে এই গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্য নির্ণয় করে যান, শ্রীপাদ সিদ্ধান্তী মহারাজ আমাকে বলেন যে,—মহারাজ! কেশব মহারাজের শারীরিক অবস্থা সুবিধার নয়। তিনি শেষ সময়ে বলে গেছেন যে, 'বামন মহারাজ শ্রীসমিতির আচার্য্য হবেন।' এখন সমিতির আচার্য্য শ্রীপাদ বামন মহারাজ। আমরা দুজনে একসঙ্গে বহুবৎসর মায়াপুরে কাটিয়েছি। তখন আমরা ছিলাম ছেলেমানুষ। মায়াপুর তখন জঙ্গল। নরহরি দাদা এবং বিনোদ দাদা ছিলেন আমাদের অভিভাবক। তাঁদের কথামত উঠেছি, বসেছি। আজ তাঁরা নাই। তাঁরা প্রকট না থাকলেও নিত্যধাম থেকে সবকিছু প্রত্যক্ষ করছেন। আমাদের মত নন তাঁরা।

অধুনা কতকগুলো লোক 'গৌড়ীয় মঠের আশ্রিত' বলে পরিচয় দিয়ে বহু অপসিদ্ধান্তপূর্ণ কথা বলছেন। তাদের অন্ততঃ প্রভুপাদের শিষ্য আমরা যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন স্বীকার করব না। যেমন তারা বলছে,—আচার্য্যের জন্মতিথি প্রতিপালিত হবে না, যেদিন দীক্ষা নিয়েছেন সেদিন প্রতিপালিত হবে। এটা সম্পূর্ণ ভুল সিদ্ধান্ত, কখনই হতে পারে না। শাস্ত্রে বলছেন,—"ঈশ্বরের জন্মতিথি যে হেন পবিত্র। বৈষ্ণবের জন্মতিথি সে হেন পবিত্র॥" যারা গুরুদেবের জন্মটাকে জন্ম বলে ভেবে নিচ্ছে, তাদের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু নয়। জন্মটা হচ্ছে কর্ম্মফলবদ্ধ জীবের। ভগবান্ বা বৈষ্ণবগণ যে জগতে আসেন, সেটা তাঁদের জন্ম নয়—আবির্ভাব। আর যখন তাঁরা চলে যান, তখন সেটা তিরোভাব। তাঁরা যে তিথিটাকে অবলম্বন

করে আসেন, সে তিথিটা শিষ্যদের কাছে পরম পবিত্র এবং সেটা প্রতিপালন-যোগ্য। সেই তিথি প্রতিপালন করলে হরিভক্তি হবে। প্রতিপালন না করলে অন্যথা করা হবে বলছেন। 'আবির্ভাব-তিরোভাব—বেদে মাত্র কয়।' সূর্য্য উদিত হচ্ছেন মানে সূর্য্য জন্মগ্রহণ করছেন—এটা বলা ভুল। আবার সূর্য্য অস্তাচলে চলে গেছেন বলতে তিনি মারা গেছেন—এটাও ভুল সিদ্ধান্ত। আমাদের নিকট এসে যখন উপস্থিত হন, তখন সেটা আবির্ভাব; যখন চলে যান সেটা তিরোভাব। তাঁরা আমাদের মত জন্মগ্রহণ করেন না, মৃত্যুবরণও করেন না। এইজন্য গীতাতে কৃষ্ণ বলছেন,—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যে বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥

আমার জন্ম এবং কর্ম্ম দিব্য। দিব্য মানে অলৌকিক, ব্যবহারিক নয়। একটা লৌকিক—ব্যবহারিক, আর একটা পারমার্থিক। ব্যবহারিক ও লৌকিকের সঙ্গে পারমার্থিকটাকে ঐক্য করে ফেললে অপরাধ হয়ে যাবে।

আজ শ্রীপাদ বামন মহারাজের আশ্রিত যারা আছেন, তারা ভাগ্যবান্। গুরুতত্ত্বটা কি? সেটা বুঝে নিয়ে চলবার চেষ্টা করবেন, যে যাহাই বলুন না কেন। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, চোখে দেখি না, অনেক সময় জানা জিনিস মনে আসে না। সেজন্য আজকের আলোচনা করবার জন্য আমি পরপর কয়েকটা Point লিখে এনেছি। সেইটা পড়ে আপনাদের কাছে বলবার চেষ্টা করছি। জিনিসগুলো বুঝবার চেষ্টা করবেন। শাস্ত্র বলছেন,—

আদৌ গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণ-দীক্ষাদিশিক্ষণম্।
বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবা সাধু-বর্ত্মানুবর্ত্মনম্॥

পরমার্থ-পথের পথিক হতে গেলে, ভগবানের কাছে যেতে গেলে 'আদৌ গুরুপাদাশ্রয়' অর্থাৎ প্রথমে গুরু পাদাশ্রয় করতে হবে। 'আশ্রয়'-শব্দের অর্থ কি?—আশ্রয়-শব্দের অর্থ হল দীক্ষাগ্রহণ। দীক্ষা নিতে হবে। শুধু দীক্ষা নিলে হবে না, শিক্ষাও গ্রহণ করতে হবে তাঁর কাছ থেকে। আর কি? বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা করতে হবে। হ্যাঁ, আমি এঁর সেবা করলে পরে আমার কল্যাণ হবে—এই বোধটা রাখতে হবে। লৌকিক-ব্যবহারিক নয়, পারমার্থিক বিশ্বাসটা রাখা প্রয়োজন। 'বিশ্বাস'-শব্দে কি বলছেন,— 'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ়-নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥

—একেই বলছেন বিশ্বাস। 'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস। বিশ্বাসটা কিরকম? আমি আপনাদের কাছে একটা উদাহরণ দিচ্ছি।—

কৃষ্ণ গোচারণ করে ফিরে আসছেন। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম প্রভৃতি সখাগণ তাঁরা আগে চলে এসেছেন। কৃষ্ণ পিছন থেকে দেখছেন যে, তাঁরা কালীয়দহের বিষাক্ত জল অঞ্জলি ভরে পান করছেন। কৃষ্ণ ছুটে এসে এক থাপ্পড় দিয়ে বললেন,—করছ কি তোমরা? এই জল বিষে পরিপূর্ণ। এর উপর দিয়ে পাখী উড়ে গেলে সে মরে যায়। আর তোমরা এই জল পান করছ! তোমরা যে মারা যাবে। তখন সখারা কি বলেছিলেন?—কানাই! এই প্রকার সামান্য বিশ্বাস নিয়ে তোমার সখারা তোমাকে ভালবাসে না। আমরা জানি, আমরা যা পান করছি এটা বিষ নয়—অমৃত। আমরা বিষপান করতে পারি না। আমরা অমৃত পান করছি। আমাদের মৃত্যু হতে পারে না। একেই বলে বিশ্বাস। অতএব গুরুপাদপদ্মে বিশ্বাস রেখে অঞ্জলি দিলে, পূজো করলে, তাঁর সেবা করলে, তাঁর আদেশ প্রতিপালন করলে আমার কল্যাণ হবে। এই সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে যে শিষ্য চলবে, তার আত্মকল্যাণ হবেই। কিরকম?—'বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবা সাধু-বর্ত্মানুবর্ত্মনম্'।—আমরা যে সৎপথে চলব, সেই সৎপথের দ্রষ্টা হচ্ছেন তিনি। তিনি দেখিয়ে দেবেন পথ। এই হচ্ছেন গুরুতত্ত্ব। এটাকে ভাল করে বুঝতে হবে। আর কি বলছেন,—

'তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।'

কেন গুরু করব? গুরুকরণটা কি লৌকিকতা, ব্যবহারিকতা?—না, এটা লৌকিকতা নয়। 'জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্'—এখানে শ্রেয় এবং উত্তম দুটো শব্দ প্রয়োগ করেছেন। কিরকম শ্রেয়?—উত্তম শ্রেয়। শুধু শ্রেয় বললে হবে না। উত্তমশ্রেয়—বাস্তবকল্যাণের জন্য গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতে হবে। সেই গুরু কেমন?—'শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতম্'—তিনি শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মে নিষ্ণাত। শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম একটাই জিনিস—Identical। এই জগতের যে শব্দ, সেটা Meterial Sound, সেটা শব্দব্রহ্ম নয়, শব্দসামান্য। আর পরজগতের যে শব্দ সেটা Transcendental Sound—অপ্রাকৃত শব্দ। সেইটাই হল শব্দব্রহ্ম। অতএব তিনি শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত। আমরা বুঝতে পারছি না, কিন্তু তিনি ভগবানের নিকটেই রয়েছেন। এই উপলব্ধিটুকু থাকবে—এইজন্য গুরুপাদাশ্রয়। তা না হলে আর কিছুর জন্য নয়। সেই গুরুর লক্ষণ কি কি?—গুরুর লক্ষণ বহু আছে। আমি কিছুটা আলোচনা

করব। তিনি কিরকম?—তিনি কৃপাসিন্ধু, কৃপার সমুদ্র, দয়ার সাগর। তিনি সুসম্পূর্ণ। সেখানে কোন অভাব আছে, অসম্পূর্ণতা আছে আমার গুরুদেবেতে—এই বোধ যেন শিষ্যের না হয়। তিনি সম্পূর্ণ, সর্ব্বসত্ত্বোপকারক—সকল সত্তার উপকারক। তাঁর কাছে যে যাবে তার কল্যাণ হয়ে যাবে। এই যে চেতন জীব তাঁর সংস্পর্শে গেলেই কল্যাণ লাভ করবেই করবে, এমন কি জড়বস্তু পর্য্যন্তও। গুরুর যে পাদুকাটী, সেটা জড় না চেতন? কিন্তু সেটাকে আমরা প্রণাম করছি। কেননা পাদুকাটী গুরুদেবের সংস্পর্শে গিয়ে প্রণম্য হয়েছে। শ্রীগুরুদেব হলেন নিঃস্পৃহ। তাঁর কোন স্পৃহা নাই, কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা নাই। তিনি সর্ব্বতোসিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ। সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শী তিনি। তিনি সর্ব্বসংশয়চ্ছেত্তা—শিষ্যের যাবতীয় সংশয় ছেদন করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। শিষ্য একটা প্রশ্ন করল, গুরু উত্তর দিতে পারলেন না, তিনি গুরু নন। গুরুদেব অনলস—তাঁর কোন অলসতা নাই। তাঁকে বলা হয়েছে গুরু, তিনিই গুরু। সকলেই গুরু হতে পারেন না।

অনেকে বলেন,—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু সমান। আমি বলছি না, শাস্ত্র বলছেন। হ্যাঁ, সমান বলেছেন, কি বিচার আছে? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানবেন,—

নৈবোপয়ন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্য্য-চৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥

যিনি চৈত্যগুরুরূপে আমার ভিতরে রয়েছেন, তিনিই মহান্তগুরুরূপে জগতে প্রকটিত।　　শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ॥

অন্তর্যামিরূপে চৈত্যগুরু আর ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে মহান্তগুরু অর্থাৎ দীক্ষাগুরু। এই দুটো রূপ তাঁর। যিনি অন্তর্যামিরূপে রয়েছেন, তিনিই আবার ভক্তশ্রেষ্ঠ রূপে জগতে প্রকটিত রয়েছেন, তিনিই হলেন দীক্ষাগুরু। অতএব তাঁকে যদি অন্য কোনরকম বোধ করা যায়, তাহলে সুবিধা হবে না। কেউ কেউ বলছেন, দীক্ষাগুরু অপেক্ষা শিক্ষাগুরু অধিক পূজনীয়, প্রণম্য। এটা ভুল সিদ্ধান্ত। কেন? ভাল করে জিনিসটা বুঝতে হবে। শাস্ত্রে বলছেন,—

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।
তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন॥

প্রথমে দীক্ষাগুরুর কথা বলেছেন, পরে শিক্ষাগুরুর কথা বলেছেন। দীক্ষাগুরুর একত্ব এবং শিক্ষাগুরুর বহুত্ব। শিক্ষাগুরু অনেক হতে পারেন। সকলকে কি শিক্ষাগুরু স্বীকার করা যাবে?—না, কখনও নয়। (ক্রমশঃ)

বর্ষারম্ভে নিবেদন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার শুভ দ্বিচত্বারিংশ-বর্ষারম্ভে তদীয় অযোগ্য ও সর্ব্বাধম সেবকসূত্রে শ্রীপত্রিকার মূল কেন্দ্রবিন্দু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সেবনার্থে তদীয় কৃপাশক্তি লাভেচ্ছায় তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সংখ্যাতীত ভক্তিপূর্ণ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীপত্রিকাখানি তাঁহারই শাব্দিক প্রকাশস্বরূপে জীব-কল্যাণে বর্ত্তমান। তাঁহারই বিচারধারা ও অপ্রাকৃত চিন্ময় অনুভূতিই এই পত্রিকার স্বরূপ। শ্রীপত্রিকা অন্বয়-ব্যতিরেকে তাঁহারই চিন্তাস্রোতে পরিপুষ্ট। তাঁহারই গম্ভীর কণ্ঠস্বর ও অদমনীয় নির্ভীকতা ও সত্যানুরাগই শ্রীপত্রিকার প্রাণ। তাঁহারই সুষ্ঠুপালিত আম্নায় ও গুরু-পারম্পর্য্যই ইহাতে উদ্ভাসিত। মায়িক ছলনা ও কপটতা এই পত্রিকায় প্রকাশ পায় না। সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের ছলনায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ ইহাতে প্রশ্রয় পায় না। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ ছলনারও ইহাতে আশ্রয় নাই। ইহাতে কেবলমাত্র "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র-পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং" বাক্যের সার্থকতা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। প্রাকৃত সংবাদপত্রের ভোগবাদের উন্মত্ততা ইহাতে স্থান পায় না। ইহা চিন্ময় বার্ত্তাবহ-স্বরূপ শ্রীরূপ-রঘুনাথের এবং রূপানুগ গুরুবর্গের শিক্ষাধারায় পরিপুষ্ট। কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগীর চেষ্টাকে ধিক্কৃত করিয়া ইহাতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের মহিমা সমুদ্ভাসিত। ইহাতে রুচিবিশিষ্ট পাঠক-পাঠিকাগণও জগদ্বরেণ্য, মাননীয় এবং পূজনীয়। বর্ষারম্ভে তাঁহাদিগকেও আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

'পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে। ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥' এরূপ সত্যকথা বলিবার সাহসিকতা যাহাদের নাই তাহারাই সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়-বাদের ছলনায় সরল জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকে। তাহারাই প্রেমের অপব্যাখ্যা করিয়া 'প্রেম' শব্দকে জীবের প্রতি যোজনা করিয়া সত্যভ্রষ্ট মিথ্যাচারী হইয়া থাকে। এই প্রকার চেষ্টাকে শাস্ত্র উৎপাত বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন—"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্॥" প্রেমের আশ্রয় জীব এবং বিষয় ঈশ্বর বা ভগবান্। আশ্রয়-বিষয়-জ্ঞানহীন ব্যক্তিই অপসিদ্ধান্তপর ধারণা পোষণ ও প্রচার করিতে পারে; তাহাদের এই কার্য্যকে কখনই শাস্ত্র-সম্মত বা সত্য

বলিয়া সিদ্ধান্তবিদ্ ব্যক্তি গ্রহণ করেন না। গ্রাম্যকথায় এরূপ বিচারকে "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে" বলা হয়। "মায়াধীশ-মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।" সুতরাং যে প্রেম ঈশ্বরের প্রতি প্রযোজ্য তাহা মায়াবশযোগ্য জীবের প্রতি প্রযোজ্য হয় না। ঈশ্বরের প্রাপ্য বস্তু জীবকে উপহার প্রদান করিলে মূর্খতারই পরিচায়ক হয় না কি? মালিকের প্রাপ্য সম্মান ভৃত্যকে প্রদান করা কর্ত্তব্য ও সঙ্গত নহে। ইহা পায়ের জুতা মাথায় রাখার ন্যায় নির্ব্বোধিতা। জীবকে ঈশ্বর বা ভগবান্ বলা যেরূপ দোষাবহ, জীবের প্রতি প্রেমের বিধানও সমপরিমাণ দোষাবহ।

"পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ"—এই বাক্য যদি সত্য হয় তবে জীবকে "ঈশ্বরজ্ঞানে" সেবা করার উপদেশ অসঙ্গত হইয়া পড়ে। যিনি মায়াবদ্ধ তাহাকে ঈশ্বর জ্ঞান করিলেও তাহার সেবায় ঈশ্বরসেবার ফল হয় না। মূর্খ হইতে পাণ্ডিত্যের ফল লাভ হয় না। মূর্খকে পণ্ডিত বলিলে মূর্খের প্রতি অতিস্তুতি এবং পণ্ডিতের প্রতি অসম্মান প্রকাশ পায়। "অতিস্তুতি হয় নিন্দার সমান।" সুতরাং এরূপ কার্য্য উভয়ের প্রতিই অপমানজনক হইয়া থাকে। ইহাতে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল লাভই হইবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ জীবকে তাঁহার জীব বা তটস্থা শক্তির অংশ বলিয়াছেন—

১। "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ (গীঃ ৭।৫)

২। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" (গীঃ ১৫।৭)

সুতরাং জীব শক্তিতত্ত্ব; শক্তিমত্তত্ত্ব নহেন। মুক্ত হইলেও তিনি শক্তিমান্ হইতে পারেন না। সুতরাং "পাশমুক্তো ভবেচ্ছিবঃ" বাক্যের ব্যাখ্যা জীব মুক্ত হইলে ঈশ্বর হইবেন—বলা অসঙ্গত। কারণ "পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ" বাক্যে পাশমুক্তশিব বস্তুই পাশবদ্ধ হইয়া থাকেন বুঝায়। যে ঈশ্বর পাশ বা মায়াবদ্ধ হইয়া পড়েন, তাঁহার ঈশ্বরত্ব মিথ্যা হইল না কি? অতএব জীবকে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করা মূর্খতারই পরিচায়ক। পরন্তু তাহাকে ঈশ্বরশক্তি-জ্ঞানে সমাদর করা কর্ত্তব্য। পরমমুক্ত ও পরমদয়াল ভগবদ্দাসগণ জীবের পাশবদ্ধদশার ক্লেশমুক্তির জন্য তাহার মায়াবন্ধন ঘুচাইয়া তাহাকে নিত্য ভগবদ্দাস্য-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। "পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ, পাশমুক্তো ভবেচ্ছিবঃ" বাক্য স্বীকার করিলে ব্রহ্মের দুই প্রকার অবস্থা অথবা দুই ব্রহ্ম স্বীকার করা হয়। ইহাতে অদ্বয়তত্ত্বের অস্বীকার-দোষ হয়। সুতরাং ব্রহ্মই মায়াবশ হইয়া জীব হয় না, ব্রহ্ম মায়াধীশ। ব্রহ্মের

জীবশক্তিই মায়াদ্বারা বশীভূত হইয়া থাকে। সুতরাং শক্তিরূপ জীবকে শক্তিমান্ ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করা অজ্ঞতামাত্র।

"হায় হায় আমি ভক্ত হইতে পারিলাম না, আমার সাধনা বিফল হইল"—সমন্বয়বাদী যদি একথা বলিয়া থাকেন, তাহাতে ভক্তিপথকে তাঁহার সাধনার পথ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করা হইল না কি? অথচ ভক্তিপথ এবং তৎপথে সাধ্যবস্তুই শ্রেষ্ঠ বলিলে তাহা গোঁড়ামি হইল—এরূপ কথা তিনি বলেন কি করিয়া? অতএব ইহাতে বুঝা যায়—তাঁহার এই খেদোক্তি প্রকৃত খেদোক্তি নহে, তাহা কপটোক্তি মাত্র।

অন্বয় (অনু+অয়) পদের অর্থে কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়াদি পদসমূহের যথাক্রমে বিন্যাসকে বুঝায়। যাহার যেই স্থান তাহাকে সেই স্থানে স্থাপন বা রক্ষা করা বুঝায়। ইহাতে অগ্রপশ্চাৎ অধিকার অবশ্যই বর্ত্তমান থাকে। খুশীমত যত্র তত্র স্থাপন করাকে অন্বয় বলে না। সমন্বয় পদও তদ্রূপ অগ্রপশ্চাৎ বা উচ্চাবচ অধিকারের সুষ্ঠুসূচক পদ। ইহা নিলামওয়ালার হরেকমাল একমূল্যের সামগ্রী নহে। শাস্ত্রে তজ্জন্য পর, পরতর ও পরতম পদগুলি তত্ত্ব এবং ধর্ম্ম—সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা উপেক্ষা করিয়া গায়ের জোরে সকলকেই সমান বলিলে সমান হইবে না। নিজ মনে 'মনকলা' খাওয়া হয় মাত্র।

সমন্বয়বাদী নিজ মতবাদ অর্থাৎ সকল ধর্ম্মেরই সাধ্য বস্তু এক—এইরূপ মিথ্যা বিচারকে সত্য, শ্রেষ্ঠ বা পরম বলিয়া মনে করেন—ইহাতে তাহার নিজের গোঁড়ামি প্রকাশ পাইতেছে তাহা বুঝিতে পারেন না, কিন্তু প্রকৃত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাবলম্বী যদি তাঁহার ধর্ম্মীয় চিন্তাস্রোতকে শ্রেষ্ঠ বা পরম বলেন, তাহা হইলেই 'গোঁড়ামি' প্রকাশ পাইল এবং তিনি উৎক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন না। পরহংস ও পরমবদ্ধ, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, বিদ্বান্ ও মূর্খ, আলোক ও অন্ধকার, ঈশ্বর ও জীব কখনই এক ভাবাপন্ন বস্তু নহে। উদারমত প্রকাশ করিতে গিয়া সত্যের অপলাপ কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি পন্থার ফল একই—ইহা শাস্ত্রে কথিত হয় নাই। কর্ম্মের ফল ভুক্তি, জ্ঞানের ফল মুক্তি, যোগের ফল অষ্টাদশসিদ্ধি ও কৈবল্যমুক্তি এবং ভক্তির ফল প্রেম বলিয়া শাস্ত্রে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগপথে কখনই প্রেম লভ্য হয় না। নির্ব্বিশেষবাদে ত্রিপুটী না থাকায় অর্থাৎ সেব্য, সেবক ও সেবার বর্ত্তমানতা বিলুপ্ত হইয়া একমাত্র ব্রহ্মের পক্ষে প্রেমধর্ম্ম থাকিতে পারে না। কর্ম্মপন্থী—ভোগী; সে ঈশ্বরকেও ভৃত্যের ন্যায় ভোগ করিতে চাহে। ভৃত্যকে বেতন-

স্বরূপ সামান্য অর্থপ্রদান করিয়া তদ্দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করাই তাহার ভৃত্যকে বেতন প্রদান করা। ইহা ভৃত্যের প্রতি ভালবাসার ছলনা। কর্ম্মীর ঈশ্বরোপাসনাও তদ্রূপ। তাহার পূজা, নৈবেদ্য ও স্তবস্তুতি সমস্ত ঈশ্বর হইতে ভোগের বস্তু সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের প্রতি মমত্বহীনতা ও নিজসুখতাৎপর্য্যই তাহার পূজাদির প্রকৃত স্বরূপ। তাহার পূজা ও স্তবাদি প্রেমপ্রসবিনী ভক্তি নহে, উহা ছলভক্তি মাত্র। জ্ঞানী কর্ম্মী অপেক্ষা বুদ্ধিমান্। তিনি বুঝিয়াছেন,—ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ভোগ্যবস্তু মাত্রেই ধ্বংসশীল। সুতরাং এই ধ্বংসযোগ্য বস্তুতে আসক্ত হইলে ক্লেশ ও শোক পরিণামে লভ্য হয়। তজ্জন্য "কৃতাত্যয়ে অনুশয়বান্ দৃষ্ট স্মৃতিভ্যাং" বাক্যকে শিরোধার্য্য করিয়া মায়িক ব্রহ্মাণ্ডকে অতিক্রম করত জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোক লাভ করাকেই শ্রেয় বলিয়া বিবেচনা করেন। এতদ্দ্বারাই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিকেই মুক্তিরূপ ফল বলিয়া স্বীকার করেন। তাহাদের এই চেষ্টাও আত্মসুখ-তাৎপর্য্যপর। ইহাতেও ঈশ্বরে মমত্ববুদ্ধির অবকাশ নাই। ইহা কর্ম্মী অপেক্ষা অধিকতর ভোগচেষ্টা। ইহাকে চরম কপটতা বলিয়া বিচারিত হইয়াছে।

"তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥"

যোগিগণও মায়িক জগৎ অতিক্রম করত পরমাত্মতত্ত্বে লীনতা প্রাপ্তি হওয়াকেই সাধ্য বলিয়া জ্ঞান করেন। পরমাত্মায় লীন হইলে প্রেম কাহার প্রতি প্রযুক্ত হইবে? ইহাদের কেহই ভগবত্তত্ত্বের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন না। তাহারা ভগবানকে প্রাকৃত দেহধারী মায়িক সত্ত্বগুণাত্মক তত্ত্ব বলিয়া ধারণা করিয়া তাঁহার প্রতি অনাদরও করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভগবানকে সচ্চিদানন্দ বস্তু এবং অপ্রাকৃত তত্ত্ব বলিয়া বিচার করিতে সক্ষম হন না এবং তাঁহার প্রতি আদর ও মমত্ব লাভ করেন না।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ইহাদের সম্বন্ধে উক্তি করিয়াছেন,—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে মনুষ্যশরীরধারী মনে করায় তাঁহার প্রতি তাহাদের অবজ্ঞা বা অপরাধ হইতেছে—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের নিজোক্তি। তিনি ইহাদিগকে মূঢ় বলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় দেখা যায়—"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর। অপরাধ নাহি আর ইহার উপর।"

এইরূপ জ্ঞানী ও যোগীদের গতি সম্বন্ধে ব্রহ্মা-শিবাদি দেবগণ বলিয়াছেন,—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
(ভাঃ ১০।২।৩২)

জ্ঞানী ও যোগিগণ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে মায়িক সত্ত্বগুণাত্মক দেহবিশিষ্ট মনে করায় তাঁহার প্রতি প্রীতি বা ভাব প্রকাশ করেন না, তজ্জন্য বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া যোগাদি ক্লেশবহুল পন্থা অবলম্বন করত বিমুক্ত বলিয়া মিথ্যা অভিমান করিলেও বস্তুতঃ তাহাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ থাকে, তজ্জন্যই পরমপদ লাভ করিয়াও তাহা হইতেও তাহাদিগকে অধঃপতিত হইতে হয়।

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা স্বয়ং অন্যত্র বলিয়াছেন,—

শ্রেয়ঃস্তিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৪)

অর্থাৎ ভক্তিপথই শ্রেয়ঃ পথ, অন্যপথ বা মত শ্রেয়ঃ নহে, পরন্তু বিঘ্নসঙ্কুল ও ক্লেশকর। যথা শ্রীকৃষ্ণের গীতোক্তি—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ (গীতা ১২।৫)

অব্যক্ত নিরাকার ব্রহ্ম-ধারণার পথ দুঃখ ও ক্লেশবহুল। ভক্তিপথই পরম মঙ্গলপ্রদ, সুখকর এবং সুখগমনযোগ্য। এই সুখাত্মক পথকে যাহারা পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান লাভার্থে ইন্দ্রিয়াদি নিগ্রহরূপ বহুধা ক্লেশস্বীকার করে তাহাদের ঐ ক্লেশই ফলস্বরূপ লাভ হয়, অন্য কিছুই লাভ হয় না। যেরূপ তণ্ডুলকণাবিহীন তুষসকল অবঘাতনদ্বারা কোনকালে চাউল প্রাপ্তি সম্ভবপর হয় না, পরন্তু অবঘাতনজনিত শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেদনারূপ ক্লেশই লভ্য হয়।

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মা ন শাম্যতি॥ (ভাঃ ১।৬।৩৬)

শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাক্য যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ পথ হইতে মুকুন্দে ভক্তিপথকে কি অধিকতর সুফলজনক পথ বলিতেছেন না?

তপস্বিভোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ (গীঃ ৬।৪৬-৪৭)

গীতার এই শ্লোক দুটীতে শ্রীকৃষ্ণ সকল পথের মধ্যে কোন্ পথ শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে নিজমত কি—তাহাই প্রকাশ করিয়া ভক্তিযোগপথে তাঁহাকে ভজনা করাই যুক্ততম পথ বলেন নাই কি ?

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ (ভাঃ ১১।১৪।২০)

ভাগবতের এই শ্লোকটীতেও কি যোগ-জ্ঞানাদি পথ অপেক্ষা ভক্তিপথকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহার মত প্রকাশ করেন নাই ?

ভক্তিপথের বা ভগবত্তত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্বহেতু কর্ম্মজ্ঞানাদি পথের সাধকগণ তত্তৎ পথ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিপথকে আশ্রয় করিয়া থাকেন বলিয়া শাস্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ (ভাঃ ১।৭।১০)

শুকদেব গোস্বামী, চতুঃসনাদি ইহার জাজ্বল্য প্রমাণ দেখা যায়। পক্ষান্তরে ভক্তিপথ পরিত্যাগ করত কর্ম্মজ্ঞানাদি পথকে অবলম্বন করিতে কোনও দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয় না। গোবিন্দের বংশীবাদনে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়তোষণ করত তাহাকে সর্ব্বোত্তম উন্নত-উজ্জ্বলরসাশ্রিত পারকীয় মাধুর্য্য-প্রেমসুখ প্রদান করিবার যোগ্যতা বিশুদ্ধ কেবলাভক্তি-পথ ব্যতীত অন্য পথে সম্ভবপর হয় না।

শাস্ত্রের এবম্প্রকার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ সত্ত্বেও যাহারা ভক্তিপথের সহিত কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি পথকে সমপর্য্যায়ভুক্ত করিতে চাহেন, তাহাদের মতকে কোন্ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন ? সুতরাং শাস্ত্রবিচারে তাহা অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে। অতএব সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের যথার্থতা—ভক্তিপথ সর্ব্বোত্তম ; যোগ, জ্ঞান ও কর্ম্মপথগুলি ভক্তির নিম্নক্রম বা সোপান বলিয়া শাস্ত্রে পরিব্যক্ত।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা শাস্ত্রাদির সুষ্ঠুবিচার অবলম্বনে শ্রীভক্তিদেবীর সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া মানবের পরমকল্যাণে চেষ্টান্বিত। অনধিকারী ব্যক্তিগণ এই জীবকল্যাণকর কার্য্যকে ধারণা করিতে অক্ষম হওয়ায় কেবল ভোগবাদের চেষ্টাকে সমাজসেবা বলিয়া অন্যায় বিচার পোষণ করিয়া থাকেন। এবম্প্রকার মায়ামুগ্ধ জীবের জন্য ভক্তগণ সতত দুঃখানুভব করেন এবং শ্রীভক্তিদেবীর শ্রীচরণে তাহাদের কল্যাণের জন্য নিষ্কপট প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

প্রিয়জনকে নববর্ষে উপহার প্রদানের ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত আছে। আমাদের আদরণীয় ও মাননীয় পাঠক-পাঠিকাগণকে কিছু উপহার প্রদান

করা আমাদেরও কর্ত্তব্য। কিন্তু মাদৃশ অতীব দীনহীন ভিক্ষুর নিজস্ব কিছুই উপহারযোগ্য বস্তু নাই। তজ্জন্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম এই দাসাধমের প্রতি অপার কৃপাপরবশ হইয়া যে 'সিদ্ধান্ত-রত্নমালা' প্রদান করিয়াছেন, তাহারই কয়েকটী রত্ন আদরণীয় পাঠক-পাঠিকাগণের শ্রীকরকমলে সমর্পণ করিতেছি। ইহাতে অদ্বৈত, সাংখ্য ও ন্যায়-মতবাদেরও পরিচয় সূচিত হইয়াছে।

"অদ্বৈতবাদিনাং ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষং বিকল্পিতম্।
ব্রহ্ম তু ব্রহ্মসূত্রস্য সৃষ্টি-স্থিত্যাদি-কারণম্॥
দৃষ্ট্বৈবং নির্ম্মিতং বাক্যং মুখ্যং গৌণমিতিদ্বয়ম্।
ব্রহ্মণো লক্ষণে ভেদো জ্ঞানিনাং শোভতে কথম্॥
'জন্মাদ্যস্য যতো' বাক্যে ব্রহ্ম সশক্তিকং ভবেৎ।
ক্লীবেন শক্তিহীনেন সৃষ্ট্যাদি সাধ্যতে কথম্॥
শক্তিনাং পরিহারে তু প্রত্যক্ষাদি প্রবাধতে।
শাস্ত্রযুক্ত্যা বিনা বস্তু নাস্তিকেনাদৃতং হি তৎ॥
কেচিদাহুঃ প্রকৃত্যৈব বিশ্বসৃষ্টির্ব্যবস্থিতা।
তেষাং বৈ পুরুষঃ ক্লীবঃ কলত্রং হি তথৈব চ॥
পত্যভাবে কুমারীণাং সন্ততির্যদি দৃশ্যতে।
তেষাং মতে প্রশংসার্হা সমাজে সা বিবর্জ্জিতা॥
জড়াণুমিলনে সৃষ্টিঃ জীববিশ্বাদিকং কিল।
স্থিতিস্তেষাং প্রমাসিদ্ধা পরিবর্ত্তনমূলকা॥
ধ্বংসস্তু কালচক্রেণ পরমাণু-বিভাজনে।
স্বভাবৈর্ঘটিতং সর্ব্বং কিমীশস্য প্রয়োজনম্॥
ঘট-পট-গুণজ্ঞানে জড়দ্রব্য-বিচারণে।
তার্কিকানাং মহামোক্ষন্যায়েন কথং ভবেৎ॥
'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।'
ইতি ন্যায়াৎ পদার্থত্বং প্রাপ্নোতি নাস্তিকঃ সদা॥
অসৎকারণবাদে হি স্বীকৃতাহভাব-সংস্থিতিঃ।
সত্তাহীনস্য সত্তা তু যুক্তিহীনা ভবেৎ সদা॥
কার্য্যকারণয়োরীত্যা জড়ান্ন চেতনোদ্ভবঃ।
গীতাবাক্যং সদামান্যং 'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'॥"

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

অবতারবাদ

'অবতার'-শব্দের অর্থ—যিনি গোলোক হইতে এই ভূলোকে অবতরণ করেন, তিনিই 'অবতার'। অবতারগণ স্ব-শরীরে এই জগতে অবতরণ করেন এবং স্ব-শরীরে এই জগৎ হইতে গোলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, সাধারণ বদ্ধজীব অবতার নহেন। বদ্ধজীব নশ্বর শরীরাদির সহিত জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুর পরে নশ্বর শরীরকে এই জগতে রাখিয়া চলিয়া যান।

স্বয়ং ভগবানকেই অবতার বলা হইয়াছে। যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিকারী, তিনিই ভগবান্। অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য—এই ষড়ৈশ্বর্য্য যাঁহার নিকট নিত্য বিদ্যমান, তিনিই ভগবান্। এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে,—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানঃ বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

এই ষড়ৈশ্বর্য্য কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের নিকটেই বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণই ৬৪ প্রকার পূর্ণগুণের অধিকারী। শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে অবতার না বলিয়া 'অবতারী বলা হইয়াছে। অবতার ছয় প্রকার, যথা—

অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার—এক, লীলাবতার—আর॥
গুণাবতার, আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৭৫-২৪৬)

১। পুরুষাবতার ঃ—মহা সঙ্কর্ষণ হইতে কারণোদশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী—এই তিন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেন।

২। লীলাবতার ঃ—চতুঃসন, নারদ, বরাহ, মৎস্য, যজ্ঞ, নরনারায়ণ, কর্দ্দম ঋষির পুত্র কপিলদেব, দত্তাত্রেয়, হয়শীর্ষা, হংস, পৃশ্নিগর্ভ, ঋষভদেব, পৃথু, নৃসিংহ, কূর্ম্ম, ধন্বন্তরি, মোহিনী, বামন, পরশুরাম, রাঘবেন্দ্র, ব্যাস, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি—এই ২৪ মূর্ত্তি।

৩। গুণাবতার ঃ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব।

৪। মন্বন্তরাবতার ঃ—বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, সার্ব্বভৌম, বিষ্বক্‌সেন, ধর্ম্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর, বৃহদ্ভানু, যজ্ঞ, বামন, ঋষভদেব—এই চতুর্দ্দশ মূর্ত্তি।

৫। যুগাবতার :—সত্যে শুক্লমূর্ত্তি, ত্রেতায় রক্তমূর্ত্তি, দ্বাপরে শ্যামমূর্ত্তি, সাধারণ কলিতে কৃষ্ণমূর্ত্তি, কিন্তু বিশেষ কলিতে পীতমূর্ত্তি।

৬। শক্ত্যাবেশাবতার :—কপিল, ঋষভদেব, অনন্ত, ব্রহ্মা, নারদ, পৃথু, পরশুরাম—এই সপ্ত মূর্ত্তি।

এই সকল অবতারের তালিকায় শ্রীকৃষ্ণের নাম পাওয়া যায় না ; কারণ শ্রীকৃষ্ণ—অবতারী। শ্রীকৃষ্ণ হইতে সব অবতার আবির্ভূত। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহা সুন্দররূপে প্রমাণিত হইয়াছে। যথা—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ (ভাঃ ১।৩।২৮)

শ্রীকৃষ্ণই কেবল স্বয়ংরূপ ভগবান্। যতপ্রকার অবতার আছেন, সেই সবই শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রকটিত হইয়াছেন। অর্থাৎ সেই সব অবতারগণ শ্রীকৃষ্ণের অংশ ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অংশী, সব অবতারের মূলপুরুষ।

ব্রহ্মার স্তুতিতেও পাওয়া যায়,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥

সৎ, চিৎ, আনন্দময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরের ঈশ্বর। তিনিই স্বয়ংরূপ, অনাদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ।

অবতার এবং অবতারীর মধ্যে পার্থক্য এই—উভয়েই ভগবৎতত্ত্ব। ভগবত্তা উভয়ের মধ্যেই বর্ত্তমান, কিন্তু লীলার ক্ষেত্রে পৃথক্। দুষ্টের দমন, সাধুর রক্ষণ, ধর্ম্ম-সংস্থাপনাদি কার্য্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নহে ; অংশরূপ বিষ্ণুর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত কার্য্য করেন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগৎ-পালন ॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাঁতে আসি' মিলে ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর-সংহারে ॥ (চৈঃ চঃ ১।৪)

পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বদাই বৃন্দাবনে অবস্থান করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।" অর্থাৎ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া

শ্রীকৃষ্ণ কোথাও যান না। বৃন্দাবনের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণ সদা-সর্ব্বদা লীলারস আস্বাদন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ (রসো বৈ সঃ) বৃন্দাবনের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রসের ভক্তগণের বশীভূত। বৃন্দাবনের রাগানুগাভক্তি ব্যতীত সাধারণ বিধি-ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের বশীভূত হন না। শাস্ত্রে আছে,—

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি।
বিধিভক্তে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৩।১৫-১৬)

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা, মথুরা প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করিলেও, সেইসব লীলায় বৃন্দাবন-রসের অভাবহেতু শ্রীকৃষ্ণ মনে-প্রাণে ভালবাসেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় থাকাকালীন প্রায়ই বৃন্দাবনের কথা স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। বৃন্দাবনের ভক্তের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধারাণীর ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ সদা-সর্ব্বদা আকৃষ্ট। শ্রীমতী যশোদা-মা, গোপীগণ, বিশেষ করিয়া শ্রীমতী রাধিকাদেবী শ্রীকৃষ্ণের বিরহে নিজের সমস্ত দেহ-মনের সুখ বিসর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র প্রাণটুকু ধারণ করিয়া রহিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রিয়সখা উদ্ধবের মাধ্যমে সেইসকল লীলা জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলায় দেখিতে পাওয়া যায়, যত গোপী তত সংখ্যক মূর্ত্তি হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে লীলারস আস্বাদন করিয়াছিলেন। তাহাতে গোপীগণের মনে কোনপ্রকার দুঃখানুভবের ক্ষেত্র ছিল। কিন্তু অবতার শ্রীরামচন্দ্র যদি দ্বিতীয় সীতার সহিত মিলিত হইতেন, তাহা হইলে সীতা আর তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। শ্রীরামচন্দ্র অবতার হেতুই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় চরম মধুর লীলা আস্বাদন করিতে সমর্থ হইলেন না।

শ্রীকৃষ্ণের এক নাম—হতারিগতিদায়ক। কিন্তু অন্য অবতারগণ এই নামের অধিকারী হইতে পারিবেন না। ইহার অর্থ—শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাহারা মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই উদ্ধারলাভ করিয়াছিলেন। এমন কি, রাক্ষসী পূতনা, অসুর কংস, শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি সকলেই উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের আর পুনঃ জন্মলাভ করিতে হয় নাই; কিন্তু রাবণ, কুম্ভকর্ণ অবতার রামচন্দ্রের নিকট নিহত হইলেও পুনরায় জন্মলাভ করিতে হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বোত্তম নরলীলা আর কোনও অবতারের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। যদিও শ্রীরামচন্দ্র, বামন, পরশুরাম, বুদ্ধ, কল্কির মত অন্যান্য অনেকেই নরলীলায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বোত্তম নরলীলা তাহাতে আস্বাদিত হয় নাই। শাস্ত্রে আছে,—"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ।"

'শ্রীকৃষ্ণ'-নামের যদি আমরা ব্যাখ্যা করি, তাহা হইলে এই নামে আমরা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব অনুমান করিতে পারিব। "কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দঃ ণশ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥" 'কৃষ্ণ' সকল জীবের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আকর্ষক। আকর্ষণ করিবার পর তিনি জীবকে শান্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

কলিযুগের তারকব্রহ্ম-নামের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণনাম নিহিত আছে। উক্ত মহামন্ত্রে পূর্ণশক্তি রাধিকা এবং পূর্ণশক্তিমান্ 'কৃষ্ণ' উভয়েই পূর্ণরূপে অবস্থান করিতেছেন। যথা—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই নামের মাধ্যমে ভক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণকেই লাভ করিয়া থাকেন। বৃন্দাবনের শ্রীরাধাপ্রেম যাহা শ্রীকৃষ্ণ কেবল আস্বাদন করিবার নিমিত্ত কলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই উন্নতোজ্জ্বল প্রেম কলির এই মহামন্ত্রের মধ্যেই বর্ত্তমান। তজ্জন্য শ্রীমহাপ্রভু কেবল হরিনামকে কলির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন—

প্রভু কহে, কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।
কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে।

আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হইতে হইলে এই কলিকালে একমাত্র শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত শ্রীনাম-মহামন্ত্র গ্রহণ করাই শ্রেষ্ঠ উপায়। বিভিন্ন শাস্ত্রাদিতে ব্যবস্থাপিত ও প্রচারিত থাকিলেও, এই শ্রীনাম-মাহাত্ম্য পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশেষভাবে এ জগতে প্রদান করিয়াছিলেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর দোষ-ত্রুটী ও তৎসংশোধন-প্রচেষ্টা

দেশের শিক্ষাপ্রণালী বিলাতী ধরণে গড়িতে যাইয়া আমাদের প্রাচীন বৈশিষ্ট্য যাহা কিছু ছিল, সব গিয়াছে। আমাদের দেশে নিম্নতম শিক্ষা-সোপান হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চতম সোপান পর্য্যন্ত দেখা যায়—ভগবৎকথার নামগন্ধও নাই! নিরীশ্বর নৈতিক জীবনযাপনের কতকগুলি মামুলী কথা আছে। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মাতাপিতার সাক্ষাৎ শাসনাধীনে থাকা অবস্থায় বরং বালকগণের চিত্তে একটু ধর্ম্মভাব দেখা যায়, কিন্তু মাতাপিতার দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া বালকগণ যতই উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে থাকে, ততই তাহার ভগবদ্বিশ্বাসটী পর্য্যন্তও হারাইতে থাকে। ক্রমে একেবারে নাস্তিক হইয়া বিলাতী ধরণের চালচলন আরম্ভ করিয়া দেয়। তাহাতে তাদের বিলাসিতা এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে, বাপ মা আর ছেলের খরচ দিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারেন না। বিলাতী-শিক্ষা লাভ করিয়া গুণধর ছেলে তখন তাহার পিতামাতার নিত্য অর্চ্চনীয় শালগ্রাম-শিলা-পূজাকে পুতুলপূজা বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না, বিষ্ণুদাসের চিহ্নস্বরূপ তুলসী-মাল্য ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণ প্রভৃতি তাহার মতে কুসংস্কার বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়, শুদ্ধভক্তগণসঙ্গে হরিকীর্ত্তনাদিতে যোগদান করা অপেক্ষা গার্ডেনপার্টি, ইভিনিং ক্লাব প্রভৃতি করিয়া চা-চুরুট, পান-তামাক প্রভৃতি কলির সেবাই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয় ইত্যাদি।

ছেলেদের মধ্যে এই যে নিরীশ্বর নাস্তিক্যভাব, ইহার মূল কারণ একমাত্র সৎশিক্ষার অভাব। শুদ্ধ সাত্বত শাস্ত্রকারগণ-প্রবর্ত্তিত শিক্ষার প্রচলন ব্যতীত ছেলেদের এই নাস্তিক্যভাব কিছুতেই দূর হইবার নহে। শিশুকাল হইতে ছাত্রগণ যে প্রকৃতির লোকের সঙ্গে যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আসিতে থাকে, সেই শিক্ষা তাহাদের হৃদয়ে এমন একটা সংস্কার বদ্ধমূল করিয়া দেয় যে, সে সংস্কার পরে শত চেষ্টাতেও যাইতে চাহে না। ভাগবত-গীতা-পুরাণাদি-কথিত ছাত্রজীবন অর্থাৎ পরমার্থ-তত্ত্ববিৎ গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাসহকারে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিদ্বারা আদর্শ ছাত্রজীবনের কথা এখনকার ছাত্রগণের নিকট যেন একটা উপকথা বলিয়া মনে হয়। কারণ বহুদিন ধরিয়া একটী পদ্ধতি উঠিয়া গেলে তাহার কথা পরে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া মনে হয়।

তখন ছাত্রগণকে অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম-কালে গুরুগৃহে যাইতে হইবে এবং

গুরুসেবা করিতে হইবে, গুরুদেবের আদেশমত ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রম অবলম্বন করিতে হইবে—কথাটির মধ্যে কিছু নূতনত্ব ছিল না; কেন না তাহাই তাৎকালিক রীতি ছিল। তখনকার ছাত্রগণের স্মৃতিশক্তি প্রখর ছিল, গুরুদেবের উপদেশ শুনিয়া শুনিয়াই ছাত্রগণ বেদবেদান্ত কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিত। সকলেরই স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা ছিল। স্বধর্ম্মনিষ্ঠগণের মধ্যে কেহ কেহ উন্নতাধিকার লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তও হইতেন। এখন প্রাথমিক শিক্ষাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ছাত্রগণ নাস্তিক হইতে আরম্ভ করে, আর বিদ্যাশিক্ষা শেষ করা পর্য্যন্ত সেই নাস্তিকতা। অবশ্য কোন সৌভাগ্যবান্ যুবক বর্ত্তমান শিক্ষার কবল হইতে ছুটি লাভ করিয়া একটু ভক্তি-জীবন লাভ করিতে চান বটে, কিন্তু তাঁহার সংস্কারগুলি তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি কিছুতেই লাভ করিতে দেয় না; হয় তাঁহাকে ভোগী-কর্ম্মী, না হয় মায়াবাদী জ্ঞানী অথবা যোগী করিয়া তাঁহাকে ভক্তিপথ হইতে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে।

শুদ্ধ সাত্বত-শাস্ত্র-প্রচারকগণের আনুগত্যে আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী আমূল সংশোধিত হইলেই বালকগণের উন্নত-জীবনের আশা করা যায়। বর্ত্তমানে যে শিক্ষাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার গতির পরিবর্ত্তন দুই এক বৎসরের চেষ্টায় যে সাধিত হইবে, তাহা নহে; তবে এখন হইতে চেষ্টা করিলেও পরিণামে অনেক সুফল আশা করা যাইতে পারে। আমাদের মনে হয়, অভিভাবকগণ যদি শিশুকাল হইতেই সন্তানগণকে সাত্বত শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ে সাত্বত শাস্ত্র আলোচনার সুবিধা করিয়া দেন, তাহা হইলে সুকুমারমতি বালকগণ সচ্চরিত্রবান্ হইয়া ক্রমশঃ ভক্তিময় জীবনযাপন করিতে পারেন। তাদৃশ ছাত্রগণদ্বারাই ভারতের ধর্ম্মাকাশ অধর্ম্মমেঘ-মুক্ত হইতে পারে। ধর্ম্মজীবনযাপন করিতে হইলেই ছাত্রগণ সংসার ছাড়িয়া বিরাগী হইয়া যাইবে, এই ভয়ে অভিভাবকবর্গ যদি তাহাদিগকে সৎশিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত করেন, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হয়। সাত্বত শাস্ত্রসিদ্ধান্তের বহুল প্রচারক্রমে জগৎ হইতে ধর্ম্মের ভাণ উঠিয়া যাইতে পারে, জগৎ একটী শান্তিময় ক্ষেত্র হইতে পারে।

তবে একটী কথা হইতেছে যে, কেবল বই মুখস্ত করা পণ্ডিত-নামধারী শাস্ত্রোদ্দিষ্ট আচরণহীন অসদাচারী অভক্ত শিক্ষকের নিকট শাস্ত্র পড়িয়া ছাত্রগণ কিছুই লাভবান্ হইবে না। বরং হিতে বিপরীত ফল হইবে। শুদ্ধ-ভক্তি যিনি নিজে আচার করিয়া প্রচার করেন, এমন আচার্য্যের চরণাশ্রয়েই জীবের মঙ্গল হইতে পারে।

বর্ত্তমানে ভারতে লোকের মধ্যে যেরূপ একটু ধর্ম্মভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে আমাদের খুবই বিশ্বাস হয় যে, ছাত্রগণ যদি সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ে সৎশিক্ষা লাভ করিয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারাই দেশের মঙ্গল হইবে। সৎশিক্ষার উন্নতিবিধানই দেশের উন্নতির একমাত্র উপায়। শিক্ষা বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি পূর্ব্বতম মহর্ষিগণ-প্রদর্শিত শিক্ষা-প্রণালী অগ্রাহ্য না করিয়া তাহার প্রচলনে যত্নবান্ হন, তাহা হইলে ভারতের বাস্তবিকই নবজাগরণ সম্পাদিত হয়। বিদ্যাকে কেবল অর্থকরী করিয়া না তুলিয়া তাহা যদি পরমার্থকরী করা যায়, তাহা হইলেই মঙ্গল। যদি বলেন,—ছাত্রগণ তাঁহাদের স্বাধীন ইচ্ছামত ধর্ম্মজীবনযাপন করিতে পারেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় না। আদর্শ ভিন্ন কখনও শিক্ষার প্রসার হয় না। বালকগণ তাহাদের সম্মুখে যেমন যেমন আদর্শ দেখিতে পাইবে, সেইরূপেই তাহাদের জীবন গঠন করিতে শিখিবে। অতএব আমাদের বিশেষ প্রার্থনা, শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ-কর্ত্তৃক আমাদের কথিত বিষয় যেন একটু স্থিরচিত্তে আলোচিত হয়।

কোন বিদেশীয় শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন আপত্তির কারণ নাই, তবে বিদেশীয় ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণ বিদেশীয় চাল চলনের অনুকরণ করিতে যাইয়া নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া না ফেলেন, ইহাই দেখিতে হইবে। আমাদের পূর্ব্বতন মহাজনগণের আদর্শে যদি ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করেন, তাহা হইলে আর স্বধর্ম্ম নাশের কোন আশঙ্কা থাকে না। শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

—শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

শ্রীপত্রিকা আজি দ্বিচত্বারিংশ-বর্ষে করিলেন পদার্পণ।
বিরুদ্ধবাদীর অপসিদ্ধান্ত সদর্পে করিয়া খণ্ডন॥
শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীল কেশব গোস্বামী।
শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচারের লাগি'॥

শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট পূরণ-মানসে।
প্রতিমাসে চল্লিশ পৃষ্ঠার পত্রিকা প্রকাশে ॥
'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' নামকরণ তাঁর সুচিন্তিত মত।
গৌড়েশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের গুণকীর্ত্তন যাঁর ব্রত ॥
পত্রিকা পঠনে অপ্রাকৃত কামদেব মদনমোহন।
পাঠকের হৃদয়ে জাগরিত হন অনুক্ষণ ॥
অপ-উপ-ছল-মিছা-কপট-ধর্ম্মীকে করিতে নিরস্ত।
একমাত্র মাসিক—'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'ই সমর্থ ॥
মহাপ্রভু-প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম ও যুক্তবৈরাগ্য শিখা'তে।
সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনমণ্ডলীর দ্বারে করাঘাতে ॥
বিচক্ষণ সম্পাদক-মণ্ডলী যাঁর অতন্দ্র-প্রহরী।
হেন শক্তি আছে কার তাঁর কণ্ঠরোধ করি ??
মোর গুরুদেব—শ্রীবামন যাঁর অধ্যক্ষ-সভাপতি।
শ্রীভক্তিবেদান্ত নারায়ণ তাঁর সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ॥
কার্য্যাধ্যক্ষ যাঁর শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক।
শ্রীভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ তাঁর প্রকাশক ॥
এ হেন বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তার সম্পাদক—শ্রীত্রিবিক্রম।
তাঁহাদের সাহচর্য্য প্রার্থনা করয়ে এ দাসাধম ॥
তাঁদের কৃপাকটাক্ষে শ্রীপত্রিকা করিয়া প্রকাশ।
এ দীনহীনের যেন হয় কিছু সৎসিদ্ধান্তাভাস ॥
প্রকাশেতে যেন কভুও না আইসে আলস্য।
গৌড়ীয়ের সেবা করি' যেন বুঝি গৌড়ীয়-ভাগ্য ॥
শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে মোর এই নিবেদন।
বৈষ্ণবানুগত্যে থাকি' সদা করি শ্রীকৃষ্ণানুশীলন ॥

শ্রীপত্রিকার সেবাভিলাষী
বৈষ্ণবদাসানুদাস—
—শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-প্রশস্তি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭১, ডাক্তার গলি
পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)
তাং ২০/১/৯০

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—
কার্য্যালয় :—শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন (কলিকাতা-৪)

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বক নিবেদন এই যে,—আপনার সম্পাদনায় প্রকাশিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত গ্রাহক ও সম্প্রতি আপনার পত্রিকার আবেদনে সাড়া দিয়ে আজীবন সদস্যভুক্ত হইয়াছি। পারমার্থিক জগতে উন্নতমানের ও নিরপেক্ষ পত্রিকার একজন গ্রাহক ও পাঠক হিসাবে আমি নিজেকে গর্ব্বিত মনে করিতেছি। কারণ, বর্ত্তমান জগতে ধর্ম্মশাস্ত্র ক্রয় করিয়া আলোচনা ও অনুশীলন করা বহু ব্যয়সাপেক্ষ। অধিকন্তু, ভাগবতধর্ম্ম বা ভক্তি লাভ করিতে হইলে শ্রীবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে শ্রবণ-কীর্ত্তন ও অধ্যয়ন একান্ত প্রয়োজন। শাস্ত্র বলেন,—"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল, হয় সাধুসঙ্গ", "সাধুসঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন" ইত্যাদি।

যাহা হউক, আপনার শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৪১শ বর্ষে ৯ম ও ১০ম সংখ্যায় প্রকাশিত "ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী" প্রবন্ধে শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের তত্ত্বসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বহুবিষয়ে আলোকপাত করিয়া বিবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের বাণী লিপিবদ্ধ করত নির্ম্মৎসর সাধুগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ১৯৪৯ খৃঃ শ্রীপত্রিকার উদ্বোধন করিয়া ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় "বিরহ-মাঙ্গল্য" প্রবন্ধ স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া যে ভাব, ভাষা, পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বসিদ্ধান্তের দ্বারা বিপ্রলম্ভ রসের উৎকর্ষ বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৪১শ বর্ষেও স্তিমিত হয় নাই। বহু প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে থাকিয়াও সুদীর্ঘকাল শ্রীপত্রিকা তাহার ধর্ম্ম নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া অতি উৎসাহের

সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা বিশ্বের আপামর জনগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া জগতের প্রচুর মঙ্গল বিধান করিয়া চলিতেছেন। ইহা বড়ই সৌভাগ্যের কথা। কারণ, অদ্যাবধি কোন পারমার্থিক পত্রিকা নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া সুদীর্ঘ ৪১শ বর্ষকাল চলিতে সক্ষম হন নাই। শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজের নিরপেক্ষতা ও সর্ব্বজ্ঞতা তাঁহার বিশ্রম্ভ সেবকগণকে নিরন্তর উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া আসিতেছে।

নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে শ্রীল কেশব গোস্বামীর বাণীতে পাই,—"সত্য যদি অপ্রিয়ও হয় তাহাও বলিয়া দিতে হইবে; তাহা না হইলে শাস্ত্রের অনেক নিগূঢ়রহস্য জগতে অপ্রচারিত ও অপ্রকাশিত থাকিয়া যাইবে। শুভানুধ্যায়ী সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের মর্ম্মভেদী বাক্য আপাতসুখকর না হইলেও উহা আত্যন্তিক মঙ্গলের হেতু।" এ ক্ষেত্রে সাধারণ নীতিবাক্য আদরণীয় নহে, যেমন—"সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।"

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের অপ্রকটের পরে (১৯৩৬ খৃঃ ৩১ ডিসেম্বর) শ্রীগৌড়ীয় মঠ-মিশনে বিশৃঙ্খলতার দরুণ শ্রীগৌড়ীয় মঠের পত্র-পত্রিকা প্রভৃতির প্রকাশন ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া যায়। এমনকি, শ্রীধাম-পরিক্রমাও বিলুপ্তির পথে ছিল। শ্রীগুরু-মনোঽভীষ্ট পূরণের জন্য শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রকাশ ও শ্রীধাম-পরিক্রমা পুনরায় প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার অসীম ধৈর্য্য, দূরদর্শিতা, পাণ্ডিত্য ও নিরপেক্ষতার ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা অন্যাভিলাষী, কুজ্ঞানী, কুযোগিগণের মতবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক শ্রীগৌরবাণী ও শ্রীপ্রভুপাদের বাণী জগতে প্রচার করিতে সমর্থ হইলেন—ছাপাখানা বা বৃহন্মৃদঙ্গের আশ্রয়ে।

শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজের মায়াবাদ-নিরসনপর গ্রন্থ ও গীতিকাব্য লিখিত দার্শনিক প্রবন্ধাদি, গভীর তত্ত্বসিদ্ধান্তমূলক বক্তৃতাবলী তৎকালে তাঁহার সতীর্থ ও অনুকম্পিত জনগণের নিকট ধ্রুবতারার ন্যায় পথের নিশানা ছিল। শ্রীল মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রকাশিত কতিপয় বক্তৃতা ও প্রবন্ধের নামোল্লেখের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া এই পত্রে লিপিবদ্ধ করিলাম। সহৃদয় পাঠকগণ নিজেদের আত্মমঙ্গলের জন্য সুযোগ পাইলেই উহা পাঠ করিবার চেষ্টা করিবেন। এহেন মহাপুরুষের লেখনী ও বক্তৃতাবলী যাহা পরমার্থ বিষয়ক জটিল প্রশ্ন ও কূটতর্কাদির শাস্ত্রসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তর দান।—অদ্বৈতবাদ নিরাস, বিরহ-মাঙ্গল্য, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার বক্তব্য, রথযাত্রার তিথি-বিচার, ব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের আরতি, শ্রীজন্মাষ্টমীর

বিশুদ্ধ-বিচার, মায়াবাদের জীবনী, সাউড়ীদলের অপপ্রচার, অপদেবতার (অবতারের) উপদ্রব নিবারণ, সাউড়ীশালার ভিতে গলদ, শ্রীনিম্বাদিত্য ও নিম্বার্ক এক নহেন, হিন্দু-সাধু-সন্ন্যাসি-নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রতিবাদ, অচিন্ত্য-ভেদাভেদ, শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রার তিথি-বিচার, জীবসেবা ও জীবে দয়া, জগন্নাথ মন্দিরে ছুঁৎমার্গ, বর্ত্তমান সমাজ ও নিরাকারবাদ, শ্রীগৌর-গোবিন্দ আরতি, শ্রীতুলসী-আরতি, শ্রীরাধা-বিনোদবিহারী-তত্ত্বাষ্টকম্ প্রভৃতি।

শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সত্যসংরক্ষণে-নির্ভীকতা—দৃঢ়তা আজও সারস্বত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজ আদরে স্মরণ করেন। শ্রীল মহারাজের অপ্রকটের কয়েক বৎসর পর শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা অনিয়মিতভাবে প্রকাশন, শ্রীগোস্বামীবর্গ ও আচার্য্যবর্গের লেখনী ভিন্ন উচ্চমানের প্রবন্ধাদি প্রকাশিত না হওয়ার দরুণ গ্রাহকগণ হতোদ্যম হইয়া পড়িলেন। শ্রীপত্রিকার গ্রাহকসংখ্যাও হ্রাস পাইতে লাগিল।

এমতাবস্থায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ, সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও সমিতির অন্যান্য সভ্যবৃন্দের আন্তরিক চেষ্টায় বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ শ্রীপত্রিকা তাঁহার পূর্ব্ব সুনাম উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। গ্রাহক সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবর্ষপূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়াই **'শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব সংখ্যা'** ৩৮শ বর্ষে ১ম সংখ্যায় প্রায় ৩২টী প্রবন্ধ ও কবিতাসহ প্রকাশিত হইলেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ, ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও আরও অনেকের দার্শনিক ও তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ প্রবন্ধাদিতে ভরপুর ছিল। পরিশিষ্টে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের 'গৌড়ীয়ের অষ্টত্রিংশ-বর্ষ' প্রবন্ধে তাঁহার নিরপেক্ষ লেখনীতে সিদ্ধান্তপূর্ণ তিথি-বিচার, জড়সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টিভঙ্গী, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ ও জাতিভেদপ্রথা এবং অবশেষে শ্রীচৈতন্যদেব ও বিশ্বমিলন বিষয়ের আলোচনা শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীর নিরপেক্ষ ধারাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 'নিরপেক্ষ নহিলে

ধর্ম্ম না যায় রক্ষণ'—শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীই শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার রক্ষা কবচ বলিয়া মনে করি।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার পরবর্ত্তী বর্ষসংখ্যা আলোচনা করিলে আমরা আরও গভীর তত্ত্বদর্শন উপলব্ধি করিতে পারি। "শ্রীধাম মায়াপুরই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান" প্রবন্ধ বিরোধি মতবাদখণ্ডনে খড়্গহস্ত-স্বরূপ, শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের "শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত", শ্রীল কেশব মহারাজের "মায়াবাদের জীবনী", শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজের "বলিহারি ডক্টরেট্ বিদ্যা", "হাতী ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল", শ্রীপাদ হরিদাস লিখিত "আমি যতিরাজ" পাঠে তথাকথিত বৈষ্ণবগণের শিরে বেত্রাঘাত, শ্রীল নারায়ণ মহারাজের "গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও সন্ন্যাস", বর্ত্তমান আচার্য্যদেব শ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামীর "বক্তৃতা ও শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা" শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার আকর্ষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৪১শ বর্ষে শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজের লিখিত "ভোগবাদ" এবং ৯ম-১০ম সংখ্যায় প্রকাশিত "ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী" প্রবন্ধে দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু ও ওঁ বিষ্ণুপাদের শাস্ত্রীয় যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা মাদৃশ পাঠককে উৎসাহিত করিয়াছেন।

দিনে দিনে শ্রীপত্রিকার উৎকর্ষ ও শ্রীবৃদ্ধিতে পাঠক ও গ্রাহকগণের আনন্দ বর্দ্ধিত হইবে ও নিগূঢ় শাস্ত্রসিদ্ধান্তমূলক বিচারে তাঁহারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন। শাস্ত্র বলেন,—"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

পরিশেষে নিবেদন,—হে অমৃতের সন্তানগণ! আপনারা হেলায় এই সুদুর্ল্লভ মানব জন্ম নষ্ট করিবেন না। পারমার্থিক 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' পাঠ করিয়া নিরপেক্ষ ও শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বসিদ্ধান্ত বিচারপূর্ব্বক অধোক্ষজ-অপ্রাকৃত জ্ঞানলাভ করিয়া মানব জীবন সার্থক করুন। "এমন দুর্ল্লভ মানব দেহ, পাইয়া কি কর ভাবনা কেহ, এবে না ভজিলে যশোদাসুত, চরমে পড়িবে লাজে॥"

শ্রীবামন-ত্রিবিক্রম-নারায়ণ চরণে মোর নিবেদন, শ্রীকেশবের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুত্রপত্র শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি করুন রক্ষণ॥

—জনৈক আজীবন সদস্য (গ্রাহক নং-৭)

এক অঙ্গে দুই রূপ

"রাধাভাব অঙ্গীকরি' ধরি তাঁর বর্ণ।
তিনসুখ আস্বাদিতে হয় অবতীর্ণ ॥"

শ্রীরাধাপ্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীধাম নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপে।

প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে যায়,—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

(১) শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, (২) শ্রীরাধা যাহা আস্বাদন করেন, আমার সেই বিচিত্র মাধুর্য্য কিরূপ এবং (৩) আমার অনুভববশতঃ শ্রীরাধা যে সৌখ্য বা আনন্দ লাভ করেন, সেই আনন্দই বা কিরূপ—এই তিনটী বিষয়ের প্রতি লোভের বশীভূত হইয়া শচীগর্ভরূপ সিন্ধুতে রাধাভাববিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ রাধাপ্রেমে বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমের স্বাদ গ্রহণ করিবার জন্যই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

তাই শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"যদি গৌরাঙ্গ নহিত, তবে কি হইত, কেমন ধরিত দে।
রাধার মহিমা প্রেমরস-সীমা জগতে জানাত কে ??
মধুর বৃন্দাবিপিনমাধুরী-প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ-যুবতী-ভাবের ভকতি শকতি হইত কার ??"

রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত-তনু গৌরাঙ্গসুন্দর একই দেহে রাধা ও কৃষ্ণের পরমতত্ত্ব আস্বাদন করিয়াছিলেন,—বহিরঙ্গে তিনি শ্রীরাধা, অন্তরঙ্গে তিনি শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীচৈতন্যদেব একদেহে উভয়রূপ, তথা উভয়বিধ প্রেমের স্বাদ গ্রহণ করিয়াই সনাতন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের পক্ষে যাহা সাধ্য, অপরের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণই অসাধ্য, তজ্জন্য বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাকে দূর হইতে বিশেষ সাবধানের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-লীলায় যতপ্রকার বৈচিত্র্য আমরা লক্ষ্য করি, রাধাভাব অঙ্গীকারকারী শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনেও তাহার প্রতিফলন ঘটিয়াছে, একটুও ব্যতিক্রম হয় নাই। ঐ অনুপম লীলা-বৈচিত্র্য কৃষ্ণপ্রিয়া শুদ্ধা সরস্বতী-বাণীর আশ্রয়েই যথাযথ অনুভূত হয়।

এক অঙ্গে দুই রূপের যে মাধুর্য্য, তাহা আস্বাদন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসাধ্য। শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত জীবোদ্ধারণ-লীলা অপ্রাকৃত বদ্ধজীবের কোনদিনই বোধগম্য বিষয় নহে। তথাপি সেই প্রেমময় শ্রীগৌরহরির অহৈতুকী করুণায় কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তির পক্ষে উহা অনুভব ও উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে। ভক্ত ও ভগবানের বিশেষ কৃপাপ্রভাবে অপ্রাকৃত শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাদি জীব-হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করে। সেই পরদুঃখদুঃখী শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকার বিনাশপূর্ব্বক আমাদিগকে প্রেমানন্দের অধিকার প্রদান করুন্—ইহাই তাঁহার নিকট একান্ত প্রার্থনা।

—শ্রীমতী কুহু বেরা, অমর্ষি (মেদিনীপুর)

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ, মিলনপল্লী (শিলিগুড়ি), তাং—১৫।৯।১৯৮৮]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রাজা হয়ে বসে আছেন, দ্বারকাধীশ। তথায় এক ব্রাহ্মণের গৃহে পুত্র জন্মগ্রহণ করল, সঙ্গে সঙ্গে সে মৃত্যুমুখে পতিত হল। এইভাবে পর পর কয়েক বৎসর ধরে ব্রাহ্মণের পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, আর ব্রাহ্মণ একটী একটী করে মৃত-পুত্রকে নিয়ে গিয়ে রাজদ্বারে নিক্ষেপ করে 'রাজারই বিকর্ম্মবশতঃ তাঁর পুত্রের মৃত্যু হচ্ছে'—এইরূপ গালাগালি দিয়ে চলে আসছেন। যখন এইরকম ঘটনা ঘটছিল, তখন একদিন সেই রাজসভায় বসেছিলেন অর্জ্জুন। তিনি ব্রাহ্মণকে ডেকে বললেন,—এই সভায় এমন কোন ব্যক্তি নাই, এমন কোন ক্ষত্রিয় নাই, যিনি ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে রক্ষা করতে পারেন? আমি প্রতিজ্ঞা করছি—আপনার পুত্রগণকে বাঁচাব ও রক্ষা করব।

পরবর্ত্তিকালে দেখা গেল, যখন ছেলে জন্মগ্রহণ করছে তখন অর্জ্জুনকে ডাকাডাকি করছেন সেই ব্রাহ্মণ। অর্জ্জুন তথায় গিয়ে হাজির হলেন।

সব মন্ত্র-তন্ত্র উচ্চারণ করে বাণরাশিদ্বারা তিনি সূতিকাগারের চারিদিক্ বন্ধ করে শর-পিঞ্জর নির্ম্মাণ করলেন। কিন্তু দেখা গেল, যথাসময়ে ভূমিষ্ট সেই শিশু রোদন করতে করতে আকাশপথে অন্তর্হিত হয়ে গেল। অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—আমি যদি ছেলেকে বাঁচাতে না পারি, তাহলে আমি অগ্নিতে প্রবেশ করব। সেই কথানুসারে অর্জ্জুন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছেন। তিনি দেহত্যাগ করবেন—এই খবর কৃষ্ণ পেয়ে গেলেন। অর্জ্জুন আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছেন, এমন সময় কৃষ্ণ এসে হাজির। সখা! তুমি এসব কি ব্যবস্থা করছ? অর্জ্জুন বললেন,—আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ব্রাহ্মণপুত্রকে রক্ষা করব, কিন্তু অনেক চেষ্টা করলাম, দিব্য অস্ত্র সব প্রয়োগ করলাম, কিছুই ত' করতে পারলাম না। তখন কৃষ্ণ বললেন,—দেখ, তুমি নিজেকে এত ছোট মনে কর না। যারা আজ গালাগালি দিচ্ছেন আমাদের, আগামীদিনে তারাই আমাদের কীর্ত্তি ঘোষণা করবেন। চল, আমরা দুজনে যাই, সেই দ্বিজপুত্রগণ কোথায় আছে, তাদের নিয়ে আসি।

'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' সিনেমায় বই দেখানো হচ্ছে আজকাল। আমাদের উপনিষদে যে উপাখ্যান আছে, তা অবলম্বন করেই ওটা লিখিত ও রচিত। সাধারণ মানুষ এই Subtle Body নিয়ে যমালয়ে যেতে পারে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, নচিকেতা এই শরীরে গেছেন যমালয়ে এবং সেখানে যমরাজের একজন নামকরা (V. I. P.) অতিথি হিসাবে হাজির হয়েছিলেন। যমরাজ তখন যমালয়ে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি হলেন Circle officer। চারিদিকে ঘুরে ঘুরে তাঁর কাজ দেখাশুনা করতে হয়। এক জায়গায় বসে থাকবার তাঁর উপায় নাই। নচিকেতা যখন যমালয়ে গিয়ে হাজির হন তখন ৫ বছরের বাচ্চা শিশু। সাধন-ভজনের বল কিরকম, চিন্তা করুন। যমরাজের গৃহিণী শ্যামলা তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। তিনি মাননীয় অতিথিকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করে বললেন,—আপনি এসেছেন, যমরাজ অনুপস্থিত, আপনি স্নান করুন, আহারাদি করুন। নচিকেতা বললেন,—আমি যাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, তাঁর সঙ্গে দেখা না করে জলগ্রহণ করব না।

তিনদিন পর যমরাজ ফিরেছেন। এসেই দেখেন মাননীয় অতিথি তাঁর দরজার গোড়ায় বসে আছেন। তাঁকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করে বললেন,—আমি বড় অন্যায় করেছি, আমার গৃহে অতিথি তিনদিন অভুক্ত অবস্থায় অবস্থান করছেন, আমাকে ক্ষমা করুন। এর পরিবর্ত্তে আমি তিনটে বর দিতে চাই আপনাকে। নচিকেতা বললেন,—দিন।

নচিকেতা বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছিলেন। তাঁর পিতা রাজা ঔদ্দালকি সমস্ত বুড়ো বুড়ো গাভীগুলো ব্রাহ্মণগণকে দান করছিলেন—যে গাভীগুলো কোনদিন বাচ্চাও দেবে না, দুধও দেবে না। নচিকেতা বললেন, —বাবা! তোমার এ কি দান হচ্ছে? এতে কোন পুণ্য ত' হবে না, বরং উল্টে পাপই হবে। বারবার এইরূপ বলে পিতাকে বিরক্ত করছেন। শেষকালে রাগ করে তিনি বললেন,—আমাকে তুমি কাকে দান করছ? পিতা রেগে গিয়ে বললেন,—যা, তোকে যমরাজকে দিলাম। 'যমরাজকে দিলাম' বলায় তিনি সশরীরে যমরাজের কাছে হাজির হয়েছিলেন। শিশু বটে, পঞ্চমবর্ষীয় বালক বটে, কিন্তু তাঁর সাধন-ভজনের এমনই বল ছিল যে, তিনি সশরীরে যমালয়ে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন।

তুমি প্রথমে কি বর চাও?—আমার পিতার সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছে, পিতা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন—আমার উপর পিতার রাগ যেন থেমে যায়। যমরাজ বললেন,—তথাস্তু। দ্বিতীয় বর তুমি চাও। দ্বিতীয় বরে তিনি আত্মতত্ত্ব জানতে চাইলেন। যমরাজ তাঁকে আত্মতত্ত্ব বললেন। আত্মতত্ত্ব তাঁর খুব ভাল জানা আছে, কেননা তিনি বৈষ্ণবগোষ্ঠীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। শিবঠাকুর যেমন বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী শিবানী, সেইরকম List এর মধ্যে যমরাজও আছেন একজন। দ্বাদশ জন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের নাম করা হয়,—

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥

এই 'বয়ম্'—শব্দে উদ্দিষ্ট হয়েছেন যমরাজ। যমরাজ নিজে কথাটা বলছেন। বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শন তাঁর ভালরকম জানা আছে। তাই আত্মদর্শন উপদেশ করলেন তাঁকে। তৃতীয় বর চাও তুমি। তৃতীয় বর চাইছেন নচিকেতা—আমাকে জন্ম-মৃত্যু রহস্য বলতে হবে। বৃক্ষ-তৃণ-গুল্ম-লতা, পাখী, পশু, মানুষ কেন জন্মগ্রহণ করছে এবং কেন মৃত্যুমুখে পতিত হয়? এ সংসারে আমাদের বারবার এই যাতায়াত কেন? আমাকে বুঝিয়ে দিন। সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন, কিন্তু এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইছেন না যমরাজ, কেন? তিনি বিবিধবাক্যে প্রলোভিত করতে লাগলেন নচিকেতাকে। তোমাকে ইন্দ্রত্ব দিতে হবে, তুমি ইন্দ্রত্ব নেবে, তুমি ব্রহ্মত্ব নেবে—যাই জিজ্ঞাসা করেন সবটাই 'না'। আমি যেটা জানতে চেয়েছি সেইটাই আমাকে জানিয়ে দিতে হবে। যমরাজ দেখলেন যে এটা খুব গোপনীয় ব্যাপার, এটা

I. B. Department-এর ব্যাপার, এটা বলা যায় না কাউকে। সেইজন্য তিনি বলতে চাচ্ছেন না, আর নচিকেতাও শুনবে না। আমাকে এইটাই বলতে হবে, আমি অন্য কিছু জানতে চাই না। যমরাজ ওঁকে প্রতিহত করবার চেষ্টা করছেন, তুমি বৃথা তর্ক করছ, শুষ্ক তর্কের দ্বারা কখনও তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।" একটু ধমক দিলেন। কিন্তু শিশু নচিকেতা ভুলবার ছেলে নয়। সে বলল,—আমি ঐটাই জানব। আমায় ঐটাই বলতে হবে। আমি আপনার কাছে এসেছি। আপনি যদি আমার গুরু হন, তাহলে আমি আপনার শিষ্য—পুত্র। এমন কি গোপন কথা আছে যেটা আমার কাছে বলতে পারবেন না আপনি? আমি শুনবার অধিকারী কিনা, আপনি আগে বিচার করুন। যদি আমি শুনবার অধিকারী হই তাহলে আমাকে বলুন। কেন আমাকে বঞ্চিত করছেন? খুব মুস্কিলের মধ্যে পড়ে গেলেন যমরাজ এই শিশুর কাছে। শেষে বলতে বাধ্য হলেন।

(ক্রমশঃ)

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের

শুভ প্রকট-বাসরে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মাঘী কৃষ্ণতৃতীয়া-তিথি করি' আলম্বন।
শরচ্চন্দ্র-সুতরূপে যাঁ'র প্রকটন॥
যাঁহার ললিত অঙ্গ-হেরি' বিজ্ঞজন।
কহে—'এই শিশু হ'বে গৌর-নিজজন॥'
যাঁহার শ্রীঅঙ্গে 'রাজে সর্ব্ব সুলক্ষণ।
তিনি প্রভু শ্রীকেশব পতিতপাবন॥ ১॥
গুরু-মনোঽভীষ্ট সদা করিতে পূরণ।
তুচ্ছ করিলেন যিনি নিজের জীবন॥
গুরুসেবায় সর্ব্বসিদ্ধি—এই শিক্ষা যাঁ'র।
তাঁর পাদপদ্ম সদা ভরসা আমার॥

আচারে-প্রচারে যাঁ'র আচার্য্য-লক্ষণ।
তিনি প্রভু শ্রীকেশব পতিতপাবন ॥ ২ ॥
বৌদ্ধ-শাস্ত্র হ'তে যিনি করিলা প্রমাণ।
'শাক্যবুদ্ধ' ও 'বিষ্ণুবুদ্ধ' নহে একজন ॥
গৌতমবুদ্ধ মনুষ্য,—নহে অবতার।
আদি-বুদ্ধই বিষ্ণুর নবম-অবতার ॥
বুদ্ধ-সম্বন্ধে যাঁহার এ হেন বিচার।
সেই জগদ্‌গুরু পদে নমি বারবার ॥ ৩ ॥
রাধা চিন্তা করি' কৃষ্ণ 'গৌর-কান্তি' পায়।
এমন সিদ্ধান্ত জানি যাঁহার কৃপায় ॥
গৌর-কৃষ্ণ একতত্ত্ব—লীলা দুইপ্রকার।
এ তত্ত্বের ব্যাখ্যা যাঁ'র অতি চমৎকার ॥
যাঁ'র মঠে শ্যামচাঁদের গৌরকান্তি ভায়।
তিনি মোর গুরুদেব, নমি তা'র পায় ॥ ৪ ॥
'বেদান্ত সমিতি' যিনি করিয়া স্থাপন।
বলদেবাচার্য্য-প্রতি জানাইলা সম্মান ॥
শঙ্কর-দর্শন যিনি করিয়া খণ্ডন।
প্রভুপাদের সঙ্কল্প করিলা পূরণ ॥
অপসম্প্রদায়-দলনে যিনি সদা ব্রতী।
তাঁ'র রাঙ্গা পদে করি কোটী কোটী নতি ॥ ৫ ॥
শ্রীগুরু-বৈশিষ্ট্য কিছু করিয়া কীর্ত্তন।
তাঁ'র পদে পুষ্পাঞ্জলি করিনু অর্পণ ॥
জয়তু জগদ্‌গুরু শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান।
অন্তিমে ঐ পদ-পাশে দিও মোরে স্থান ॥ ৬ ॥

শ্রীব্যাসপূজা-বাসর
ইং ২২।২।৯০

শ্রীগুরু-কিঙ্করাণুকিঙ্করাভাস
পতিতাধম—
—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী (কবিভূষণ)

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞান তার উন্নতিকে অব্যাহত রাখিয়া আজ আমাদের সম্মুখে Computor লইয়া হাজির হইয়াছে। Computor এর নিয়মানুযায়ী Switch on করিলে Computor এ প্রস্তুত করা হিসাবাদি যদ্রূপ বুঝিতে পারা যায়, তদ্রূপ আমরাও এই বিজ্ঞানের যুগে বর্ত্তমান থাকার দরুণ একবার বৈষ্ণব সংবিধানের Switch on করিয়া দেখি—(১) ব্যাসপূজা কি? (২) অতীতে ব্যাসপূজা প্রথম কোথায়, কাঁহার দ্বারা প্রচলিত হইয়াছিল? (৩) ব্যাসপূজার ফল কি? ইত্যাদি।

শ্রীব্যাসপূজা কি? তাহা সর্ব্বপ্রথম জানা প্রয়োজন। Geometry-র নিয়মানুযায়ী বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুকে স্পর্শ করিয়া পরিধির একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত যে সরলরেখা অঙ্কন করা হয়, তাহাকে 'ব্যাস' বলে। তদ্রূপ জীবের সহিত ভগবানের যিনি নিত্য সম্বন্ধ করাইয়া দেন বা জীব-হৃদয়ে ভগবৎতত্ত্বকে যিনি প্রকাশ করেন, তিনিই 'ব্যাস'। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের পূজাকে 'ব্যাসপূজা' বলা হয়। 'ব্যাসপূজা' বলিতে কেবলমাত্র ব্যাসদেবের পূজাই নহে, তদনুগত গুরুবর্গের পূজাকেও লক্ষ্য করিয়া থাকে।

আজ হইতে প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে কলিযুগ-পাবনাবতারী অভিন্নব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভুর দ্বারা শ্রীবাসঅঙ্গনে ইহার প্রথম প্রচলন করাইয়াছিলেন। তৎপরে বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের প্রচারক শ্রীল প্রভুপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ইহজগতে পুনঃ প্রচলন করেন।

শাঙ্কর সম্প্রদায়েও ব্যাসপূজার প্রচলন থাকিলেও উহা যথার্থ ব্যাসপূজা নহে, ব্যাসপূজার নামে প্রহসন মাত্র। পূজ্যবস্তুকে আমরা নির্ব্বিচারে নিষ্কপটে ভ্রম-প্রমাদাদিশূন্য জানিয়া পূজা করিয়া থাকি ও তাঁহার উপদেশ পালন করিয়া থাকি। যেখানে তিনি ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষে দুষ্ট—এরূপ বিচার বা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, সেখানে পূজ্যবুদ্ধি কোথায়? তাই শ্রীশঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥

আমি ব্যাসকে মানিব, অথচ তাঁহার বিচার মানিব না—এরূপ কথা

অসম্ভব। শ্রীব্যাসদেবে ও ব্যাসাভিন্ন গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি জীবের অধোগতির মূল কারণ। এজন্য শাস্ত্রশিরোমণি পুরাণসম্রাট শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য শাস্ত্রসমূহে তারঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—"ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ", "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"। ভগবান্ যখন উপদেশকের পদবী গ্রহণ করিয়া জীবের নিত্যমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তখন তিনি 'আচার্য্য' নামে অভিহিত হন। উপদেশক আচার্য্যের অবমাননা করিলে বা তাঁহার সহিত শিষ্য আপনাকে সমজ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত অসূয়া বা স্পর্দ্ধা করিলে শিষ্যের কোনদিন সাফল্যের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং উদ্দিষ্ট বিষয় লাভের জন্য আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্‌বোধে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে তদবস্তুজ্ঞানে বিধিমত পূজা করিতেই হইবে। সুতরাং আদৌ আমাদিগকে শ্রীব্যাসের অনুগত হইতে হইবে। তাঁহার বাণী ও শিক্ষা গ্রহণ করিয়া জগতে তাঁহার প্রচারে ব্রতী হইতে হইবে। তাঁহার শিক্ষাতেই সমস্তপ্রকার কল্যাণ নিহিত আছে।

অদ্য অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথি। শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণসরোজ বন্দনার্থে যে-সমস্ত তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে ব্যাসপূজার ফল সম্বন্ধে Clear conception হওয়ার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে।

Physiologist অভিমত সামান্যতমও যদি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় তাহলে আমরা বুঝিতে পারি, মনুষ্য-শরীরে ২০৬খানা মতান্তরে ২১৮খানা হাড় আছে। প্রত্যেক হাড়ের কমবেশী প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও Backbone বা মেরুদণ্ডই প্রধান। মেরুদণ্ডবিহীন মনুষ্য সমাজের জঞ্জাল-সদৃশ। শ্রীব্যাস-পূজা বা গুরুপূজাই হইল— Backbone of Spiritual life (devotion life)। Democratic country-তে বসবাস করিয়া "Might is right" মনে করিয়া যদি কেহ বলেন গুরুপূজার কোন প্রয়োজন নাই, গুরুদেবের জয় দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে,—তাহার নিজ গুরুদেবের প্রতি আদৌ শ্রদ্ধা নাই। গুরুসেবক কখনও অন্য গুরুসেবককে গুরুভক্তি হইতে নিবারিত করিবেন না, পরন্তু উৎসাহই প্রদান করিবেন। তাহা না করিলে তিনি গুরুসেবক নহেন, সেবকব্রুব। আমরা ভগবদ্ভজন করিবার জন্য আসিয়াছি সত্য, কৃষ্ণপ্রেমই চরম প্রয়োজন, ইহাও নিখুঁত সত্য। তাই বলিয়া কোন দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তির প্ররোচণায় গুরুদেবের পূজা করিব না, ইহা হইতেই পারে না। ভগবত্তার চরমসীমা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজমুখেই প্রিয়ভক্ত উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

প্রথমং তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥

হে সৌম্য! তুমি যদি আমার সেবা করিতে চাও প্রথমে তোমার গুরুদেবের শরণাগত হও, তাঁহার পূজা কর। তবেই সিদ্ধি হইবে—ভগবদ্ভক্তি হইবে, অন্যথায় সব নিষ্ফল হইয়া যাইবে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়ের দ্বিচত্বারিংশ-বর্ষ

শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা

দেখিতে দেখিতে শ্রীপত্রিকার একচত্বারিংশ-বর্ষ অতিক্রান্ত হইল। শ্রীপত্রিকার বলিষ্ঠ লেখনী বিভিন্ন পাঠকের সেবাবিহীন বুদ্ধি ও প্রচেষ্টাকে সংশোধনপূর্ব্বক প্রাকৃত কামনা-বাসনা-ছেদনে স্বীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীপত্রিকার পাঠকগণ "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্"—ভাগবতীয় বাণী হৃদয়ঙ্গম করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইয়াছেন। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরপরাধে গৌরবিহিত কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া তাহাতে আত্মাহুতি প্রদানই বাস্তব আত্মকল্যাণ-লাভের প্রকৃষ্ট উপায়,—ইহা বিশেষভাবে আমাদের উপলব্ধির বিষয়।

শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণ নিরাকারবাদী বহ্বীশ্বরবাদী নহেন

বহ্বীশ্বরবাদী, পঞ্চোপাসক, শূন্যবাদী, নির্ব্বিশেষবাদি-সম্প্রদায় তাহাদের স্ব-স্ব নাস্তিক্যভাব লইয়া প্রাকৃত সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের দ্বারাই জগদীশ—জগন্নাথের সেবা হয় ভাবিয়া অকিঞ্চিৎকর প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু জড়গুণাশ্রিত কোনরূপ প্রাকৃত চেষ্টাদ্বারা অধোক্ষজ-অপ্রাকৃত শ্রীজগন্নাথ-দেবের বাস্তবসেবা সম্ভব নহে, তাহা তাহাদের বোধগম্য হয় না। যাঁহারা শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বলিয়া জ্ঞান ও উপলব্ধি করেন, তাঁহারা কখনই ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক—একায়ন-পদ্ধতি ছাড়িয়া

বহুশাখা-সমন্বিত অব্যবসায়ীর কাম্য নানা দেব-দেবীর আরাধনায় প্রবৃত্তি লাভ করেন না। সাত্বত-সম্প্রদায় ঐরূপ অকিঞ্চিৎকর নশ্বর উপাসনাকে তুচ্ছ ও ইতর কামনামূলে প্রতিষ্ঠিত জানিয়া অহৈতুকী ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন। নানাদেবৈকসেবিগণ ভক্তিবিরোধী সমন্বয়বাদের আবাহন করিয়া শ্রীনীলাচলনাথের অপ্রাকৃত সেবা-বঞ্চিত হন।

শ্রীপুরুষোত্তমদেব—সর্ব্বশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ

ভগবৎপ্রেরিত নিত্যসিদ্ধ পরদুঃখদুঃখী মহাভাগবতগণ অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত সবিশেষ শ্রীপুরুষোত্তমেরই সেবা করিয়া থাকেন। নির্ব্বিশেষবাদীর ভুবনেশ্বরের সেবা বা শ্রীঅনন্ত বাসুদেবের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন আদৌ সেবা-পর্য্যায়ভুক্ত নহে। শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বাস্তববস্তুরই সেবাধিকারী। তাঁহারা অনিত্য নশ্বর তাৎকালিক উপাসনায় আগ্রহ প্রদর্শন না করিয়া শ্রীভগবানের নিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রীজগন্নাথদেবের পূর্ণাবয়ব পরিলক্ষিত না হইলেও, তিনি অসম্পূর্ণ বা অপূর্ণাঙ্গ, এরূপ বিচার বিশেষ দোষাবহ ও অপরাধজনক। তিনি সনাতন পরংব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-তনু। তাঁহা হইতেই নিখিল চিদচিৎ বিশ্ব ও জৈবজগৎ সৃষ্ট ও প্রকাশিত হইয়াছে। বেদে-উপনিষদে আমরা তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে……তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম।" সুতরাং তাঁহার নিত্য শ্রীনাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য লইয়া তিনি অসমোর্দ্ধরূপে সয়ংসম্পূর্ণভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। অতএব প্রাকৃত জগতের সবিশেষ-নির্ব্বিশেষরূপ মলযুক্ত কোন প্রকার বিশেষণে তিনি বিশেষিত হইতে পারেন না। "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্", "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে", "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্" প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা বেদোপনিষৎ-ভাগবতাদি তাঁহার অপ্রাকৃত মহিমার সামান্য দিগ্‌দর্শন করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের শ্রীনীলাদ্রিনাথরূপে বিশ্রম্ভ সেবাগ্রহণ

অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু গৌড়ীয়নাথরূপে বিশুদ্ধ বিচার-সম্বলিত সাধন-ভজনপ্রণালী জগজ্জীবের প্রতি অহৈতুকী কৃপা-পরবশ হইয়া শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি নীলাচল শ্রীক্ষেত্রে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার চরম ভজন-শিক্ষা জগতের কল্যাণের নিমিত্ত প্রকট করিয়াছেন। বদ্ধজীবকুল আপনাদিগকে ঐকান্তিকী কেবলাভক্তির আশ্রয়গ্রহণকারীরূপে পরিচিতি বা স্বীকৃতি দিতে না পারায় শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তন-যজ্ঞ হইতে বহুদূরে অবস্থিত। শ্রীভগবান্

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপে ব্রজেন্দ্রনন্দন, তিনিই আবার শ্রীনীলাদ্রিনাথরূপে প্রকটিত হইয়া ভক্তসেবকগণকে অমায়ায় তাঁহার সেবাসুযোগ দানপূর্ব্বক তাঁহাদের বিশ্রম্ভসেবা গ্রহণ করিয়া আত্মতুষ্ট হইয়া বিরাজিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু উপাস্যতত্ত্ব-নির্ণয়ে স্বয়ং এবং স্বরূপাদি ষড়্‌গোস্বামী ও গৌড়ীয়-গুরুবর্গের দ্বারা যে-সকল তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত প্রকাশ ও প্রচার করাইয়াছেন, তাহা ভক্তিবিরোধী জনগণের উপলব্ধির বিষয় হয় নাই। তিনি গৌড়ীয়গণকে সর্ব্বতোভাবে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন।

দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ উপদেশ

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা নির্ব্যলীকভাবে করিতে গেলে অসৎসঙ্গত্যাগ—যোষিৎ-যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গ বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সাধক-সাধিকাগণের অধিকাংশ প্রাকৃত বা কনিষ্ঠাধিকারী হওয়ায়, বদ্ধজীবগণের ভোগোন্মুখী আচার-আচরণ-সমূহ প্রায়শঃই তাহাদিগকে অমার্জ্জিত ও অভদ্র হইবার যোগ্যতা প্রদান করে। সুতরাং বিশেষ সাবধানতার সহিত ঐরূপ স্বরূপবিভ্রান্তিকর সাধন-ভজনবিরোধী সঙ্গ ও পরিবেশ সযত্নে পরিহার করিয়া চলাই বুদ্ধিমান্ হরিভজনপিপাসু জনগণের বিশেষ ও একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে।

উন্নতোজ্জ্বলরসে আরাধনার চমৎকারিতা

সুতরাং দুঃসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক গুরু-বৈষ্ণবানুগত্যে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবা ব্যতীত কখনই সুনির্ম্মল আত্মার নিত্যকল্যাণলাভ হয় না। শান্ত, দাস্য, গৌরব-সখ্যের অধিকারিগণ শ্রীকৃষ্ণের যে উপাসনা বা সেবা করেন, তাহা শ্রীনন্দনন্দনের সেবার আংশিক প্রকাশ মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহকে যাঁহারা পরমোপাস্য-বিগ্রহরূপে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাঁহাদের অপ্রাকৃত রসবিচারে ন্যূনতা বা অজ্ঞতা পরিলক্ষিত হয়। বৈধভক্তি-পথের পথিকগণ অনুরাগের সহিত ভগবৎ-সেবা করিবার অধিকারী নহেন; তাঁহারা বিধি-নিষেধের অন্তর্গত বৈধভক্তি-দ্বারা মর্য্যাদামার্গে সর্ব্বশক্তিমানের পূজার্চ্চন করিয়া থাকেন। ঐরূপ উপাসনা বা আরাধনায় উন্নতোজ্জ্বল-রসাদির প্রকাশ না থাকায় উহা অভীষ্ট চরমফল প্রদানে অসমর্থ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতা ও আরাধানার কথাই জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন। তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকেই মধুররতির উপাস্য 'কান্ত'রূপে নির্ণয় করিয়াছেন। এইরূপ আরাধনায়ই উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। অভিধাবৃত্তিতে বৈষ্ণবগণই—কার্ষ্ণ এবং তাঁহারাই গৌড়ীয়নাথের একান্ত অনুগত 'গৌড়ীয়' বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের উন্নত সেবাধিকার—সাধু-শাস্ত্রকর্ত্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত।

শ্রীবিগ্রহ দর্শনের বাস্তব অধিকারী নির্ণয়

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে শ্রীজগন্নাথ-দর্শন—"প্রতিমা নহ তুমি, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন" বাক্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—শ্রীজগন্নাথদেব অধোক্ষজ-তত্ত্ব। তিনি কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু নহেন। আমরা নিজেদের ইচ্ছা ও জ্ঞানের প্রভাবে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি না। শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপা যাঁহার প্রতি বর্ষিত হইবে, একমাত্র তিনিই তাঁহাকে দর্শনের অধিকারী হইবেন; নতুবা পুরুষাভিমানে ভোগবুদ্ধি লইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেই তাঁহার হস্ত-পদরহিত দর্শন ঘটিবে। রজস্তমোগুণ-তাড়িত ব্যক্তিগণের ভগবদ্দর্শন হইতে পারে না। যতদিন জীব ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত হইতে না পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের প্রকাশ তাহাদের চিত্তে প্রকটিত হইবে না।

"ব্রহ্মার ন্যায় ব্যক্তি—যিনি আমাদের হইতে কতগুণে শ্রেষ্ঠ, তিনিও নিজ অক্ষজদর্শনে ভগবান্‌কে মাপিতে গিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহার চেষ্টা দর্শন করিয়া তৎসমীপে উদিত হইয়া বলিলেন,—আমি স্বরূপতঃ যে পরিমাণ ও সত্তাবিশিষ্ট এবং যে যে রূপ, গুণ ও লীলাবিশিষ্ট, তুমি সেইসকল বিষয়ের যথাযথ অনুভব আমার কৃপায় সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হও। এস্থলে "মদনুগ্রহাৎ" কথাটী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ভগবদনুগ্রহই একমাত্র কারণ। ভোগবুদ্ধিরহিত হইয়া অনন্য-চিত্তে ভগবদ্দর্শনের যত্ন করিলেই ভগবৎকৃপা লাভের অধিকারী হওয়া যায়। ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত বিজ্ঞান-রহস্য-সংযুক্ত অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপের উপলব্ধি ঘটে না। শ্রৌতপথ অতিক্রম করিয়া ভগবজ্ জ্ঞানলাভ হয় না। ভগবজ্ জ্ঞানলাভের নিদর্শনই ভজনকারীর ভজনীয় বস্তুর সেবাবৃত্তিতে অবস্থান।"

রথযাত্রানুষ্ঠানের তাৎপর্য্য ও শিক্ষা

শ্রৌতপথাশ্রয়ীর ভগবদনুগ্রহলাভ-বিষয়ে যে দর্শন ও অনুভব, জাগতিক বিচারবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের তাহা কোনদিনই অনুধাবনের বিষয় নহে। যাঁহারা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে স্নাত, তাঁহারাই শ্রীরূপানুগত্যে ভবসিন্ধুতীরে সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান মহাপ্রভু শ্রীজগদ্বন্ধুর রথযাত্রা-মহোৎসবের বাস্তব তাৎপর্য্য অর্থাৎ শ্রীরাধার অনুগত সম্প্রদায় ব্রজরাজনন্দনকে প্রেমরজ্জুদ্বারা আকর্ষণপূর্ব্বক ঐশ্বর্য্য-লীলাক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র-নীলাচল হইতে মাধুর্য্য-লীলাভূমি সুন্দরাচল-বৃন্দাবনে লইয়া যান, উপলব্ধি করিয়া থাকেন। বার্ষভানবীর ভাবকান্তি-গ্রহণকারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত সম্প্রদায় প্রথম রথযাত্রার সময় তাঁহাদের নিজস্থানে

লইয়া যাইবার জন্য যেরূপ যত্নবিশিষ্ট হন, উল্টারথের সময় তাঁহাদের সে যত্ন নাই। তাঁহারা ঘরের নিজস্ব ধনকে পরের দুয়ারে ঠেলিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হন না।' গোকুলের বিরহ-বিধুরা গোপীগণ কুরুক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে তীর্থযাত্রাছলে গমন করিয়া তাঁহাদের প্রাণগোবিন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের পক্ষে এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। বিরহ বা বিপ্রলম্ভই তাঁহাদের ভজন। অনবসরকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আলালনাথে গমন বা বিশ্রাম—বিপ্রলম্ভ-ভজনেরই বিশেষ উদ্দীপক। শ্রীগৌরসুন্দর এইরূপ বিরহ-বিধুর গোপীগণের ভাব লইয়াই শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন। শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে তাঁহার সম্ভোগস্পৃহার পরিবর্ত্তে বিরহানল বা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে সুখপ্রদানের চেষ্টা অধিকতর উদ্দীপ্ত হইত।

শ্রীরাধা-মাধব-ভজনে অধিকার-প্রার্থনা

আমরা শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়-গুরুবর্গের বাণীতে পাই,—"জড়চিন্তা ও জড়ধর্ম্মকে দূর করিয়া ক্রমশঃ চিদ্ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে ব্রজে গোপীজন্ম লাভ হইবে। গোপী হইতে না পারিলে কৃষ্ণভজন হইবে না।" শ্রীগৌরসুন্দরের অনর্পিতচর মহাদান—শ্রীমাধব-ভজনরীতি যাহা সুদুর্ল্লভ হইলেও তিনি দান করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎও অনুশীলন ও আলোচনার সময় ও সুযোগ আমাদের হইল না। আমরা অনর্থ ও জড়ের বিক্রমে এতদূর অভিভূত যে, সেই অনর্থরাশি পরিমার্জ্জনপূর্ব্বক আত্মশোধন করিতে পারিতেছি না! আমরা কিরূপে তাঁহার নিজজনগণের একান্ত আশ্রয়ে তাঁহার বিপ্রলম্ভ ভজনের —মহা অবদানের বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিব? গুরু-বৈষ্ণবগণ ভূরিদ—পরম করুণাময়, আমরা আত্মঘাতী হইয়া সেই অহৈতুকী কৃপা কিরূপে অনুভব করিব? আমরা স্বরূপে পরতন্ত্র-স্বতন্ত্র হইয়াও, স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারক্রমে আত্মমঙ্গলের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি! এরূপ দুরবস্থায় "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ"—এই বেদান্ত-বাক্যই আমাদের একমাত্র আশাবন্ধ। বিরহ বা বিপ্রলম্ভদশায় বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের আদর্শ, শিক্ষা, আচার, প্রচারাদি অনুশীলনে একান্তভাবে প্রযত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। অপ্রাকৃত বিরহ-ভাবোদ্দীপ্তা সর্ব্বশুভঙ্করী শ্রীনামকীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিমহাদেবী আমাদের হৃদয়ান্তঃপুর আলোকিত করুন্। আমরা যেন নব-উদ্দীপনায় শ্রীহরিকীর্ত্তন ও শ্রীনাম-দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে পারি।

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER

SHRI GOUDIYA-PATRIKA

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
   Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali month i. e. once in month.
3. Printer's Name—Tridandi-Swami Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj.
   Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
   Address—Shri Devananda Goudiya Math.
   Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
4. Publisher's Name— Do
   Nationality— Do
   Address— Do
5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj.
   Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
   Address—Shri Devananda Goudiya Math.
   Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
6. Name and address of individuals who won the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the total capital.— Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Swami Bhakti Vedanta Acharyya* hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd./-Swami B. V. Acharyya

Signature of Publisher.

Dated—28. 2. 90

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পও সেই শ্রম॥

৪২শ বর্ষ | ৪ মধুসূদন, ক্ষীরোদশায়ী, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ
৩১শে চৈত্র, শনিবার, ১৩৯৬, ইং ১৪।৪।৯০ | ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাসকৃতং শ্রীবলদেব-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্‌গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে শ্রীনারদ-বহুলাশ্ব-সংবাদে বলভদ্রজন্ম-বর্ণনে দশমেঽধ্যায়ে]

শ্রীবেদব্যাস উবাচ,—

১। দেবাধিদেব ভগবন্ কামপাল নমোঽস্তু তে।
নমোঽনন্তায় শেষায় সাক্ষাদ্রামায় তে নমঃ॥ ৩৬॥

[শ্রীনন্দ মহারাজ বিস্মিত হইয়া বেদব্যাসকে শিশুরূপী শেষকে দর্শন করাইলে সত্যবতী-তনয় ব্যাসদেব ক্রোড়স্থিত বলদেবকে অবলোকন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—]

শ্রীবেদব্যাস বলিলেন,—হে দেবাধিদেব ভগবন্! আপনি কামপাল;

আপনাকে নমস্কার। আপনি শেষ অনন্ত সাক্ষাৎ বলরাম, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৬ ॥

২। ধরাধরায় পূর্ণায় স্বধাম্নে সীরপাণয়ে।
সহস্রশিরসে নিত্যং নমঃ সঙ্কর্ষণায় তে ॥ ৩৭ ॥

আপনি ধরাধর, পূর্ণতেজোময়, লাঙ্গলপাণি, সহস্রমস্তক, সঙ্কর্ষণ, আপনাকে নিত্য নমস্কার করি ॥ ৩৭ ॥

৩। রেবতীরমণ ত্বং বৈ বলদেবোঽচ্যুতাগ্রজঃ।
হলায়ুধঃ প্রলম্বঘ্নঃ পাহি মাং পুরুষোত্তম ॥ ৩৮ ॥

আপনি রেবতীরমণ, অচ্যুতাগ্রজ, বলদেব, হলায়ুধ ও প্রলম্বঘ্ন। হে পুরুষোত্তম! আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৩৮ ॥

৪। বলায় বলভদ্রায় তালাঙ্কায় নমো নমঃ।
নীলাম্বরায় গৌরায় রোহিণেয়ায় তে নমঃ ॥ ৩৯ ॥

আপনি বল, বলভদ্র ও তালাঙ্ক নামে অভিহিত, আপনাকে নমস্কার। আপনার পরিধানে নীল বসন ও বর্ণ গৌর; হে রোহিণীনন্দন! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৩৯ ॥

৫। ধেনুকারির্মুষ্টিকারিঃ কুম্ভাণ্ডারিস্ত্বমেব হি।
রুক্ম্যরিঃ কূপকর্ণারিঃ কূটারির্ব্বল্বলান্তকঃ ॥ ৪০ ॥

আপনি ধেনুক, মুষ্টিক, কুম্ভাণ্ড, রুক্মী, কূপকর্ণ, কূট ও বল্বলের অন্তক ॥ ৪০ ॥

৬। কালিন্দী-ভেদনোঽসি ত্বং হস্তিনাপুর-কর্ষকঃ।
দ্বিবিদারির্যাদবেন্দ্রো ব্রজমণ্ডল-মণ্ডনঃ ॥ ৪১ ॥

আপনি কালিন্দীর ভেদ ও হস্তিনাপুরের কর্ষণ করিয়াছিলেন; আপনি দ্বিবিদের অরি, যাদবেন্দ্র ও ব্রজমণ্ডলের মণ্ডনস্বরূপ ॥ ৪১ ॥

৭। কংসভ্রাতৃ-প্রহন্তাসি তীর্থযাত্রাকরঃ প্রভুঃ।
দুর্য্যোধন-গুরুঃ সাক্ষাৎ পাহি পাহি জগৎপ্রভো ॥ ৪২ ॥

আপনি কংসভ্রাতাদিগের নিহন্তা, তীর্থযাত্রাকারী সাক্ষাৎ প্রভু ও দুর্য্যোধনের গুরু। হে প্রভো! জগৎ রক্ষা করুন, রক্ষা করুন ॥ ৪২ ॥

৮। জয় জয়াচ্যুত দেব পরাৎপর
স্বয়মনন্ত দিগন্ত-গতশ্রুত।
সুর-মুনীন্দ্র-ফণীন্দ্রবরায় তে
মুসলিনে বলিনে হলিনে নমঃ ॥ ৪৩ ॥

হে অচ্যুত পরাৎপর দেব! আপনার জয় হউক, জয় হউক। আপনি সাক্ষাৎ অনন্ত ও দিগন্ত-বিশ্রুতকীর্ত্তি, সুরেন্দ্র-মুনীন্দ্র ও ফণীন্দ্রবর, আপনি হলী-বলী ও মুসলী; আপনাকে নমস্কার করি॥ ৪৩ ॥

৯। ইহ পঠেৎ সততং স্তবনন্তু যঃ
স তু হরেঃ পরমং পদমাব্রজেৎ।
জগতি সর্ব্ববলং ত্বরিমর্দ্দনং
ভবতি তস্য জয়ঃ স্বধনং ঘনম্॥ ৪৪ ॥

ইহ সংসারে যে মানব সতত আপনার এই স্তব পাঠ করেন, তিনি শ্রীহরির পরমপদ প্রাপ্ত হন; জগতে তাঁহার শত্রু-সংহারক সর্ব্ববিধ বল লাভ হয় এবং তিনি প্রভূত অর্থ-পরমার্থলাভে সর্ব্বত্র জয়ী হন॥ ৪৪ ॥

শ্রীনারদ উবাচ,

১০। বলং পরিক্রম্য শতং প্রণম্য
দ্বৈপায়নো দেব-পরাশরাত্মজঃ।
বিশালবুদ্ধির্মুনিবাদরায়ণঃ
সরস্বতীং সত্যবতীসুতো যযৌ॥ ৪৫ ॥

শ্রীনারদ বলিলেন,—অনন্তর সমস্ত মুনিগণসহ বিশালবুদ্ধি বদরী-বনবাসী দ্বৈপায়ন পরাশরতনয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস শ্রীবলদেবকে শতবার প্রদক্ষিণ-প্রণাম করিয়া সরস্বতী-তীরে প্রস্থান করিলেন॥ ৪৫ ॥

শ্রীমহাপ্রসাদে বিতর্ক

স্মার্ত্ত ও পরমার্থ-ভেদে রুচির পার্থক্য; স্মার্ত্ত-ধুরন্ধর বাসুদেব-সার্ব্বভৌমের মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য উপলব্ধি

জগতে সকল বিষয়েই স্মার্ত্ত ও পরমার্থ-ভেদে রুচি দুইপ্রকার। কেবল রুচি নয়, সমস্ত সিদ্ধান্ত ও কার্য্যেও ঐপ্রকার ভেদ লক্ষিত হয়। সত্ত্ব-রজ ও তমোগুণের প্রভাবানুসারে এইপ্রকার রুচির ও সিদ্ধান্তের ভেদ হইয়া থাকে। বহুকাল হইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ সম্বন্ধে এইপ্রকার রুচি ও সিদ্ধান্ত-ভেদ দেখিয়া আসিতেছি। বিদ্বদ্বর বাসুদেব-সার্ব্বভৌম মহাশয় যে-সময়ে সর্ব্বপণ্ডিতাগ্রগণ্য হইয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে বাস করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহারও মনে শ্রীমহাপ্রসাদ-বিষয়ে বিষম সংশয় ছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ষষ্ঠ

পরিচ্ছেদে দেখা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় যখন তাঁহার চিত্ত রজ ও তমোগুণদ্বয় অতিক্রম করিয়া ভক্তির বিশুদ্ধ সত্ত্বে অধিকার লাভ করিল, তখন তাঁহার আর মহাপ্রসাদে কোন সন্দেহ ছিল না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাতে তিনি নৃত্য করিতে করিতে অধৌত-বদনে শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা করিয়া বলিলেন, যথা পদ্মপুরাণে,—

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্রকাল বিচারণা॥
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥

সংশয়াত্মার মহাপ্রসাদ-গোবিন্দ-শ্রীনামব্রহ্ম ও বৈষ্ণবে শ্রদ্ধার অভাব

বাসুদেব-সার্ব্বভৌম মহাশয় তৎকালে স্মার্ত্তজগৎ ও মায়াবাদী পণ্ডিতদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। এরূপ থাকিয়াও তিনি স্বয়ং বাক্যের দ্বারা ও চরিত্রের দ্বারা জগৎকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়াছেন, তখন আর শিষ্টাচারী কোন ব্যক্তিরই তদ্বিরুদ্ধে কথা কওয়া উচিত নয়। কিন্তু সৌভাগ্য ব্যতীত জীবের সংশয় দূর হয় না; সুতরাং তাঁহার পরেও সংশয়াত্মা ব্যক্তিগণ শ্রীমহাপ্রসাদ সম্বন্ধে বহুবিধ বিতর্ক করিয়া থাকেন। সার্ব্বভৌম অপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্য-প্রাপ্তি ইহার কারণ নহে। মহাভারতে এইপ্রকার দুর্গতির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

শ্রীমহাপ্রসাদ সম্বন্ধে কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের কুতর্ক উত্থাপন ও দৈবদণ্ড লাভ

যে-সময়ে আমরা শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ছিলাম, সে-সময়েও অনেক স্মার্ত্ত পণ্ডিতকে মহাপ্রসাদ-বিষয়ে কুতর্ক করিতে শুনিয়াছি। কেহ বলিতেন যে, মন্দিরের মধ্যে মহাপ্রসাদ সেবন করা কর্ত্তব্য; কেহ বলিতেন, মন্দিরের বাহিরে পঞ্চক্রোশ পর্য্যন্ত প্রসাদ সেবন কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বা বলিতেন, মহাপ্রসাদ সর্ব্বদা শূদ্রস্পৃষ্ট; মন্দিরের ভিতর বা মন্দিরের বাহিরে কোথাও সেবন করা উচিত নয়। ঐ শ্রেণীর পণ্ডিতদিগের প্রতি যে-সকল দৈবদণ্ড হইয়াছিল, তাহাও আমরা দেখিয়াছি।

বঙ্গবাসী-পত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে স্মার্ত্তের বহির্ম্মুখী ব্যবস্থা

বঙ্গবাসী-পত্রে আমরা একটী বহির্ম্মুখ ব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়াছি। ইহাতে আমাদের কিছু দুঃখ নাই, যেহেতু এইরূপ ব্যবস্থা মায়াবদ্ধ জীবের সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। ব্যবস্থা এই যে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ ক্ষেত্র-পঞ্চক্রোশের বাহিরে গ্রহণ করা উচিত নয়। স্বীয় ব্যবস্থা সমর্থন করিবার জন্য কোন বিদ্যারত্ন মহাশয় নিম্নলিখিত শাস্ত্রপ্রমাণ কয়েকটী তুলিয়াছেন।—

উৎকল খণ্ডে—পঞ্চক্রোশমিদং ক্ষেত্রং সমুদ্রান্তর্ব্যবস্থিতম্।
ত্রিক্রোশং তীর্থরাজস্য তটভূমৌ সুনির্ম্মিতং।
সুবর্ণবালুকাকীর্ণং নীলপর্ব্বতশোভিতং॥
বিষ্ণুলয় গতং তদ্ধি নির্ম্মাল্যং পতিতাদয়ঃ।
স্পৃশন্ত্যন্নং ন দুষ্টং তদ্ যথাবিষ্ণুস্তথৈবতৎ॥
ব্রতস্থাবিধবা তত্র সর্ব্বে বর্ণাশ্রমাস্তথা।
তৎপ্রাশনেন পুরন্তে দীক্ষিতাশ্চাগ্নিহোত্রিণঃ॥
স্বদেশ্যাঃ পরদেশ্যা বা সর্ব্বে তত্র সমা মতাঃ।
চিরস্থমপি সংশুষ্কং নীতং বা দূরদেশতঃ।
'যথা তথোপযুক্তং তৎ' সর্ব্বপাপপ্রণোদনম্॥
কুক্কুরস্য মুখাদ্ভ্রষ্টং—

ক্রিয়াযোগসারে—লবণাম্ভোনিধেস্তীরে পুরুষোত্তমসংজ্ঞকং।
পুরং তদ্ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ স্বর্গাদপি সুদুর্ল্লভং॥
প্রবিশন্তস্ত তৎ ক্ষেত্রং সর্ব্বে স্যুর্বিষ্ণুমূর্ত্তয়ঃ।
তস্মাদ্ বিচারণা তত্র ন কর্ত্তব্যা কদাচন॥
চাণ্ডালেনাপি সংস্পৃষ্টং গ্রাহ্যং তত্রান্নমগ্রজৈঃ।
সাক্ষাদ্বিষ্ণুর্যতস্তত্র চাণ্ডালোপি দ্বিজোপি চ॥

উদ্ধৃত প্রমাণ-শ্লোকাবলীর যথার্থ তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ, এবং সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি-স্থাপন

উক্ত ব্যবস্থার মধ্যে পণ্ডিতমহাশয় কেবল স্কন্দপুরাণের উৎকল খণ্ড এবং পদ্মপুরাণীয় ক্রিয়াযোগসার দুইটী মাত্র শাস্ত্র হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় যে, তাঁহার অন্যান্য শাস্ত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে যাহা কথিত আছে, তাহা দেখিবার সুবিধা হয় নাই। দুঃখের বিষয় এই যে,

পণ্ডিত মহাশয়ের সিদ্ধান্তে অবিচারিত বিধান-দোষ দেখা যায়। আবার তিনি যে কয়েকটি প্রমাণ তুলিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার সিদ্ধান্ত বল পায় না। উক্ত প্রমাণগুলিতে এইমাত্র কথা আছে যে, শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র—পঞ্চক্রোশ। এই পঞ্চক্রোশের মধ্যে যে ভগবদালয় আছে, তদ্গতব্যক্তির নির্ম্মাল্য ও অন্নগ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে বর্ণ-বিচার নাই। ইহাতে এরূপ কোন কথা নাই যে, কেবল সেই মন্দিরের মধ্যে বা পঞ্চক্রোশের মধ্যে প্রসাদ সেবন করিবে, পঞ্চক্রোশের বাহিরে করিবে না। 'নীতং বা দূরদেশতঃ' এই শব্দগুলির দ্বারা মন্দির-মধ্যে বা মন্দির হইতে কিয়ৎ পরিমাণ দূর পর্য্যন্ত প্রসাদ সেবন করা উচিত—এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে; তাহাতে আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের পাণ্ডিত্যে চমৎকৃত হইলাম, কেননা 'চিরস্থমপি সংশুষ্কং নীতং বা দূরদেশতঃ। যথা তথোপযুক্তং তৎ' এই শব্দগুলির অভিধাশক্তি বিচার করিলে সমস্ত জগতে প্রসাদ সেবনের বিধি করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণগুলিতে এমত কোন শব্দ পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা 'দূরদেশতঃ' শব্দের অর্থ লক্ষণাদ্বারা কুণ্ঠিত করা যায়। পদ্মপুরাণ হইতে গৃহীত বচনটীতে 'প্রবিশন্তস্তু তৎ ক্ষেত্রং' এই শব্দগুলি হইতে দ্বিতীয় পদে 'তত্র' শব্দের অর্থদ্বারা কেবল ঐ ক্ষেত্রমাত্র বুঝাইতে পারে না। 'তত্র' শব্দে তদ্বিষয়ে অর্থাৎ শ্রীমহাপ্রসাদ-বিষয়ে ইহাই বুঝিতে হইবে। 'চাণ্ডালেনাপি সংস্পৃষ্টং' শ্লোকে দুইটী 'তত্র' শব্দ আছে। তাহার অর্থ সেই ক্ষেত্রনিষ্ঠ বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা ক্ষেত্রের বহির্ভাগে প্রসাদান্ন পাইবার কোন নিষেধ বাক্য দেখা যায় না।

উপবাসাদি-ব্রত-নির্ণয়ে স্মার্ত্তগণের ব্যবস্থা পারমার্থিকগণের গ্রহণযোগ্য নহে

ঐ পদ্মপুরাণে যখন "ন দেশ-নিয়মস্তত্র" এই বাক্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যধৃত শ্লোকে পাওয়া যায়, তখন মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ন্যায়সিদ্ধান্ত কখনই বুধগণ-কর্ত্তৃক আদৃত হইতে পারে না। স্মার্ত্তপণ্ডিতগণ যদি সকলেই ঐরূপ সিদ্ধান্ত করেন ত' করুন, তাহাতে শ্রীমহাপ্রসাদের কোন ক্ষতি নাই; কেন না, প্রাচীনকাল হইতে শুদ্ধ মহাপ্রসাদান্ন পাশ্চাত্য-দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দূরদেশে নীত হইতেছে এবং তত্র তত্রস্থ পারমার্থিক পণ্ডিগণকর্ত্তৃক আদৃত হইয়া গৃহীত হইতেছে। পারমার্থিক পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহা সমস্ত পারমার্থিক জগতে গৃহীত হয়; সুতরাং স্মার্ত্ত ও পরমার্থ-ভেদে সিদ্ধান্তও সর্ব্বত্র দ্বিবিধ। স্মার্ত্তগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত মাথায় করিয়া রাখুন,

তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি বা ক্ষতি নাই। শ্রীহরিবাসরাদি সম্বন্ধেও দ্বিবিধ মত আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে।

কর্ম্মজড় স্মার্ত্তমত পারমার্থিকগণ-কর্ত্তৃক চিরকাল উপেক্ষিত

শেষকথা এই যে, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সিদ্ধান্ত তাঁহার সম্প্রদায়ে গৃহীত হউক। তিনি পরমার্থীদিগকে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করিবেন, এরূপ আশা (যেন) না করেন। কথা এই যে, এরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ্য পত্রে মুদ্রিত করিবার কারণ দেখা যায় না। স্মার্ত্ত-পরমার্থ-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিবাদ উঠাইবার কি প্রয়োজন আছে? তবে এই কথা বলা যায় যে, এখন কলিকাল; এইরূপ মহাপ্রসাদ সম্পর্কে বৃথা বিতর্ক উঠাইয়া, শ্রীপুরুষোত্তম মন্দিরের শাখামৃগাদির বধ-ব্যবস্থা করিয়া এবং মন্দির-সংলগ্নস্থানে মলত্যাগ ব্যবস্থাপূর্ব্বক কেবল ভক্তবৃন্দের মনে কষ্ট দেওয়া কতকগুলি লোকের লীলা-খেলা হইয়া থাকে।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

দীক্ষা-বিধান

সাধারণতঃ মানবগণ বীজগর্ভ-সমুদ্ভূত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য বৈদিক বিধানমত দশটী সংস্কার গ্রহণ করেন। উপনয়ন সংস্কার দশটী সংস্কারের অন্যতম। এই সংস্কার প্রাপ্ত হইলে মানবের পাপ অপনোদিত হইয়া দ্বিতীয় নিষ্পাপ জন্ম হয়। যে কুলে সংস্কার গ্রহণ পৈতৃকাচার নহে, তথায় জন্মাবধি বীজগর্ভ-সমুদ্ভূত পাপ প্রশমিত হয় না। আর যে কুলে সংস্কার-বিধি প্রচলিত, সেই কুলকে পুণ্যময় কুল বলিয়া পণ্ডিতগণ আখ্যা দিয়া থাকেন। প্রাক্তন পাপবহুল হইয়া মানবগণ শোচ্য শূদ্রকুলে উদ্ভূত হন আর প্রাক্তন পাপ ক্ষীণ হইয়া পুণ্যলব্ধ জীব দ্বিজকুলে শরীর লাভ করেন।

দ্বিজকুলে স্থূলশরীর পাইলেই যে বীজগর্ভ-সমুদ্ভূত পাপাক্রান্ত হইতে হইবে না, এরূপ নয়, পরন্তু দশসংস্কার প্রভাবে প্রবর্ত্তমান পাপ বিনাশকল্পে উপনয়ন-সংস্কার আবশ্যক। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—'এবমেনঃ শমং যাতি বীজগর্ভ-সমুদ্ভবং।' উপনয়ন-সংস্কারে আচার্য্য বেদ-সমীপে মানবকে লইয়া যান। উপনীত দ্বিজই বেদাধ্যয়ন করেন। যিনি বেদাধ্যয়ন-বিমুখ, তিনি উপনয়ন

বিশিষ্ট হইয়াও উপনয়ন-গ্রহণের একমাত্র তাৎপর্য্যহীন হইয়া ইহ জন্মেই শূদ্র হইয়া যান এবং বংশ-পরম্পরা 'দ্বিজ' শব্দ বাচ্য হইবার পরিবর্ত্তে শূদ্রবংশের জনক হন। শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণবংশ বলিয়া পরিচয় দিলে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণের যোগ্যতা হয় না। ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। সাবিত্র্য সংস্কার গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত তাঁহার এক জন্ম বা শূদ্রতা বর্ত্তমান থাকে। সংস্কার গৃহীত হইলে মানবক দ্বিজ হন।

বিশুদ্ধ মাতাপিতার নিকট জন্মলাভ করিলে তাহাই শৌক্র জন্ম। শৌক্র জন্ম বিধানক্রমে সাধারণতঃ পুরোহিতকর্ত্তৃক বিচার না করিয়া পূর্ব্ববংশগত প্রথামত উপনয়ন সংস্কার বিহিত হয়। যেখানে শৌক্রজন্মের অসদ্ভাব, তথায় নানাপ্রকার যোগ্যতার বিচার উপস্থিত হয়। পুরোহিত সেই কালে বিচার করিয়া উঠিতে পারেন না। শৌক্র জন্ম হইলেই যে তিনি ব্রাহ্মণ হইবেন, এরূপ নহে, তাঁহার সাবিত্র্য বা দ্বিতীয় জন্ম লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত বীজগর্ভ-সমুদ্ভূত প্রবর্ত্তমান পাপের অবসান হয় না। পূর্ব্ব পুণ্যফলে প্রাক্তন দুর্জাতিত্ব-অভাবেই তাঁহার বিশুদ্ধ জনক-জননী লাভ হয়। 'বিশুদ্ধ'-শব্দে সংস্কার-বিশিষ্ট অর্থাৎ পাপ-বর্জ্জিত বংশে পুণ্যবানের জন্ম হয়। বেদপাঠের অভাবে লব্ধ-দ্বিতীয়জন্ম দ্বিজের পুনরায় পাপময় শূদ্রত্ব লাভ ও বংশপরম্পরাক্রমে শূদ্রতা বা অদ্বিজত্ব বা বেদপাঠাযোগ্যতা জানিতে হইবে। ইহাই শৌক্র বিধানক্রমে দ্বিজত্ব।

দ্বিজ যে কালে শাস্ত্র-বিধিমত দীক্ষা গ্রহণ করেন, তখনই তাঁহার প্রকৃত সংস্কার হয়। যে-সকল মানবক সামাজিক বিধানমতে দ্বিজত্ব-লাভে বাধা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা গুরুর নিকট নিজ যোগ্যতার পরীক্ষা প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা লাভের যোগ্যতা লাভ করেন। শিষ্যের যোগ্যতা বা নিজ বৃত্তের পরিচয়—আশ্রয় গ্রহণ। আশ্রয় গ্রহণ আর কিছুই নয়, কেবল সেবা-প্রবৃত্তির পরিচয়ে শরণাগত হওয়া। অভক্তির পথে আশ্রয় গ্রহণের সম্ভাবনা নাই। 'গুরুপদাশ্রয়' বলিতে গুরুকে ঈশ্বর-বোধ এবং আপনাকে দাস বা বশ্য-বোধ। সদ্‌গুরু-বিচারে বেদ বলেন,—বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠই সদ্‌গুরু এবং সৎশিষ্যের হস্তে যজ্ঞীয় সমিধাদি যজ্ঞীয় উপায়ন বর্ত্তমান থাকিবে। যে মানবক অক্ষজ জ্ঞান বা অধিরোহ-পন্থা বা মায়ার ভোক্তা ত্রিগুণাত্মকতা পরিহার করিবার সঙ্কল্প করিয়া অধোক্ষজের সেবা বা অবতীর্ণ, অবিসংবাদিত নিরন্তকুহক সত্যে অবস্থিত হইতে পারিবেন, তাঁহারই গুরুচরণাশ্রয়-বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইয়া দীক্ষা-প্রাপ্তি হইবে। 'দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ

পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্ব কোবিদৈঃ॥' 'দীক্ষা' বলিলে এই বুঝায় যে, যে অনুষ্ঠান হইতে মানবক বা দ্বিজের প্রকৃতির অতীত জ্ঞানলাভ হইয়া প্রাকৃত পাপ-পুণ্যাদির সম্যক্ বিনাশ সাধিত হয়, তাহাকেই বিজ্ঞজনে 'দীক্ষা' সংজ্ঞা দিয়া থাকেন।

দীক্ষা দ্বিবিধ—বৈদিকী ও বেদানুগা। বেদানুগা দীক্ষা দ্বিবিধা—পৌরাণিকী ও পাঞ্চরাত্রিকী। যোগ্যজ্ঞানে সংস্কৃত দ্বিজের দীক্ষা বৈদিকী। অযোগ্যজনে অধিকারীজ্ঞানে পৌরাণিকী দীক্ষা এবং অনধিকারী-বিচারে ভাবী যোগ্যতা লাভের উদ্দেশে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা। ব্রহ্মযামল বলিয়াছেন,—কলিকালে বৈদিকী দীক্ষার সম্ভাবনা নাই। তাহাই শ্রীহরিভক্তিবিলাসে পঞ্চমবিলাস-প্রারম্ভে উদাহৃত হইয়াছে।

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পাহি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগম-মার্গেন শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস পৌরাণিকী দীক্ষার বিস্তৃত পদ্ধতি মধ্যে যোগ্যতা-বিধায়ক দশসংস্কারের বিধান দীক্ষার অঙ্গমধ্যে উল্লিখিত করিয়া ক্রম-দীপিকা সারদাতিলক, রামার্চ্চনচন্দ্রিকা পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বর্ণন করেন নাই এবং দীক্ষার অনুকূলে আগমবিধির কথাই সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥

অর্থাৎ দীক্ষাবিধানের অন্তর্গত প্রণালীর মধ্যেই বৈদিক উপনয়ন-সংস্কার অন্তর্নিহিত থাকে। দীক্ষাকালেই অনধিকারী মানবকের দ্বিজত্ব সিদ্ধ হয়। দীক্ষা সমাপ্ত হইলে আর তাহার মধ্যকালীয় মৌঞ্জিবন্ধনাদি অনুষ্ঠান অবশিষ্ট থাকে না। তাহা পূর্ব্বেই সাধিত হইয়া যায়।

একমাত্র শৌক্রবিধানের পক্ষপাতী পঞ্চোপাসকীয় স্মার্ত্তগণ শূদ্রদীক্ষা-বিধান বলিয়া যে বিচার করিয়াছেন, তাহা 'দীক্ষা' শব্দবাচ্য নহে। তাহাকে নামাপরাধ বা দীক্ষা-বাধ বলা যাইতে পারে। এইপ্রকার দীক্ষাদান-চাতুরীদ্বারা যে কৃত্রিমতা সাধিত হইয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণব স্মার্ত্ত বা পারমার্থিকগণ বলেন যে, উহা নব্যস্মার্ত্তের মনগড়া কাল্পনিক মন্ত্র। নব্যস্মার্ত্ত নিজগুরুর নিকট যে সিদ্ধ মন্ত্র শ্রবণ করিয়াছেন, তাহার বর্জ্জন, বর্দ্ধন, পরিবর্ত্তনাধিকার তাহাকে কেহ দিতে পারেন না। সুতরাং শূদ্রের বিত্তে লুব্ধ হইয়া ভৃতকস্বরূপে শূদ্রকে মন্ত্র দিতে গিয়া তাঁহার ধর্ম্মহানিকর কৃত্রিমপথ অবলম্বন ভাল হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা

প্রদত্ত হইত বলিয়া সেইকালে দীক্ষিতগণ সকলেই দ্বিজ হইতেন। তখন পঞ্চোপাসকীয় স্মার্ত্ত বা নিরীশ্বর স্মার্ত্ত সমাজের উপর অধিক প্রভুত্ব করিতে পারে নাই। পরবর্ত্তিকালে যখন নিরীশ্বর স্মার্ত্তের অধীন জনগণ বৈষ্ণবাচার্য্য হইবার জন্য দুষ্ট সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিলেন, সেইকালেই দীক্ষিত ও অদীক্ষিত উভয়েরই মুড়ি-মিশ্রীর ন্যায় বৈষম্য বিদূরিত হইল। সুতরাং দীক্ষাকার্য্য না হইয়া প্রাকৃত সহজমত বা স্মার্ত্ত বা বিষ্ণুবিরোধী মতবাদ প্রচলিত ছিল।

শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগৌরহরি ও তাহার পার্ষদগণের অভিপ্রায়মত সেই কাল-প্রোথিত সনাতনী দীক্ষাপ্রণালীর বহুল প্রচারের যত্ন করিতেছেন। দীক্ষা-বিধানক্রমে 'দ্বিজত্ব' কথাটি সম্পূর্ণভাবে চাপা দিয়া নিরীশ্বর-প্রথা বা পঞ্চোপাসনার পদ্ধতি বৈষ্ণব-জগৎকেও বিপথগামী করাইতেছে। আচার্য্যের কার্য্য করার ছলনায় আচার্য্য সম্প্রদায় বলিয়া পরিচয় দিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধকেই ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া চালাইতে চায়। ইহাদিগের জন্যই ভাগবত বলিয়াছেন,—কলিকালে প্রকৃত দ্বিজ বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণ ব্রাত্য হইয়া যাইবেন; আর শূদ্রগণ, ব্রাহ্মণবংশ বা ন্যাসী প্রভৃতি পরিচয় ছলনায় উদর ও স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতিপালনোদ্দেশে প্রতিগ্রহ করিতে থাকিবেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্রহ্মণ্যদেবকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিয়া লইবেন। সেই সকল অধর্ম্মজ্ঞগণ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণবংশজাত সন্ন্যাসী বা গোস্বামী প্রভৃতি উচ্চ উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়া ভূতকাধ্যাপকরূপে ব্যাসাসন প্রভৃতি অন্যায়পূর্ব্বক দখল করিয়া ধর্ম্মোপদেশক হইবেন। উদরোপস্থবেগজীবিগণ মর্কট বৈরাগী হইয়া রাগানুগ পরমহংস বেশে ত্রিদণ্ড ও দৈক্ষ্য বা যজ্ঞসূত্র ছাড়িয়া দিয়া নিজের কপট দৈন্য প্রচার করিয়া রাসলীলা পড়িয়া শুনাইয়া 'ভক্ত' নামে অভিহিত হইবেন। এই সকলই কলির ধর্ম্ম।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পাঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্॥

নারপঞ্চরাত্রে (ভারদ্বাজসংহিতা ২য় অধ্যায় ২৪ শ্লোক)—

স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব চ মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥

আচার্য্যগুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্র-প্রভাবে শিষ্যের পুনর্জ্জন্ম হয়। বিনীত শিষ্যপুত্রদিগকে বৈদিক দশসংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য শিষ্যদিগকে ব্রহ্মচারী করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন। ইহাই

দীক্ষাবিধি। অনেকে অজ্ঞতানিবন্ধন বলিয়া থাকেন যে, পাঞ্চরাত্রিকী মন্ত্রকেই দ্বিতীয় জন্ম বলিয়া গ্রহণ করিলে কি দোষ হয়? তৎপ্রতিষেধে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর উল্লিখিত শ্লোকই যথেষ্ট মনে হয়।

"বৈদিকী লৌকিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"

ভক্তির অনুকূল দশসংস্কারাদি ভক্তির বিরোধী নহে। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদ সৎক্রিয়াসার-দীপিকা গ্রন্থে দশসংস্কার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবকুলকে পঞ্চোপাসকের প্রচণ্ড তাপ হইতে সুশীতলচ্ছায়া দিয়াছেন। তিনিই নিরীশ্বর কর্ম্মিগণের তীক্ষ্ণ দশনরূপ ফলভোগ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীমহাভারতের লিখিত "শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।" এই বাক্যে আমরা জানিতে পারি যে, শূদ্র হইয়া পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার মধ্যেই বৈদিক দশসংস্কার-পদ্ধতি অনুস্যূত আছে। দীক্ষার পরে আর দ্বিজত্বের লক্ষণাভাব থাকে না।

এক ব্যক্তির এক শত্রু লেখাপড়া শিখিয়া হাকিম হইয়াছেন শুনিয়া তিনি বলিলেন,—শত্রু কখনই বেতনভোগী হাকিম হইতে পারিবে না। তদুত্তরে তিনি যখন শুনিলেন, শত্রু মুন্সেফ্ হইয়াছেন, তখন তিনি বলিলেন,—হোক্ না মুন্সেফ্, মাহিনা পাইবে না। এইরূপে দ্বিজ-ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হইলেও সে ব্রাহ্মণ হইবে না, তাহার ব্রাহ্মণ-লক্ষণ যজ্ঞসূত্র থাকিবে না। আবার কেহ বলেন,—দীক্ষিত ব্যক্তির যজ্ঞসূত্রে 'তৃণাদপি সুনীচতা'র ব্যাঘাত হয়। আমাদের স্পর্দ্ধা করবার জিনিষটা এত সহজ-প্রাপ্য হইয়া গেল, সুতরাং 'তৃণাদপি সুনীচ' থাকিলে আমরা তাহাকে পাপী শূদ্র বলিবার সুযোগ পেতাম। আমরা নিজেরা ব্রাহ্মণ এবং আমাদের গুরু ছয় গোস্বামী তাহাদিগকে শূদ্র বলিবার সুযোগ পাচ্ছি, তাহা ত' আর পাব না—এইসব অসুবিধা। পরমহংসের বেশে বর্ণচিহ্ন ও আশ্রমচিহ্ন নাই, তাহাতে আমাদের ন্যায় কলির শয়তানের সমগ্র জগতের গুরু পরমহংস দাসগোস্বামীকে শালগ্রাম শিলাপূজায় অনধিকারী বলিবার সুযোগ পাচ্ছি, তাহাতেও বাধা পড়িতেছে।

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারই বাস্তব বদান্যতা ও জীবে দয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)
ইং ২৭ ১২।৬১

স্নেহভাজনেষু—

* * * ! তোমার ২৩।১২।৬১ তারিখের ৮০ লাইন লিখিত ১খানা পোষ্ট-কার্ড পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। সুদীর্ঘ ১½ বৎসর তোমাকে উপাধির জন্য কলেজে থাকিতে হইবে। আমিও প্রত্যহই তোমার কথা চিন্তা করিয়া থাকি, আর নরোত্তম ঠাকুরের একটী গান স্মরণ করি। তিনি লিখিয়াছেন,—"রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস।" সর্ব্ববিষয়েতে ঈশ্বরের ইচ্ছাই প্রবল, ইহা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবে। তিনি যেভাবে যাহাকে গঠন করিয়া তোলেন, তিনি সেইভাবে গঠিত হইয়া থাকেন। ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহারও চলিবার ক্ষমতা নাই।

যাহা হউক, যাহাতে ভালভাবে পাশ করিতে পার সেই বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইবে। বৈষ্ণব হৃদয়ে সমস্ত গুণেরই বিলাস। সুতরাং পার্থিব জগতের যাবতীয় গুণই, তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান বৈষ্ণবগণে থাকে। জড়বিজ্ঞান আসুরিক হইলেও দেবতাগণ তাহাতে কমা নহেন। তুমি ভাল করিয়া পাশ করিয়া আসিবে।

সর্ব্বদাই সত্যকথা প্রচারে ব্রতী থাকিবে। সৎসাহসযুক্ত ব্যক্তিগণের ভগবানই সহায়। পৃথিবী অসৎপথে চলিলে আমরা তাহার দাসত্ব করিব না। পাপ প্রবৃত্তির বা অসৎ কথার কোন প্রশ্রয় দিবার জন্য জন্মগ্রহণ করি নাই। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আসুরিক শিক্ষাকে আমরা আদৌ প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহি। কলির প্রাবল্যে বিশ্বের যাহা প্রগতি তাহা রোধ করিতে হইবে। বিশ্বের মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণের ইহাই একমাত্র ব্রত হওয়া দরকার। ইহার নামই মহাবদান্য এবং ইহাকেই বলে জীবে দয়া। তুমি নির্ভীকভাবে সত্যকথা বলিবে। সত্য প্রচারের জন্য নিত্যানন্দ প্রভু, হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি বৈষ্ণব-গণই পাষণ্ডগণের দ্বারা প্রহৃত হইয়াছেন। এমন কি, বহু মহাজনকে সত্যের জন্য প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছে। সুতরাং আমাদের ভীত হইলে চলিবে না। মহাপ্রভুর Policy—তৃণাদপি সুনীচ হইয়া এবং বৃক্ষ অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া জীবে দয়া বা প্রচার করিতে হইবে। ভগবৎকথা প্রচারই জীবে দয়া।

অধিক কি ? আমার শরীর একপ্রকার আছে। আমি আগামী ৪।১।৬২ মথুরা যাচ্ছি। ইতি—

শ্রীগৌরজনকিঙ্কর—
—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রীল ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৫ পৃষ্ঠার পর]

আমার যখন দীক্ষা হল বাগবাজারে (হরিনাম হয়েছিল মায়াপুরে), তখন সকলে আমাকে 'প্রভু' বলে ডাকতে লাগলেন। আমার ব্রহ্মচারী-নাম ছিল—শ্রীরাধারমণ। 'রাধারমণ প্রভু' বলে ডাকতেন। তখন আমি ছেলে-মানুষ। গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের কাছে গেলাম, গিয়ে বললাম,—প্রভো! আগে আমাকে সকলে 'রাধারমণ' বলে ডাকতেন, এখন আমাকে 'রাধারমণ প্রভু' বলছেন কেন? প্রভুপাদ তখন হাসলেন। হেসে বললেন,—দেখ, তোমাকে যে প্রভু বলছেন তাতে তুমি মনে করো না—তুমি 'প্রভু' হয়ে গেছ। এটা একটা উদাহরণ ও শিক্ষা। পাছে অভিমান আসে, গর্ব্ব এসে যায়; সেই গর্ব্বটাকে খর্ব্ব করার জন্য 'গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার'—এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

এখন আমার কোন গুরুভাই আমাকে প্রশ্ন করছেন যে,—শ্রীল বন মহারাজের শিষ্য বসে আছেন, আপনার শিষ্যও বসে আছেন। যদি আপনার কোন গুরুভাই (যিনি দেহরক্ষা করেছেন), তাঁর কোন শিষ্য (যিনি শিষ্য করছেন) এমন সময় এসে যায়, সে আপনাকে প্রণাম করবে কিনা বা বন মহারাজকে প্রণাম করবে কিনা? আমি বললাম—না, সে তার গুরুকে প্রণাম করবে। কিন্তু গুরুর কর্ত্তব্য হবে, তিনি বলবেন,—আমার গুরুবর্গরা বসে আছেন, তাঁদের প্রণাম কর। অতএব যদি সে তার গুরুদেবের আদেশে এসে প্রণাম করে তাহলে তার অপরাধ হবে না। কিন্তু যদি সে গুরুকে আগে প্রণাম না করে, তাহলে তার অপরাধ হবে। গুরুদেবের কর্ত্তব্য হবে শিষ্যকে বলবার, আগে আমার গুরুবর্গকে প্রণাম কর। এইটা বিধি এবং নিয়ম। দীক্ষাগুরুকে শ্রেষ্ঠ বলে জানবে। অতএব 'দীক্ষাগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।' এর মধ্যে আবার কথা। শ্রীল কেশব মহারাজের শিষ্য যাঁরা বড় বড় এখানে বসে আছেন, তার মধ্যে কেশব মহারাজের শিষ্য একজন ছেলেমানুষ বসে আছে। এঁরা যেমন সম্মানীয় হবেন, সে কি সেই সম্মানটা পাবে? এতে ব্যতিক্রম দোষ হবে নাকি? সে জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতার সম্মানটা

পাবে না। সে শিক্ষাগুরুর মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে না। শিক্ষাগুরুর মধ্যে গণ্য হচ্ছেন কে?—যিনি গুরু-বৈষ্ণব এবং ভগবানের সেবাশিক্ষা দিচ্ছেন, তিনিই শিক্ষাগুরু। যিনি গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবাশিক্ষা দিচ্ছেন না, তিনি শিক্ষাগুরুর মধ্যে গণ্য নহেন। তাঁর অভিমান আছে মাত্র, কার্য্যতঃ তাঁর দ্বারা কোন কল্যাণ হবে না।

শাস্ত্রে বলছেন,—দীক্ষাগুরুই শিক্ষাগুরু। তিনি যখন দীক্ষা দিচ্ছেন তখন তিনি শিক্ষাও দিচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে দীক্ষা-শিক্ষাগুরু অভিন্ন। আর যেসব শিক্ষাগুরু তাঁহারা শিষ্যের নিকট দীক্ষাগুরুর ন্যায় সমান সম্মানের পাত্র নহেন। দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষাগুরু উভয়ে বসে আছেন। দীক্ষাগুরু আগে প্রণম্য, শিক্ষাগুরু পরে। বাবা ও কাকা দাঁড়িয়ে আছেন, আগে গিয়ে কি কাকাকে প্রণাম করবে ছেলে? তা কখনও হয় না। আগে পিতাই প্রণম্য, তারপর কাকা—এই হল শিক্ষা। এই সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে।

একটা কথা বলি আপনাদের কাছে। গুরুতত্ত্বকে অবজ্ঞা করলে শিষ্যের কখনও কল্যাণ হয় না। আমি একটা উদাহরণ রাখছি আপনাদের কাছে।—

শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী জাগতিক বিচারে ভ্রাতা; আর জীবগোস্বামী ভ্রাতুষ্পুত্র। বল্লভাচার্য্য বৃন্দাবনে রূপগোস্বামীর কাছে গেলেন। গিয়ে বলছেন,—শ্রীরূপ! তুমি যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থ লিখেছ, এটা অপূর্ব্ব সুন্দর হয়েছে। কিন্তু একটা দুঃখের বিষয়, বড় বেদনা লেগেছে। তুমি লিখেছ,—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

আপনি ভুক্তি-মুক্তিকে 'পিশাচী' বললেন। মোক্ষকামী লোক অনেক আছে, তারা এটাকে গালাগালি মনে করবে না কি? আপনার মত একজন মহৎব্যক্তি গালাগালি দিচ্ছেন। শ্রীল রূপগোস্বামী তখন বললেন,—আপনি যা বলছেন তা আমি মেনে নিচ্ছি। বল্লভাচার্য্য সন্তুষ্ট হয়ে যমুনার পারে চলে গেলেন। বল্লভাচার্য্য তাঁর থেকে বয়সে বড় ছিলেন। দেখুন, বৈষ্ণব কাকে বলে। আমাদের বৈষ্ণবোচিত ভাব কোথায়?

যখন বল্লভাচার্য্য রূপগোস্বামীর নিকট এসেছিলেন তখন জীবগোস্বামী সেখানে বসে ছিলেন। তিনি বল্লভাচার্য্যের পিছনে পিছনে যমুনার তীরে

হাজির হলেন। সেখানে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। বল্লভাচার্য্য জিজ্ঞাসা করলেন,—কে বাবা তুমি? জীবগোস্বামী বললেন,—আপনি একটু আগে যাঁর কাছে গিয়েছিলেন, আমি তাঁর শিষ্য। তোমার নাম কি?—আমার নাম শ্রীজীব। কি বলছ বাবা তুমি?—আপনি যে আমার গুরুদেবের সিদ্ধান্তটাকে খণ্ডন করে এলেন, এটা ত' খণ্ডনের জিনিস নয়। তিনি ত' ঠিকই লিখেছেন। বললেন কি রকম? তিনি লিখেছেন,—"ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥" তিনি ভুক্তি-মুক্তিকে পিশাচী বলেন নাই, ভুক্তি-মুক্তির স্পৃহাটাকে পিশাচী বলেছেন। নারীকে ঘৃণা করা হয় না। কেউ যদি বলেন নারীটা ঘৃণ্য, সেটা হতে পারে না। কিন্তু নারীর প্রতি যে খারাপ ভাবটা, সেটাই ঘৃণ্য। এটাই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু আপনি কি করে বললেন,—এটা ঠিক নয়। বল্লভাচার্য্যের মাথা ঘুরে গেল, আবার ফিরলেন। ফিরে এসে রূপ গোস্বামীর নিকট বললেন,—শ্রীরূপ! তুমি যা লিখেছ, তা ঠিক আছে। ওটা কাটবার দরকার নাই। কেন প্রভু, আপনি ত' এইমাত্র বলে গেলেন—এটা ভুল। আমার এই ভুলটা একটা প্রিয়-দর্শন বালক ভেঙ্গে দিল। কে সেই বালক?—জীবগোস্বামীকে দেখিয়ে বললেন এই ছেলেটা আমার ভুল ভেঙ্গে দিল। তুমি ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহাটাকে বাদ দাও বলেছ। ভোগের বাসনাটাকেই খারাপ বলা হয়েছে। শ্রীরূপ আগেও 'আচ্ছা' বলেছেন, এখনও 'আচ্ছা' বললেন। কি সুন্দর ব্যবহার দেখুন।

যখন বল্লভাচার্য্য চলে গেলেন তখন রূপগোস্বামী জীবগোস্বামীকে বললেন, —তোমার মুখদর্শন করব না, তুমি বৃন্দাবন বাসের যোগ্য নহ। তোমার এখনও অভিমান যায় নাই। তুমি এতবড় একটা লোক তাঁকে বলতে গিয়েছ। জীবগোস্বামী—নিজের শিষ্য, আবার ভ্রাতুষ্পুত্র। জীবগোস্বামী একটাও কথা বললেন না যে, প্রভু! আমি অন্যায় করি নাই। তিনি যমুনার তীরে নন্দগ্রামে ভজন করতে লাগলেন। আগে মাধুকরী করে খেতেন, পরে ছেড়ে দিলেন। বসে বসে কেবল হরিনাম করেন, খাদ্যগ্রহণ করেন না। সনাতন গোস্বামী দ্বাদশবন ভ্রমণ করতে করতে নন্দগ্রামে এসে হাজির হলেন। তখন ব্রজবাসীরা বলছেন,—দেখুন, একটা প্রিয়দর্শন বালক এখানে বসে বসে হরিনাম করছে, খাদ্যও গ্রহণ করে না। জীবনটা বোধ হয় ত্যাগ করে দেবে সে। সনাতন গোস্বামী গিয়ে দেখেন শ্রীজীব। কি ব্যাপার! এরকম করছ কেন? তোমার জীবন ত' শেষ হয়ে যাবে। তখন শ্রীজীব উত্তর দিচ্ছেন,—প্রভু! (বাবা বলতেন না) গুরুকৃপাবিহীন জীবন। যে গুরুর কৃপা পেল না,

গুরুদেব যাকে ত্যাগ করলেন, তার জীবনের কি দাম আছে? তার মৃত্যুই ভাল। আমি মৃত্যুকেই শ্রেয়ঃ মনে করেছি। কি হয়েছে? সমস্ত কথা খুলে বললেন। আমি গুরুনিন্দা সহ্য করতে পারি না। সেজন্য প্রতিবাদ করেছিলাম। তা গুরুদেব যখন আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তখন আমার সরে আসাটাই ভাল। তাই সরে এসেছি। গুরুদেবকে উদ্বেগ দিই নাই।

সনাতন গোস্বামী শ্রীজীবকে কিছু না বলে শ্রীরূপের কাছে ফিরে এসে বলছেন,—শ্রীরূপ! শ্রীজীব যে প্রাণত্যাগ করতে বসেছে। তুমি তাকে কৃপা কর, দয়া কর। শ্রীরূপ গোস্বামী বললেন,—হ্যাঁ, রূপ ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন—আয় বাবা। একেই বলে গুরুনিষ্ঠা। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়েছেন এসব সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্তগুলোকে মেনে চলতে হবে, তবে না আমাদের কল্যাণ হবে। শাস্ত্র সেইজন্য বললেন,— আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।

ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

গুরুতত্ত্বটা কি? আচার্য্যকে আমার স্বরূপ জানবে। 'মাং বিজানীয়াৎ'—আমার মত জানবে, 'নাবমন্যেত'—তাঁকে অবমাননা করবে না, নিন্দা করবে না। কেন?—'সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ'—সমস্ত দেবতার যে শক্তি সেই শক্তি গুরুর, যেটা দেবতাদেরও নাই। ভগবৎ কৃপায় করুণাশক্তি—সর্ব্বশক্তি সমন্বিত হচ্ছেন তিনি। কেন?—সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানকে তিনি দিতে পারেন। এরূপ আর কেউ পারেন না—দেবতারাও পারেন না। তাঁদের ঐ ক্ষমতা নাই। এই বিচারে তাঁকে দেখতে হবে। অতএব দীক্ষাগুরুরই প্রাধান্য দিয়েছেন।

'আদৌ গুরুপূজা'। কার পূজা হচ্ছে? আগে দীক্ষাগুরুর পূজা হচ্ছে, না শিক্ষাগুরুর পূজা হচ্ছে? আদৌ দীক্ষাগুরুর পূজা করতে হবে, শিক্ষাগুরুর নয়। দীক্ষাগুরুই সর্ব্বপ্রথম পূজ্য। তুলসীদাস একটা কথা বলেছেন,—

গুরু আউর গোবিন্দ দো খাড়ে হ্যায় কিসকো লাগুঁ পাঁও।
যো গুরু কো লাগে উসকো বলিহারী যাই॥

শ্রীগুরু এবং গোবিন্দ দুজনে দাঁড়িয়ে আছেন, কাকে প্রণাম করব আগে? —আগে গুরুকে প্রণাম করব, তারপর গোবিন্দকে প্রণাম করব। যদি এই সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তাহলে শিক্ষাগুরু আগে কি করে প্রণম্য হবেন? এরূপ বিচার সুষ্ঠু হতে পারে না। দীক্ষাগুরু অপেক্ষা শিক্ষাগুরুর বৈশিষ্ট্য অধিক হতে পারে না। যেখানে বৈশিষ্ট্য রেখেছেন, সেখানে দীক্ষাগুরুই শিক্ষাগুরু। এই বিচার জানতে হবে। গুরুতত্ত্বটা এই রকম জিনিস। তাই বলেছেন,—

সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে, জ্ঞান করে উপদেশ।
তও কয়লাকি ময়লা ছোটে, যও আগ করে পর্‌বেশ॥

সদ্‌গুরু কাকে বলছেন?—ভেদ অর্থাৎ রাস্তা যিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন, 'জ্ঞান করে উপদেশ'—তত্ত্বজ্ঞান যিনি উপদেশ করেন,—"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥" 'কয়লাকি ময়লা ছোটে'—কয়লা ত' ময়লা, কিন্তু যদি তাতে অগ্নি প্রবেশ করে, তাহলে তার ময়লা ছেড়ে যায়। তেমনি গুরুদেবের উপদেশরূপ অগ্নি যখন শিষ্যের মধ্যে প্রবেশ করবে, তখন হৃদয়স্থিত যে-সকল ময়লা, কালিমা রয়েছে, কুপ্রবৃত্তিগুলো রয়েছে, সেগুলো পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। তারপর ভগবদ্ দর্শন হবে। ইংরাজীতে দুটো কথা বলছেন,—Transparament ও Opaque। যতক্ষণ অসচ্ছ ভাব থাকছে ততক্ষণ কোন ছবি প্রতিফলিত হতে পারে না, কিন্তু যখন Transparent Medium হচ্ছে, তখন ছবি প্রতিফলিত হবে।(ক্রমশঃ)

জন্মান্তরবাদ

পরমেশ্বর ও পরলোক লইয়াই ধর্ম্ম। জন্মান্তর ও পরলোককে আকাশ-কুসুম কল্পনা করিয়া অবিশ্বাসের চক্ষে দর্শন করিলে মানুষ কিসের জন্য ধর্ম্ম করিবে? ইহলোকে ইহজন্মেই যদি মরণের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যায়, মানুষের সকল জ্বালা ঘুচিয়া যায়, তবে যম, নিয়ম, ঈশ্বর-আরাধনাদির আবশ্যকতা কি? কঠোর সংযম-তপস্যা-বিধানের কি প্রয়োজন আছে? শাস্ত্র-হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিবারও যৌক্তিকতা বা কি থাকিতে পারে? মানুষ কেবলমাত্র জন্তুধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্নেহ-মায়া-মমতা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক হিংসার রাজ্যের পরিসীমা দিনের পর দিন ক্রমাগত বৃদ্ধি করিয়া ত' চলিতে পারিত। কই, সেইরূপ ত' দেখা যায় না। কই, এখনও পর্য্যন্ত ত' অশান্তির কালো ধোঁয়া সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিতে পারে নাই। কারণ মানুষের মন হইতে জন্মান্তরবাদ ও ঈশ্বর আরাধনার দৃঢ় বিশ্বাস এখনও মুছিয়া যায় নাই। তাই বিশ্বের সবাই বিশেষ করিয়া ভারতবাসী নাস্তিক চার্ব্বাকের মতবাদকে বহুমাননপূর্ব্বক জড়ভোগের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতেছে না। নাস্তিক চার্ব্বাকের মতবাদটি জন্মান্তর-বাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। চার্ব্বাক্ বলিয়াছেন,—

ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥

"যতকাল জীবিত থাকিবে, ততকাল সুখেই জীবনযাপন করিবে, গৃহে কোন বস্তু না থাকিলে ঋণ করিয়া আনন্দ ভোগ করিবে; ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না, কেননা, যে শরীরে জীব পান-ভোজন করিয়াছে, তাহাদের উভয়েরই শরীর ফিরিয়া আসিবে না। এমতাবস্থায় 'কে কাহার নিকট চাহিবে, আর কেই বা পরিশোধ করিবে?"

সনাতন শাস্ত্র পদ্মপুরাণ "জলজা নবলক্ষাণি" শ্লোকে জীবের কর্ম্মফলানুসারে এই ভবসমুদ্রে "কৃমি-বৃক্ষ-পশু-নরাদি" চৌরাশী লক্ষ যোনি পরিভ্রমণের কথা পরিষ্কার জানাইয়া দিয়া জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে সন্দেহের অবসান ঘটাইয়াছেন। শাস্ত্রের অন্যত্র কথিত আছে,—

কর্ম্মণা সুখমশ্নাতি দুঃখমশ্নাতি কর্ম্মণা।
জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্ত্তন্তে কর্ম্মণো বশাৎ॥

"মানুষেরা কর্ম্মদ্বারা সুখভোগ করে, কর্ম্মদ্বারাই দুঃখভোগ করে। কর্ম্মবশেই তাহারা জন্মগ্রহণ করে, কর্ম্মদ্বারা শরীরধারণ করিয়া থাকে এবং কর্ম্মবশেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।" পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের অত্যন্ত সুকৃতিসম্পন্ন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই জন্মান্তর ও জন্মান্তরীয় কর্ম্মফল স্বীকার করিয়া থাকেন। এই বিশ্বাস হৃদয়ে ধরিয়াই ভারতীয় নরগণ ঐহিক সুখ বিসর্জ্জন দিয়া বিপন্নার্ত্তিহর ও শরণাগতরক্ষক ভগবানের পাদপদ্ম সেবায় নিজেদের সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন।

কিন্তু বর্ত্তমানে এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের নিকট জন্মান্তরবাদ কবিকল্পনা আর কাব্যের অলঙ্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে সর্ব্বগ্রাসী জড়শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সমাজ হইতে যেন এই বিশ্বাস কর্পূরের মত উড়িয়া যাইতেছে। যদি জন্মান্তর, জন্মান্তরীয় কর্ম্মফল ভোগ তাঁহাদের হৃদয়ে দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত জাগরূক থাকিত, যদি তাঁহারা অধ্যাত্ম জীবনের কথা, পরলোকের কথা, কর্ম্মফলজনিত অদৃষ্টের কথা ক্রমে ক্রমে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলাইয়া না ফেলিতেন, তবে কখনই ইহজীবনে পাপের অগ্নি জ্বালাইয়া, দানবীয় দীপ্তিপূর্ণ চাহনিতে বাসনার আহুতি লইয়া তাঁহাদের দাঁড়াইতে হইত না।

বিবিধ বিষয়-বাসনা-বিজড়িত অনন্ত সুখ-দুঃখ-পূর্ণ সংসারের দিকে তাকালেই জন্মান্তরের ছবি স্পষ্টভাবে দেখা যাইবে। জগতের কোথাও সমতা নাই—দৃষ্টিপাতে এই বাস্তব সত্য ধরা পড়িবে। ইহলোকে কেহ নানাসুখ

ভোগ করিতেছে, কেহ দুঃখ-দুর্দ্দশায় কষ্ট পাইতেছে। কেহ ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাসুখে বাল্য-যৌবন অতিক্রমপূর্ব্বক বার্দ্ধক্যে সংসার-সমুদ্রের উত্তাল-তরঙ্গমালার ঘাত-প্রতিঘাতে প্রতিনিয়ত বিধ্বস্ত হইতেছে। কেহ আমরণ বৃক্ষতলবাসী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্নের দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিতেছে। কাহারও দুধে চিনি, কাহারও শাকে বালি। কেহ আজীবন সুখের ক্রোড়ে লালিত-পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া অন্তিমে রোগ-পীড়ায় অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে; কেহ সারাজীবন রোগ-শোকে জর্জ্জরিত হইয়া মনোদুঃখে কালযাপন করিতেছে।

এইরূপ বিবিধ অবস্থা-বৈষম্যের কারণ কি? অনন্ত করুণানিধান ন্যায়বান্ ভগবান্ ক্ষুদ্র, বৃহৎ, রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, সুখী, দুঃখী, সকলকেই সমান চক্ষে দেখিয়া সমান স্নেহ বিতরণ করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট আত্ম-পর নাই। তাঁহার সৃষ্টিতে বৈষম্য ও পক্ষপাত নাই। তবে সৃষ্টিরাজ্যে এ বৈষম্যের কারণ কি? কারণ—অদৃষ্ট। এই অদৃষ্ট কি? অদৃষ্ট আর কিছুই নয়, স্ব-স্ব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল। চারি বৎসরের কোন একটী বিকৃতাঙ্গ শিশুকে রোগ-যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতে দেখিলে তাহা তাহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফলশ্রুতি বলিয়া জানিতে হইবে। ভগবান্ উহাকে কষ্ট দিতেছেন—কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহা বলিবেন না। এই সমস্ত কারণেই ভারতবাসীর জন্মান্তরবাদে দৃঢ় বিশ্বাস। সুতরাং পূর্ব্বজন্মের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসহেতু কি ঈশ্বর, কি আত্মা, কি পরলোক—ভারতবাসীর নিকট এ সমস্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা স্বতঃসিদ্ধ।

মানুষ এই দেহেই নানারূপ দেহান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। বাহ্য বিজ্ঞানমতে প্রতিক্ষণে দেহাভ্যন্তরে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্য্য চলিতেছে। সেই নিত্য সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্য্য প্রভাবে প্রতি দশবৎসর অন্তর কি মানবের নূতন নূতন দেহান্তর ঘটিতেছে না? যদি ঘটিয়া থাকে, তবে কৌমারের পরে যৌবন আসিলে মানুষের যে দেহান্তর, যৌবনের পর প্রৌঢ়েও সেই দেহান্তর এবং প্রৌঢ়ের পর জরায়ও তদ্রূপ দেহান্তর। সুতরাং এই কৌমার, যৌবন, প্রৌঢ় ও জরায় মানুষের শৈশব-মৃত্যু, কৌমার-মৃত্যু, যৌবন-মৃত্যু ও প্রৌঢ়-মৃত্যু সংঘটিত হইতেছে। কারণ সেই সেই কালে তাঁহার পূর্ব্ব শরীরের সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন হইয়াছে। জীব যদি এতবার মৃত্যুর পরে জীবিত থাকে, তবে জরা-মৃত্যুর পর যে জরায় শরীরের ধ্বংস সাধিত হয়, সেই শরীরের ধ্বংসের পরে সেই জীব জীবিত থাকিবে না কেন?

অতএব মৃত্যুর পর জীবাত্মা বিদ্যমান থাকিয়া যে নতুন দেহ ধারণ করে, তাহা যুক্তিসিদ্ধ। এই যুক্তিতে জীব বাঁচিয়া থাকে বলিয়া বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানী জীবের মৃত্যু দেখিয়া মুহ্যমান হয় না। মৃত্যুর পর জীবের যে দেহান্তরপ্রাপ্তি হয়, সেই দেহেরও কৌমার, যৌবন, জরা ও মৃত্যু আছে। আবার তৎপর দেহেরও তদ্রূপ উৎপত্তি ও লয় জীবের জন্মজন্মান্তর অনাদিকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন,—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ (গীতা ২।১৩)

"জীবের এই দেহে বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য কালের গতিতে উপস্থিত হয়। তেমনি কালের গতিতে দেহান্তর প্রাপ্তিও হয়। জ্ঞানিগণ তাহাতে মোহগ্রস্ত হন না।"

পেসিমিজম্ এবং বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের মূল লক্ষ্যই জড়নির্ব্বাণ লাভ

পাশ্চাত্ত্যধর্ম্ম ও সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে একটী বিষয়ে বিরাট্ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাত্ত্যধর্ম্মে একজন্মবাদ স্বীকৃত হয়। যদিও পাশ্চাত্ত্যদেশীয় দার্শনিক Darwin তাঁহার Theory of Evolution এ জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু জীবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ ছিলেন। কি করিয়া জীবাত্মা এক জন্ম হইতে অন্য এক জন্ম প্রাপ্ত হইতেছে—তাঁহার এ সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না। তিনি কেবল বলিয়াছেন,—"পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথমে 'জেলিফিস' নামক এককোষী প্রাণী ছিল এবং ক্রমবিকাশের ফলে তাহারাই সর্ব্বশেষে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। মনুষ্যজন্মই জীবের ক্রমবিকাশের সর্ব্বশেষ অবস্থা। মনুষ্যজন্ম হইতে জীব কখনও নিম্নযোনি বা উন্নততম যোনি আর প্রাপ্ত হইবে না।" ডারউইনের Theory-তে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হইলেও তাহা সনাতন ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ "জীব কর্ম্মফলানুযায়ীই নিম্নযোনি বা দেবত্ব লাভ করিতে পারে"—এই Absolute Truth তিনি তাঁহার Theory-তে উল্লেখ করেন নাই। তাই ডারউইনের Theory দ্বারা প্রকৃতপক্ষে জগতের কোন মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

পরমারাধ্যতম পরম কারুণিক শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের

দ্বিনবতিতম শুভ আবির্ভাব-বাসরে দীনের

আর্ত্তি কুসুমাঞ্জলি

আজি শুভ মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া-লগন।
শ্রীগুরু পূজিতে সবে হয়েছে মগন॥
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ "জয় গুরু" বলে।
পুষ্পাঞ্জলি অর্পিছে শ্রীচরণকমলে॥
শিষ্য-প্রশিষ্য করি কিবা ত্যাগী, গৃহিজন।
প্রেমভক্তিমাখা অর্ঘ্য করে নিবেদন॥
মুঞি তব শিষ্যক্রুব অধম পাপিষ্ঠ।
নহি কর্ম্মী, নহি জ্ঞানী, নহি ভক্তিনিষ্ঠ॥
সর্ব্ববিধ ভাবে মুঞি সেবার অযোগ্য।
কৃপাবারি বর্ষি' মোরে কর সেবার যোগ্য॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ-মাৎসর্য্যাদি।
সর্ব্ববিধ দোষ মোর আছে নিরবধি॥
জড়কামে মত্ত মুঞি নহি কৃষ্ণার্পণে।
অনুরাগ দ্বেষিজনে, ক্রোধ ভক্তজনে॥
লোভ হয় বিষয়ে মোহ তল্লাভ বিনে।
মদ হয় কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ গুণ বর্ণনে॥
হেন সব দোষে দোষী মুঞি মূঢ়মতি।
কেমনে লভিব তব চরণে ভকতি॥
তবে এক ভরসা যে আছে মোর চিত্তে।
পুনঃ পুনঃ তারিতে আসিবে নাকি ভৃত্যে॥
এই আশা বুকে লয়ে আছি এই মর্ত্ত্যে।
জন্ম-জন্মান্তরে যেন তার' এই ভৃত্যে॥
কতবার এ জগতে হয়েছে জনম।
পশু-পক্ষী কীটাদিতে গমনাগমন॥

কিন্তু প্রভু সে জনমে নাহি ছিল রতি।
এ জনমে তব কৃপায় পাইয়াছি স্মৃতি॥
এই স্মৃতি সদা যেন রহে মোর হৃদে।
প্রার্থনা জানাই তব চরণ-সরোজে॥
তুমি নিত্যানন্দশক্তি কৃষ্ণ-কৃপামূর্ত্তি।
শরণাগত-জনে করাও লীলা স্ফূর্ত্তি॥
শরণাগত-বৎসল তুমি হে মহান্।
আশ্রিত জনেরে তুমি দাও দিব্যজ্ঞান॥
সেইরূপ মম হৃদি অন্ধকার নাশি।
দাওহে হৃদয়ে মোর ভক্তি-জ্ঞান-শশী॥
"ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি" শ্লোক প্রমাণে।
উদ্ধারিতে নাহি পারে জীব ভক্তিবিনে॥
কিবা ভক্তি, কেবা ভক্ত, কিবা তার সেবা।
তোমা কৃপাবিনা প্রভু জানে আর কেবা??
তোমা লঙ্ঘিয়া কে জানিয়াছে পরতত্ত্ব?
শাস্ত্রবচনে কোথাও নাহিক মহত্ত্ব॥
'আদৌ গুরুপদাশ্রয়'—শাস্ত্রের বচন।
তবে ত' হয় শ্রীগৌর-কৃষ্ণ আরাধন॥
এই ত' সিদ্ধান্তসার, শাস্ত্রের বচন।
শ্রীগুরুকৃপায় জীবের হয় ত' স্ফুরণ॥
নমি আমি ব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুচরণে।
আর প্রণমি গুরুপ্রিয় বৈষ্ণবের গণে॥
সবাকার পদরেণু করিয়ে বন্দন।
জন্মে জন্মে হই যেন কৃপার ভাজন॥

শ্রীগুরুকরুণারেণুপ্রার্থী—
—শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৪০ (৩) পৃষ্ঠার পর]

শাস্ত্রে অন্যত্রও পরিলক্ষিত হয়,—

নারায়ণোঽপি বিকৃতিং যাতি গুরোঃ প্রচ্যুতস্য দুর্ব্বুদ্ধেঃ।
কমলং জলাদপেতং শোষয়তি রবির্ন পোষয়তি॥

(জমদাখ্যান সংহিতা)

কোন দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি গুরু হইতে বিচ্যুত হইলে ভগবান্‌ও বিরূপ হইয়া যান। যেমন পদ্মফুল যতক্ষণ পর্য্যন্ত জলকে আশ্রয় করিয়া থাকে ততক্ষণ সূর্য্য তাহাকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। জল ত্যাগ করিলে ঐ সূর্য্য তাহাকে আর প্রকাশ না করিয়া শুকাইয়া দিবেন।

অতএব এই সমস্ত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের দ্বারা জীবের চরম প্রয়োজন প্রমাণিত হইতেছে এবং তাহা ব্যাসপূজারই ফল। এজন্য আমরা কোনপ্রকার ভাঁওতাবাজীতে কাণ না দিয়া ব্যাসপূজা বা গুরুবর্গের পূজা করিব। শ্রীল গুরুদেবের পরিচয়ে নিজ পরিচয় প্রদান করিব। নিত্যকাল শ্রীগুরুদেবের জয় প্রদান করিব। গুরুদেবের জয় দিব না, গুরুদেবের পরিচয় দিব না—ইহা কখনও হইতেই পারে না। কেননা 'গুরু ছাড়ি গোবিন্দ ভজে, সে জন নরকে মজে'। গুরুদেবকে ছাড়িয়া ভগবানের যতই সাধন-ভজন করা যাক, ফল—নরক। এজন্য 'সাধু সাবধান' বাক্য স্মরণ রাখিয়া অসাধুগণের আদেশ-নির্দ্দেশে কাণ দিলে চলিবে না।

আমরা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মাসিক পত্রিকায় দেখিতে পাই—"শ্রীল আচার্য্যদেব ভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহত্বহেতু অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীশচীনন্দন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীল আচার্য্যদেবের নামের পূর্ব্বে 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' বলিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। আশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্লিষ্ট বিষয়-বিগ্রহ-দর্শনই—গৌড়ীয় দর্শন। আচার্য্য—অভিন্ন কৃষ্ণ, তিনি বিষ্ণুপাদ; দীক্ষাগুরুও শিক্ষাগুরু উভয়েই সেবককোটি, তাঁহাতে কৃষ্ণকোটিত্ব বা বিষ্ণু-কোটিত্বের বিচার নাই। সর্ব্বদেবময়ত্ব আচার্য্যত্বের অন্তর্ভুক্ত। আচার্য্য বলিব, অথচ 'বিষ্ণুপাদ' বলিব না—এইরূপ বিচার আচার্য্যের পদের প্রতি অপরাধ—ভক্তিসিদ্ধান্তের নিকট অপরাধ।" এইজন্যই শ্রীগুরুদেবের নামের পূর্ব্বে 'বিষ্ণুপাদ'-শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।

অস্মদীয় গুরুদেব বিশ্বে বেদান্তের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, করিতেছেন

এবং করিবেন। এখন বেদান্ত-সিদ্ধান্ত কি, তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন। কাহারও মতে কর্ম্ম, আবার কাহারও মতে জ্ঞান। কিন্তু ভালভাবে বিচার করিলে দেখা যায়,—বেদান্তের মূল তাৎপর্য্য কর্ম্ম বা জ্ঞান নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রদর্শিত উত্তমাভক্তি—যাহা শ্রীশচীনন্দন শ্রীসনাতন-শিক্ষা, শ্রীরূপশিক্ষা, সর্ব্বোপরি শ্রীরায়রামানন্দ-সংবাদের মাধ্যমে বিশ্বে বিঘোষিত করিয়াছেন। কোন একসময়ে কোন এক ব্রজবধূ নৃত্যাবস্থায় শ্রীগোপীকান্তকে দর্শন করিয়া অন্য গোপীগণের নিকট বর্ণন করিতেছেন,—

শৃণু সখে! কৌতুকমেকম্ নন্দনিকতনে ময়া দৃষ্ট।
,গোধূলি-ধূসরাঙ্গে নৃত্যতি বেদান্ত-সিদ্ধান্ত ॥

নন্দবাবার অলিন্দে গরুর খুরের দ্বারা উত্থিত ধূলায় ধূসরিত হইয়া নন্দনন্দন নৃত্য করিতেছেন। ইহার হাব-ভাব ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নাই। বেদান্ত-সূত্রের দ্বারা ইহার পুষ্টি করা অত্যাবশ্যক। বেদান্তসূত্রের ১।১।২ সংখ্যা সূত্র 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় প্রসঙ্গে দেখা যায়,—"আদ্য এব পরো রসঃ।" শৃঙ্গার রসের দ্বারা যে যুগলকিশোরের সেবা, তাহাই শ্রীল গুরুদেব শিক্ষা দেন। ইহাই বেদান্তের গূঢ় তাৎপর্য্য বলিয়া বোধ হয়। অস্মদীয় পরম-গুরুদেব আচার্য্য-কেশরী নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমিতির নাম 'শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি' রাখিয়াছেন এবং তাঁহার আশ্রিতগণকে 'ভক্তিবেদান্ত' উপাধি প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেননা, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণাশ্রয়ঃ স ন ব্রজরামানুগঃ স্বহৃদি সপ্ত শল্যানি মে"—আমার আশ্রয় করিয়াও যে ব্রজসুন্দরীগণের আনুগত্যে ভজন না করে, তাহার ভজন আমার হৃদয়ে সপ্তশূল-সদৃশ হইয়া থাকে। এইরূপ সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বিচারধারা যিনি জগতে প্রচার করেন, সেই গুরুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী ওঁ বিষ্ণুপাদকে আমি প্রণাম করি।

কৃষ্ণ-স্বরূপায়—স্বয়ং কৃষ্ণ এরূপ নহে। প্রিয়ত্বহেতু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় হওয়ার জন্য 'কৃষ্ণ-স্বরূপায়' বলা হইয়াছে। এর প্রমাণ আমরা গুর্ব্বষ্টকে পাই,—'সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈঃ'। পুরাণসম্রাট প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই,—'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ'। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ জগন্মঙ্গলের জন্য যুগে যুগে বিভিন্নরূপে অবতরিত হন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের করুণা-ঘন মূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবও জগতের মঙ্গল-সাধনের জন্য এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন।

এজন্য 'সুমঙ্গলায়' শব্দের অবতারণা করা হইয়াছে। 'রাধাঙ্গকান্ত্যা বিভূষিতায়', —শ্রীমতী রাধারাণীর ন্যায় অঙ্গকান্তিবিশিষ্ট ইহা মুখ্যার্থ নহে। আশ্রয়-বিগ্রহের মূল শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী যদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট, তদ্রূপ শ্রীগুরুদেবও কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা পরায়ণ ও কৃষ্ণার্থে অখিল ভোগত্যাগ-যুক্ত। 'চৈতন্যলীলামৃত ধারণায়' চৈতন্যলীলারূপী অমৃত কিভাবে ধারণ করেন, তাহা উল্লেখ করা হইতেছে। শ্রীশচীনন্দনই স্বয়ং নন্দনন্দন, স্বয়ং অবতারী, স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও 'শ্রীকৃষ্ণ' 'শ্রীকৃষ্ণ' সর্ব্বদা এই নাম উচ্চারণ করেন। দক্ষিণদেশ ভ্রমণকালে শ্রীবেঙ্কটভট্টের গৃহে অবস্থানকালে রঘুনন্দনের সেবা অপেক্ষা গোপীকান্তের সেবার উৎকৃষ্টতা দেখাইয়া দক্ষিণদেশবাসীকে অপার করুণা করিয়াছেন। শ্রীশচীনন্দন স্বয়ং নন্দনন্দন হইলেও নীলাদ্রিতে অবস্থান করিয়া শ্রীনবীনকৃষ্ণের সেবারই উৎকৃষ্টতা জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। এই সেবাশিক্ষা দেওয়ার জন্যই ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যদিও তাঁহার অবতারের অন্যান্য কারণ ছিল।

শ্রীগুরুদেবও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ধারায় অভিষিক্ত হওয়ার জন্য সর্ব্বত্রই শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার উৎকৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। এইরূপ গুণে গুণান্বিত অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী ওঁ বিষ্ণুপাদকে প্রণাম করি।

শ্রীভগবান্ ভূভার হরণের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। শ্রীবরাহরূপে ভগবান্ পৃথিবীর উদ্ধার এবং ভূভার হরণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অসুরগণ পৃথিবীর বুকে অনর্থ সৃষ্টি করিয়া থাকে, ভক্তগণকে ভগবদ্ভজনে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। এইজন্যই ভগবান্ অসুরগণকে সংহার করিয়া থাকেন। তদ্রূপ শ্রীগুরুদেব তাঁহার উপদেশরূপী অতিতীক্ষ্ণ তলোয়ারদ্বারা আশ্রিত স্নিগ্ধ শিষ্যের সমস্ত অনর্থ দূর করিয়া হৃদয়ে সম্বন্ধজ্ঞান, স্বরূপজ্ঞান উদিত করিয়া থাকেন। পুরাণসম্রাট প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়— 'ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত', 'সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গ-মুক্তিভিঃ'। শিষ্যব্রুব বা নামধারী শিষ্য না হইয়া স্নিগ্ধ শিষ্য হইলে গুরুদেব তাহার উদ্ধারের জন্য বারংবার এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন, ইহা শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের উক্তি হইতে এবং সর্ব্বপ্রথম গোস্বামিগ্রন্থ 'বৃহদ্ভাগবতামৃতম্' এর গোপকুমারের উপাখ্যান হইতে বুঝা যায়। শ্রীশুকদেব গোস্বামী আদিকে মহামুনি বলা হইয়াছে। কারণ তাঁহারা ভক্তিরূপী ভূষণের দ্বারা ভূষিত। তদ্রূপ অস্মদীয় গুরুদেবও মহামুনির দিব্যগুণের দ্বারা বিভূষিত। এইরূপ দিব্য গুণের দ্বারা বিভূষিত শ্রীল গুরুদেবকে প্রণাম করি।

'রূপানুগবর্য্যং'-শব্দের ব্যবহারোপযোগিতা জানিতে হইলে অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। বিগত ৫০১ গৌরাব্দে শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমাকালে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরে (মায়াপুরধামস্থ) 'রূপানুগ ভক্তিদ' শব্দের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে অস্মদীয় গুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে এবং অস্মদীয় শিক্ষাগুরুদ্বয় শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিজীবন জনার্দ্দন গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখ হইতে যাহা শ্রবণের সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাহাই নিঃসঙ্কোচে বর্ণন করিতেছি। এজন্য সুধী পাঠকবৃন্দ আমার ধৃষ্টতা গ্রহণ করিবেন না—ইহাই অনুরোধ।

ভক্তি দুই প্রকার—(১) বৈধী এবং (২) রাগানুগা। যত্ররাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে। শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে॥ শাস্ত্রোক্তয়া প্রবলয়া ভক্তন্মর্য্যাদয়ান্বিতা ভক্তিরিয়ং কৈশ্চিন্মর্য্যাদা-মার্গ-উচ্যতে। সাধনাদি বিষয়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে কোথাও লোভ, কোথাও বা শাস্ত্র-শাসনই সাধনের প্রবর্ত্তক হয়। যে-ভক্তিতে লোভ প্রবর্ত্তক না হইয়া শাস্ত্র-শাসনই প্রয়োজক হয়, তাহাকে বৈধী ভক্তি বলে। শাস্ত্রোক্ত প্রবল মর্য্যাদাযুক্ত এই বৈধী ভক্তিকে কোন কোন পণ্ডিতগণ মর্য্যাদামার্গ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

রাগানুগাভক্তি জানিতে হইলে রাগাত্মিকার স্বরূপ জানা প্রয়োজন। "ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগোত্মি-কোদিতা।" ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিক পরমাবিষ্টতা অর্থাৎ পরম আবেশ-মূলক প্রেমময় তৃষ্ণা, তাহাকে রাগ বলে। সেই রাগময়ী ভক্তিই রাগাত্মিকা।—"বিরাজন্তীম-ভিব্যক্তং ব্রজবাসী জনাদিষু। রাগাত্মিকামনুস্থতা যা সা রাগানুগোচ্যতে।"ব্রজবাসী জনাদিতে প্রকাশ্যভাবে বিরাজমানা যে ভক্তি, তাহাকে 'রাগাত্মিকা' বলে। সেই রাগাত্মিকার অনুগতা ভক্তিকেই রাগানুগা নামে অভিহিত করা হয়। রাগাত্মিকা ভক্তি দুই প্রকার—কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা। কামরূপা ভক্তির অনু-গামিনী যে তৃষ্ণা, তাহাকে কামানুগা ভক্তি বলে। ইহা সম্ভোচ্ছাময়ী ও তত্ত-দ্ভাবেচ্ছাময়ী ভেদে দুই প্রকার। সম্ভোচ্ছাময়ী কেলি তাৎপর্য্যবতী। কেলি অর্থাৎ ক্রীড়া, ব্রজদেবীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রীড়াকেই সম্ভোগ বলা হয়। ব্রজ-যূথেশ্বরীদিগের কৃষ্ণের প্রতি যে ভাবমাধুর্য্য সেইরূপ ভাবমাধুর্য্যের কামনাকে তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা বলা হয়। তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা সখীগণের মধ্যে কেহ কেহ যুগলকিশোরে সমস্নেহা, কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণস্নেহাধিকা, কেহ কেহ শ্রীরাধা-স্নেহাধিকা। শেষোক্ত এই শ্রীরাধাস্নেহাধিকা সখীর শ্রীরূপগোস্বামীপাদ 'ভাবোল্লাস' রতি আখ্যা দিয়াছেন। ইহার নামই মঞ্জরীভাব বা রাধাদাস্য।

এই মঞ্জরীগণের মধ্যে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রধানা। শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্যে শ্রীরাধাস্নেহাধিকা হইয়া যুগলকিশোরের সেবিকাকে রূপানুগ বলা হয়। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিভৃত-নিকুঞ্জ-লীলায় ললিতাদি সখীগণ স্বতন্ত্র নায়িকা হওয়ার দরুণ যাইতে সঙ্কোচ বোধ করেন, এমতাবস্থায় তাঁহাদের সেবার জন্য এই মঞ্জরীগণই উপস্থিত থাকেন। এইজন্যই দাসগোস্বামী বলিয়াছেন—"তাম্বূলার্পণ-পাদমর্দ্দন ·····কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাং·····সংশ্রয়ে॥" মঞ্জরীগণের কোন অবস্থাতেই সঙ্কোচ নাই, এইজন্যই 'অসঙ্কোচিতা ভূমিকাং' বলিয়াছেন। শ্রীযুগল-কিশোরের প্রীতিমূলা সেবার জন্য সখীগণের সহিত পরামর্শ করেন—'নিকুঞ্জ-যূনো-রতি-কেলি-সিদ্ধ্যৈ যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।' শ্রীল গুরুদেব রূপানুগগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এজন্য 'রূপানুগবর্য্য' বলা হইয়াছে। এইরূপ রূপানুগবর্য্য গুরুদেবকে নিজ অধিকার অনুযায়ী শারীরিক ও মানসিক গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিয়া ইহার বিপরীত মনে করা অতত্ত্বজ্ঞের পরিচায়ক, ইহাতে অপরাধের সম্ভাবনা।

শ্রীগুরুদেব—শ্রীনিত্যানন্দ হইতে অভিন্ন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু অখণ্ড গুরুতত্ত্ব এবং শ্রীগুরুদেব তাঁহারই প্রকাশ। এজন্য শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈঃ"। তিনি সাক্ষাৎ হরি নহেন, শ্রীহরির করুণা-গুণ মূর্ত্তিমান্ হইয়া জগতে গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। "যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি। আমারে কিনিয়া লহ বল গৌরহরি॥" শ্রীনিত্যানন্দাষ্টকে দেখা যায়,—

"যথেষ্টং রে ভ্রাতঃ! কুরু হরি হরিধ্বনিমনিশং
ততো বঃ সংসারাম্বুধি-তরণ-দায়ো ময়ি লগেৎ।
ইদং বাহু-স্ফোটৈরটতি রটয়ন্ যঃ প্রতিগৃহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং-নিরবধি॥"

শ্রীগুরুদেব—শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ হওয়ার জন্য জীবের দুঃখে দ্রবীভূত হইয়া জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া তাহাদের উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন—"মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজকার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥" যাঁহারা তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে তিনি জন্মে জন্মে উদ্ধার করেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ-রচিত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত-গ্রন্থের গোপ-কুমার তাহার স্পষ্ট প্রমাণ।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীল গুরুদেব যুগপৎ রূপানুগবর্য্য ও নিত্যানন্দাভিন্ন হন কিভাবে? শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ত' বলদেবরূপে রাধাকৃষ্ণের সেবায় উপস্থিত

থাকিতে পারেন না, রসাভাস দোষ হইয়া যাইবে। এই সংশয় নিরসনার্থ বলা হইয়াছে,—"নিতাই অনঙ্গমঞ্জরী দেহ কৃপা করি আমারে কিঙ্করী করিয়া।" অতএব যুগপৎ 'রূপানুগবর্য্য' ও 'নিত্যানন্দাভিন্ন' এই সংশয় দূরীকরণ হইল।

'শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় পরিকরম্'—শ্রী—রাধা, রাধাকৃষ্ণের প্রিয় পরিকর। তিনি যুগলকিশোরের প্রীতিবিধানে নিত্য ব্যস্ত। এজন্য শাস্ত্রে বলা হইয়াছে,—

রাধাসম্মুখ-সংসক্তিং সখীসঙ্গ-নিবাসিনীম্।
তামহং সততং বন্দে গুরুরূপাং পরাং সখীম্॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের মহাপ্রসাদ অন্যান্য সকলকে নিবেদনের পূর্ব্বে প্রিয়ত্বহেতু শ্রীগুরুদেবকেই সর্ব্বপ্রথম নিবেদন করা হয়। শ্রীগুরু-গায়ত্রীতে 'কৃষ্ণানন্দায়' কৃষ্ণ + আনন্দায়=কৃষ্ণানন্দায়। শ্রীমতী রাধিকাকে যিনি আনন্দ প্রদান করেন তিনি কৃষ্ণের প্রিয় হন কিভাবে? "রাধিকার দাসী যদি হোয় অভিমান। শীঘ্রই মিলয়ে তবে গোকুল কান॥" "কৃষ্ণনাম-গানে ভাই রাধিকা-চরণ পাই, রাধানাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র।"—ইহাই স্পষ্ট প্রমাণ।

উপসংহারে বলা যায়,—"ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা?" ছাড়িয়া শ্রীগুরুসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা? "শ্রীগুরুদেব বৈষ্ণব-প্রধান" (শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ—৪।১০।৮৯, মথুরা)। এজন্য ভজনপ্রয়াসী সাধকগণ যেন কখনই গুরু ও বৈষ্ণব-অবজ্ঞা ও অপরাধ না করেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের এই আদেশ মনে রাখিয়াই আমাদের বিশেষ সাবধানের সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। তবেই শ্রীব্যাসপূজার সার্থকতা।

—শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর-প্রদত্ত ভাষণ

শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য

আগ্রহী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সংগ্রহ করুন।

ধর্ম্ম কি ? সকল ধর্ম্ম কি সমান ?

নির্ম্মল জীবাত্মার নিত্য স্বভাবকেই জীবের ধর্ম্ম বলে। জীব মাত্রেই শ্রীভগবানের সন্তান বা সেবক। পিতার সেবা করা যেমন পুত্রের ধর্ম্ম, সেইরূপ জগৎপিতার সেবা করা জগজ্জীবের ধর্ম্ম। ভগবান্ এক এবং সনাতন ধর্ম্মও এক। জীবাত্মার কোন প্রাকৃত জাতি বা বর্ণ নাই। জাতি বা বর্ণধর্ম্মগুলি নশ্বর দেহ ও মনের ধর্ম্ম। ঐ সকল নশ্বর বা অনিত্য ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আত্মধর্ম্ম বা স্বরূপের ধর্ম্মকে আশ্রয় করিবার জন্য গীতায় চরম উপদেশ,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (গীতা ১৮.৬৬)

ধর্ম্মহীন ব্যক্তিগণ সকল ধর্ম্মের সমন্বয় করিয়া লইতে বলিতেছেন। ইহা অজ্ঞান-প্রসূত ব্যাপার। নিত্যধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম, অধর্ম্ম, বিধর্ম্ম—সব এক নহে। উহাদের সমন্বয় সম্ভব নয়। আত্মজ্ঞানী পণ্ডিতগণ সকল প্রাণীকে সমান দেখেন; অতএব আত্মজ্ঞান যাঁহার বেশী, তিনিই তত স্পৃশ্য বা পবিত্র; আর যাঁহার যত কম, তিনিই তত অস্পৃশ্য বা অপবিত্র।

"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।" ধর্ম্মই যাবতীয় সুখ-শান্তির ও শ্রীবৃদ্ধির মূল-কারণ। ধর্ম্মহীনতা বা ধর্ম্ম-বিদ্বেষই যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ও অধঃপতনের কারণ। অধোক্ষজ শ্রীহরিকে ভক্তি করাই পরম ধর্ম্ম। এই ভক্তিধর্ম্ম পালন না করিলে মায়ার বন্ধন ঘটে, জীবের নানাবিধ ক্লেশ-অশান্তি ভোগ করিতে হয়। নৈতিক অবনতি, দুর্নীতি, ধর্ম্মহীনতা, ঈশ্বর-বিদ্বেষ বা ধর্ম্ম-বিদ্বেষই যাবতীয় অশান্তির মূলকারণ। এই ভারতবর্ষ ধর্ম্মীয় পীঠস্থান বা পুণ্যভূমি। এখানেই শ্রীভগবানের দশাবতার আবির্ভূত হইয়াছিলেন, পৃথিবীর অন্য কোন স্থানেই তাহা হয় নাই। এই ভারতবর্ষেই মুনি-ঋষিগণের আবির্ভাব হইয়াছে। স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর এই ভারতবর্ষেই আবির্ভূত হইয়া লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরী এই ভারতেই বর্ত্তমান। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী—পুণ্যতোয়া নদীসকল এখানেই প্রবাহিতা। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, শ্রীব্যাসদেব প্রভৃতি অসংখ্য মহর্ষি, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষিগণের তপস্যার স্থান। এই ভারতবর্ষে দুর্ল্লভ মানব-জনম লাভ করিয়াও যাহারা আত্মধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক সাধন-ভজনের চেষ্টা না করেন, তাহারা

হতভাগ্য। সর্ব্বোপরি শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ন্যায় পতিতপাবন ও পরম দয়াল অবতারে যে যুগে জগাই-মাধাইয়ের ন্যায় মহাপাতকীগণও কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিল, সেই যুগে যাহারা পতিত থাকিল, তাহাদের দুর্ভাগ্যের কথা বর্ণনাতীত। কোটি কোটি জন্ম ধরিয়া যদি তাহারা অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হয়, তথাপিও তাহারা এই ক্ষতিপূরণ কিছুতেই করিতে পারিবে না।

বর্ত্তমানে অনেকে ধর্ম্মের আবরণে অধর্ম্ম প্রচার করিয়া কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণকে অসৎপথে বা অধর্ম্মের দিকে লইয়া যাইতেছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে যিনি সদ্‌গুরু-সমীপে গীতা-ভাগবত-বেদ-পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি শাস্ত্রীয় সদাচার যথাযথভাবে পালন করিয়াছেন, এইরূপ নীতিবান্, আদর্শপরায়ণ ব্যক্তিই ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার যথাযথ অধিকারী।

আজকাল কলির প্রভাবে বহু অসদাচারী, অনধিকারী ব্যক্তি ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করিতেছেন। এমন কি, ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশের প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক ও গীতাশাস্ত্রাদি যাহারা সদ্‌গুরুর নিকটে সুষ্ঠুভাবে অধ্যয়ন করেন নাই, তাহারাও ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের ধৃষ্টতা পোষণ করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা কোমলশ্রদ্ধ সাধারণ লোক বিপথগামী হইয়া থাকে। যেমন চিকিৎসাবিজ্ঞান না পড়িয়া রোগীকে চিকিৎসা করিতে যাওয়া অন্যায়, সেইরূপ ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরও ধর্ম্মকথা আলোচনা বা সে-সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করাও অন্যায়। অনেক ধর্ম্ম-প্রচারকগণ বলিয়া থাকেন,—"যত মত তত পথ।" ইহা শাস্ত্রীয় প্রমাণসিদ্ধ বাক্য নহে। "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ"—শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত দ্বাদশ মহাজন যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই ভগবানকে লাভ করিবার একমাত্র পথ। শ্রীভগবানের প্রদর্শিত ও নির্দ্দেশিত পথেই আমাদের চলিতে হইবে। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র কৃপা করিয়া অর্জ্জুনকে মত ও পথের কথা বলিয়াছেন,—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ (গীতা ৬৪-৬৬)

সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম পরমশ্রেয়ঃসাধক আমার বাক্য শ্রবণ কর। তুমি

আমার অত্যন্ত প্রিয়। এইহেতু তোমাকে কল্যাণকর কথা বলিতেছি। তুমি আমাতেই একমাত্র চিত্ত রাখ, আমাকে ভক্তি কর, আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর। আমি সত্যপ্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি,—তুমি আমাকেই পাইবে। লৌকিক সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি আমাতেই শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। শোক করিও না। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুও ঐ পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ধ্রুব-প্রহ্লাদাদি ও ঐ পথে সাধন করিয়াছেন। অন্য মানবের কল্পিত পথগুলি গ্রহণীয় নহে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—"ধর্ম্মন্তু সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীতম্।" স্বয়ং ভগবান্-কর্ত্তৃক যে ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই ভাগবত-ধর্ম্ম, সনাতন-ধর্ম্ম, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। কোন মানব বা অতিমানব, দেবতা, ঋষি হইতে এই ধর্ম্ম সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং মনোধর্ম্মীর মতে চলিতে হইবে না। তাহাদের মতে ভুল-ভ্রান্তি থাকিবেই। অতএব সকল ধর্ম্ম সমান নহে। সনাতন ধর্ম্ম নিত্য, আর মনোধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, কল্পিত ধর্ম্ম নিত্য নহে। ইহা অনিত্য ধর্ম্ম।

যে যাহাই করুক, যে মতে বা যে পথে চলুক না কেন, সকলে একই স্থানে যাইবে না এবং 'যত মত তত পথ'—একথা অশাস্ত্রীয়। সতী ও অসতী, সাধু ও চোর—ইহাদের মত ও পথ পৃথক্ এবং গন্তব্যস্থান পৃথক্। আবার উপাস্য-দেবতাও পৃথক্।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ (গীঃ ১৭।৪)
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥ (গীঃ।৯।২৫)

সাত্ত্বিকাদিভেদে মানবের উপাস্য-বস্তুও ভেদ হয়। যিনি সাত্ত্বিক, তিনি সেইরূপ দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন। আর তামসিক ব্যক্তিগণ ভূত-প্রেতাদির পূজা করিয়া থাকেন। সুতরাং যে যে ধর্ম্ম করুক এক স্থানে পৌঁছাইবে ও সকল মতই সমান, সকল ধর্ম্ম সমান—একথা কখনও সত্য নহে। ইহা মায়া-মোহগ্রস্ত লোকের প্রলাপোক্তি মাত্র। ঐ সকল অশাস্ত্রীয় বাক্যদ্বারা ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে বিপথে চালিত করা নিতান্ত অন্যায়। কোন প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান বা মিশনের প্রবক্তাগণ বলেন,—"যে যাহাই করুক একই স্থানে যাইবে।" তাহা হইলে চোর, দস্যু, লম্পট, মদ্যপায়ী প্রভৃতি সকলেরই উৎশৃঙ্খলতা আরও বাড়িয়া যাইবে। যাহার ফলে ভারতের নৈতিক অবনতি

ও অধঃপতন দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। বরং প্রচার করিতে হইবে—সৎকর্ম্মের গতি—সৎলোকে, আর অসৎকর্ম্মের গতি—নরকে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ লোকেরাই বলেন যে, সকল ধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া লাও। জীবের বদ্ধদশায় যে-সকল অনিত্য দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম প্রভৃতি মিথ্যা কল্পনা মাত্র। ঐ সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণে শরণাগত হওয়াই জীবের একমাত্র বাস্তব ধর্ম্ম। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' শ্লোক-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

এই আজ্ঞা-বলে যদি ভক্তের শ্রদ্ধা হয়।
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি' সে শ্রীকৃষ্ণে ভজয়॥

—শ্রীমদনমোহন দাস ব্রহ্মচারী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীপত্রিকার কাগজ, মুদ্রণ-ব্যয় ও ডাকমাসুল অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্ত্তমান ৪২শ বর্ষ হইতে শ্রীপত্রিকার বার্ষিক ভিক্ষা ২৫·০০ টাকা এবং ষান্মাসিক ভিক্ষা ১৪·০০ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। গ্রাহকগণ বর্ত্তমান বর্ষের ভিক্ষা তদনুসারে প্রেরণ করিলে বিশেষ বাধিত হইব। এ বিষয়ে আপনাদের সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি কামনা করি।

বিনীত নিবেদক—
কার্য্যাধ্যক্ষ,
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৯ পৃষ্ঠার পর]

ব্রহ্মতত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে জন্ম-মৃত্যু রহস্য সবকিছু বলে দিলেন। সর্ব্বশেষে বললেন,—দেখ, এটা কাকেও বলবে না। নচিকেতা বললেন,—আচ্ছা, আমি বলব কি না সেটা আমি বুঝব পরে। তিনি এই জন্ম-মৃত্যু রহস্য জেনে নিয়ে ফিরে এসেছেন এবং জগদ্বাসী সকলকে জানিয়েছেন। তবেই না প্রচার হয়েছে এই রহস্যটা। এতে তিনি গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই।

'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ'—এটা একটা প্রসঙ্গ। আর এখানে আর একটা ঘটনা। এক ব্রাহ্মণের শিশু বার বার মারা যাচ্ছে, তাকে বাঁচাবার কেউ নাই; সখা অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করেছেন শিশুকে বাঁচাবেন। সেই সভায় কিন্তু অতিরথ, মহারথ প্রভৃতি হাজির ছিলেন অনেকে। বাসুদেব কৃষ্ণ, সঙ্কর্ষণদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি হাজির সেই সভায়। কিন্তু কেউ ঐ ছেলেকে বাঁচিয়ে দেব, এই কথা বলেন নাই। কিন্তু অর্জ্জুন বলে ফেললেন—আমি তোমার ছেলেকে বাঁচাব। ভগবান্ তাঁর ভক্তকে দিয়েই এ জগৎকে রক্ষা করেন। ভাল-মন্দ সবকিছু শিক্ষা দিতে গেলে ভগবানকে তাঁর একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগণকে দিয়ে শিক্ষা দিতে হয়—সেইটাই দেখাচ্ছেন।

অর্জ্জুনের অহঙ্কার করা অন্যায় হয়েছে। কেননা, সেখানে স্বয়ং ভগবান্—উপরওয়ালারা হাজির আছেন। তাঁরা যখন দায়িত্ব নিচ্ছেন না, তাহলে ব্যাপারটা নিশ্চয় ঘোরতর। সেই শিক্ষাই এখানে রয়েছে। ভগবানকে যাঁরা ভালবাসতে চাচ্ছেন তাঁদের ত' তত্ত্বদর্শনের অভাব নাই, তত্ত্বজ্ঞানের অভাব নাই, তাঁদের তত্ত্বজ্ঞান জানা আছে। তথাপি কেন তাঁদের উল্টো-পাল্টা আচরণ—প্রশ্ন হতে পারে। শাস্ত্র বলছেন,—সমস্ত তত্ত্বদর্শন, ভাল-মন্দ জগৎকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবান্ উপযুক্ত মাধ্যম নির্ণয় করেন তাঁর ভক্তকে। কখনও অতাত্ত্বিক সাজিয়ে, কখনও অজ্ঞ সাজিয়ে তাঁর মুখ দিয়ে সংশয়-সন্দেহসূচক প্রশ্ন করাচ্ছেন, আর স্বয়ং ভগবান্ তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত-সম্মত উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। এখানে সেই ঘটনা ঘটেছে। রাজা যদি নীতি-আদর্শ পরায়ণ হন, তাহলে রাজ্যের কল্যাণ হয়, আর রাজা যদি নীতি-আদর্শহীন ভ্রষ্টাচারী হন, তাহলে রাজ্যের সমূহ ক্ষতি। এখানে আলোচনার মধ্যে সেই বিষয়টী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

ভগবত্তত্ত্ব নির্ণয় করতে গিয়ে বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত

বলেছেন,—ভগবান্ বৃহচ্চৈতন্য ; জীব অনুচৈতন্য। অনুচৈতন্য জীবাত্মা অংশ, আর পূর্ণ—সনাতন পরব্রহ্ম ভগবান্। অংশ কি করে পূর্ণ হবে? এমন অঙ্ক ত' কষা যায় না। ছেলেবেলায় জ্যামিতিতে পড়েছিলাম,—'The part equal to the whole, which is absurd.' অংশ কোনদিন পূর্ণের সঙ্গে সমান হয় না। কিন্তু সাধারণ মানুষ আজ উল্টোপাল্টা অঙ্ক কষছেন, কষবার চেষ্টা করছেন। মিলবে না কোনদিন ঐ অঙ্ক।

হে জীব! তুমি কেন ব্রহ্ম হতে চাচ্ছ? পরব্রহ্ম ভগবান্ তিনি তাঁর পূর্ণশক্তি নিয়ে বসে আছেন। তুমি তাঁর সিংহাসন দখল করতে যাচ্ছ কেন? তুমি ঠিক যা, তাই তুমি থাক। শাস্ত্রে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে তা বুঝান হয়েছে,—অগ্নি—অগ্নির দাহিকা শক্তি, সূর্য্য—সূর্য্যের কিরণ, সমুদ্র—সমুদ্রের তরঙ্গ। ঠিক এর উল্টো করে কথাগুলো যদি বলা যায়—তরঙ্গের সমুদ্র, দাহিকাশক্তির অগ্নি, কিরণের সূর্য্য, তাহলে উল্টো হয়ে যাবে। এরকম সম্পর্ক আমরা কখনও বলি না। অগ্নির দাহিকা শক্তি, সমুদ্রের তরঙ্গ, সূর্য্যের কিরণ বলতে হয়। আধার-আধেয় তত্ত্ব বিচার করেছেন এখানে শাস্ত্র। আশ্রিত এবং আশ্রয়—দুটো তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। সমুদ্র যদি বলে যে তরঙ্গ আমার, তাহলে Theory ঠিক আছে, কিন্তু তরঙ্গ যদি বলে আমিই সমুদ্র, ঠিক হবে না, ভুল হয়ে যাবে Theory। শাস্ত্র যুক্তি দিয়ে এ কথা বুঝিয়েছেন,—যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গাস্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভূরি জীবাঃ।

ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদব্ধিস্ত্বং ব্রহ্ম কস্মাদ্ভবিতাসি জীব ॥

তরঙ্গ কোনদিন সমুদ্র হবে না, কিন্তু সমুদ্র যদি বলে তরঙ্গ আমারই—কথাটা ঠিক আছে। সুতরাং হে জীব! তুমি ব্রহ্ম হতে চাচ্ছ কেন, তুমি ব্রহ্মের আসন দখল করতে যাচ্ছ কেন? তুমি কি জান না—Anarchist—রাজদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহী হলে কি সাজা হয়? শাস্ত্র আলোচনা করতে গেলে সর্ব্বদা বিষয়বস্তু পাশাপাশি রেখে বিচার করতে হবে। কে সেই পরাৎপর-তত্ত্ব ভগবান্, কে সেই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবান্, কে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্, কে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্? শাস্ত্র বিচার করেছেন—যাঁর কোন অভাব নাই, যিনি স্বীয়লাভে সন্তুষ্ট আপ্তকাম যদুপতি ভগবান্, তাঁর সঙ্গে অন্য একজন সাধারণ মানুষের তুলনা হবে? "অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।" সাধারণ মানুষ ত' অভাবগ্রস্ত, স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়, সবসময় অভাব—দাও, দাও। ভগবানের ত' অভাব নাই, তিনি স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত। সেই পরাৎপর তত্ত্ব ভগবান্ অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব—বেদে,

উপনিষদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাঁর সমান কেহ নাই, উর্দ্ধেও কেহ নাই। He is second to none, সেই তত্ত্ব হল পরাৎপর তত্ত্ব। ভগবান্ তাঁকেই বলা হয়েছে।

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ॥

যাঁর সমকক্ষ কেউ নাই, যাঁর উর্দ্ধেও কেউ নাই—সেই তত্ত্ব যদি ভগবান্ হন, তাহলে মানুষ কেন তাঁর সঙ্গে সমতার অঙ্ক কষতে যাচ্ছে। কেন অঙ্ক কষতে যাচ্ছে—Equal in all aspect। ভুল ধারণা, সেটা হবে না কোনদিন। যেটা অসম্ভব সেটাকে সম্ভব করতে যাচ্ছে কতকগুলো অবুঝ ও অর্ব্বাচীন।

আচার্য্য শ্রীশঙ্করপাদ ভগবানের আদেশে মায়াবাদ প্রচার করেছেন এ জগতে। নির্ব্বিশেষ মতবাদ, যার অপর নাম Pantheism। বুদ্ধদেব প্রচার করেছেন শূন্যবাদ—Nihilism। আচার্য্যশঙ্কর তার উপর একটু Sugar coating করে ব্রহ্মবাদ প্রচার করেছেন। কিন্তু জিনিস দুটো এক। কে এই শঙ্করাচার্য্য?—স্বয়ং শিবঠাকুর। ভগবান্ আজ্ঞা করেছেন,—দেখ শিব, আমার ভক্তের পথ রোধ করছে নিরীশ্বর নিরাকারবাদী নাস্তিকগণ। তুমি তাদিগকে অন্যদিকে Divert—পরিচালনা কর। কিভাবে করব প্রভু? আমার উপরে কেন এ ধরণের আদেশ? আমার পক্ষে কি এ আদেশ পালন করা সম্ভব? আমি ত' তোমাকে ছাড়া, তোমার নাম ছাড়া কিছু জানি না। তুমি এই উল্টোপাল্টা আজ্ঞা করছ, পালন করতে হবে আমাকে! শিবঠাকুর ইচ্ছুক নন। ভগবান্ বলছেন,—এটা তোমার দ্বারাই সম্ভব, অন্যের দ্বারা সম্ভব নয়। তোমাকেই এটা করতে হবে। কি করব?—তুমি বেদবাক্য, শ্রুতি-স্মৃতির কদর্থ কর, উল্টোপাল্টা ব্যাখ্যা দিয়ে দাও।—"অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোকগর্হিতম্।"—মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।

ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিণা ॥

শিবানীকে বলছেন শিবঠাকুর—কলিকালে আমি ব্রাহ্মণের ঘরে গিয়ে মায়াবাদরূপ অসচ্ছাস্ত্র প্রচার করব। যার অপর নাম প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ। ঘটনাগুলো ত' অস্বীকার করার উপায় নাই, শিবঠাকুর স্বয়ং আগে বলে রেখেছেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে আদেশ পালন করতে হয়েছে। উল্টোপাল্টা শ্রুতির কদর্থ ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে তাঁকে। যার নাম—বেদান্ত-দর্শনের "শারীরক-ভাষ্য"। তিনি অভিধা বাদ দিয়ে লক্ষণাবৃত্তিতে ব্যাখ্যা দিয়ে উহা রচনা করেছেন। আমরা সবাই ভগবানের সঙ্গে মিশে যাব, ভগবান্ হয়ে

যাব। এখন ত' সব ঐ দলের। ভগবান্ বলেছেন,—যারা এই Theory মানবে, তারা সব দৈব-বিরোধী আসুরিক শ্রেণীভুক্ত। তারা আসুর, নাস্তিক। বর্ত্তমান দুনিয়ায় আস্তিক-নাস্তিকের একই আসন—সম্মান। কিন্তু নিরপেক্ষ-ভাবে আলোচনা করলে তা প্রমাণিত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গীতার মধ্যে বলেছেন,—হে অর্জ্জুন! জগতে দুই শ্রেণীর মানুষ আছে।—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥

যাঁরা ভগবদ্ভক্ত তাঁরা দৈবীভাবাপন্ন, আর যারা ভগবদ্বিরোধী তারা আসুরিক ভাবাপন্ন। ভগবান্ নিজে এ বিষয়ে প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন। মায়াবাদের কথাও ভগবান্ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেন। গীতার ১৬শ অধ্যায়ের মধ্যে দৈবীসম্পদ ও আসুরিক সম্পদ ব্যাখ্যা করেছেন। আসুরিক সম্পদ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রথমেই বলছেন,—"ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা"—এই তত্ত্বটা ব্যাখ্যা ও প্রমাণ করা অসম্ভব। কিন্তু এ বিষয় নিয়ে বাজারে নির্ব্বিশেষ-মতবাদীরা বহু অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥

'ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা' বাক্যের মধ্যে জগন্মিথ্যাত্ববাদ অপ্রমাণিত। ব্রহ্ম যদি সত্য হন, তাহলে জগৎও সত্য হবে। জগৎ অনিত্য কিন্তু সত্য। এক নাস্তিক 'জগৎ মিথ্যা' এই কথা বললেন। দ্বিতীয় নাস্তিক বললেন কি?—'জগদাহুরনীশ্বরম্'—এই জগতে ঈশ্বর বলে, ভগবান্ বলে কেউ নাই। তৃতীয় নাস্তিক বলছেন,—'অপরস্পরসম্ভূতম্'—Atom Molecules Theory —কণাদের বৈশেষিক দর্শন। চতুর্থ নাস্তিকের মতবাদ হল—ভগবান্ বলে একজনকে মেনে নিতে পারি, কিন্তু সেই ভগবান্ আমাদের কল্যাণের জন্য জগৎ সৃষ্টি করেন নাই, আমাদের সৃষ্টি করেন নাই। 'কিমন্যৎ কাম-হেতুকম্'—সেই ভগবান্ জগৎ সৃষ্টি করেছেন তাঁর কামনা-বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য, আমাদের কল্যাণের জন্য নয়। এইসব নাস্তিকের তালিকা ভগবান্ নিজমুখে গীতার মধ্যে উপদেশ করে যাচ্ছেন। আমরা আছি কোথায়, বাস করছি কোথায়! এসব কথাগুলো কি আলোচ্য বিষয় নয়? ভালটা যদি শিখতে হয় আমাদের তাহলে খারাপ কোন্‌টা কোন্‌টা সেগুলো ত' জেনে নিতে হবে। আমি যেন খারাপের মধ্যে না পড়ে যাই। আমি

ভালই হব, Good boy হব, ইহাই যদি উদ্দেশ্য, তবে খারাপটাও আমাকে জেনে রাখতে হবে। সে সম্বন্ধেও সুষ্ঠু অভিজ্ঞানলাভ প্রয়োজন।

ডারউইন সাহেবের Theory-র সাথে আমাদের শাস্ত্রের Theory-র পার্থক্য কোথায় হচ্ছে? তিনি বললেন,—মানুষের উপরে আর কোন শ্রেষ্ঠ জীব নাই বা শ্রেষ্ঠ অবস্থা নাই। আমাদের শাস্ত্র বললেন,—চেতনতার ক্রমবিকাশানুসারে এই মানুষের চরম উন্নতি সম্ভব, এই মানুষের আবার অধঃপতনও আছে। মানবের যে কাজ, তা যদি মানুষের ভিতরে না দেখা যায়, মনুষ্যত্বের সদ্ব্যবহার যদি সে না করে, তাহলে এই মানুষই আবার পশুত্বে চলে যায়। আবার বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, লতা হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এটাকে Diversion। Deviation বলে। এর ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে শাস্ত্রে। আপনারা জানেন, অহল্যা পাষাণী হয়েছেন। নৃগরাজ একজন ধার্ম্মিক রাজা। দান করতে গিয়ে তাঁর সামান্য ত্রুটী-বিচ্যুতি হয়েছে। তজ্জন্য তাঁকে কৃকলাস হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। আপনারা জানেন—ধনকুবেরের দুই ছেলে—নলকুবর ও মণিগ্রীব অর্জ্জুন বৃক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। দেবতাগণের মধ্যে পরম রূপবান্ সুদর্শন বিদ্যাধর রূপগৌরব করেছিলেন বলে, অঙ্গিরা-গোত্রজাত ঋষিগণকে দেখে ঠাট্টা করেছিলেন বলে, কুরূপগ্রস্ত ঋষিগণকে দেখে পরিহাস করেছিলেন বলে জন্মগ্রহণ করলেন অজগররূপে। ভুরি ভুরি এই রূপ অধঃপতনের উদাহরণ শাস্ত্রে আছে। সেকথা গীতায় কৃষ্ণ বললেন,—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥

শেষকালে জীবাত্মা আবার আচ্ছাদিতচেতনাদিরূপে জন্মগ্রহণ করছে। তাহলে শাস্ত্রের এই বিচার মানতে গেলে ডারউইন সাহেবের বিচারের সঙ্গে মতবিরোধ উপস্থিত হয়। শাস্ত্রে মনুষ্যজীবনের ঊর্দ্ধগতি ও অধোগতি—এই দুয়েরই বিচার বিবেচনার ক্ষেত্র রয়েছে। বাস্তবসত্য বা পরমসত্য বলেছেন শাস্ত্রে। (ক্রমশঃ)

বিহ্বল প্রতাপরুদ্র

প্রভুর মিলন আশে আকুল রাজন,—
বিরহে বিহ্বল রায়, রাজ্যসুখ নাহি ভায়,
কভু হাসে কভু কাঁদে পাগল যেমন !
যে জন 'গৌরাঙ্গ' বলে ধরে তার পায়,—
সদা লুটে ধরাতলে, হিয়া ভাসে আঁখিজলে,
কেমনে গৌরাঙ্গ পাব সবারে সুধায় ।
সার্ব্বভৌম পদে ধরি কহিছে রাজন,—
কতদিন হেন আর, করিব বা হাহাকার,
পাব না কি হেরিতে সে যুগল চরণ ?
ভক্তবশ ভগবান্ ভাগবত গায়,—
তোমার চরণ ধরি, দেখাও সে গৌরহরি,
তব কৃপাবলে দয়া হবে গো আমায় ।
প্রভু বিনা এ জীবন শুধু মোর ভার,
সে'পদ আঁকিয়া বুকে, সাগরে ডুবিব সুখে,
প্রভু বিনা রাজ্যভোগ কি হবে আমার ?
প্রভু বিনা কি করিব পুত্র-পরিজন ?
প্রভু বিনা এ হৃদয়, কেবল মরুভূময়,
এ মোর জীবন নহে সুদীর্ঘ মরণ !
জগৎ তারিতে শুনি তাঁর অবতার,—
কেবল কি হেনরূপে, রাখি মোরে মোহকূপে,
তারিবেন এ জগৎ বাসনা তাঁহার !
বল বল সার্ব্বভৌম ! কি করি উপায় ?
বিনা সেই গৌরহরি, মরমে মরমে মরি,
গরল আনিয়া সখে দেহ করুণায় !
গরল করিয়া পান ত্যজিব জীবন,—

অভাগারে করি স্নেহ, আমার সে মৃতদেহ,
ফেলে রেখ সিন্ধুতীরে রেখ নিবেদন !
স্নান তরে যবে প্রভু করিবে গমন,—
পদধূলি উড়ি' যায়, ভূষিবে আমার কায়,
উথলি উঠিবে তাহে এ মৃত জীবন।

—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারোদ্দেশ্যে তাঁরই শুভাবির্ভাব-তিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীগৌরের প্রেম-ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত ভক্তগণকে লইয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির (রেজিঃ) সেবকগণ তাঁহাদের পূর্ব্বাচার্য্যবর্গের প্রবর্ত্তিত ধারানুযায়ী প্রতি বৎসর বৃন্দাবনা-ভিন্ন শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব বিপুল সমারোহে পালন করেন। বর্ত্তমান বর্ষেও সমিতির সেবকগণ যথারীতি শ্রীধামপরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ৬ই মার্চ্চ আকাশবাণী ভবন হইতে স্থানীয় সংবাদে এবং বহুল প্রচারিত আনন্দবাজার পত্রিকার ২৩শে ফাল্গুন ১৩৯৬, ৭ই মার্চ্চ ১৯৯০ সংখ্যায় শ্রীসমিতির এই মহোৎসবের প্রচারও হইয়াছিল।

পরিক্রমার পূর্ব্ব হইতে প্রকৃতি দেবী কিছুটা বিরূপ আকার ধারণ করায় সমিতির সদস্যবর্গ কিছুটা বিব্রত বোধ করেন। কিন্তু মহাপ্রভুর ভক্তগণের প্রাণের আর্ত্তনাদে তিনি তাঁহার সেই রূপ পরিগ্রহ করেন। তৎফলে নির্ম্মল নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া ও মুক্ত পরিবেশের মধ্যে পরিক্রমা ও গৌর-জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে প্রায় পঞ্চসহস্রাধিক শ্রদ্ধালু ভক্ত এই মহোৎসবে যোগদান করত উৎসবকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলেন।

গত ২০শে ফাল্গুন ১৩৯৬, ইং ৫ই মার্চ্চ ১৯৯০ সোমবার সন্ধ্যায় শ্রীধাম পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয় এবং ২১শে ফাল্গুন মঙ্গলবার হইতে পরিক্রমা-

সূচী অনুযায়ী যথাক্রমে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (কীর্ত্তনাখ্য), শ্রীমধ্যদ্বীপ (স্মরণাখ্য), শ্রীকোলদ্বীপ (পাদসেবনাখ্য), শ্রীঋতুদ্বীপ (অর্চ্চনাখ্য), শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বন্দনাখ্য), শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (দাস্যাখ্য), শ্রীরুদ্রদ্বীপ (সখ্যাখ্য), শ্রীসীমন্তদ্বীপ (শ্রবণাখ্য) ও শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (আত্মনিবেদনাখ্য) প্রভৃতি নবধাভক্তির পীঠস্থানসমূহ দর্শন ও তত্তৎস্থানমাহাত্ম্য বর্ণনমুখে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারি ও যাত্রিগণ পরিক্রমা করেন। শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদ আশ্রমের সভাপতি-অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভববন মহারাজ, শ্রীমৎ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমৎ সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমৎ বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমৎ যতি মহারাজ প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ শ্রীধাম মহিমা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া যাত্রীবৃন্দের পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করেন। শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ শারীরিক অসুস্থতাহেতু মাত্র কিছুক্ষণের জন্য শ্রীহরিকথা পরিবেশন করেন।

পরিক্রমান্তে ২৬শে ফাল্গুন রবিবার অর্থাৎ শ্রীগৌরজন্মোৎসব-দিবসে সারাদিন শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হয়। অদ্য প্রায় ১½ শতাধিক শুদ্ধভক্তি যাজনকারী হরিভজনোৎসুক ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হইতে শ্রীহরি-নাম ও দীক্ষা গ্রহণ করত তাঁহাদের পারমার্থিক জীবনযাপনক্ষেত্রের পথ প্রশস্ত করেন। সন্ধ্যায় শ্রীগৌরাবির্ভাব-লগ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ অভিষেক ও আরতি হয়। আরাত্রিকান্তে যাত্রিগণকে অন্নকল্প প্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

রাত্রে ভি. ভি. ও. যোগে 'শ্রীজগন্নাথদেব' ও শিলিগুড়িস্থ শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত শ্রীল গুরু-মহারাজের আবির্ভাব-তিথিপূজার ছবি প্রদর্শন করান হয়।

২৭শে ফাল্গুন সোমবার সাধারণ-মহোৎসব দিবসে যাত্রিগণকে ও আগন্তুক মাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া যাত্রিগণ সাধুসঙ্গে শ্রীধামপরিক্রমা ও শ্রীগৌরের লীলাকথা স্মরণ করিতে করিতে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে সেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪২শ বর্ষ | ৬ ত্রিবিক্রম, প্রদ্যুম্ন, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ ৩১শে বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৯৭, ইং ১৪।৫।৯০ | ৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্ম-মহেশ্বরাদি-দেবগণকৃতং শ্রীদেবকী-গর্ভস্তোত্রম্

[শ্রীমদ্‌গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে শ্রীনারদ-বহুলাশ্ব-সংবাদে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-জন্মবর্ণনে একাদশোঽধ্যায়ে]

শ্রীনারদ উবাচ,—

১। অথ ব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনীন্দ্রৈরস্মদাদিভিঃ।
শৌরি-গেহোপরি প্রাপ্তাঃ স্তবং চক্রুঃ প্রণম্য তম্॥ ৭॥

শ্রীনারদ কহিলেন,—অনন্তর অস্মদাদি মুনীন্দ্রগণসহ ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ বসুদেব-গৃহে আগমন করিয়া শ্রীভগবানকে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৭॥

দেবা উচুঃ,—

২। যজ্জাগরাদিষু ভবেষু পরং হ্যহেতু-
হেতুঃ স্বিদস্য বিচরন্তি গুণাঃ শ্রয়েণ।
নৈতদ্বিশন্তি মহদিন্দ্রিয়-দেবসঙ্ঘা-
স্তস্মৈ নমোঽগ্নিমিব বিস্তৃত-বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ৮ ॥

দেবগণ বলিতে লাগিলেন,—যিনি জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের উৎপত্তি-হেতু নহেন অথচ হেতু হন এবং যাঁহার আশ্রয়ে গুণসকল বিচরণ করে; অনলোৎপন্ন অগ্নিকণা যেমন তাহাতে পুনঃ প্রবেশ করিতে পারে না, তদ্রূপ মহত্তত্ত্ব ও ইন্দ্রিয়গণের দেবতা যাঁহাতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ, তাঁহাকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

৩। নৈবেশিতুং প্রভুরয়ং বলিনা বলীয়ান্
মায়া ন শব্দ উত নো বিষয়ীকরোতি।
তদ্‌ব্রহ্ম পূর্ণমমৃতং পরমং প্রশান্তং
শুদ্ধং পরাৎপরতরং শরণং গতাঃ স্মঃ ॥ ৯ ॥

যিনি প্রভু, যাঁহাকে জানা যায় না, যিনি স্বীয় বলে বলীয়ান্, মায়া ও শব্দের অবিষয়ীভূত, আমরা সেই পূর্ণ, প্রশান্ত, শুদ্ধ, অমৃত পরম পরাৎপর ব্রহ্মের শরণাপন্ন হই ॥ ৯ ॥

৪। অংশাংশকাংশক-কলাদ্যবতারবৃন্দৈ-
রাবেশ-পূর্ণসহিতৈশ্চ পরস্য যস্য।
সর্গাদয়ঃ কিল ভবন্তি তমেব কৃষ্ণং
পূর্ণাৎ পরং তু পরিপূর্ণতমং নতাঃ স্মঃ ॥ ১০ ॥

যে পরম-পুরুষের অংশ, অংশাংশ, কলা, আবেশ ও পূর্ণ প্রভৃতি অবতারে সৃষ্টি-সংহারাদি সাধিত হয়, পূর্ণ হইতেও পরিপূর্ণতম সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমরা নমস্কার করি ॥ ১০ ॥

৫। মন্বন্তরেষু চ যুগেষু গতাগতেষু
কল্পেষু চাংশকলয়া স্ববপুর্বিভর্ষি।
অদ্যৈব ধাম পরিপূর্ণতমং তনোষি
ধর্ম্মং বিধায় ভুবি মঙ্গলমাতনোষি ॥ ১১ ॥

যিনি অতীত ও অনাগত মন্বন্তর, যুগ ও কল্পে স্বীয় অংশকলায় শরীর ধারণ করিয়া থাকেন; সম্প্রতিও যিনি স্বীয় পরিপূর্ণ-ধাম বিস্তৃত করিতেছেন,

সনাতন ধর্ম্ম বিস্তারপূর্ব্বক তিনিই পৃথিবীর বিবিধ মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

৬। যদ্দুর্ল্লভং বিশদ-যোগিভিরপ্যগম্যং
গম্যং দ্রবদ্ভিরমলাশয়-ভক্তিযোগৈঃ।
আনন্দকন্দ-চরণস্তব মন্দযানং
পাদারবিন্দ-মকরন্দ-রজো দধামঃ ॥ ১২ ॥

যিনি উত্তম যোগিগণেরও দুর্ল্লভ এবং একমাত্র সরল শুদ্ধাশয় ভক্তিযোগ-গম্য, আনন্দকন্দে মন্দমন্দ বিচরণশীল সেই বিভুর পদারবিন্দের মকরন্দ-রজকে আমরা হৃদয়ে ধারণ করি ॥ ১২ ॥

৭। পূর্ব্বং তথাত্র কমনীয়-বপুষ্মরং ত্বাং
কন্দর্প-কোটিশত-মোহনমদ্ভুতং চ।
গোলোকধাম-ধিষণ-দ্যুতিমাদধানং
রাধাপতিং ধরণধর্য্যধনং দধামঃ ॥ ১৩ ॥

হে রাধাপতে! আমরা আপনার যে রূপ পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম এবং এখনও দেখিতেছি,—আপনার সেই অদ্ভুত কমনীয় শতকোটি কন্দর্পমোহন দেহকান্তি উত্তম গোলোকধামের দ্যুতিধারী ধরণী-ধারণক্ষম রূপ হৃদয়ে ধারণ করি ॥ ১৩ ॥

শ্রীনারদ উবাচ,—

৮। নত্বা হরিং তদা দেবা ব্রহ্মাদ্যা মুনিভিঃ সহ।
গায়ন্তস্তং প্রশংসন্তঃ স্বধামানি যযুর্মুদা ॥ ১৪ ॥

শ্রীনারদ বলিলেন,—ব্রহ্মাদি দেবগণ মুনিগণসহ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মুদিতমনে তাঁহার প্রশংসা ও গুণগান করিতে করিতে স্ব-স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৪ ॥

কুটীনাটী

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশে কুটীনাটী পরিত্যাগের বিশেষ পরামর্শ আছে। কোনস্থলে নিষিদ্ধাচার, জীব-হিংসা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি ভক্তিবাধক বস্তুর মধ্যে কুটীনাটীকে ধরিয়াছেন। অন্যস্থানে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন,—

"অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটীনাটী পরিহরি' একান্ত হইয়া॥"

আবার শ্রীদাস গোস্বামী স্বীয়কৃত (মনঃশিক্ষা ···) শ্লোকে "কুটীনাটী ভর-খরক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা রাধাকৃষ্ণ-প্রেমপ্রাপ্তির অত্যন্ত বিরোধী বলিয়া ধরিয়াছেন। অতএব শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের 'কুটীনাটী' পরিত্যাগ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

'কুটীনাটী' শব্দার্থ কি? অভিধান খুঁজিয়া এই শব্দটীর অর্থ পাওয়া যায় না। শব্দটী বঙ্গসমাজে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। যেস্থানে 'কুটীনাটী'-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সেই স্থানের ভাবার্থ বিচারপূর্ব্বক এবং শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের লোকেরা এই শব্দ ব্যবহার করিবার সময় যে অর্থ মনে করেন, তাহা জানিয়া আমরা 'কুটীনাটী' বলিলে কি বুঝায়, লিখিতেছি। 'কুটীনাটী'-শব্দে 'কুটী' ও 'নাটী' এই দুইটী কথা আছে। শুচিবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সকল বিষয়েই 'কুটী'-দৃষ্টি করেন অর্থাৎ একটী জলাশয়ে স্নান করিলেন, কিন্তু তন্নিকটে কোন মল-ক্ষেত্র থাকায় সেই জলাশয়ের 'কুটী' মনে করিয়া সমস্ত দিন সেই আলোচনায় ব্যস্ত থাকেন। কোন ভাল বিষয় আলোচনা করিতে পান না। 'শুচিবায়ু' একপ্রকার কুটীনাটীর স্থল। যাঁহাদের ঐ প্রকার বায়ু আছে, তাঁহারা পৃথিবীর কোন স্থলকে পবিত্র মনে করিতে পারেন না, কোনও সময়কে শুদ্ধ মনে করিতে পারেন না, কোনও ব্যক্তিকে শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। শুদ্ধভক্তের স্মার্ত্তবিরুদ্ধ কোন আচার দেখিলে তাঁহাকে আর বৈষ্ণব মনে করিয়া সঙ্গ করেন না। এইস্থলে 'কু'-টীর উপর 'না'-টী উপস্থিত হইল। নীচবর্ণের সাধুলোকের প্রতিষ্ঠিত ভগবন্মূর্ত্তির প্রসাদ না পাওয়া একটী কুটীনাটী। কুটীনাটী প্রবল থাকিলে কোন খাদ্যদ্রব্যে সুখলাভ হয় না। কুটীনাটী একপ্রকার মানসিক পীড়া। সেই পীড়া থাকিলে কৃষ্ণভক্তি হওয়া সুকঠিন। বৈষ্ণবসেবা ও বৈষ্ণব-সঙ্গ কুটীনাটীগ্রস্তের পক্ষে বড়ই কঠিন, কেন না,—

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
ভক্ত-শেষ হইলে 'মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান'॥
ভক্ত-পদধূলি, আর ভক্ত-পদজল।
ভক্ত-ভুক্তশেষ,—এই তিন মহাবল॥

কুটীনাটীগ্রস্ত ব্যক্তির বর্ণাভিমান ও সৌন্দর্য্যাভিমান-প্রযুক্ত মহা-মহাপ্রসাদে, ভক্ত-পদধূলিতে ও ভক্ত-পদজলে দৃঢ় বিশ্বাস হয় না। তিনি সর্ব্বদা বৈষ্ণবাপরাধ ও নামাপরাধে দোষী; অতএব তাহার মুখে হরিনাম হওয়া কঠিন। কতকগুলি লোক আছেন তাহারা শুদ্ধবৈষ্ণবের পীড়া সময়ে ঘৃণা প্রকাশ করেন, কিন্তু মহাপ্রভু বলিয়াছেন, হে সনাতন! তোমার দেহে যে কণ্ডুরসা হইয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণবের ঘৃণা হয় না।—

*　　*　　*　　*

ভদ্রাভদ্র বস্তুজ্ঞান নাহি অপ্রাকৃতে॥
দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম॥
প্রভু কহে,—বৈষ্ণব-দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের, চিদানন্দময়॥ *

'কুটীনাটী'-শব্দের অর্থ মহাপ্রভু 'এই ভাল, এই মন্দ' শব্দদ্বারা করিয়া দিয়াছেন। বৈষ্ণবের শরীরে যে কিছু কর্ম্মগতিকে অভদ্র দেখা যায়, তাহাকে অভদ্র মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। বৈষ্ণবের স্মৃতিশাস্ত্র-বিরুদ্ধ কোন বিশেষ দুরাচার-ব্যবহার দেখিলেও তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া মানিতে হইবে, নতুবা নামাপরাধ হইবে। যথা শ্রীভগবদ্গীতা,—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যো সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ॥ (গীঃ ৯।৩০)

এই উপদেশস্থলে ভক্তিবিরুদ্ধ আচারসকল সত্ত্বেও কোন ব্যক্তিকে বৈষ্ণব বলিয়া মানিতে হইবে, এরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। শুদ্ধবৈষ্ণবের অনাদর অসৎসঙ্গ অর্থাৎ অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ও অভক্তসঙ্গ, গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, ভক্তিশাস্ত্রের নিন্দা,

---

* উক্ত প্রমাণের দ্বারা জানা যায়, কোনও বৈষ্ণবের অপ্রকট বা পরলোক গমনের পর তাঁহাকে অগ্নি সংযোগ বা তীর্থোদকে প্রদান অথবা ভূগর্ভে স্থাপন করিয়া অনেকে স্মার্ত্তের ন্যায় নিজদিগকে অপবিত্র জ্ঞানে স্নানাদি করেন। ইহাও কুটীনাটী এবং বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ বিশেষ। বৈষ্ণব সর্ব্বদাই পবিত্র—ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক।—সম্পাদক

নাম-নামীতে ভেদজ্ঞান, অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামের কাম্য, জড়দেহের অহংতা-মমতাবশতঃ নামে প্রীতির খর্ব্বতা, নামবলে পাপাচরণ প্রভৃতি যে-সকল ভক্তিবিরুদ্ধ আচার নির্ণীত আছে, তাহা যে ব্যক্তিতে দেখা যাইবে, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণে অনন্যভক্তি লাভ করিয়াছেন, এরূপ বলা যায় না। অনন্য-ভক্তের ভক্তিবিরুদ্ধ আচার অসম্ভব। যেখানে ভক্তিবিরুদ্ধ আচার, সেখানে ভক্তি নাই। সেরূপ লোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই বিধান হইয়াছে। যাঁহার শুদ্ধভক্তি আছে, তাঁহার স্মৃতিবিরুদ্ধ আচার দেখিয়া কুটীনাটী পরিত্যাগ করিবেন। কুটীনাটী যতপ্রকার হয়, তাহা বিচার করিয়া যাহাতে কুটীনাটী হৃদয়ে না থাকে, তাহার চেষ্টা করিবেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বর্ণান্তর

ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে মানবের বর্ণ-বিভাগ ছিল না, পরে ত্রেতাযুগের প্রারম্ভেই বর্ণ বিভাগ আরম্ভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ ১৭শ অধ্যায় :—

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাঃ হংস ইতি স্মৃতঃ।
ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্মে হৃদয়াত্রয়ী ॥
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রাঃ মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচার-লক্ষণাঃ ॥

সত্যযুগে আদিতে মানবগণের একমাত্র বর্ণ ছিল এবং উহা 'হংস' নামে কথিত হইত। হে মহাভাগ, ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে আমার প্রাণ ও হৃদয় হইতে বেদত্রয় আবির্ভূত হয়। আমার বিরাট্‌রূপ পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদদেশ হইতে নিজ নিজ আচার-লক্ষণ-ভেদে বর্ণ-চতুষ্টয় জন্মগ্রহণ করে। নীলকণ্ঠ মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮৮।৪ শ্লোক-টীকায় বলেন,—'বর্ণাঃ সাত্ত্বিকং রাজসং তামসং মিশ্রং চেতি স্বচ্ছত্বাদি-সাম্যাৎ গুণবৃত্তং বর্ণশব্দেনোচ্যতে।' 'বর্ণ' শব্দে জীবের গুণবৃত্ত বুঝায়।

শ্রীমহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্ম ১৮৮ অধ্যায়ে ভরদ্বাজ বলিলেন,—

জঙ্গমানামসংখ্যেয়াঃ স্থাবরাণাঞ্চ জাতয়ঃ।
তেষাং বিবিধ-বর্ণানাং কুতো বর্ণ-বিনিশ্চয়ঃ ॥

স্থাবর ও জঙ্গমসমূহের অসংখ্য জাতি। তাহাদের নানাপ্রকার বর্ণের কি-প্রকারে বর্ণ নিশ্চয়রূপে নির্ণীত হয়। তদুত্তরে ভৃগু বলিতেছেন,—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥
ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাং তু লোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রানামসিতস্তথা॥
হিংসানৃতপ্রিয়লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।

জীবের বর্ণসমূহের বিশেষ নাই অর্থাৎ দেহী বর্ণ-নির্ব্বিশেষ। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণময় জগৎ সৃষ্টি করেন। পরে স্ব-স্ব-কর্ম্ম-প্রভাবে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণতা লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণপ্রকাশাত্মা শমদমাদি স্বভাববিশিষ্ট সিত। ক্ষত্রিয় রজোগুণপ্রবৃত্ত্যাত্মা শৌর্য্যতেজঃ প্রভৃতি স্বভাবযুক্ত লোহিত। বৈশ্য কৃষ্যাদি হীনকর্ম্ম-প্রবর্ত্তক রজস্তমোব্যামিশ্র পীত। শূদ্র আবরণাত্মা তমোগুণ-যুক্ত স্বতঃপ্রকাশপ্রবৃত্তিহীন অপরচালিত শকটবৎ কৃষ্ণ বা অসিত। পরহিংসা ও মিথ্যাপ্রিয় লোভী হইয়া সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিগণ তমোগুণ বশতঃ সংস্কার-বর্জ্জিত অশুচিসম্পন্ন হইয়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইতে শূদ্রতা প্রাপ্ত হন। এইসকল হীন-কর্ম্মপ্রভাবেই ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে পৃথক্ হইয়া ক্ষত্রিয়াদি অন্যবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সকল জীবই নিত্যধর্ম্ম সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ অথবা সত্ত্বগুণ-প্রকাশাত্মা; তিনিই সিত বা সত্ত্বগুণী হইয়াও অপর ধর্ম্ম রজোযোগে লোহিত, আবার সত্ত্বহীন রজোগুণী লোহিত অপর তমোযোগে পীত এবং সত্ত্বরজোহীন তমোগুণী অসিত বর্ণতা লাভ করেন। যিনি বর্ণ ধারণ করিয়া বিভিন্ন বর্ণ বলিয়া পরিচিত হন, তিনিই বর্ণান্তর গ্রহণ করায় তাঁহার বর্ণ বা গুণানুসারে বর্ণান্তর নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই বর্ণবিভাগের মূলে বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে ব্রাহ্মণ অবস্থিত।

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে (১০।৯০।১১) ব্রাহ্মণ-বিভাগের কথা পরিদৃষ্ট হয়। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ-সংহিতা (৭।১।১।৪), শুক্লযজুর্ব্বেদ-সংহিতা (১৪।২৮), অথর্ব্ববেদ (১৫।১০।১) এবং (১৯,৬,৬), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১।২।৬।৭ এবং ৩।১২।৯।৩) এবং শতপথ-ব্রাহ্মণ (২।১।৪।১৩) প্রভৃতি নানাস্থানে ব্রাহ্মণোৎপত্তির কথাও দেখা যায়।

ব্রাহ্মণবিত্ত নিরবচ্ছিন্ন অষ্টচত্বারিংশ সংস্কারবিশিষ্ট দ্বিজের পুত্রকে ব্রাহ্মণ করিবার যে বিধান আছে, তাহাতে শৌক্র-পারম্পর্য্যক্রমে সংস্কার প্রদত্ত হইয়া

ব্রাহ্মণ স্বীকৃত হয়। ব্রাহ্মণের পুত্রের ব্রাহ্মণ হইবার যোগ্যতা আছে জানিয়া "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত" অর্থাৎ "ব্রাহ্মণকে অষ্টমবর্ষে উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করাইবে" এরূপ শ্রুতিবাক্য আছে। গোভিলীয় গৃহ্যসূত্রেও "গর্ভাষ্টমেষু ব্রাহ্মণং উপনয়েৎ" বিধান দৃষ্ট হয়। ষোড়শ বর্ষকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের উপনয়নকাল। তাহা অতীত হইলে আর ব্রাহ্মণের উপনয়ন দিবে না। উপনয়নের নির্দ্দিষ্টকাল গত হইলে পতিত সাবিত্রীক হয়। ইহারই 'ব্রাত্য' সংজ্ঞা। ব্রাত্যকে উপনয়ন দিবে না, তাহাকে বেদধ্যয়ন করাইবে না, তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিবে না। স্মৃতি বলেন,—

গৃহোক্তকর্ম্মণা যেন সমীপং নীয়তে গুরোঃ।
বালো বেদায় তদ্‌যোগাৎ বালস্যোপনয়ং বিদুঃ॥

বৈদিক গৃহ্যবিধানক্রমে যে অনুষ্ঠানদ্বারা বেদাধ্যাপক আচার্য্য গুরুর সমীপে বেদাধ্যয়নের জন্য বালককে লইয়া যাওয়া হয়, সেই অনুষ্ঠানকেই বালকের উপনয়ন বলে। জ্ঞানের উন্মেষের পূর্ব্বে বেদাধ্যয়ন কার্য্যের উপযোগিতা নাই, তজ্জন্যই উপনয়নের পূর্ব্বে যে-সকল সংস্কার আবশ্যক, তাহার অনুষ্ঠান-কাল অভাবপক্ষেও সাত বৎসর লাগে। অধ্যাপনের জন্য আচার্য্য-সমীপে আট-বৎসরের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ বালককে লইয়া যাওয়া বিহিত নহে। মাতাপিতার গৃহ হইতে অন্যত্র গুরুগৃহে সেই শিশু কালে বাসের সম্ভাবনা নাই। গৃহ্যবিধানানন্তর বেদাধ্যয়নকালেই ব্রাহ্মণ শ্রৌতবিধান-গ্রহণে সমর্থ হন। পরিশেষে যজ্ঞ-দীক্ষায় দীক্ষিত হইবার অবকাশ লাভ করেন। যদি ষোড়শবর্ষের মধ্যে ব্রাহ্মণগণকে গুরুগৃহ বাসের জন্য প্রেরণ-সম্ভাবনা না থাকে এবং ব্রাহ্মণবটুর অধ্যয়ন করিবার কোন ইচ্ছা বা রুচি না থাকে, তাহা হইলে তিনি নিজ রুচিবলেই উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে অভিলাষ করেন না জানিতে হইবে। জড়ভরতের আখ্যান হইতেই জানা যায়, নিরবচ্ছিন্ন সংস্কারবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি কর্ম্মসংস্কার-গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইবার রুচি না থাকিলে ব্রাহ্মণবংশজাত বালক আদৌ সংস্কার গ্রহণ-পূর্ব্বক গুরুগৃহে যাইতেই অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড-পদ্ধতিতে অগ্নিই সংস্কারের আদি উপাদান। এই কর্ম্মকাণ্ড-পদ্ধতি ভাবী উদ্দেশ্যের জন্য ভব্য-প্রস্তাবমাত্র, কিন্তু ফলকালে বৈষম্যের সম্ভাবনা। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

———

নিষ্ঠার সহিত চাতুর্ম্মাস্যাদি ব্রতপালন ও কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট হইবার উপদেশ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ
বংশটীলা
পোঃ মথুরা (মথুরা)।
ইং ৩০।১।৬২

স্নেহাস্পদেষু—

* * *। * * * ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার সময় তুমি গিয়া ঘরটী দখল লইয়া আমাদের তরফে বন্দোবস্ত করিলে ভাল হইত। আমাদের লোকজন ঐরূপ বিষয় কার্য্যে অনুপযুক্ত। তোমরা হরিসেবার কার্য্যে ঐরূপ উদাসীন হইলে চলিবে কেন? কার্য্যের সময় অতিক্রম করিয়া গেলে তাহাতে অনেক গোলযোগ উপস্থিত হয়।

* * * সেখানে গোয়ালঘর করিতে দেওয়া হইবে না। * * * প্রভুও * * * প্রভু কি জন্য তোমার বাড়ীতে গিয়াছিলেন? * * * প্রভুর বিচারধারা লোকমুখে যাহা শুনিতেছি, তাহা বেদান্ত সমিতির ভক্তিপ্রচারের অনুকূল নহে। তুমি তাহাতে গা ঢালিয়া দিও না।

কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট না হইলে রাধারাণীর কৃপালাভ করা যায় না। ভগবানের জন্য কষ্টস্বীকার করাই ভক্তির লক্ষণ। সুখ-সুবিধা খুঁজিতে যাওয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ বলিয়া জানিবে। ভগবৎসেবা সর্ব্বতোভাবে করা আবশ্যক।

তোমাদের ঐদিকে চাতুর্ম্মাস্যাদি ব্রতের পরিপন্থীরূপে অনেকে আরাম খুঁজিয়া বেড়ায়। ইহা শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বীয় আচরিত প্রচারের বিরুদ্ধ। তুমি এইসব কার্য্যের অনুমোদন ও প্রশ্রয় দিবে না। হরি-ভক্তিবিলাসের বিধি সমস্তই গৃহস্থব্যক্তিগণের অবশ্য পালনীয়। হরিভক্তি-বিলাস কাহাদের জন্য লেখা হইয়াছে, তাহা শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভে মুখবন্ধেই লিখিয়া দিয়াছেন। গৃহস্থ ভক্তগণের অনেক পরিশ্রম করিতে হয়, এইরূপ অছিলায় ব্রতাদি পালন না করা অত্যন্ত অন্যায় ও অপরাধজনক। বেদান্ত সমিতির বৈশিষ্ট্য কখনও নষ্ট করা উচিত নহে। শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্রতাদি পালনে পরাঙ্মুখ হইলে উহা কখনও আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইবে না। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রীল ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৭ পৃষ্ঠার পর]

আমি বাংলাদেশের ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিং, দিনাজপুর, খুলনা, যশোহর প্রভৃতি স্থানে প্রচারে গিয়েছিলাম। একজন মুসলমান আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন,—মহাশয়! ভগবান্ ভগবান্, হরি হরি করছেন; আমরাও আল্লা আল্লা করছি, কিন্তু তাঁকে ত' দেখা যায় না। তিনি কোথায় আছেন, তাঁকে কি করে চিনব? আপনি কি চোখে দেখেছেন?—কি উত্তর দেব? আমি উত্তর দিলাম—হ্যাঁ দেখেছি। লণ্ডনে একটা Play হচ্ছে, তোমার এখানে এইটুকু একটা T. V. বাক্স, তুমি সেই Playটা এখানে দেখছ কি করে? লণ্ডন থেকে ছবিগুলো এল কি করে? Ether-এর সাহায্যে সেখানে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার ফলে তুমি এখানে সেই বিষয়বস্তুগুলো দেখছ। তুমিও তোমার মনটাকে T. V. কর, দেখবে গোলোক থেকে ভগবান্ এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তুমি তাঁকে দেখতে পাবে। At that time you can realise—তুমি উপলব্ধি করতে পারবে; এ ব্যবস্থা ছাড়া উপলব্ধি করতে পারবে না।

কেউ একটা যুবতী নারীকে ভালবাসে। সে এখানে নাই, বোম্বেতে আছে। বোম্বেতে থাকলেও তার অন্তরে আছে। ভগবানকে যদি সেইরকম প্রীতি করতে পার, তাহলে ভগবান্ গোলোকে থেকেও তোমার হৃদয়ে থাকবেন। ভগবান্ নিজে বলেছেন,—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমি সাধুগণের হৃদয়। সাধু আমাকে ছাড়া কাউকে জানে না, আমিও সাধুকে ছাড়া কাউকেও জানি না। সে কি? তুমি সাধুর হৃদয়ে রয়েছ বলছ, কিন্তু তুমি ত' প্রতি জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে রয়েছে বলেছ। হ্যাঁ আমি অন্তর্যামিরূপে রয়েছি। সে দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছে, তার দুঃখ-কষ্ট দেখে আমি কষ্ট পাই। কিন্তু আমি যে ভক্তের হৃদয়ে থাকি আমি কষ্ট পাই না, আনন্দ পাই। তার সেবাময় চিত্তবৃত্তি দেখে আমি আনন্দ লাভ করি। শাস্ত্র বলেছেন,—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

দেবতাকে যেমন দেখছি, গুরুকেও তেমন দেখতে হবে; কোন অংশে কম নয়।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তি-লতা বীজ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ॥

কৃষ্ণ-ভজন করবেন। কৃষ্ণভজন করলে তবে তার মায়াজাল সরে যাবে। তখন সে কৃষ্ণপাদপদ্ম পাবে। তাছাড়া কৃষ্ণপাদপদ্ম পাওয়ার আর কোন উপায় নাই। গুরুকৃপা ব্যতীত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। গুরু কি রকম? রামা-শ্যামা গুরু হতে পারেন না।

"বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥"

"এই ছয় বেগ যার সদা বশে রয়।
সে জন গোস্বামী, তারে পৃথিবী পূজয়॥"

'গোস্বামী'-শব্দের দুটো অর্থ। 'গো' মানে গাভী। গাভীর স্বামী অর্থাৎ ষাঁড়। সে হল কামুক। আর 'গো' মানে ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের যিনি স্বামী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে যিনি Control (নিয়মিত) করছেন, তিনি গোস্বামী। তিনি গোদাস—ইন্দ্রিয়ের দাস নন। তিনি পৃথিবী বিজয় করেন। তাঁর সংস্পর্শে গেলে কল্যাণ হবে।

"আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥"
"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"

যিনি নিজের জীবনে আচরণ করে অন্যকে শিখান, তিনি আচার্য্য বা গুরু। শাস্ত্রের সর্ব্বত্র গুরুর প্রাধান্য দিয়েছেন ভগবান্ অপেক্ষা। আমাদের গুরুদেব বলতেন,—ভগবান্ স্বয়ং যদি এসে বলেন যে 'আমিই ভগবান্', তাঁকে বলব—আপনি যেতে পারেন। গুরুদেব যখন এসে বলবেন—দেখ, ইনি ভগবান্, তখন আমি মাথাটা নত করব। "কবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করি' মোরে দেখাইবে।"—কথাটী আছে। কেন গাওয়া হয় "শ্রীরূপমঞ্জরী পদ, সেই মোর

সম্পদ" ? গীতিটী গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে নয় কি ? ভাল করে বুঝতে হবে বিষয়টী। অতএব আচার-প্রচার দুটোরই দরকার আছে।

বর্ত্তমানে শিক্ষাগুরু ও মহান্তগুরু নিয়ে গোলমাল চলছে। অনেকে বলছেন,—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু উভয়েই সমান সম্মাননীয়। আমি স্বীকার করি,—শিক্ষাগুরু সম্মাননীয়, কিন্তু দীক্ষাগুরুর সম্মুখে নয়। চৈত্যগুরু দ্বিধাবিভক্ত হয়েছেন। কিভাবে হয়েছেন ?—শিক্ষাগুরু আর মহান্তগুরু। মহান্তগুরুই একাধারে শিক্ষাগুরু। গুরুদেব কি মন্ত্রটা দিয়ে খালাস হয়ে যাচ্ছেন ? তিনি শিষ্যকে কি শিক্ষা দিচ্ছেন না যে, বাবা ! তুমি এইভাবে চলবে, এইভাবে তোমার জীবনটা পরিচালিত করবে ? অতএব (ক) চৈত্যগুরু শ্রীব্যাসদেব শিক্ষাগুরু, (খ) দীক্ষাগুরুই শিক্ষাগুরু। আর যত শিক্ষাগুরু তাঁরা কি শিক্ষা দেবেন ?—তাঁরা গুরুদেবের আনুগত্যে ভগবানের সেবাশিক্ষা দেবেন। যদি কোন শিক্ষাগুরু গুরুদেবের আনুগত্যে শিক্ষা না দেন, তাহলে তিনি শিক্ষাগুরু নহেন। তিনি কখনও শিক্ষাগুরু হতে পারেন না। কি শিক্ষা দেবেন তিনি ? তাঁর দ্বারা কি কল্যাণ হবে জগতের ? কোন কল্যাণই হতে পারে না। তিনি Procedure টা বলবেন,—বাবা ! এইভাবে চল। পথ দেখাবেন তিনি, তাঁর কাছে যাও। তিনি করুণা করলে পরে ভগবানকে দেখতে পাবে, নচেৎ তুমি ভগবানকে দেখতে পাবে না। সেইজন্য শাস্ত্র বলছেন,—

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"

এই পয়ারটী কেন বলেছেন ? এর মধ্যে একটা বিচার আছে। একদল গুরুকে ভগবৎকৃপা-মূর্ত্তিরূপে দেখছেন। আর একদল গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলছেন। তারা বলছেন—ভগবানের আর মূর্ত্তি দরকার নাই, গুরুকে বসিয়ে দিচ্ছি। এটা আমরা স্বীকার করি না। কেন স্বীকার করি না ? সিদ্ধান্তটা বুঝতে হবে। King and representative of the king. Representative of the king is not a king. রাজার প্রতিভূ এসেছেন, তিনি তাঁর সম্মান পাবেন। রাজা আসেন নাই বলে রাজার প্রতিভূ—Viceroy রাজসম্মানটা পাচ্ছেন, কিন্তু Viceroy রাজা নন। তেমনি ভগবানের প্রতিভূ হলেন গুরুদেব—তাঁর Representative হচ্ছেন গুরুদেব। সেই ভগবান্ নিজেই বলেছেন—"তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্।" আমারই মত গুরু পূজ্য। কেননা, তাঁর কৃপা ব্যতীত তুমি আমাকে পাবে

না। অতএব এই যে গুরুদেব ভগবান্ তিনি হলেন সেবক-ভগবান্, আর ভগবান্ হলেন সেব্য-ভগবান্। গুরুদেব যদি স্বয়ং ভগবান্ হয়ে যান, তাহলে এ শ্লোক হত না।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

তাঁর পাদপদ্ম যিনি দেখিয়ে দেন, তিনি হচ্ছেন শ্রীগুরুদেব। গুরুদেব কি পা-টা বাড়িয়ে দিয়ে বলেন আমি ভগবান্, এইখানে মাথাটা নত কর। কখনও না। অতএব এই বিচারে আমরা গুরুদেবকে দেখি। তিনি সেবক-ভগবান্। তিনি আমাকে ভগবানের পাদপদ্মে পৌঁছে দিবেন। যিনি ভগবানের পাদপদ্মে পৌঁছে দিবার ক্ষমতা, যোগ্যতা রাখেন না, সে গুরুদেবকে আমরা গুরুদেব বলি না। তার উদাহরণ,—

বামনদেব গিয়েছেন বলিরাজের কাছে, ভিক্ষা গ্রহণ করবেন তিনি, দান করবেন বলিরাজ। বামনদেব আগে আগে চলে যাচ্ছেন। ব্রাহ্মণগণ ত' লোভী, তাঁরা বলছেন—একটা বাচ্চা ছেলে আগে আগে চলেছে, কি না কি চেয়ে নেবে, শেষে আমরা কিছু পাব না। তাই বামনদেবকে ধরে পিছনে করে দিয়েছেন। যখন ব্রাহ্মণগণ বলির কাছে পৌঁছেছেন তখন দেখেন বামন লোকটী বলিরাজের নিকট দাঁড়িয়ে আছেন। তখন বলছেন,—হায়! হায়! একে ত' পিছনে ফেলে আসলাম, এ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, ব্যাপারটা কি রকম! বলিমহারাজ বলছেন,—আপনি কি চান? বললেন—আমি কিছু চাই না, আমার পায়ের ত্রিপাদ ভূমি আমি চাই। তখন ব্রাহ্মণগণ নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন। বাবা! তুই বেশী চেয়ে নিবি, না—তোর পায়ের ত্রিপাদ ভূমি নিবি। তোর পায়ের তিনপাদ ভূমি আর কতটুকু? বোকা কোথাকার! তখন বলি মহারাজ বলছেন,—আপনি নিজের স্বার্থটা বুঝছেন না ত', বেশী কিছু চান, আমি দিয়ে দেব। না, আমার বেশী কিছু দরকার নাই, ত্রিপাদ ভূমি হলে চলবে।

এমন সময় গুরু শুক্রাচার্য্য এসে উপস্থিত হয়েছেন। যে সে গুরু নন তিনি। শক্তি আছে তাঁর। এসে বলছেন—করছ কি তুমি বলি! বলি বললেন,—আমি দান করছি। এঁকে চেন তুমি?—আজ্ঞে না। স্বয়ং ভগবান্। তোমার সব কিছু নিয়ে নেবে, কিছু থাকবে না। তার মানে আজকালকার গুরুদেব বলছেন,—তোর যদি সব নিয়ে নেয় তাহলে আমি খাব কি? তাঁর চলবে কি করে? বলি মহারাজ বললেন,—বলেন কি,

উনি ভগবান্! বললেন—হ্যাঁ। তাহলে ত' খুব ভাল কথা, আমার দুইদিক্ থেকে লাভ। ভগবান্ যদি হন তাহলে তিনি সব নেবেন, আর যদি ভগবান্ না হন তাহলে ত্রিপাদ ভূমি নেবেন। আমার কোনদিকে ঠকা নয়।

তখন নিয়ম ছিল—কমণ্ডলুতে জল নিয়ে ওঁ বলে দান করতে হত। বলিরাজ কমণ্ডলু থেকে জল নিতে যাচ্ছেন, জল পড়ছে না। তখন বামনদেব বলছেন,—শলাকা দিয়ে নল পরিষ্কার করে দাও। শলাকা ব্যবহারের পর শুক্রাচার্য্য কাণা হয়ে কমণ্ডলুর নল থেকে বেরিয়ে এলেন। এখানে শুক্রাচার্য্যকে 'কাণা' বলছেন কেন?—

'শ্রুতি-স্মৃতি উভে নেত্রে' শ্লোকে শ্রীবামনের দুটো নেত্র—শ্রুতি ও স্মৃতি। শ্রুতি হচ্ছেন মা। মা যেমন বাবার পরিচয় দেন—ঐ তোর বাবা, বাবাকে দেখে নাই ছেলে, কি বুঝবে বাবাকে, মা বলে দেন। তদ্রূপ শ্রুতি হল বেদমাতা, আর স্মৃতি বলে দেন—কি করে বাবার সেবা করতে হয়। ইনি (বামনদেব) যে ভগবান্ সেটা শুক্রাচার্য্য বলে দিচ্ছেন, কিন্তু তাঁর সেবা করতে দিচ্ছেন না। এইজন্য কাণা বললেন। বলিরাজ কিন্তু শুনলেন না, বললেন তোমার কথা আমি শুনব না, দান করবই। এই বলে গুরুকে পরিত্যাগ করলেন।

বামনদেব দুপায়ে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল নিয়ে নিলেন। কোন্ গুরু আছেন, এখন যারা ভগবানের মূর্ত্তি রাখেন না, নিজেরা ভগবান্ সেজে বসেছেন, সেই গুরু এখান থেকে পুরীর মন্দির পর্য্যন্ত পা-টা বাড়িয়ে দিন দেখি। তাহলে আমি সব ছেড়ে দিয়ে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করব। শুধু তাই নয়, যখন বলি মহারাজকে বললেন আমার আর এক পায়ের দান দাও, আর এক পা তাঁর কোথায় তখন? তিনি আর একটা পা বের করে দিলেন। কই কেমন গুরুদেব দেখি ত' তৃতীয় একটা পা বের করে দিন—যে সব গুরুরা আজকাল ভগবান্ সেজেছেন। ক্ষমতা আছে? আমাদের সিদ্ধান্ত হল—গুরু ভগবান্, কিন্তু গুরু—সেবক-ভগবান্। সেব্য বস্তুকে দিবার জন্য তিনি এসেছেন। গুরু ছাড়া কেউ ভগবানকে দিতে পারেন না, কারও ক্ষমতা নাই। এইটাই হল বিচার ও সিদ্ধান্ত। এই বিচারটাই নিতে হবে আমাদের। (ক্রমশঃ)

———

জন্মান্তরবাদ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬০ পৃষ্ঠার পর]

পাশ্চাত্ত্যধর্ম্মের একজন্মবাদীরা বলেন,—"একজন্মবাদ স্বীকার না করিলে মানব ইহজন্মেই ভগবানের প্রতি অনুরক্ত হইবে না।" কিন্তু আমাদের প্রাচ্য ভূমিতে নাস্তিক চার্ব্বাক্ ব্যতীত আর সকলেই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন, এমনকি বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়েও জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্যদেশের 'পেসিমিজম্' (Pessimism) বা 'নির্ব্বাণবাদধর্ম্ম' বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের সদৃশ হইলেও জন্মান্তরবাদ বিষয়ে তাহাদের মধ্যে বিরাট্ পার্থক্য বিদ্যমান। পাশ্চাত্ত্যদেশীয় পেসিমিজম্ এবং ভারতীয় জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম—উভয়ই জড়নির্ব্বাণবাদ হইলেও পেসিমিজম্‌কে একজন্মগত জড়নির্ব্বাণবাদ, আর বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মকে বহুজন্মগত জড়নির্ব্বাণবাদ বলা যাইতে পারে। সপেনহুয়ার, হার্টম্যান প্রভৃতি একজন্মগত জড়নির্ব্বাণবাদী। বৌদ্ধরা বলেন,—"বহু জন্মে দয়া-বৈরাগ্যাদি-গুণ অভ্যাস করিতে করিতে শাক্যসিংহ প্রথমে বোধিসত্ত্ব প্রাপ্ত ও অবশেষে বুদ্ধ হইয়াছিলেন।" জৈনগণ বলেন,—"সদ্‌গুণ-দয়া-বৈরাগ্যাদি অভ্যাস করিতে করিতে বহু জন্মে জীবের ক্রমগতি অনুসারে নারদত্ব, মহাদেবত্ব, পরবাসুদেবত্ব, চক্রবর্ত্তিত্ব ও অবশেষে পূর্ণ নির্ব্বাণ লাভ হয়।" যাঁহারা জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে গোঁজামিল দিতে হয়।

খ্রীষ্টান ও মুসলমান—ধর্ম্মের ঈশ্বর ও আল্লা নিষ্ঠুর ও কুবিচারক

খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্ম জন্মান্তর স্বীকার করেন না, কিন্তু স্বর্গাদি লোকান্তর স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—"পরমেশ্বর বিচার করিয়া জীবের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে দেহান্তে পুণ্যবান্‌কে অনন্ত স্বর্গে ও পাপীকে অনন্ত নরকে প্রেরণ করেন। তবে এমন হইতে পারে যে, পাপ ও পুণ্যের তারতম্যানুসারে যাহার পরিমাণ অল্প, অগ্রে সেই লোকে বাস করিয়া পশ্চাৎ অনন্ত নরকে বা অনন্ত স্বর্গে যাইবে।" ইহাতে ঈশ্বর বা আল্লার প্রতি ঘোরতম নিষ্ঠুরতা ও অবিচার আরোপ করা হয়। কেননা, পরিমিত কাল, কোটী কোটী যুগ হইলেও অনন্তকালের তুলনায় কিছুই নহে। অনন্ত-কালের তুলনায় জীবের জীবনকাল কতটুকু? যাঁহাকে 'দয়ার সাগর' বলি,

তিনি যে এই অল্পকাল পরিমিত মনুষ্যজীবনে কৃত পাপের জন্য অনন্তকাল স্থায়ী দণ্ডবিধান করিবেন, ইহার অপেক্ষা অবিচার ও নিষ্ঠুরতা আর কি আছে? এ যেন "স্নেহময়ী জননী তাঁহার সন্তানের বুকের রক্ত পান করিতেছেন"—এইরূপ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে—পরমেশ্বর নিষ্ঠুর নহেন, তিনি অত্যন্ত দয়াময়।

খ্রীষ্টানধর্ম্মে প্রকৃতপক্ষে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত

জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া অধ্যাপক সাদার্সের প্রশ্নের উত্তরে জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ যাহা বলিয়াছিলেন (শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ-গ্রন্থে লিখিত) তাহা নিম্নে সবিস্তারে বর্ণনা করা হইতেছে,—

"গীতাশাস্ত্র বৈষ্ণব-দর্শন হইতে পৃথক্ নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে জন্মান্তরবাদের যথার্থ তাৎপর্য্যের পরিপূর্ণতা প্রকাশিত হইয়াছে। জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হইলে লোকে পর পর জন্মের অস্তিত্বের আশায় বর্ত্তমান জন্মে পাপপ্রবৃত্তির সঙ্কোচ করিবে না অর্থাৎ বর্ত্তমান জন্মে যথেচ্ছ পাপাচরণ করা যাউক, পরবর্ত্তী জন্মসমূহে সেই সকল অসুবিধা ও অন্যায় পূরণ করিয়া লইতে পারিব,—এইরূপ বিচার গৃহীত হইয়া যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে জন্মান্তর অস্বীকার করা হয়, তাহা ভাগবতের "এই মানবজন্মেই জীবন থাকিতে থাকিতে ঐকান্তিকভাবে ভগবদনুকূলের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা"র উপদেশের দ্বারা আরও পরিপূর্ণতম বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রণালীতে সার্থকতা মণ্ডিত হইয়াছে। জন্মান্তরবাদ অস্বীকার করায় যে, জড় সর্ব্বৈকবাদরূপ সর্ব্বগ্রাসী বিপদ মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, তাহা ভাগবতের বিচার অবলম্বন না করিলে কখনও অতিক্রম করা যায় না। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের অনেকে জন্মান্তরবাদ অস্বীকার করিলেও, মনীষিগণ খ্রীষ্টধর্ম্ম জগতেই জন্মান্তরবাদ স্বীকারের বহু উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। 'বাইবেল' ধর্ম্মগ্রন্থের সেণ্ট জনের সুসমাচারে উক্ত হইয়াছে,—"And as Jesus passed by, he saw man who was blind from his birth. And his disciples asked him saying,—"Master, who did sin? This man or his parents? That he was born blind." (St. John 9, 1-2) অর্থাৎ "যখন যীশুখ্রীষ্ট চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি একটী জন্মান্ধ মানুষকে দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভো, কে পাপ করিয়াছে? এ ব্যক্তি, না—ইহার মাতা-পিতা? যাহার ফলে এ ব্যক্তি অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।"

খৃষ্টীয় উপদেশকগণ যাঁহারা 'Christian father' আখ্যায় অভিহিত হইতেন, তাঁহারাও স্পষ্টভাবে জন্মান্তরবাদের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। Origen বলিয়াছেন,—"Is it not more in conformity with reason that every soul for certain mysterious reasons is introduced into a body and introduced according to its deserts former actions?" (Origen Contra Celscea, I. XXXII).

"I am sure that I, such as you, see me here, have lived a thousand times and I have to come again another thousand times."—Goethe

অর্থাৎ—"প্রত্যেক আত্মা যে প্রাক্তন কর্ম্মবশে এবং নিজ উপযুক্ততা-অনুসারে কোন রহস্যময় কারণাধীনতায় শরীর বিশেষে প্রবিষ্ট হয়, একথা কি বিবেক অধিকতর দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে না? আপনারা আমাকে দেখিতেছেন; কিন্তু আমি নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলিতেছি যে, এই আমারই সহস্র জীবন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং আমাকে আরও সহস্রবার আসিতে হইবে।"

গ্রীকগণ যাহাকে 'Metemphychosis' বলিলেন বা ইংরেজী ভাষায় যাহাকে 'Transmigration' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা হয়, সেই জন্মান্তরবাদ এককালে প্রাচীন গ্রীস, মিশর ও পাশ্চাত্য দেশের অনেক স্থানেই ন্যূনাধিক স্বীকৃত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন,—মহাত্মা যীশুখ্রীষ্টের প্রচারকগণ জন্মান্তরবাদের সহিত তাঁহাদের অনেক পূর্ব্বাপর সিদ্ধান্তের সমাঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারায় জন্মান্তরবাদকে অস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি খৃষ্টধর্ম্মের কোন যুক্তিবাদী কোন সুযুক্তিদ্বারা জন্মান্তরবাদ অস্বীকার করিতে পারেন নাই, অধিকন্তু অনেকে স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন। হেরোডোটস্, পিণ্ডার, প্লেটো প্রভৃতি সকলেই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের প্রধান বৈজ্ঞানিক হাক্সলি তাঁহার "Evolution and Ethics"-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"None but very hasty thinkers will reject it on the ground of inherent absurdity like the doctorine of evolution itself that of transmigration has its root in the world of reality and it may claim such support as the great argument of 'Analogy' is capable of supplying".

অর্থাৎ "চঞ্চল অবিবেচকগণ ব্যতীত অন্য কেহই জন্মান্তরবাদকে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিবে না। বিবর্ত্তনবাদ বা ক্রমবিকাশবাদের ন্যায় জন্মান্তরবাদেরও বাস্তব জগতে দৃঢ় মূল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং ইহা উপমান-প্রমাণের দৃঢ় যুক্তিদ্বারাও সমর্থিত হইতে পারে।"

অধ্যাপক লুটোলস্কি (Lutolawski), গেটে (Goethe) প্রভৃতি মনীষিগণ জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। লুটোলস্কি বলিয়াছেন,—"I cannot give up my conviction of a previous existence on earth before my birth and that I have the certainty to be born again after my death, until I have assimilated all human experience, having been many times male and female, wealthy and poor, free and enslaved generally having experienced all conditions of human condition."—"আমার জন্মের পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে আমার পূর্ব্ব অস্তিত্ব ছিল এবং আমাকে যে নিশ্চয়ই মৃত্যুর পরে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে এবং যে পর্য্যন্ত নিখিল মানবীয় অভিজ্ঞতা আমার দ্বারা পরিপক্কভাবে সংগৃহীত না হইবে এবং সেই সকল অভিজ্ঞতায় বহুবার পুরুষ, স্ত্রী, ধনী, দরিদ্র, মুক্ত, বদ্ধরূপ সর্ব্ববিধ অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া মানবীয় সমগ্র জ্ঞাতব্য আমার দ্বারা সঞ্চিত না হইবে, সেই পর্য্যন্ত আমার জন্মের বিরাম হইবে না—এই সুদৃঢ় বিশ্বাস আমি কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারি না।"

পাশ্চাত্ত্য অভিজ্ঞতাবাদিগণের এইরূপ জন্মবাদ্ বা Franciscus Mercurious Helmot (1618-1699) Leichtenburg (1742-1799) Lessing (1780) Herder (1791) Schopenhauner (1760-1788) প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণের জন্মান্তরবাদ কিংবা পারস্যদেশের জালালুদ্দিন রুমী নামক সুফী সম্প্রদায়ের লেখক, কিংবা থিয়সফি সম্প্রদায়ের জন্মান্তরবাদ বা ভারতীয় ন্যায় দর্শনের "প্রেত্যাভ্যাসকৃতাৎ স্তন্যাভিলাষাৎ" সূত্রানুযায়ী জন্মান্তরবাদ কিংবা বৌদ্ধগণের জড়নির্ব্বাণবাদে বহু জন্মান্তরবাদ নানাপ্রকার বিরুদ্ধ যুক্তির দ্বারা আক্রমণযোগ্য এবং অধিরোহবাদ জাত হওয়ায় অসম্যক্ ও অসম্পূর্ণ।

শ্রীহরিভজনই—জন্মান্তরের হস্ত হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়-স্বরূপ

সনাতন শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ-বেদান্ত জন্মান্তর নিরোধের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ উপায়

নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। জীব নিজ-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত পৃথিবীতে তাঁহার আসা-যাওয়ার রেশ থামিয়া যায় না। 'কৃষ্ণের নিত্যদাস' জীব কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করিলেই মায়াপিশাচী তাঁহাকে জন্মান্তরের ফাঁদে ফেলিয়া ঘুরপাক খাওয়াইতে থাকে। জীবাত্মা স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে লিঙ্গদেহে আশ্রিত হন। জীব লিঙ্গদেহ আশ্রয় করিয়া স্থূলদেহ পরিত্যাগ করেন এবং চৌদ্দ ভুবনে ঘুরপাক খাইতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে,—

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস'—এই কথা ভুলে
মায়ার নফর হইয়া চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু সুখী, কভু দুঃখী, কভু কীট, ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

রোগের কারণ জানিয়া সুচিকিৎসক রোগীর চিকিৎসা করিলে যেরূপ রোগ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ সাধু-গুরু ভবরোগাক্রান্ত জীবকে ভবরোগনাশক শ্রীহরিনামামৃত পান করাইয়া জন্মান্তরের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। এই প্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু বৈষ্ণব-দার্শনিক শিরোমণি শ্রীল জীব গোস্বামীর লেখনীর দ্বারা জানাইয়াছেন যে, ভগবৎসেবায় দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানের দ্বারাই জীবের সমস্ত পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা বিনষ্ট হয়; ইহজন্মেই শৌক্র, সাবিত্র্য ও ও দৈক্ষ্য—এই ত্রিজন্মান্তর লাভ করিয়া জীব কর্ম্মমার্গীয় জন্মান্তরবাদের বিভীষিকা হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হন। ভগবৎসেবায় দীক্ষিত ব্যক্তির কর্ম্মমার্গীয় জন্মান্তরবাদিগণের ন্যায় জন্মান্তরাপেক্ষা থাকে না, ইহজন্মেই তাঁহাদের ভগবৎ-সেবায় জন্মলাভ হয়, সেই জন্ম অন্য কোন জন্মান্তর-পরম্পরা সৃষ্টি করিতে পারে না। বৈষ্ণবদর্শনে এইরূপ জন্মান্তরবাদের সুষ্ঠু মীমাংসা আছে।"

শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই জীবের চরম প্রয়োজন

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "সনাতন শিক্ষার" নিম্নোক্ত বাক্যগুলি অনুক্ষণ স্মরণপূর্ব্বক জীব শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভয়-পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইবেন।—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৫১)

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

নর-তনু ভজনের মূল

এই ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া দেহধারী জীবগণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোবহুল স্ব-স্ব কৃতকর্ম্মফলে যথাক্রমে দৈবী, মানুষী ও নারকী প্রভৃতি বিবিধ গতিলাভ করিয়া থাকেন; আবার স্ব-স্ব-বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্ম বিষ্ণুতে সমর্পিত হইলে ক্রমে ক্রমে তাহাদের কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভও ঘটে। নিখিল জগতের উদ্ধারকল্পে পৃথিবীতে অবতীর্ণ পরংব্রহ্ম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং গীতার ১৮।৪৫, ৪৬ শ্লোকে জানাইয়াছেন—"মানব নিজ-নিজ-কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইয়া যে-প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিবে, তাহা শ্রবণ কর। যিনি ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে এই জগতে ব্যাপ্ত আছেন, তাঁহার আরাধনা করিলে মানব অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করে। ভক্তিই তৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়—নিখিল শ্রুতি-বেদ-বেদান্তাদির ইহাই নির্দ্দিষ্ট পন্থা।"

জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত সুকৃতিফলে জীবের যে-কালে ভগবদ্ভক্তের প্রকৃষ্ট সঙ্গলাভ হয়, তৎকালে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণের হেতুস্বরূপ কাম্যকর্ম্মাদির মূল যে অবিদ্যাগ্রন্থি তাহা ছিন্ন হয় এবং তৎফলে অধোক্ষজ ভগবানে অহৈতুকী ভক্তির উদয় হয়। এ জন্য দেবতাবৃন্দও এই পুণ্যক্ষেত্র ভারত-ভূমিতে ভগবদ্ভজনোপযোগী মানব-জন্মের প্রশংসাপূর্ব্বক উহা কামনা করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

ভারতবর্ষে ভজনোপযোগী মানব-দেহলাভ-প্রশংসা

"অহো! এই ভারতবর্ষে জাত মানবগণ কি মহাপুণ্যজনক তপস্যাই না করিয়াছিলেন, অথবা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি কোন সাধন ব্যতিরেকেই ইঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন! যেহেতু এই ভারতভূমিতে যে মনুষ্য-জন্মলাভের জন্য আমরা বাসনামাত্রই করিয়া থাকি, ইঁহারা সেই ভারতাঙ্গনে মুকুন্দ-সেবনোপযোগী মানব-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা দুষ্কর যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও দানাদির ফলে যে তুচ্ছ স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছি, উহাতে আর কি ফললাভ হইল? স্বর্গে শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম-স্মৃতি আদৌ সম্ভব হয় না, বরং অতিশয় বিষয়ভোগ-হেতু ভগবৎস্মৃতি একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায়; দ্বিপরার্দ্ধকাল আয়ুষ্মান্ হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ অপেক্ষা অল্পায়ু হইয়া ভারত-ভূমিতে জন্মলাভ শ্রেষ্ঠ; কেননা, ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাবর্ত্তন ঘটে। মর্ত্ত্যবাসিগণের দেহ ক্ষণভঙ্গুর এবং পরমায়ু অল্প হইলেও মনস্বি মানবগণ সেই অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাদের কৃতকর্ম্মসমূহ ভগবান্ হরিতে সমর্পণ করিয়া শ্রীহরির অভয়পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন, সেই স্থান হইতে তাঁহাদের আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। যে-স্থানে ভগবৎ-কথারূপ সুধাসরিৎ প্রবাহিত নাই, যে-স্থানে সেই বৈষ্ণবী-নদী-তটাশ্রিত ভক্ত-ভাগবতগণের অধিষ্ঠান নাই, যে-স্থানে নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি মহোৎসব-সহকারে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে আরাধনা নাই, ব্রহ্মলোক হইলেও সুমেধাগণ সেই স্থান কখনও আশ্রয় করেন না।—

'যেথানে তোমার নাই যশের প্রচার।
যথা নাই বৈষ্ণবগণের অবতার॥
যেথানে তোমার মহামহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই॥
গর্ভবাস-দুঃখ, প্রভু, এহো মোর ভাল।
যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্ব্বকাল॥
তোর পাদপদ্মের স্মরণ নাহি যথা।
হেন কৃপা কর, প্রভু, না ফেলিবা তথা॥'

এই ভারতবর্ষে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং সম্পৎপরিপূর্ণ ভজনোপযোগী মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়াও যে-সকল প্রাণী জ্ঞান-কর্ম্মাদির কষায় পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিযোগাশ্রয়ে যত্নবান্ না হয়, তাহারা বনচর বিহঙ্গের ন্যায় পুনরায় বন্ধনদশা

প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পাশবদ্ধ পক্ষিগণ যেমন কোনপ্রকারে ব্যাধ-কর্ত্তৃক একবার পাশমুক্ত হইয়াও তাহাদের নিজকৃত অনবধানতাদোষে সেই বৃক্ষে বিহার করিতে যাইয়া আবার বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ঐ সকল ব্যক্তি ভারত-ভূমিতে ভগবদ্ভক্তি-লক্ষণরূপ মোক্ষপ্রাপক মনুষ্য-জন্মলাভ করিয়াও নিজ নিজ কর্ম্মদোষে পুনর্ব্বার বদ্ধদশা প্রাপ্ত হয়।

ভগবদ্বিভূতিবুদ্ধিতে বিশ্বরূপোপাসকগণও ধন্য; কেননা স্ব-স্ব অধিকার অনুসারে তাহারা ইন্দ্রাদি বিভিন্ন নামে ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গ তত্তদ্দেবতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বিধি-মন্ত্রাদির দ্বারা যে-সকল হবিঃ পরিত্যাগ করেন, সর্ব্বাঙ্গী ভগবান্ শ্রীহরি পৃথক্ পৃথক্ রুদ্র-ইন্দ্রাদি নামে আহূত হইয়াও কৃপাপূর্ব্বক সেই সকল দ্রব্য হর্ষসহকারে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ-প্রদানে সমর্থ ও স্বয়ং পরিপূর্ণস্বরূপ ভগবান্ হইয়াও তাহা উপেক্ষা করেন না। সামান্য কামনা-বাসনা পূরণের নিমিত্তও যদি কেহ কৃষ্ণভজনে অগ্রসর হন, তাহা হইলেও তদ্‌ভক্ত-সঙ্গফলে তাঁহার পূর্ব্বোদিষ্ট বাসনা দূরীভূত হয়। অজ্ঞ সকাম ভক্তগণ ভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে ভগবান্ তাঁহাদিগের প্রার্থিত বিষয় প্রদান করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু কামনা-উদয়কারী অর্থ তাহাদিগকে কখনও দেন না। যাঁহারা ইতর কামনাবিনাশী তাঁহার পাদপদ্ম পাইবার ইচ্ছা না করিয়াও তাঁহার ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বয়ং স্বীয় পাদপল্লব দিয়া থাকেন।—

"অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলে কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥
কৃষ্ণ কহে,—'আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এ বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ, সেই মূর্খে বিষয় কেনে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥'
'কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি' দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥"

অতএব আমরা সম্যক্ প্রকারে যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য সৎকর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত পুণ্যফলে অধুনা যে স্বর্গসুখাদি উপভোগ করিতেছি, যদি সেই পুণ্যের (সুকৃতির) কিঞ্চিন্মাত্রও অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ভারতবর্ষে আমাদের হরি-স্মরণোপযোগী মানবজন্ম লাভ হউক—ইহাই প্রার্থনা; কারণ

ভগবান্ শ্রীহরি এই ভারতবর্ষে তদ্ভক্তগণের বিশেষভাবে কল্যাণ বিস্তার করিয়া থাকেন।"

এই পবিত্র ভারতক্ষেত্রে মানবজন্ম লাভ বিশেষ সৌভাগ্যের পরিচায়ক। তজ্জন্য ইহা 'সুদুর্ল্লভ' ও 'পরমার্থদ' বলিয়া শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব আত্যন্তিক মঙ্গলের নিমিত্ত আমৃত্যু চেষ্টা ও যত্নই ইহার একমাত্র সফলতা—

এতাবজ্জন্ম-সাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥ (ভাঃ ১০।২২।২৪)
প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ॥ (বিঃ ৩।১২।৪২)

প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা জীবের ভগবদ্বৈমুখ্য অপনোদনপূর্ব্বক তন্মুখীকরণরূপ নিত্যদয়া প্রদর্শনই দেহধারী জীবগণের জন্মসাফল্য। কায়-মন-বাক্যের দ্বারা ইহ-পরকালে প্রাণিগণের নিমিত্ত ভগবদ্ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি উৎপাদন করাই বুদ্ধিমান মনুষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, ভারতভূমিতে জন্মিয়া মানবকে নিত্যদয়া বা কৃষ্ণোন্মুখী করাই, অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া জানাইয়াছেন—'ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার। জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার॥' (চৈঃ চঃ আঃ ৯।৪১)

পবিত্র ভারতবর্ষে নরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের প্রকৃত নিত্য উপকার করাই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র দেশে ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণিমধ্যে শরীর ধারণ করার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ভজনবিহীন মানব জীবন্মৃত ও আত্মঘাতী

মনুষ্য শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—এই দুইটীর যে কোন একটীকে আশ্রয় করিয়া থাকে। আমার নিত্য কল্যাণকে শ্রেয়ঃ এবং আপাত-মনোরম পরিণামে বিষবৎ বিষয়াদি সংগ্রহ-পিপাসাকেই প্রেয়ঃ বলা হয়। ধীর ব্যক্তি ধর্ম্মপথেই সর্ব্বদা বিচরণ করেন, আর বিবেকহীন মন্দবুদ্ধি অনিত্য বিষয় সুখেই মত্ত হইয়া থাকে। লক্ষ লক্ষ জন্মের পর এই মনুষ্য জন্ম লাভ হইয়াছে বলিয়া ইহা দুর্ল্লভ—সুদুর্ল্লভ; অনিত্য নশ্বর হইলেও ইহা ভগবদ্ভজনোপযোগী পরমার্থপ্রদ সুদৃঢ় নৌকাস্বরূপ। সদ্গুরু-কর্ণধার লাভ করিয়াও যে মানব এই সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করেন না, তিনি 'আত্মঘাতী' শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। ভগবদ্ভজন বা ভগবৎসেবাই আত্মার নিত্যা বৃত্তি; সেই স্বতঃসিদ্ধ চিন্ময় নিত্যবৃত্তিকে স্তব্ধীভূত

করাই আত্মহত্যা বলিয়া শাস্ত্রাদিতে উক্ত হইয়াছে। ভক্তিবৃত্তিই সেই আত্মহত্যা হইতে জীবকে নিবৃত্তি করিয়া চেতনরাজ্যে স্থাপনপূর্ব্বক পরমশান্তি দান করিতে সমর্থ। ফলভোগী ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী কর্ম্ম-জ্ঞানাদি কষায়ে আবদ্ধ হইয়া ভক্তির পরমশোভা দর্শনে অসমর্থ।

সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যে তজ্জন্য কোনস্থলে প্রবৃত্তিমার্গের উপদেশ লক্ষ্য করা যায় না। সদ্‌বৈদ্য ভব-রোগীর নিমিত্ত কখনই কুপথ্যের ব্যবস্থা করেন না। ইহসংসারে মানবগণের কর্ম্মাদি ধর্ম্মোদ্দেশ্যে—শ্রীহরির প্রীতির নিমিত্ত—কৃষ্ণার্থে অখিলভোগ-ত্যাগ উদ্দেশ্যে কৃত না হইলে তাহাদের প্রাণধারণ বৃথা অর্থাৎ শাস্ত্র তাহাদিগকে 'জীবন্মৃত' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বিষয়ভোগ বা ইন্দ্রিয়-তর্পণই জীবের প্রাণধারণের একমাত্র লক্ষ্য নহে; ভগবৎ-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন হওয়া উচিত; নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারাও সেই তত্ত্বলাভের সম্ভাবনা নাই। স্বভাবতঃ কর্ম্মজড়গণ বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানের আবাহনপূর্ব্বক নিজদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেও, বস্তুতঃ কর্ম্মাগ্রহিতা ভগবদুদ্দেশ্যে প্রদর্শিত না হওয়ায় উহা নিরর্থক হইয়া পড়ে—উহাই বন্ধনের কারণ হয়। জ্ঞান-যোগাদি চেষ্টা ভক্তিপথের বিঘ্নস্বরূপ; ভক্তগণ কখনই উহাতে বৃথা কালক্ষেপ করেন না। গৃহমেধিগণ তুচ্ছ সংসারসুখে মগ্ন হইয়া তাহাতে কখনই পরিতৃপ্ত হয় না, তথাপি উহাই তাহাদের একমাত্র কাম্য। একাদশেন্দ্রিয় সব সময়ে ভোগোন্মুখী জীবকে বিষয়ভোগে আকর্ষণ করিয়া বিব্রত করিতেছে। মানবের তাহা হইতে উদ্ধারের কোনরূপ চেষ্টা-যত্ন বা আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না, বরং সে অধিকতর উৎসাহের সহিত উহাতেই রুচিবিশিষ্ট। এ দুর্ল্লভ মানব-জন্ম বা নর-তনুদ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে শ্রীভগবানের সেবা বা তন্নাম-রূপ-গুণাদি কীর্ত্তনই হইার সার্থকতা। যদি ভগবদ্ভজন বা হরিসেবা না হয়, তবে এ শরীর ধারণ বৃথা; ইহাকে ভারবাহী বলীবর্দ্দের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বিষ্ণুবৈষ্ণব-দর্শন ও তাঁহাদের সেবা ব্যতীত মানব-দেহ শবতুল্য। ভগবানের অভয় শ্রীপাদপদ্মে শরণ না লওয়া পর্য্যন্ত মানব দেহমনোধর্ম্মে আসক্ত হইয়া ভয়-শোকাদিতে অভিভূত হয়। এই জড়াসক্তিই বা পক্ষান্তরে ভগবৎ-বিস্মৃতিই তাহার সংসার দশার মূল কারণ।—

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥"

পরমপিতা শ্রীভগবানের সেবাই জীবস্বরূপের ধর্ম্ম। "অমৃতের সন্তান" জীবগণের শ্রীকৃষ্ণভজন ও তাহাতে ভক্তিবিধানই শ্রেষ্ঠ কৃত্যরূপে নিরূপিত

হইয়াছে। প্রাকৃত জগতের মাতাপিতার সেবায় অনিত্য পিতৃলোকাদি, দেবতাদির আরাধনায় নশ্বর দেবলোক ইত্যাদিই প্রাপ্তি হয়, কিন্তু ভগবদ্-যাজিগণ নিত্য শাশ্বত স্থানে অধিষ্ঠিত পরাৎপর তত্ত্বকে লাভ করিয়া ধন্য হন।—

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥
সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়।
কৃষ্ণ-গুরু নাহি মিলে, ভজহ হিয়ায়॥"
"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে তারা রৌরবে পড়ি' মজে॥"

এ সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা আমরা জানিতে পারি, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন বিনা মনুষ্যের জীবন এবং সেবা-বঞ্চিত-অবস্থাও নিরয়প্রাপিকা। তজ্জন্য বৈষ্ণব-মহাজন "মনঃশিক্ষা" পদাবলীতে মানবদেহধারী জীবগণের উদ্দেশ্যে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন।—

"এ মন! আর কি মানুষ হবে?
ভারত-ভূমেতে, জনম লভিয়ে, কি কাজ করিলি কবে॥
এ মন! কি লাগি আইলি ভবে।
এমন জনমে, 'হরি' না ভজিলি, সে তুই মানুষ কবে॥
মানুষ-আকার, হইলে কি হয়, করহ ভূতের কাম।
নহিলে বদনে, কেন না বলহ, 'শ্রীকৃষ্ণ' 'গোবিন্দ' নাম॥
পাখীরে যে নাম, লওয়াইলে লয়, শারী-শুক আদি কত।
তুমি যে ইহাতে, আলস্য করহ, এ হয় কেমন মত॥
দিবস-রজনী, আবোল-তাবোল, পচাল পাড়িতে পার।
তাহার ভিতরে, কখন কেন কি, 'গোবিন্দ' বলিতে নার॥
ভজিব বলিয়ে, কহিয়া আইলি, ভুলিলি কি সুখ পাইয়ে।
বুঝিনু আবার, শমন-নগরে, নরকে মজিবি যাইয়ে॥
বদন ভরিয়া, 'হরি' বল যদি, ক্ষতি না হইবে তায়।
কহে 'প্রেমানন্দ', তবে যে নিতান্ত, এড়াবে কৃতান্ত দায়॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭৭ পৃষ্ঠার পর]

শাস্ত্র কাকে বলেছেন ?—Constitution। ভারতবাসী আমরা, ভারতবর্ষে বাস করি, Indian Constitution মেনে নিয়েছি। কেন ?—আইনের সুযোগ-সুবিধাগুলো পাব বলে। শাস্ত্র হচ্ছেন—Spiritual Constitution। আমার আত্মসমর্পণের যে প্রচেষ্টা, সেটা যদি আমি চাই তাহলে আমাকে শাস্ত্র মানতে হচ্ছে। যেমন সন্তানের অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য পিতামাতা, Guardian কে মেনে নিতে হয় তদ্রূপ। অস্বীকার করার উপায় নাই। যিনি Constitution করেছেন প্রজাশাসনের জন্য, আইন-কানুন, নীতি-আদর্শ সব সংরক্ষণ করেছেন, তাঁকেও মেনে নিতে হচ্ছে আমাদের। যদি কেহ বলেন—তিনি কিছু নন, তাহলে কোথা থেকে হল ওটা ? যিনি মূল নীতি-আদর্শের ধারক-বাহক তাঁকে বলা হয়েছে ভগবান্। তাঁকে মেনে নিতে হচ্ছে। তাঁকে বলছে নীতি-হীন, দুর্নীতিপরায়ণ। মুস্কিল ত' সেখানে। পুত্র-কন্যা-সন্তান যদি পিতা-মাতাকে বলে আমার পিতামাতা দুর্নীতিপরায়ণ, তাহলে দুর্নীতিপরায়ণ পিতা-মাতার সন্তান সুনীতিপরায়ণ কি করে হতে পারে ? যুক্তি দিয়ে আপনারা বিচার করবেন। শাস্ত্রযুক্তিতে এইরূপ উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হয়েছে।

আমি যদি আমার অস্তিত্ব সংরক্ষণ করতে চাই, ভালমানুষ হতে চাই, আমার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চাই, তাহলে আমার উপরওয়ালাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে হবে। আমি তাঁদের অস্বীকার করতে পারি না। যথাস্থানে সম্মান আরোপ করতে হবে। ইহাই ত' শাস্ত্রের প্রকৃত শিক্ষা। গুরুমুখী বিদ্যা যিনি অর্জ্জন করেছেন, তার কোন অসুবিধা নাই, কোন ভুল বুঝাবুঝি —Misunderstanding হতে পারে না। যেহেতু তত্ত্বদর্শন তার জানা আছে। ভাল-মন্দ দুটো দিক্ তিনি জেনে নিয়েছেন। তত্ত্বদর্শনের ভাল-মন্দ জানা না থাকলে যে কোন মুহূর্ত্তে ভুল হতে পারে। যে কোন মুহূর্ত্তে আমি সৎকে অসৎ, অসৎকে সৎ বলতে পারি। এ দুটোই ত' ভুল। সৎকে সৎ, অসৎকে অসৎ ; চোরকে চোর, সাধুকে সাধু বলাটাই সত্যদর্শন। চোরকে সাধু বলা আর সাধুকে চোর বলা সাম্যবাদ বা সমদর্শন নয়। একে সত্যদর্শন বলা হয় নাই শাস্ত্রে। সমদর্শনের কথা বলা হয়েছে শাস্ত্রে।—

বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

সমদর্শন ব্যাখ্যা করা হয়েছে শাস্ত্রে। কাকে লক্ষ্য করেছেন ?—আত্ম-দর্শনকে। ভগবান্ প্রতি জীবাত্মায়, প্রতি শরীরে অবস্থিত—এটা হল সত্য-দর্শন। এই দর্শনের নাম হল সমদর্শন। এখানে অন্য কোন দর্শনের কথা চিন্তা করা হয় নাই। মূল-মালিক যিনি তিনি যদি দুর্নীতিপরায়ণ হন, তাহলে জিনিসটা আসবে কোথা থেকে ?

একজন মাষ্টার মহাশয়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল—তিনি বললেন আমি ভগবান্ মানি না। তাহলে কি মানেন আপনি ?—আমি নীতি-আদর্শ মানি। আপনার নীতি-আদর্শ কাকে আশ্রয় করে ? এ প্রশ্নের জবাব নাই। নীতি-আদর্শের মূল্যায়ণ যে করছেন আপনি, সেই নীতি-আদর্শ পাচ্ছেন কোথা থেকে ? নীতি-আদর্শের Generation কে ? নীতি-আদর্শ এল কোথা থেকে ? ভাল-মন্দের বিচার পাচ্ছেন কোথা থেকে ? ভগবানের আজ্ঞা পালন করলেন অর্জ্জুন। তিনি ভক্তত্ব—সখ্যভাব লাভ করলেন। আর ভগবদাজ্ঞা পালন না করে উপেক্ষা করে একজনকে নরক দর্শন করতে হল। বিচারের কথা এগুলো। সনাতন শাস্ত্রের Theory এগুলো। আইন যেমন আছে তেমন প্রত্যেকটা আইনের Exception—ব্যতিক্রমও আছে। কেন ?—Exception proves the rule। দুটো পাপাপাশি আছে। আইন যেমন মানতে হচ্ছে তেমন আইনের পাশাপাশি ব্যতিক্রমও মানতে হচ্ছে। এটা ঋষিগণের ও ভগবানের শিক্ষা।

আইন একটা প্রথমে বলা হয়েছে। সেই আইনের ব্যাখ্যা (A), (B), (C), (D) ধারা-উপধারা করে চলল। শেষের দিকে যে ব্যাখ্যা এল দেখা গেল সেটা মূল আইন থেকে সরে গেছে। তথাপি ঐ ধারা-উপধারাগুলি মূল আইনের অনুগত ও সমধর্ম্মী। শাস্ত্রে কিন্তু সব জিনিসটাকে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। নীতি-আদর্শ ভগবানকে কেন্দ্র করে। আর তাঁকে যদি বাদ দিয়েছি তাহলে নীতি-আদর্শ শিখে কি লাভ ? সে নীতি-আদর্শ কাকে লক্ষ্য করে ? কোথায় দাঁড়াবে সে ? সেইজন্য কথাটা হচ্ছে—ভগবান্ নীতি-আদর্শের ধারক। তাঁর জন্য সব কিছু, তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই সব কিছু প্রচেষ্টা আমাদের। সেইজন্যই কর্ম্ম। সংসারে কর্ম্ম করবে কি জন্য ? গীতায় কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন,—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণঃ, যজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ,—যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতিশ্রুতেঃ।" বিষ্ণু

ভগবান্‌কে কেন্দ্র করে তুমি সংসারে কর্ম্ম আচরণ কর। তবে তোমার মুক্তি। যদি সে উদ্দেশ্য না থাকে, তবে তোমার কর্ম্মবন্ধন অবশ্যম্ভাবী। দুটো পোকামাকড়কে দিয়ে উদাহরণ দিলেন, যারা গৃহস্থের ঘরে থাকে, প্রায় দেখা যায়। একটা হল মাকড়সা। ঘরের কোণের দিকে জাল তৈরী করে নিজের থুথু দিয়ে। তাতে সে বদ্ধ হয় না, অন্য পোকামাকড়গুলো ধরা পড়ে। এই মাকড়সা জাতীয় ব্যক্তি যাঁরা এ সংসারে আছেন, তাঁরা হলেন মুক্তজীব, মুক্তপুরুষ। সংসারের কালিমা তাঁদের স্পর্শ করে না, সংসারের বিষয়-বাসনা তাঁদের আক্রমণ করে না।

আর একটা হল গুটীপোকা। সে তার লালা দিয়ে সুতো বের করে গুটী তৈরী করে, গুটীর মধ্যেই বদ্ধ হয়। শেষকালে তাকে সিদ্ধ করে মারা হয়। অতএব এক কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি, আর এক কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধদশা লাভ। সুতরাং কর্ম্মের যে গহণা গতি সেটা জেনে নিতে হবে। কর্ম্মপ্রগতিটা কি? কোন্ কর্ম্ম করব?—"কর্ম্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা।" সেই পরমদেবতার প্রীতির উদ্দেশ্যে যে কর্ম্মাচরণ, সেটা বাস্তব কর্ম্ম, আর সবই অকর্ম্ম-বিকর্ম্মের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। বেদের মধ্যে সেই কর্ম্মের নির্দ্দেশ দিয়েছেন।

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥

বাচ্চা শিশু সব, তেতো ওষুধ গিলবে না। দুষ্টু, শয়তানের দল সব। আমরা সবসময় চাচ্ছি ফল। কি ফল পাব? ফলটা আগে বল। শাস্ত্র সেইজন্য কিছু প্রলোভন দেখিয়ে রেখেছেন—এটা করলে এই হবে, ওটা করলে ওই হবে। আমি যদি সেটা অভ্যাস করি তাহলে অভ্যাসযোগের দ্বারা কিছু লাভ সম্ভব। কিন্তু সে অভ্যাস ত' করতে চাচ্ছি না। সেটুকু ক্লেশস্বীকার পরিশ্রম আমাদের দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। তাহলে বস্তু লাভ করব কি করে? 'কষ্ট করলে কেষ্ট পায়'—কথাটা আছে। কিন্তু কষ্ট করতে চাচ্ছি না, কেষ্ট পাব কি করে? গোড়া কেটে দিচ্ছি আগে, প্রচেষ্টা নাই। অনায়াসে কিছু করতে চাচ্ছি, বিনা পরিশ্রমে কিছু পেতে চাচ্ছি। কি করে হবে? শাস্ত্র আলোচনা করলে আমরা দেখছি,—ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা থাকা চাই। কে ভগবান্, আর কে জীবাত্মা? এই জগৎ কি? ভগবানের সঙ্গে আমার কোনদিন সম্পর্ক ছিল কি? যদি ছিল সেই সম্পর্ক Cut off হয়েছে কেন? বা এখন কোন উপায় আছে কি না পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করার?—এইসব প্রশ্নগুলো হল তত্ত্বজিজ্ঞাসা। আচার্য্য শঙ্করপাদ সেই

তত্ত্বজিজ্ঞাসার কথা বলে গেছেন—"কে তুমি কোথায় ছিলে, কি করিতে হেথা এলে। কিবা কাজ করে গেলে, পাবে কি সুখ জীবনে ??" চিন্তা কর তুমি। আমরা যে কর্ম্মাচরণ করছি এখানে সে কর্ম্মের ফলটা কি ? সে কর্ম্ম কোথায় আমায় পৌঁছে দেবে ? আমার জমার ঘর কিছু আছে কি না ? Fixed Deposit কিছু হচ্ছে কি না ? না সবটাই খরচের খাতায়, করছি কি আমি ? সময়টার সদ্ব্যবহার করছি, না অসদ্ব্যবহার করছি। সূর্য্যদেব প্রতিদিন উদিত ও অস্তমিত হচ্ছেন। আমার যে সীমিত পরিমিত পরমায়ু তার একটা একটা দিন চলে যাচ্ছে। সূর্য্যদেব জানিয়ে দিচ্ছেন তোমার গোণা দিন একটা নিয়ে নিলাম। চিন্তার কথা ত' ! সময়ের সদ্ব্যবহার বলছি ত' আমরা, কিন্তু সময়ের সদ্ব্যবহারটা কিভাবে হবে ? 'Time and tide wait for none' কথাটা সকলের মুখস্থ আছে, কিন্তু সময় ত' কারও জন্য অপেক্ষা করছে না। অপেক্ষা করে তারই জন্য যিনি সময়ের সদ্ব্যবহার করেন। তার জন্য নিশ্চয়ই অপেক্ষা করে। ভগবানকে জানতে গেলে, ভগবানকে ভালবাসতে গেলে, ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা রাখতে গেলে ভাল-মন্দের বিচার দুটো পাশাপাশি রেখে আমাদের বিচার করতে হবে। শাস্ত্র সে বিচারটা দিয়ে রেখেছেন আমাদের কাছে। শাস্ত্র আলোচনা মানে Comperative study। পাশাপাশি রেখে বিচার করা হয়েছে এবং সেই বিচারটা আমাদের ভালভাবে পরখ করতে হবে। শাস্ত্র মানে হল সুযুক্তিপূর্ণ বাক্য। আজকাল অনেকে বলছেন, শাস্ত্র হল—কতকগুলো মেয়েলি গল্প। বাস্তবিক তা নয়। এটা Eshop's Fabels বা Arabian Knights এর গল্প নয়। ঋষিগণের কথার মধ্যেই রয়েছে,—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোবিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

হে জীবগণ ! হে মনুষ্যগোষ্ঠী ! তোমরা কখনও সেই বাক্যকে গ্রহণ করবে না, সেই বাক্যকে কখনও মানবে না—যে বাক্যের পিছনে সদ্যুক্তি নাই। সুতরাং বিচারক্ষেত্র কোন্‌টা আমি সেই Point আলোচনা করবার জন্য একটা বিশেষ অধ্যায় ধরেছি—শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধের ৮৯তম অধ্যায়।

শ্রীশুক উবাচ,—শ্রীশুকদেব এই প্রসঙ্গ বর্ণনা করে যাচ্ছেন রাজা পরীক্ষিতের কাছে। পরীক্ষিৎ রাজা বোকা ছিলেন না। রাজ্যশাসন করেছিলেন তিনি। ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন, অধার্ম্মিক ছিলেন না। কিন্তু ব্রহ্মশাপ—সাতদিনের

মধ্যে তক্ষক সর্প দংশনে মৃত্যু হবে তাঁর। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ বিচার বিবেচনা করে সকলের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে স্থির করেছেন যে জীবনের এই সায়াহ্নকালে শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথা শ্রবণ করতে হবে। তাহলেই আমার সর্ব্বার্থসিদ্ধি, জীবনের সুষ্ঠুতা বাস্তবে রূপায়িত হবে। সেই-ভাবে ভাগবতকথা, ভগবানের লীলাকথা শুনতে বসেছেন। শুকদেব বর্ণনা করছেন,—

একদা দ্বারবত্যান্তু বিপ্রপত্ন্যাঃ কুমারকঃ।
জাতমাত্রো ভুবং স্পৃষ্ট্বা মমার কিল ভারত॥
বিপ্রো গৃহীত্বা মৃতকং রাজদ্বার্য্যুপধায় সঃ।
ইদং প্রোবাচ বিলপন্নাতুরো দীনমানসঃ॥

ব্রাহ্মণ পত্নীর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হল। ব্রাহ্মণ উক্ত মৃতপুত্রকে নিয়ে রাজদ্বারে উপস্থিত হলেন এবং কাতর ও দুঃখিত-চিত্তে বিলাপ করতে করতে বলতে লাগলেন,—

ব্রহ্মদ্বিষঃ শঠধিয়ো লুব্ধস্য বিষয়াত্মনঃ।
ক্ষত্রবন্ধোঃ কর্ম্মদোষাৎ পঞ্চত্বং মে গতোঽর্ভকঃ॥

নালিশটা কি?—ব্রাহ্মণ-দ্বেষী, কুটিলমতি, লোভী, বিষয়াসক্তচিত্ত রাজার পাপকর্ম্মবশতঃই আমার এই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। নালিশ কিন্তু দিচ্ছেন রাজদ্বারে কৃষ্ণের কাছে। কৃষ্ণ তখন দ্বারকার রাজা ছিলেন। শুনলে মনে হয়, কৃষ্ণেরই সমালোচনা করছেন ব্রাহ্মণ। কিন্তু অধ্যায় শেষের দিকে যখন আলোচনা করব, তখন আপনারা দেখবেন ব্রাহ্মণ তত্ত্ববিৎ। তিনি জানেন নীতি-আদর্শের কথা। তিনি ভগবানের পরে দোষারোপ করছেন না। সাধারণভাবে যেটা বলা প্রয়োজন সেটা তুলে ধরছেন। ব্রাহ্মণবিদ্বেষী কাকে বলে? ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম কাকে বলা হয়েছে?—যাঁরা ভগবানকে ভালবাসেন তাঁদের বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ। সেইরূপ ব্যক্তিগণের মালিক হচ্ছেন ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ। সেইজন্য প্রণাম মন্ত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমরা—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

ব্রাহ্মণ কে?—'ব্রহ্ম জানাতি ইতি ব্রাহ্মণ'। পরব্রহ্মের সন্ধান যিনি পেয়েছেন, ভগবানকে যিনি জেনেছেন, বুঝেছেন, তিনি হলেন ব্রাহ্মণ। এটা সাধারণ কথা নয়। আমি ব্রাহ্মণ ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি, সুতরাং আমি ব্রাহ্মণ, তা নয়। ব্রাহ্মণের যে ক্রিয়াকলাপ, আচার-অনুষ্ঠান আছে—শাস্ত্রে সত্য, শৌচ,

তপঃ ইত্যাদি যে বারোটী গুণ বর্ণিত আছে, সেইগুলি যিনি আচরণ করছেন, তিনি ব্রাহ্মণ। তার প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠান যদি কেউ না করছেন তাকে কি ব্রাহ্মণ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে ?

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি চোদনাৎ॥

ব্রাহ্মণের তিনটে জন্ম। মাতৃকুক্ষি থেকে জন্ম সকলের সমান। দ্বিতীয় জন্ম হচ্ছে ব্রাহ্মণ যখন উপনয়ন-সংস্কার লাভ করেন। 'তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং' —তৃতীয় জন্ম হল যখন তিনি মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করছেন। যিনি ভগবৎতত্ত্বজ্ঞ তিনি হলেন ব্রাহ্মণ। আর যিনি ভগবানকে ভালবাসেন না বা ভগবৎতত্ত্ব অবগত নহেন বা তাহা জানার কোন প্রচেষ্টা নাই, তাঁকে ত' ব্রাহ্মণব্রুব বলা হয়েছে। তাকে বলা হয়েছে ব্রহ্মবন্ধু। গালাগালির শব্দ। ব্রাহ্মণাধম শব্দও প্রয়োগ করা হয়েছে শাস্ত্রে। তাহলে ব্রাহ্মণবিদ্বেষী কে ?—ভগবানকে যিনি ভালবাসেন না, ভগবদ্ভক্তকে যিনি ভালবাসেন না, তিনি হলেন ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী। যাঁরা ভগবানের ভজন-সাধন করেন, ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা করেন, ভগবৎতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা হলেন ব্রাহ্মণ। গুণগত বিচার।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটে গুণ প্রাকৃত গুণ। দৈবীমায়ার দ্বারা রচিত এই তিন গুণ। ভগবানকে এই তিন গুণের মধ্যে সীমিত করা হয় না। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন তাঁর একটা বিশেষণ আছে—ত্রিগুণাতীত, লোকাতীত, মায়াতীত। (ক্রমশঃ)

প্রাত্যহিক জীবন

আমরা অনেক সময়ে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশার্থীর মুখে প্রথমেই এই প্রশ্নটী শুনিতে পাই—"আমার কর্ত্তব্য কি ? আমি চলিব কিরূপে ?" অর্থাৎ ধর্ম্মোন্মুখ ব্যক্তি ধর্ম্ম-জীবনযাপনের প্রারম্ভেই প্রাত্যহিক জীবনের অনুষ্ঠানা-বলীর একটী তালিকা ঠিক করিয়া তদনুসারে চলিতে সঙ্কল্প করেন। এরূপ সঙ্কল্প উত্তম। কিন্তু এতৎপূর্ব্বে একটী জানিবার কথা আছে।

আমরা জাগতিক ব্যাপারে দেখিতে পাই যে, বালিকা বিবাহের পূর্ব্বেই পতিগৃহের দৈনন্দিন কৃত্যগুলির তালিকার জন্য ব্যস্ত হয় না। পতির সহিত কিরূপে সম্বন্ধ হইবে সর্ব্বাগ্রে বালিকার ও বালিকার অভিভাবকগণের তদ্বিষয়েই

চেষ্টা ও যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আগে পতির সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন, পতিগৃহে গমন, তারপর পতি ও পতির সম্পর্কীয় আত্মীয়বর্গের সেবোপযোগী জীবনযাপনের জন্য চেষ্টা। পতির সহিত সম্বন্ধস্থাপন না করিয়া অর্থাৎ পতি ঠিক না করিয়া যদি কেহ বারবনিতার ন্যায় উদ্দেশ্যবিহীন গৃহকার্য্যগুলি সযত্নেও সম্পাদন করিতে থাকে, তবে সেইরূপ অনুষ্ঠানাবলী সুখ-শান্তি বা মঙ্গলের হেতু না হইয়া অনুষ্ঠানকারিণীকে ইন্দ্রিয়লালসারূপ পাপ ও তজ্জন্য নরকেই নিমগ্ন করে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

ভগবানই আমাদের নিত্য পতি। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে সেই পতির সহিত সম্বন্ধ করিয়া দেন। এইজন্য শ্রীগুরুদেবকে "সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা" বলে। সম্বন্ধজ্ঞানের নামই 'দীক্ষা' বা 'দিব্যজ্ঞান'।

পতির সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে বালিকা যে কিছু গৃহকার্য্যের অভিনয় করে, তাহা পুতুল-খেলা বা লক্ষ্যবিহীন অনুকরণ মাত্র। বালিকার পুতুল-খেলার দ্বারা সত্য সত্য পতির সেবা হয় না, কেবল জ্ঞানহীনা বালিকার সাময়িক মানসিক সন্তোষ হয় মাত্র। আবার পতি-সম্বন্ধবিমুখিনী ব্যভিচারিণী বারবনিতার গৃহকার্য্যগুলিও উহার নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্যই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু পতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত সাধ্বী গৃহলক্ষ্মীর দৈনন্দিন গৃহকার্য্য-গুলির প্রত্যেকটীই পতির সুখান্বেষণ-উদ্দেশ্যে সাধিত হওয়ায় উহা সুশৃঙ্খল, মঙ্গলজনক ও সমগ্র গৃহ-পরিবারের শান্তিবিধায়ক হইয়া থাকে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় (ভাঃ ১১।২।৩৪) ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত ভক্তের দৈনন্দিন অনুষ্ঠান এবং বিষয়ী ও অভক্তের ঠিক সেইরূপ আচরণের মধ্যে কিরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ বর্ত্তমান, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন; যথা—"বিষয়িণঃ প্রাতরারভ্য মূত্রপুরীষোৎসর্গ-মুখ-প্রক্ষালন-দন্তধাবন-স্নান-দর্শন-শ্রবণ-কথনাদি-ব্যাপারাঃ বিষয়সুখ-ভোগার্থমেব, কর্ম্মিভিস্তু দেবপিত্রাদিপূজার্থমেব ক্রিয়ন্তে তথৈব ভগবদ্ভক্তেন তে তে ভগবৎ-সেবার্থমেব কর্ত্তব্যা ইতি তে তেঽপি তেষাং ভক্ত্যঙ্গানি ভবেয়ুরিতি।" অর্থাৎ যেরূপ বিষয়িগণ প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মূত্রপুরীষোৎসর্গ, মুখপ্রক্ষালন, দন্তধাবন, স্নান, দর্শন, শ্রবণ ও কথনাদি ব্যাপার বিষয়সুখভোগের জন্যই করিয়া থাকেন এবং কর্ম্মকাণ্ডরত ব্যক্তিগণও দেবপিত্রাদি পূজার জন্যই তৎ তৎ কার্য্য করেন, ভগবদ্ভক্তগণও তদ্রূপ সেই সেই কার্য্য, সেইরূপভাবে ভগবৎসেবার জন্যই করেন। তাহাতে "মূত্র-পুরীষোৎসর্গ হইতে শ্রবণ-

কথনাদি" যাবতীয় দৈনন্দিন ব্যাপার ভক্ত্যঙ্গরূপেই পর্য্যবসিত হয়। মূলকথা এই যে, সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ভগবদ্ভক্ত বিষয়ী ও কর্ম্মকাণ্ডরত ব্যক্তির ন্যায় যাবতীয় কার্য্যই করিয়া থাকেন। ভক্ত, বিষয়ী ও কর্ম্মীর বাহ্যানুষ্ঠানে কোনও পার্থক্য নাই; কেবলমাত্র অন্তরনিষ্ঠায় ও উদ্দেশ্যে ভেদ। সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি সকল কার্য্যই ভগবানের প্রীতি ও সেবার উদ্দেশ্যে করেন; আর বিষয়ী ও কর্ম্মকাণ্ডরত ব্যক্তি স্ব স্ব ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ-সুবিধার জন্যই তৎ তৎ কার্য্য করেন। যেমন, সাধ্বী-স্ত্রী কেশবিন্যাস, বেশ-রচনা, গৃহসংস্কার ও রন্ধনকার্য্য প্রভৃতি যাবতীয় অনুষ্ঠান পতিসুখের জন্যই করেন; আর নিজসুখ-তাৎপর্য্যপরা বারবনিতাও তৎ তৎ কার্য্যগুলিই নিজ অর্থাদি-সুখেচ্ছাকৈতবমুখে করিয়া থাকে।

অতএব, আমাদের সর্ব্বাগ্রে সম্বন্ধযুক্ত হওয়াই আবশ্যক। সম্বন্ধের পরে 'অভিধেয়' অর্থাৎ "আমাদের যাহা কর্ত্তব্য" তাহা নির্ণয় ও তদনুষ্ঠান। 'সম্বন্ধ' ও 'অভিধেয়' পরস্পর অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট। 'সম্বন্ধ' ব্যতীত 'অভিধেয়' নির্ণয় হয় না। আবার অভিধেয়- যাজন ব্যতীত সম্বন্ধ দৃঢ় হয় না। যেমন কোন বালিকা বিবাহের পরে যদি পতিগৃহে গমন না করে, এবং তথায় গমন করিয়াও পতিসেবা না করে, তাহা হইলে তাহার পতির প্রতি আসক্তি বা সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় নাই জানিতে হইবে। যখন ভার্য্যা পতিগৃহের কার্য্যগুলি অত্যন্ত আপনার বোধে প্রাণপণে করিতে থাকে; নানাপ্রকার অভাব, অসুবিধা, রোগ, শোক অগ্রাহ্য করিয়াও পতিগৃহের যাবতীয় কার্য্য দৃঢ়তা, আসক্তি ও রুচির সহিত অনুষ্ঠান করিতে থাকে; তখনই বালিকার অভিভাবকগণ এবং অপর সকলেও জানিতে পারে যে, ঐ বালিকার পতির সঙ্গে যথার্থ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। অভিধেয়ের পরই 'প্রয়োজন' সিদ্ধ হয়।

সাধ্বী পত্নী কি চান্? তিনি কখনও অপরের প্রশংসাপ্রাপ্তির জন্য পতিসেবা করেন না। কিম্বা, পতিসেবার পরিবর্ত্তে স্বীয় ইন্দ্রিয়সুখের উদ্দেশ্যে অলঙ্কার বা বেশভূষা কিছুই কামনা করেন না। তিনি চান পতির সুখের জন্য পতির সেবা; পতির প্রীতিই তাঁহার প্রয়োজন। পতির সুখেই তাঁহার সুখ, নিজের সুখ তাঁহার প্রয়োজনীয় বস্তু নহে।

"কুষ্ঠ-বিপ্রের রমণী,　　পতিব্রতা-শিরোমণি,
পতি লাগি' কৈল বেশ্যার সেবা।
স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি,　　জিয়াইল মৃত পতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা॥" (চৈঃ চঃ অঃ ২০।৫৭)

সর্ব্বতোভাবে নিজ স্বার্থ বর্জ্জন করিয়া ভগবৎপ্রীতির অনুসন্ধানই ভক্ত-জীবনের মূলমন্ত্র। ইহাই সম্বন্ধযুক্ত ভক্তের প্রয়োজন।

ভক্তিলাভেচ্ছুর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য সদ্‌গুরুপদাশ্রয়। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—"আদৌ গুরুপদাশ্রয়ঃ"। শ্রুতি বলেন,—"ভগবদ্বস্তুর বিজ্ঞানলাভ করিতে হইলে 'সমিৎপাণি' হইয়া বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ভগবত্তত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবে" (মুণ্ডকোপনিষৎ ১।২।১২)। "আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন" (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬।১৪।২)। "যাঁহার ভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমনি শ্রীগুরুদেবেও ঐকান্তিকী ভক্তি, সেই মহাত্মাই শ্রুতির মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।২৩)। শ্রীমদ্ভাগবতেও কথিত হইয়াছে যে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজিজ্ঞাসু ব্যক্তি উত্তম মঙ্গল জানিবার জন্য সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় করিবেন। যিনি শ্রুতিশাস্ত্র সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, কৃষ্ণৈকশরণ এবং প্রাকৃত লোভাদির বশীভূত নহেন, তিনিই সদ্‌গুরু।

ভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তিই পারমার্থিক গুরুর পদাশ্রয় করিবেন। পারমার্থিক গুরু-বরণ-কালে ব্যবহারিক বিচার আনিলে প্রকৃত সত্য লাভ হয় না। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—"ব্যবহারিক, লৌকিক ও কৌলিক অযোগ্য গুরু পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয়গ্রহণ করিবে" (ভক্তিসন্দর্ভ ২১০)। বিষ্ণুস্মৃতি বলেন,—"শিষ্যের নিকট হইতে যিনি পরিচর্য্যা বা যশোলাভের বাসনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই 'গুরু' পদবাচ্য নহেন।" "স্নেহবশতঃ বা লোভবশতঃ যে গুরু দীক্ষা দেন এবং ভালবাসার খাতিরে বা লোভের আশায় যিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন" (হরিভক্তিবিলাস ২।৫)। "কেহ যদি এই সকল শাস্ত্রের আদেশ না জানিয়া কৌলিক বা লৌকিক প্রথা অনুসারে কোনও অগুরুকেই 'গুরু' বলিয়া বরণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি ঐরূপ গুরুপদিষ্ট-মন্ত্রদ্বারা নরকলাভ হয় জানিয়া পুনরায় যথাশাস্ত্র বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিবেন" (হরিভক্তি-বিলাস ৪।১৪৪)। যাঁহাদের সত্যানুসন্ধিৎসা অত্যন্ত কম, তাঁহারা অনেক সময়ে মনে করেন, অসদ্‌গুরু ত্যাগ করিয়া সদ্‌গুরু গ্রহণ করিলে গুরু-ত্যাগ-রূপ অপরাধে পতিত হইতে হইবে। কিন্তু আচার্য্যগণ ও নিখিল সাত্বত স্মৃতি-শাস্ত্র বলেন,—"এরূপ অসদ্‌গুরু পরিত্যাগই বিধি" (ভক্তিসন্দর্ভ ২১০ ও ২৩৮ সংখ্যা)। যে ব্যক্তি আচার্য্যবেশে অন্যায় কথা কীর্ত্তন করেন ও যিনি শিষ্যরূপে অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকালের জন্য

ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকেন" (হরিভক্তিবিলাস ১।৬২)। পূর্ব্বাচার্য্যগণের আচরণও এই সকল শাস্ত্র-সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করেন। অনেকে আবার বলিয়া থাকেন—"দুগ্ধ যেরূপই হউক না বা গুরু যাহাই থাকুন না কেন, বিষপ্রদ বিক্রেতা হইতে বা গুরুক্রব হইতে দুগ্ধ বা লব্ধ মন্ত্র (?) ত' আর কিছু খারাপ হয় নাই? আর শিষ্যের যদি ভক্তি (?) থাকে তাহা হইলে শিষ্যের কল্পনার বলে অসদ্‌গুরুও শিষ্যের নিকট 'সৎ' বলিয়া প্রতিভাত হইবে!"—এই সকল কথা সমর্থন করিবার জন্যও বহু বহু মনঃকল্পিত গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্র এই সকল মনোধর্ম্মোত্থ কথার সমর্থন করেন না। (ক্রমশঃ)

শ্রীবৃন্দাবনবাসী পদে প্রার্থনা

জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, জয় বৃন্দাবন।
কালিন্দী-যমুনা জয় ধেনুবৎসগণ॥
শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরি-গোবর্দ্ধন।
গিরিধারী, গোপীনাথ, মদনমোহন॥
কেশীঘাট, বংশীবট, দ্বাদশ-কানন।
যাঁহা যাঁহা লীলা কৈল শ্রীনন্দনন্দন॥
গোপ-গোপী আদি যত ব্রজবাসিগণ।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সবার চরণ॥
বেণু, বেত্র আদি যত নাগকন্যাগণ।
শ্রীদামাদি সখা যত ব্রজবাসিগণ॥
বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ।
ঊর্দ্ধবাহু করি' বন্দোঁ সবার চরণ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবপদ করিয়া স্মরণ।
গোপী-পদরেণু মাগে দাস বৃন্দাবন॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব বন মহারাজ

শ্রীল গুরু-মহারাজের

উত্তরবঙ্গ ও আসামে শ্রীহরিকথা প্রচার

গত ২৯শে মার্চ্চ, ১৯৯০, ১৫ই চৈত্র ১৩৯৬, বৃহস্পতিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরামগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীবাঁকেবিহারী ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া উত্তরবঙ্গ ও আসামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারোদ্দেশ্যে শুভযাত্রা করেন। ৩০শে মার্চ্চ শ্রীসমিতির কুচবিহার-সহরস্থ প্রচারকেন্দ্র শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠে পৌঁছান। তথায় ভক্তবৃন্দ শ্রীল গুরুপাদপদ্মকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর আরাত্রিকান্তে শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ-স্কন্ধের ২য় অধ্যায় হইতে নিমি-নবযোগেন্দ্র সংবাদের কিয়দংশ পাঠও ব্যাখ্যা করেন।

পরদিবস অর্থাৎ ৩১শে মার্চ্চ প্রাতে যাত্রা করিয়া বাসযোগে ধুবড়ী জেলার গোলকগঞ্জস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে উপনীত হন। তথায় দিবসদ্বয় অবস্থান করত শ্রীহরিকথা প্রচারপূর্ব্বক ২/৪/৯০ তাং এ ধুবড়ী সহরের শ্রীকিশোরী পালচৌধুরী মহাশয়ের গৃহে পদার্পণ করেন। পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমৎ বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমৎ মঙ্গল মহারাজ প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণও তথায় উপস্থিত হন। শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীকিশোরকৃষ্ণ প্রভুর গৃহে ২ দিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

৩/৪/৯০ তাং এ ধুবড়ী নিবাসী শ্রীনিখিলচন্দ্র দাস মহোদয়ের গৃহে শ্রীল-গুরুপাদপদ্ম শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ৪/৪/৯০ ও ৫/৪/৯০ তাং এ স্থানীয় বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বিশেষ অনুরোধে ধুবড়ী শ্রীহরিসভায় ধর্ম্মসভার আয়োজন হইয়াছিল। উক্ত সভার প্রথমদিনে অর্থাৎ ৪/৪/৯০ তাং এর ধর্ম্মসভায় শ্রীল গুরু-মহারাজকে সভাপতিরূপে বরণ করেন। তৎপরে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেম পরমার্থী মহারাজ, শ্রীরামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য (অবসর-প্রাপ্ত অধ্যাপক, ভোলানাথ কলেজ, ধুবড়ী), শ্রীরুক্মিনীকান্ত রায় (প্রাক্তন এ. এল. এ. ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ গৌরীপুর কলেজ) শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব বন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ও প্রধান অতিথি শ্রীদীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য (Addl. Deputy Commissioner, Dhubri) 'সনাতনধর্ম্ম'

সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর সভাপতির ভাষণে শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন।

দ্বিতীয় দিবসে অর্থাৎ ৫/৪/৯০ তাং এর ধর্ম্মসভায় শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, প্রধান অতিথি শ্রীনির্ম্মল সরকার (Senior advocate), শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীদীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বক্তাগণ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিশেষে শ্রীদীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য-কৃত কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর ও দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সনাতন ধর্ম্মের ভূমিকা সম্পর্কে শ্রীল গুরু-মহারাজ বিশেষ ভাষণ প্রদান করেন।

৬/৪/৯০ তাং এ স্থানীয় শ্রীবামাপদ রায় মহাশয়ের গৃহে শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ৭/৪/৯০ তাং এ কোকড়াঝাড় জেলার বাসুগাঁও সহরে শ্রীসমিতির প্রচারকেন্দ্র শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে শুভযাত্রা করেন। তথায় ১২।৪।৯০ তাং পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া ১৩।৪।৯০ তাং-এ গৌহাটীর আদাবাড়ী নিবাসী প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীগোবর্দ্ধনলাল রায়-এর গৃহে পদার্পণ করেন। তথায় প্রত্যহ পাঠ-কীর্ত্তন হইতে থাকে এবং নিকটস্থ কয়েকজন গৃহস্থ ভক্তের গৃহে উৎসবাদি হয়। ১৬/৪/৯০ তাং এ গৌহাটীর কালাপাহাড় নিবাসী শ্রীযুক্তা প্রভা নাথ-এর বিশেষ আগ্রহে এবং শ্রীসুজিৎ সেনগুপ্ত ও তৎ সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বন্দনা সেনগুপ্তের ইচ্ছায় তাঁহাদের বাসভবনে যাত্রা করেন। তথায় দুই দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হয়। অতঃপর সদলবলে জলপাইগুড়ি জেলার বারবিশা, কুচবিহারস্থ শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ হইয়া ২৪/৪/৯০ তাং এ কুচবিহার নিশিগঞ্জের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী শ্রীগৌরপদ মালাকার মহাশয়ের গৃহে শুভাগমন করেন। নিকটস্থ ছিট্‌কিবাড়ী নিবাসী স্বধামগত শ্রীসতীশচন্দ্র দাসাধিকারী ও শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ সাহা মহাশয়ের গৃহেও পদার্পণ করেন। তথায় দিবসদ্বয় পাঠ-কীর্ত্তনপূর্ব্বক ২৬/৪/৯০ তাং এ শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠে আগমন। তথা হইতে শ্রীশ্যাম-সুন্দর গৌড়ীয় মঠে শুভযাত্রা। এখানে শ্রীল গুরুদেব অসুস্থতাহেতু প্রায় এক মাসকাল অবস্থান করিবেন।

২৮/৪/৯০ তাং-এ শিলিগুড়ির পূর্ব্ব বিবেকানন্দ পল্লীতে শ্রীহৃষীকেশ রায় ও শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারীর প্রচেষ্টায় নির্ম্মিত শ্রীশ্রীগোপালমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শ্রীল গুরুদেব তথায় গমন করেন। পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ প্রভৃতি সন্ন্যাসি ও ব্রহ্মচারিগণ উক্ত শ্রীগোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার যাগ-যজ্ঞ-হোমাদি ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়াছেন।

—নিজস্ব সংবাদ

নির্য্যাণ

আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেব (মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কেশিয়াড়ী থানা নিবাসী) শ্রীভাগবতচন্দ্র দাসমহাপাত্র (দীক্ষানাম শ্রীভক্তিকমল দাস) গত বাং ১৭ই চৈত্র ১৩৯৬, ইং ৩১শে মার্চ্চ ১৯৯০, শনিবার সকাল ১০-৪৫ মিঃ গৌর-পঞ্চমী-তিথিতে শ্রীল রামানুজাচার্য্যের আবির্ভাব-দিবসে দেহরক্ষা করেন। বাং ১৩৫১ সনে শ্রীপাদ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তৎপূর্ব্বে বাং ১৩৫২ সনে শ্রীল প্রভুপাদের অন্যতম অনুকম্পিত শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজের প্রথম কেশিয়াড়ীতে প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের ভূমি ও গৃহ দান করেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের বাৎসরিক উৎসবে শ্রীপাদ সন্ত মহারাজের নিয়ামকত্বে সমস্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের সাধুসন্তদের আনয়নের ক্ষেত্রে তাঁর অগাধ উৎসাহ ও প্রচেষ্টা ছিল। তৎকালীন শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের বাৎসরিক মহোৎসবে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ পদার্পণ ঘটেছিল।

তিনি জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত শ্রীপাদ সন্ত মহারাজের নির্দ্দেশে শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজায় রত ছিলেন। পরলোক গমনের দিন শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের শ্রীগৌরকুণ্ডে স্নানরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মঠ প্রাঙ্গনে দেহ রাখেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের দাতা হইয়াও তিনি সেবকের ন্যায় জীবনযাপন করতেন। তিনি নিরভিমানী ছিলেন। তাঁর সরলতা সমস্ত বৈষ্ণব মণ্ডলীকে আকৃষ্ট করত। তিনি শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীশ্যামসুন্দর দাসমহাপাত্র শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত। তিনি বর্ত্তমানে জীবিত আছেন।

গত ২৭শে চৈত্র পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীপাদ সন্ত মহারাজের উপস্থিতিতে তাঁর পুত্রত্রয় শ্রীমান্ রাধানাথ, সঞ্জয় এবং কৃষ্ণকান্ত নিজ বাসভবনে সাত্বত স্মৃতি-বিধানে আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে বহু সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণববৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

—শ্রীরাধানাথদাস মহাপাত্র
কেশিয়াড়ী (মেদিনীপুর)

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা

ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

মহোৎসবে আহ্বান

(পুরীধামের প্রথানুসারে)

[২৪শ বর্ষ]

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
তেঘরিপাড়া,
১৮ই বৈশাখ, ১৩৯৭ ; ইং ২৮।৪।৯০

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আগামী ৭ই আষাঢ়, ১৩৯৭ (ইং ২২।৬।৯০) শুক্রবার হইতে ১৭ই আষাঢ়, ১৩৯৭ (ইং ২।৭।৯০) সোমবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের বিশেষ সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন সেবাপঞ্জী প্রদত্ত হইল।

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

সেবাপঞ্জী

১। **৭ই আষাঢ়,** (ইং ২২।৬।৯০) শুক্রবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, কীর্ত্তন, আরতি ও বক্তৃতা।

২। **৮ই আষাঢ়,** (ইং ২৩।৬।৯০) শনিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় **নগর সঙ্কীর্ত্তনমুখে** গুণ্ডিচাবাড়ী গমন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠান্তে **গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন** এবং মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **৯ই আষাঢ়,** (ইং ২৪।৬।৯০) রবিবার—**শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** ; অপরাহ্ণ ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তনযোগে শোভাযাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন ; পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যায় আরাত্রিক, সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ** পাঠ।

৪। **১০ই আষাঢ়,** ২৫শে জুন সোমবার হইতে ১২ই আষাঢ়, ২৭শে জুন বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।

৫। **১৩ই আষাঢ়,** (ইং ২৮।৬।৯০) বৃহস্পতিবার—**হেরাপঞ্চমী-দিবসে** শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৭টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন ; সন্ধ্যায় আরাত্রিক, তদনন্তর **শ্রীমদ্ভাগবত** পাঠ।

৬। **১৪ই আষাঢ়, ২৯শে জুন** শুক্রবার হইতে ১৬ই আষাঢ়, ১লা **জুলাই** রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে বক্তৃতা।

৭। **১৭ই আষাঢ়,** (ইং ২।৭।৯০) সোমবার—অপরাহ্ণ ৩টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা ;** পরে শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, আরতি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সাধারণ মহোৎসব।

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে উক্ত সমিতির "সাধারণ সম্পাদক"-এঁর নামে উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

* স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। *

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥



* অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥ *

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম মুছুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম।

৪২শ বর্ষ | ৭ বামন, গর্ভোদশায়ী, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৯৭, ইং ১৭।৬।৯০ | ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীবসুদেব-দেবকীকৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্‌

[শ্রীমদ্‌গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে শ্রীনারদ-বহুলাশ্ব-সংবাদে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-জন্মবর্ণনে একাদশোঽধ্যায়ে]

শ্রীনারদ উবাচ,—

১-২। ভাদ্রে বুধে কৃষ্ণপক্ষে ধাত্রর্ক্ষে হর্ষণে বৃষে।
কৃষ্ণাষ্টম্যামর্দ্ধরাত্রে নক্ষত্রেশ-মহোদয়ে॥ ২৩॥
অন্ধকারাবৃতে কালে দেবক্যাং শৌরিমন্দিরে।
আবিরাসীদ্ধরিঃ সাক্ষাদরণ্যামধ্বরেঽগ্নিবৎ॥ ২৪॥

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী-তিথিতে রোহিণী-নক্ষত্রযুক্ত বুধবারে হর্ষণযোগে অর্দ্ধরাত্রে অপাপ চন্দ্রে বৃষলগ্নে অন্ধকারাবৃত সময়ে অরণি হইতে যজ্ঞাগ্নির ন্যায় বসুদেবগৃহে দেবকীতে সাক্ষাৎ হরি আবির্ভূত হইলেন॥ ২৩-২৪॥

৩। হরিমানকদুন্দুভিস্তবৈঃ স্তবনং তং প্রণিপত্য বিস্মিতঃ।
অকরোদুতি-প্রভূদয়ো গতভিঃ সূতিগৃহে কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩০ ॥

বিস্মিতমনা বসুদেব বিবিধ স্তবে স্তুতি ও প্রণাম করিলেন, প্রভুর উদয়ে তাঁহার ভয় অপনোদিত হইল; তিনি সূতিকাগৃহে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

শ্রীবসুদেব উবাচ,—

৪। একো যঃ প্রকৃতিগুণৈরনেকধাসি
হর্ত্তা ত্বং জনক উতাস্য পালকস্ত্বম্।
নির্লিপ্তঃ স্ফটিক ইবাস্য দেহবর্ণৈ-
স্তস্মৈ শ্রীভুবনপতে নমামি তুভ্যম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীবসুদেব বলিলেন,—তুমি এক হইয়াও যোগমায়া-গুণে নানাবিধ। তুমি এই জগতের হর্ত্তা, জনক ও পালক; কিন্তু নির্লিপ্ত তোমার দেহশোভা স্ফটিকবৎ শুভ্র; হে জগৎপতে! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৩১ ॥

৫। এধঃসু ত্বনল ইবাত্র বর্ত্তমানো
যোঽন্তস্থো বহিরপি চাম্বরম্ যথা হি।
আধারো ধরণিরিবাস্য সর্ব্বসাক্ষী
তস্মৈ তে নম ইব সর্ব্বগো নভস্বান্ ॥ ৩২ ॥

কাষ্ঠমধ্যস্থ অগ্নির ন্যায় যিনি হৃদয়মধ্যস্থ হইয়াও আকাশের ন্যায় বাহিরেও বিদ্যমান্, যিনি ধরণীর ন্যায় সর্ব্বাধার এবং যিনি বায়ুর ন্যায় সর্ব্বসাক্ষী ও সর্ব্বগত, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৩২ ॥

৬। ভূভারোদ্ভট-হরণার্থমেব জাতো
গো-দেব-দ্বিজ-নিজবৎস-পালকোঽসি।
গেহে মে ভুবি পুরুষোত্তমোত্তমস্ত্বং
কংসান্মাং ভুবনপতে প্রপাহি পাপাৎ ॥ ৩৩ ॥

তুমি পৃথ্বীর ভারস্বরূপ দারুণ যোদ্ধাদিগকে নিহত করিবার জন্য ভূতলে আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছ। তুমি গো, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও নিজভক্তজনকে পালন কর। হে পুরুষোত্তম ভুবনপতে! পাপ কংস হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ৩৩ ॥

৭। পরিপূর্ণতমং সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণং শ্যামসুন্দরম্।
জ্ঞাত্বা নত্বাথ তং প্রাহ দেবকী সর্ব্বদেবতা ॥ ৩৪ ॥

সর্ব্বদেবতা-স্বরূপিণী দেবকী তাঁহাকে পরিপূর্ণতম শ্যামসুন্দর সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারিয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীদেবক্যুবাচ,—

৮। হে কৃষ্ণ হে বিগণিতাণ্ডপতে পরেশ
গোলোকধাম-ধিষণধ্বজ আদিদেব।
পূর্ণেশ পূর্ণ পরিপূর্ণতম প্রভো মাং
ত্বং পাহি পাহি পরমেশ্বর কংসপাপাৎ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীদেবকীদেবী বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি অগণিত ব্রহ্মাণ্ডপতি, পরেশ, গোলোকধামের প্রকাশক ধ্বজাস্বরূপ, আদিদেব, পূর্ণেশ, পূর্ণ, পরিপূর্ণতম ও প্রভু। হে পরমেশ্বর! পাপ কংস হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর—পরিত্রাণ কর ॥ ৩৫ ॥

শ্রীনারদ উবাচ,—

৯। তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্।
সস্মিতো দেবকীং শৌরিং প্রাহ স বৃজিনার্দ্দনঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীনারদ বলিলেন,—পরিপূর্ণতম পাপনাশন সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহা শুনিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে দেবকী-বসুদেবকে পূর্ব্বসৃষ্টির বিষয় স্মরণ করাইয়া দিলেন। [সূতিকাগৃহে বসুদেব-দেবকীর সমক্ষে শ্রীহরি তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত হইয়া বালক হইয়া গেলেন] ॥ ৩৬ ॥

মুষ্টিভিক্ষা

ব্রজে বৈষ্ণবগণ দ্বারে দ্বারে মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। শ্রীব্রজমণ্ডলে গৃহস্থ মানবগণ বঙ্গভূমির ন্যায় ডাল, ভাত খান না। তাঁহারা রুটী, ছোলাভাজা ইত্যাদি রুক্ষ দ্রব্য আহার করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ গৃহস্থদিগের দ্বারে উপস্থিত হইলে প্রত্যেক বৈষ্ণবকে এক টুকরা করিয়া রুটী দিয়া থাকেন। দশজনের বাটী হইতে এক এক টুকরা করিয়া রুটী পাইলে এক এক বৈষ্ণবের ভোজনোপযোগী খাদ্যদ্রব্য সংগঠন হয়। বহুকাল হইতে ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণবদিগের মাধুকরী-বৃত্তি-লভ্য রুটীর দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ হয়।

বঙ্গভূমিতে রুটীর প্রথা নাই। বঙ্গবাসী গৃহস্থগণ ডাল, ভাত খাইয়া থাকেন। বঙ্গভূমিতে মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বত্র খাদ্যদ্রব্য লাভ হয় না। কেননা, সকল বাটীতে দেবসেবা নাই; দেবতার প্রসাদ পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবকে কি ভিক্ষা দিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া গৃহ হইতে একমুষ্টি চাল আনিয়া দিয়া থাকেন। ব্রজে যেরূপ রুটীর টুকরা প্রদত্ত হয়, গৌড়ে সেইরূপ তণ্ডুল-মুষ্টি প্রদত্ত হয়। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, বৈষ্ণবেরা ব্রজমণ্ডলে যেরূপ অনায়াসে রুটীর টুকরা খাইয়া দিনপাত করেন, সেরূপ গৌড়-মণ্ডলে তণ্ডুল-মুষ্টি লইয়া অনায়াসে দিনপাত করিতে পারেন না। তণ্ডুলগুলিকে পাক করিতে হইলে হাঁড়ি, কাঠ প্রভৃতি অনেক দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হয়। আবার পাক করিতে গেলে যে সময় লাগে, তাহাতে ভজনের অনেক ব্যাঘাত হয়।

ষোলক্রোশ বৃন্দাবন যে ধাম, ষোলক্রোশ নবদ্বীপও সেই ধাম। অতএব গৌড়মণ্ডলে শ্রীনবদ্বীপ-ধামের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায় সমস্ত গৃহস্থের নিকট হইতে মাধুকরী করা প্রশস্ত হইলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে সুষ্ঠু হয় না। নিকটে নিকটে এত সেবাস্থান পাওয়া যায় না যে, প্রতিস্থান হইতে এক গ্রাস অন্ন-ডাল লইয়া ভক্তদের উদর পূরণ হয়। সুতরাং বৈষ্ণবগণ মাধুকরী করিতে পান না; এবং মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করিতেও যত্ন করেন না। শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে আজকাল ক্রমশঃ নানাস্থানে অনেক সেবা প্রকাশ হইতেছে; তাহাতে বৈষ্ণবদিগের জীবন নির্ব্বাহের অনেক সুবিধা হইবে আশা করা যায়।

সে যাহা হউক, মুষ্টিভিক্ষার আজকাল অবস্থা কি, তাহা বিবেচনা করা যাউক। বৈষ্ণবগণ মুষ্টিভিক্ষা লইতে প্রস্তুত হইলেন না দেখিয়া একদল অযোগ্য স্ত্রী-পুরুষ মুষ্টি ভিক্ষা-প্রথার সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন। যে-সব স্ত্রীলোক উপার্জ্জন করিয়া উদর ভরণ করিতে আলস্য প্রকাশ করে, তাহারা প্রাতে উঠিয়া বস্ত্র ত্যাগ করুক না করুক, গৃহিণীর কার্য্য সমাপন করিয়া তিলক-মালা ধারণপূর্ব্বক আমাদের শচীনন্দনের নাম লইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করে। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পূর্ব্বেই তাহারা ৩।৪ সের চাল লইয়া ঘরে আইসে। ঐ চাউল কিছু পাক করে, আর কিছু বিক্রয় করে। বিক্রয় করিয়া যাহা পায়, তাহাতে উপপতির সেবা ও জারজপুত্রের উদর পালন ও বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে। ফল এই হইয়াছে যে, মুষ্টিভিক্ষা-দাতা এইরূপ উদর ভরণের উপায় প্রদান করিয়া আর সেবক-সেবিকা অনায়াসে পান না। দুই তিন ঘণ্টার পরিশ্রমে যদি এত লাভ হয়, তাহা হইলে পরিচর্য্যা-কার্য্য করিয়া কেন খাইবে?

আদৌ শুদ্ধবৈষ্ণবের উপকারার্থে মুষ্টি ভিক্ষার সৃষ্টি হয়। এখন উহা একটা ব্যবসায় হইয়া পড়িয়াছে। পীড়িত, অন্ধ, বৃদ্ধ ও অনাশ্রিত বালকেরাও মুষ্টিভিক্ষা পাইবার যোগ্য বটে। আজকাল তাহাদের প্রতি কেহ দৃষ্টি করেন না। ধর্ম্মধ্বজী বৈষ্ণব-বৈরাগীগণ জগতের কোন কার্য্যদ্বারা অন্ন সংগ্রহ করিবে না মনে করিয়া মুষ্টিভিক্ষা অবলম্বন করিয়াছে। ইহাদের হাত হইতে গৃহস্থদিগের নিস্তার নাই। দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ আসিয়া ভিক্ষা মাগিতেছে; যতক্ষণ প্রত্যেককে তণ্ডুল-মুষ্টি না দিবে, ততক্ষণ তাহাদের বাক্য যন্ত্রণায় গৃহস্থ টিকিতে পারিবে না। গৃহস্থ ও গৃহিণী যদি একটু সরিয়া গেলেন, সম্মুখে প্রাপ্ত ঘটী-বাটী-কাপড় ঐ সঙ্গে সঙ্গে সরিয়া পড়ে। (ইহাতে) গৃহস্থদিগের একপ্রকার বিপদ হইয়া পড়িয়াছে। 'প্রতিদিন এ বিপদে পড়িব না' —এই চিন্তা করিয়া কেহ কেহ রবিবারে ভিক্ষা দেন। সেদিন আর তাঁহাদের কোন প্রকারে নিস্তার নাই; কাঙ্গালী বিদায়ে দিনপাত হয়, কোন শুভকার্য্য করিতে পান না। যদি যথার্থ কাঙ্গালী হইত, তাহলে দানের সার্থকতা হইত।

বস্তুতঃ দাতাগণ অপেক্ষা গ্রহীতাগণ সুসম্পন্ন দাতাগণের মুষ্টি গ্রহণ করিয়াই উহারা এত অর্জ্জন করে যে, অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদের গৃহ-দ্বার-পশু প্রভৃতি সম্পত্তি হইয়া পড়ে। সময়ে সময়ে ভিক্ষুকগণ গৃহস্থগণকে এমন অমঙ্গলের ভয় দেখায় যে, তাঁহারা ভীত হইয়া ঋণ গ্রহণপূর্ব্বক ভিক্ষা দান করিয়া থাকেন। দরিদ্র গৃহস্থের আয় কি? প্রতিদিন যদি অর্দ্ধসের তণ্ডুল ঐরূপ অপাত্রে দিতে হয়, তাহা হইলে উহারা কিরূপে সংসার নির্ব্বাহ করিবেন? এই প্রথাটী যদি একেবারে উঠিয়া যায় তাহা হইলেও কোন দোষ হয় না।

ক্ষুধিত ব্যক্তিকে দুটী অন্ন ও সাধু-বৈষ্ণবকে সামান্য মিষ্টান্ন দান করিয়াও গৃহস্থদিগের কোন ক্ষতি হইতে পারে না; সেই পর্য্যন্ত ভিক্ষাদান বজায় রাখিলে ভাল হয়। ভিক্ষা-ব্যবসায়ীদিগকে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া গৃহস্থগণ অপরাধ করিতেছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। এখন সমাজ-সংস্কারের সময় এই কু-প্রথাটী রহিত করা চাই। তাহা হইলে সদ্‌গৃহস্থের অবস্থা ভাল হইবে। উপযুক্ত ভিক্ষুকের দুঃখ নাশ হইবে এবং সংসারের সাধারণ উন্নতি হইবে। "অপাত্রে দীয়তে দানং তদ্দানং তামসং স্মৃতম্"—এই ভগবদ্বাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক সকলেই সুপাত্রে দান করুন।*

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

---

* শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উক্ত প্রবন্ধ তাঁহার "শ্রীসজ্জনতোষণী" মাসিক পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৫৭-৫৯ পৃষ্ঠায় ১৩০১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, ইহাতে বর্ত্তমান সরকারের

বর্ণান্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৮৮ পৃষ্ঠার পর]

অক্ষজ চেষ্টা যে সর্ব্বত্র সাফল্য লাভ করিবে এরূপ নহে। বালকের ইচ্ছা হউক বা না হউক, তাহার পিতৃবর্গ বা সামাজিকবর্গ বংশের বা সমাজের কুলগত প্রথারক্ষার জন্য তাহাকে গুরুগৃহে যাইতে বাধ্য করেন। তাহাতে ফল হয় এই যে, পিতৃবর্গ বা অপরের প্রয়োচনাক্রমে তাঁহাদের প্রস্তাবিত কর্ম্মকাণ্ডে বালকের অনেক সময়ে যোগ্যতার অভাবে অথবা রুচির বৈষম্যে প্রার্থিত ফল লব্ধ হয় না। এই কারণেই বংশের শুভানুধ্যায়িগণের বিধানমত কার্য্য করিয়াও ব্রাহ্মণ বালক উপনীত হইলেও পরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা বর্ণবহির্ভূত শ্রেণী-বিশেষে বর্ণান্তরিত হন।

স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহদ্বয়েই বর্ণ ধারণ করে। দেহীর সকল বর্ণধারণ-যোগ্যতা দেহদ্বয় দ্বারাই সম্ভবপর হয়। হংস বা নির্গুণ ব্রাহ্মণ দেহধারণসত্ত্বেও বিরাট-পুরুষের সর্ব্বাঙ্গ-নিঃসৃত বলিয়া তাহার একমাত্র অপরিবর্ত্তনীয় নির্গুণ সত্তাই গুণজাতদর্শনে অনাত্মভূমিকায় চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। গুণ ও তদুত্থ কর্ম্মই দ্রষ্টার দর্শনে সমধর্ম্মা জীবের বর্ণের বিভাগ করিয়াছে। বিরাট্ সমষ্টি সমাজকে লক্ষণ-বিচারেই চারিভাগে বিভক্ত করা হয়। বিভাগ-পদ্ধতি বা লক্ষণদ্বারা ব্যক্তিবিশেষকে জানিতে হইলে তাহার স্থূল পরিচয় বা দেহের পূর্ব্ব পরিচয়াদি পিতৃকুলেই আবদ্ধ স্থির করিতে হয়। পরে তাহার সূক্ষ্ম পরিচয় বা বৃত্তগত পরিচয় বর্ণবিভাগ-কার্য্যের সহায়তা করে। সূক্ষ্ম পরিচয়ে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ

ভিক্ষুক-নিরোধ আইনের (Beggers Act এর) কতকটা সহায়ক হইতে পারে। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ ভিক্ষা বন্ধ কখনই করা হইবে না, বরং সুবিচারপূর্ব্বক সৎপাত্রে ভিক্ষা অবশ্যই দিতে হইবে। সাধু-সজ্জন, সন্ন্যাসী, ত্যাগী, বৈষ্ণবগণকে ভিক্ষাদ্বারা সাহায্য না করিলে গৃহস্থের কখনও মঙ্গল হইতে পারে না। ধর্ম্মার্থে দান সর্ব্বদাই করা কর্ত্তব্য। অপাত্রে দান চিরদিনই নিন্দনীয়। ব্যবসায়ী ভিক্ষুকদের ভিক্ষাবৃত্তি আদরণীয় নহে। কিন্তু দীন, দুঃখী, কাঙ্গাল, অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত, দুঃস্থ, বিপদগ্রস্তদের সহায়তা করা গৃহস্থগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। 'দান' মনুষ্য-জীবনের একটী প্রধান ধর্ম্ম—বিশেষতঃ কলিকালে। ধর্ম্ম কখনও উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না। 'দান'-ধর্ম্ম বজায় রাখিতে হইলে উহা গ্রহণ করার পাত্রও স্থির থাকা একান্ত প্রয়োজন।—**সম্পাদক**

দেখিতে গিয়া আমরা অনেক স্থলে স্থূল শরীরের মূল অনুসন্ধান করি। কিন্তু যদি সূক্ষ্ম শরীর স্থূল হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, সিদ্ধান্ত করি, তাহা হইলে ফলের খোসা হইতে তন্নিহিত বীজের উদ্ভব মানিয়া লইতে হয়। স্থূল শরীরই সূক্ষ্ম শরীরের জনক বলিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে সেরূপ ধারণা সূক্ষ্ম শরীরের ধারণায় অনুমোদিত হয় না। স্থূলের পতনে যখন সূক্ষ্ম শরীরের পুনরায় স্থূলগ্রহণ বিচারিত হয়, তখন সূক্ষ্মের পূর্ব্বাবস্থানই স্বীকৃত হয়। যাঁহারা জন্মান্তরবাদ বা কর্ম্মপদ্ধতি অনুমোদন করেন, তাহারা স্থূল হইতে সূক্ষ্মের উদ্ভব না মানিয়া সূক্ষ্মই স্থূল আবরণ গ্রহণ করেন, ইহাই বলিয়া থাকেন। বাসনাই গুণময় জগৎ হইতে স্থূল শরীরের উপাদান গ্রহণ করে। স্থূল শরীর বহির্জ্জগতের যে উপাদান পরবর্ত্তী সময়ে ক্রমশঃ গ্রহণ করেন, তাহা নিজের বা অপরের তাদৃশ সূক্ষ্মশরীর বা মনের অনুমোদনক্রমেই তাঁহার তাদৃশ রুচির উদয় হয় বা তাহাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়। এই চিদাভাস মন বা সূক্ষ্ম কারণই স্থূল-গ্রহণের হেতু।

দর্শন দ্বারা দৃশ্যবস্তুর বর্ণোপাদান স্থিরীকৃত হয়। ইন্দ্রিয়দ্বারাই দর্শনাদি হইতেই ধারণা বা ধর্ম্মের অভিব্যক্তি। যে কালে স্থূলদর্শন-প্রক্রিয়ায় দৃশ্য মানবের বাহ্য পরিচয় লক্ষিত হয়, তৎকালে মানবের বর্ণপরিচয় শৌক্রবিচারেই আবদ্ধ হয়। আবার চিন্তাশীল মানববৃন্দ বৃত্ত-বিচারকেই বর্ণ-নির্ণয়ের কারণরূপে নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু সকলেই সুষ্ঠুভাবে চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতে অসমর্থ হইবে, বিচার করিয়া সামাজিক স্থূল কার্য্যাদি নির্ব্বাহার্থে অর্থাৎ যৌনসম্বন্ধ প্রভৃতি নিরূপণ বিষয়ে শৌক্রপরিচয়কেই প্রাধান্য দেন। শৌক্র-পরিচয়-প্রাধান্যে লক্ষণ বা বৃত্তদ্বারা বর্ণনিরূপণ-পন্থা নানা প্রকারে বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকায় সাধারণ ধর্ম্মশাস্ত্র বা গৃহ্যসূত্রাদিতে সচরাচর এই বিষয়ের সুষ্ঠু মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রৌত ক্রিয়া যে কালে বিচাররহিত ভারবাহিগণের কর্ম্মফলভোগমার্গে পরিণত হইল, তৎকালেই পঞ্চরাত্র-বিধি শ্রৌতক্রিয়ার স্থানে সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত হন। বেদ আরণ্যক শুদ্ধসংখ্যান ভক্তিযোগ একত্র স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া পঞ্চবিধ জ্ঞান 'পঞ্চরাত্র' নামে তত্তৎস্থান অধিকার করিয়াছিল। কর্ম্মিগণ যাহাকে শ্রৌতানুষ্ঠান বলিতেন, আরণ্যকগণ তাহা হইতে তাঁহাদের নিজত্বে পার্থক্য স্থাপন করেন। পাঞ্চরাত্রিক বেদবিধান উপাসনামার্গে ভক্তগণের শ্রৌতানুষ্ঠান। উপনিষদ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞান নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুর শ্রৌতানুষ্ঠান। স্মৃতি ও পুরাণাদি শ্রুতি-বিষয়েই ঔজ্জ্বল্য সাধন করিয়াছেন। কর্ম্মি-শ্রৌত মলিন পদ্ধতিকে তাঁহারা একেবারে উৎসাদিত

না করিয়া তাহাকে অসম্পূর্ণ ও অবিবেকিগণের বিধান বলিয়া তাহারই সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। সেইজন্যই নারদ পঞ্চরাত্র বলেন,—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

শ্রৌতবিধান, স্মার্ত্তবিধান, পৌরাণিকবিধান ও পঞ্চরাত্র-বিধান সমতাৎপর্য্যবিশিষ্ট। যেখানে তাহাদের পরস্পর বৈষম্য নিরূপিত হইয়াছে, সেইখানেই হরি-ভজনকার্য্যে বা অন্বয়জ্ঞানে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। পঞ্চরাত্র-বিধান শ্রৌতবিধানের প্রতিকূল জানিলেই কাল্পনিক পঞ্চরাত্র-বিধি উৎপাতের কারণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে। শ্রৌতবিধি-গ্রহণে দেশ-কাল-পাত্র ভেদজনিত অযোগ্যতা যে শ্রুত্যনুকূল তন্ত্র বা শ্রুতিবিস্তৃতিদ্বারা অভাব-পূরণে সমর্থ ও সমতাৎপর্য্যবিশিষ্ট হয়, তাহাই পঞ্চরাত্র-বিধান। শ্রৌতবিধানের আনুগত্যে গৃহ্যোক্ত বর্ণাশ্রম-বিধিগুলির যথাযথ উপযোগিতা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় সেই অভাব পূরণের জন্য ও বৈদিকবিধান অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীনারায়ণের শ্রীবাক্য হইতেই পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র উদ্গত হইয়াছেন। পঞ্চরাত্রশাস্ত্র-সাহায্য না লইয়া যে বিবদমান শ্রৌতপদ্ধতি, তাহা অনেক স্থলে বাধা প্রাপ্ত হয়। বিষ্ণুর উপাসনা বিকৃত হইয়া যে পঞ্চরাত্রবিরোধ-বাদ শ্রৌতবিধির অঙ্কে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহা উৎপাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

কাল-প্রভাবে গৃহ্যোক্ত বিধিগুলি বা শ্রৌতবিধান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতেছে না। শাণ্ডিল্যের পঞ্চরাত্রের মহিমা, যাহা শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদবিরোধ বলিয়া বিবর্ত্তের আবাহন করিয়াছে, তাহাই শ্রীমহাভারতে সুষ্ঠুভাবে বেদানুকূল বলিয়া বহুপূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধান্তিত আছে। কর্ম্মী যাহাকে শ্রৌত বলিয়া নিজ মহত্ত্ব-প্রচারে ব্যস্ত হন, তাহাই পঞ্চরাত্রবিদ্‌গণের বিচারে বিষ্ণুভক্তি-বিরোধী হওয়ায় জড়ভোগ মাত্র। বেদশাস্ত্রই কর্ম্মিগণের হস্তে পড়িয়া যে ভগবদ্-বিস্মৃতি আনয়ন করে, পঞ্চরাত্রবিদ্‌গণ সেই বেদশাস্ত্রই হরি-উপাসনার আকরস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বেদশাস্ত্রের ভোগপর কর্ম্মকাণ্ড, ত্যাগপর জ্ঞানকাণ্ড ও ভোগত্যাগাতীত ভগবৎসেবাপর উপাসনাকাণ্ড সম্প্রদায়ত্রয়ে পরস্পর ভেদ উৎপন্ন করে। সকলেই বেদানুগ-চেষ্টাবিশিষ্ট হইলেও তাহাদের মধ্যে তারতম্য আছে। সুতরাং বর্ণাশ্রমাদি-বিচার ও কর্ম্মি জ্ঞানি-ভক্ত-ত্রিবিধ সমাজে শ্রৌত-গৃহ্য-সূত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়ে যে ভেদ আছে, তাহা লইয়া বিবাদ করিতে গেলে সুফল লাভ করা কঠিন।

গৃহসংস্কার-গ্রহণে বয়োবস্থাবিধি শ্রীমহাভারত, সাত্বতসংহিতা ভাগবত, পঞ্চরাত্র প্রভৃতিতে বেদতাৎপর্য্য যেরূপভাবে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

অনধিকারীর নির্জ্জন-ভজনের ছলনা—ইন্দ্রিয়-তর্পণপর ও হরিভজন-বিরোধী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা
পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)।
১৯।৮।১৯৬৩

স্নেহাস্পদেষু—

* * * * মহারাজ! আপনি * * * * মহারাজকে পত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে আপনার ঠিকানা দেখিয়াছিলাম। সেই ঠিকানায় পত্র দিতেছি, পাইবেন কিনা বুঝিতেছি না।

আমার বর্ত্তমানে শরীরের অবস্থা বিশেষ ভাল নহে। আগামীকল্য রক্ত পরীক্ষা হইলে নূতনভাবে চিকিৎসা আরম্ভ করিতে পারি।

এ বৎসর আগামী শুক্রবার ২৩।৮।৬৩, বাংলা ৬ই ভাদ্র তারিখে হাওড়া হইতে কেদার-বদ্রী পরিক্রমার জন্য * * * মহারাজ, * * * মহারাজ ও * * * যাইতেছে। তাহারা সর্ব্বমোট ১৫ জনের টিকিট কাটিয়াছে। আরও ২/১ জন হইলে হইতে পারে। তাহারা Hill Concession-এ Return করিয়া প্রথমে দেরাদুন যাইবে। তথা হইতে হরিদ্বার আসিবে। হরিদ্বার দর্শন করিয়া ঋষীকেশ যাইবে। তাহাদের সহিত আপনার দেখা হইবে কিনা বলিতে পারি না। আপনার নির্জ্জন ভজনের ব্যাঘাত হইলে দেখা করা বোধ হয় সম্ভব হইবে না।

আমরা আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট শুনিয়াছি,—**নির্জ্জন ভজন ইন্দ্রিয়তর্পণের নামান্তর; সুতরাং তাহা হরিভজনের বিরোধী।** শতকরা ১০০ জন ঐ শ্রেণীর লোককে পতিত হইতে দেখা যায়। হরিভজন না হইলে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাই হয়। আপনি যেরূপ আদর্শ (?) স্থাপন করিলেন, তাহা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পক্ষে হানিকর।

আপনি বৃদ্ধ ও বুদ্ধিমান্। আপনাকে অধিক লেখা আমার বাহুল্য। আপনার এইরূপ জীবন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমার নিকট সুস্পষ্টভাবে জানান প্রয়োজন ছিল। আমি আপনার কার্য্যকলাপে অবাক্ হইয়াছি। শরীর অপটু হইলেও যে কোন মঠে থাকিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতে পারিতেন। তাহাতে ইহকাল ও পরকালে মঙ্গল হইত।

সংস্কৃত পরীক্ষায় এবার ৫ জন পাশ করিয়াছে। * * * ও * * * ফেল করিয়াছে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রীব্যাসপূজা কাহাকে বলে ?

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠান বিশেষভাবে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। 'শ্রীব্যাসপূজা' অর্থে শ্রীব্যাসদেবের পূজাকেই লক্ষ্য করে। আবার শ্রীব্যাসদেবের পূজা বলায় কোন্ বস্তুটী লক্ষীভূত হয়, তাহা সুষ্ঠুভাবে অনুভূত না হইলে শ্রীব্যাসপূজা ও শ্রীগুরুপূজার ঐক্য উপলব্ধি হয় না। জ্যামিতি-মতে 'ব্যাস' অর্থে পরিধিদ্বারা সীমাবদ্ধ কেন্দ্রে অবস্থিত সরলরেখাকে বুঝায়। এরূপ সরলরেখা অসংখ্য হইতে পারে; কিন্তু অসংখ্য হইলেও প্রত্যেকটিরই একই ধর্ম্ম। সেইরূপ ব্যাসও বহু হইলেও প্রত্যেকেই মূলতঃ একই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। গোলোক-মধ্যস্থিত কেন্দ্রকেই কৃষ্ণ কহে। তাহাতে সন্নিহিত রেখাস্বরূপ শক্তিই শ্রীব্যাস। তাঁহাকে কখনও অংশ, কখনও শক্তিরূপে গণনা করা হয়। বেদাদি-বিভাগ কার্য্যদ্বারা বদ্ধজীবকে কৃষ্ণসম্বন্ধ স্মরণ করাইয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করাই শ্রীব্যাসের কার্য্য। ব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুদেবেও তাহাই প্রধানরূপে দৃষ্ট হয়। একারণ শ্রীগুরুদেবই শ্রীব্যাসদেব, শ্রীব্যাসদেবই শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীগুরুপূজাই শ্রীব্যাসপূজা।

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" বাক্যে কৃষ্ণকেই আচার্য্য বলিয়া জানিতে নির্দ্দেশ রহিয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরও অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের শিক্ষাদান করিয়াছেন। "গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥" গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণেরই রূপ। শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবানের প্রিয়তম-জ্ঞানে অভেদরূপে দর্শন করেন। তজ্জন্য শ্রীগুরুদেবের সেবাই ভগবৎ-সেবা; শ্রীভগবৎসেবা বলিয়া পৃথক্ আর কি আছে? সেইহেতু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীগুরুপূজাই করিয়া থাকেন। ইহা কনিষ্ঠাধিকারে বা বদ্ধাবস্থায় কখনই ধারণা হইতে পারে না।

'পূজা'-শব্দদ্বারা কোন্ বস্তুকে লক্ষ্য করা হইবে? পুষ্প-চন্দন-ধূপাদি পঞ্চ বা ষোড়শোপচারদ্বারা অর্চ্চনকেই কেবলমাত্র পূজা বলা হয় না। অর্চ্চনা সাধারণতঃ কনিষ্ঠাধিকারে ব্যবস্থাপিত হয়। কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অনুধাবন করিতে না পারিলে অর্চ্চনা সার্থক হইতে পারে না। সুতরাং Ontology কে পরিত্যাগ করত কেবল Morphology তে নিবদ্ধ না থাকিতে শাস্ত্রে প্রচুর নির্দ্দেশ পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীগুরুদেব বা শ্রীব্যাসদেবের প্রীতি কিভাবে সাধিত হয় তাহা যিনি অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন তিনিই প্রকৃত শ্রীব্যাস-পূজক বা শ্রীগুরুপূজক।

'নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ" বাক্য হইতে জানা যায়, পূজা বা সেবা—সাক্ষাৎ চিদ্‌রাজ্যেই সম্ভব। মায়িকাবস্থায় সেই চিদ্‌বৃত্তির সম্যক্ উদয় না হইলেও তদুন্মুখী-ভাবকে আশ্রয় করিয়া সাধন করিতে করিতে মায়িকভাব অপনোদিত হয় ও পরিশেষে চিদ্‌বৃত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। জীবন্মুক্ত-অবস্থায় জীব তখন হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত হইয়া নিজকে তৎসেবক বলিয়া জ্ঞানলাভ করে। তখন মায়াবৃত্তির কোন প্রভাব তাহাতে কার্য্য করিতে পারে না। যে শক্তি-প্রভাবে বদ্ধজীব সেই চিদ্ভাব লাভ করিতে পারেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। এজন্য শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত বদ্ধজীবের সেই পরম-ভাব লাভের আর অন্য কোন উপায় নাই। শাস্ত্র বলেন,—

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"। (ছাঃ ৬।১৪।২)
তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)
নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং, স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং, নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥
(ভাঃ ৭।৫।৩২)

[আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তিই সেই পরব্রহ্মকে জানেন। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসু ব্যক্তি উত্তমশ্রেয় অবগত হইবার জন্য সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিবেন। যিনি 'শব্দব্রহ্মে' অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, 'পরব্রহ্মে' নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য যিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভের বশীভূত নহেন, তিনিই সদ্‌গুরু। যাবৎ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের পদধূলিদ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ গৃহব্রতগণের মতি অনর্থনাশক কৃষ্ণপাদ-পদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।]

গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় ব্যতীত কাহারও চিদ্রাজ্যে প্রবেশাধিকার সম্ভব হয় না; কিন্তু কি-প্রকার জীব শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিবে? তদ্বিষয়ে বদ্ধজীবের স্বাভাবিক রুচি কখনই পরিদৃষ্ট হয় না। এক্ষেত্রে জীবের পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতিই তাহাকে এইরূপ সৎসঙ্গলাভের সুযোগ দান করে।—

"সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ।"
"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত-সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ, পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥"

[হে অচ্যুত! ভব-ভ্রমণ করিতে করিতে অপবর্গ অর্থাৎ তাহার সমাপ্তি

হইলে যখন জীবের সৎসঙ্গ লাভ হয়, তখনই সদ্‌গতি ও পরাবরেশ্বর-স্বরূপ তোমাতে রতি জন্মে।]

"এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥"

অতএব ভাগ্যবান্ অর্থাৎ সুকৃতিশালী জীব ব্যতীত কেহ কখনও সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে পারে না; আবার সদ্‌গুরু আশ্রয় না হইলে কর্ম্ম-জ্ঞানাদি নানামার্গে জীবের ভ্রমণ করিতে হয়, বৈকুণ্ঠরাজ্যে প্রবেশাধিকার ও চিন্ময় সেবাফল প্রেমধনে অধিকার লাভ হয় না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীল ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯৪ পৃষ্ঠার পর]

অতএব 'গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥" এখন কেউ কেউ বলবেন—শিক্ষাগুরু ও তাঁর প্রাধান্য। "শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ,—এই দুই রূপ॥" দুটো ভাগে ভাগ করেছেন শিক্ষাগুরুকে। অন্তর্য্যামিরূপে রয়েছেন সেই চৈত্যগুরু, আর ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে মহান্তগুরু বা দীক্ষাগুরু। অন্যান্য শিক্ষাগুরুগণ যে প্রাধান্য দিচ্ছেন—দীক্ষাগুরুগণ অপেক্ষা শিক্ষাগুরু শ্রেষ্ঠ, সেটা হতে পারে না।

শুক্রাচার্য্য কোন্ গুরু হলেন?—তিনি প্রকৃত গুরু নন। যেমন—পরশুরাম। ভীষ্মদেব গুরু পরশুরামকেও ত্যাগ করলেন। কিন্তু কেন ত্যাগ করলেন? তিনি ত' ভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার। ভীষ্মদেব ত' তাঁর শিষ্য। অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে ভীষ্ম জয় করে এনেছিলেন। অম্বিকা এবং অম্বালিকাকে ভাই বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। কিন্তু অম্বা শল্যরাজকে ভালবাসতেন। শল্যরাজ অম্বাকে বিবাহ করল না। তখন অম্বা ভীষ্মকে বিয়ে করতে চাইল। কিন্তু ভীষ্ম বললেন,—আমি ত' প্রতিজ্ঞা করেছি বিবাহ করব না। তুমি গুরুর কাছে যাও। গুরু বললে 'গুরোরাজ্ঞা হ্যবিচারণীয়া'—গুরুর আজ্ঞা অবিচারে পালন করতে হয়। পরশুরামের কাছে গেলেন। পরশুরাম ভীষ্মকে বিয়ে করতে বললেন। কিন্তু ভীষ্ম বললেন,—

সে কি গুরুদেব! আমি ত' প্রতিজ্ঞা করেছি আকুমার ব্রহ্মচারী থাকব, জীবনে বিয়ে করব না, আর আপনি গুরু হয়ে একি কথা বলছেন! পরশুরাম বললেন,—আমি গুরু বলছি—বিবাহ কর।

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

উৎপথগামী গুরুকে পরিত্যাগ করাই বিধি। ভীষ্ম গুরুকে পরিত্যাগ করলেন। তখন গুরু বললেন,—'যুদ্ধং দেহিং'। যুদ্ধ কর। আঠার দিন যুদ্ধ করে ভীষ্ম পরশুরামকে পরাস্ত করে জয়লাভ করেছিলেন। এইজন্য তাঁর নাম হয়েছিল 'রামজয়ী'। অতএব এই যে বাইরের যোগ্যতা, এটা গুরুর কার্য্য নয়। গুরু কে?—যিনি ভগবানের পাদপদ্ম দেখিয়ে দিতে পারেন, তিনি প্রকৃত গুরু। কতকগুলো Power সঞ্চয় করলাম, তার দ্বারা গুরু হয়ে যাব, ভগবানকে পেয়ে যাব—সেটা হবে না। যোগীদের অনিমা, লঘিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব প্রভৃতি সিদ্ধি লাভ হয়। কিন্তু সিদ্ধির দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যাবে না।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি, তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

চৈত্ত্যগুরুর সঙ্গে জীবের সাক্ষাৎ নাই। 'চৈত্ত্যগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে'—অতএব মহান্তগুরু-স্বরূপে তিনি গুরু হন। মহান্তগুরুই দীক্ষাগুরু। শিক্ষা-গুরুকে মহান্তগুরু কোথাও বলা হয় নাই। স্পষ্টভাবে এখানে বলেছেন—কে খণ্ডন করবেন করুন এই কথা।

ভগবৎশিক্ষা দিলেই কি তিনি শিক্ষাগুরু হবেন? শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরুর আনুগত্যে সেবা করার শিক্ষা দিবেন। দীক্ষাগুরুকে বাদ দিয়ে যদি তিনি নিজে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র ন্যায় ব্রহ্মা হয়ে যান, তা কখনও হতে পারে না। দীক্ষাগুরু হচ্ছেন মহান্তগুরু—যিনি জীব উদ্ধার করার জন্য এসেছেন। গুরু দুই প্রকার—নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ। ভগবান্ গুরুকে পাঠান জগতে কখনও নিত্যসিদ্ধ করে, আবার কখনও সাধনসিদ্ধ করে। দীক্ষাগুরু যদি ভগবৎপ্রেরিত জন হন, তিনি শিষ্য করবেন লোককে উদ্ধার করবার জন্য। তিনি ত' প্রেরিত সন্তান জীবকে উদ্ধার করবার জন্য। এইজন্য তাঁকে মহান্তগুরু বলা হয়েছে। তিনি ভগবানের আদেশ প্রতিপালন করে থাকেন। ভাল করে জিনিসটা বুঝতে হবে।

বৌদ্ধবাদ যখন জগৎটাকে আচ্ছন্ন করল, দয়াধর্ম্ম প্রচার করলেন বৌদ্ধরা,

তখন শিবকে ডেকে স্বয়ং ভগবান্ বলছেন,—যাও তুমি জগতে। জগতে গিয়ে তুমি বেদের কদর্থ কর।—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

আমাকে বাদ দিয়ে জীবকে ব্রহ্ম করে দাও। 'মাঞ্চ গোপয়'—আমাকে গোপন কর, আর 'সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা'—বহির্ম্মুখ সৃষ্টি যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। শিব হাতজোড় করে বললেন,—প্রভু! আমি এ কাজ করতে পারব না। আমি আপনাকে গোপন করতে পারব না। তখন ভগবান্ বললেন,—তুমি ছাড়া এ কাজ হবে না। এখন এটা দরকার। মায়াবাদ—নির্ব্বিশেষবাদ স্থাপন করতে হবে এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ তোমাকে বলতে হবে।

ভগবানের কথাতে শিব আসলেন শঙ্করাচার্য্য হয়ে। কিন্তু শেষে পারলেন না তিনি ভগবানকে গোপন করতে। আচার্য্য শঙ্কর একল কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর জন্মস্থান কেরলে। আর শেষে বলে গেলেন,—'ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং গোবিন্দং ভজ মূঢ়মতে।' এটা কাঞ্চীপুরমের শঙ্করপন্থিগণ স্বীকার করেন না।

আরও একটা উদাহরণ দিচ্ছি।—শিব যখন কাশীতে ছিলেন, তখন একদিন শঙ্করাচার্য্য মণিকর্ণিকার ঘাট দিয়ে আসছিলেন। দুর্গাদেবী মৃতবৎ শিবকে কোলে নিয়ে রাস্তায় শুয়ে আছেন। শঙ্করাচার্য্য এসে বলছেন,—আপনি এ কি করছেন! মড়া নিয়ে শুয়ে আছেন! সরে যান, নইলে যাব কি করে? তখন মেয়েটী উত্তর করছেন,—আপনার সিদ্ধান্ত কি? আপনি বলেছেন—'জীব ব্রহ্ম', 'সর্ব্বব্রহ্মমিদং জগৎ'। যদি 'সর্ব্বব্রহ্মমিদং জগৎ' হয়, তাহলে আপনি মড়া দেখছেন কি করে? আপনার সিদ্ধান্ত কিরূপে বজায় থাকে? তখন শঙ্কর অবাক্ হয়ে গেলেন। একটা মেয়ে আমাকে এরকম কথা বলছে! এরূপ বলার পর দুজনে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। শিব-দুর্গা নিজেই এসেছিলেন তত্ত্বদর্শন প্রকাশ করার জন্য। অতএব নির্ব্বিশেষ মতবাদ—অদ্বৈতবাদ টিকবে না। এতে অকাট্য কোন যুক্তি নাই; সুতরাং অদ্বৈতবাদ অপ্রমাণিত।

শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু-তত্ত্ব কি করে জানা যাবে? "কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥" তর্কের দ্বারা কি জানা যাবে? —না, 'কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে'—এখানে কোন ভাগ্যবানে বলেছেন, সকলের ভাগ্যে হবে না। 'গুরু অন্তর্যামি-

রূপে শিখায় আপনে ॥'—তিনি অন্তর্যামিরূপে শিখাবেন। কৃষ্ণ কৃপা করে ত' গুরুদেবকে পাঠিয়েছেন। কৃষ্ণ যদি কৃপা করে গুরুকে না পাঠাতেন, তাহলে আপনি কৃষ্ণকৃপাটা লাভ করতেন কোথা থেকে? গুরুকে ত' পাঠালেন সেইজন্য আপনার কাছে। আপনি যদি আধার তৈরী করেন, তাহলে ঠিক আপনার আধারে সেই কৃপাটা আপনা থেকে এসে যাবে। শ্রীল জীবগোস্বামি-পাদ লিখেছেন,—'ভগবৎকৃপা ভক্তকৃপাগামিনী, ভক্তকৃপা ভগবৎকৃপা-গামিনী।' ভগবানের কৃপাটা গুরুকৃপায় লাভ হবে এবং গুরুকৃপাটা ভগবানের কৃপায় লাভ হবে। এটা ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। ভগবান্ কৃপা করলে আমি গুরুকৃপা পাব, গুরু কৃপা করলে আমি ভগবানের কৃপা পাব। কিন্তু শিক্ষাগুরু যেখানে দম্ভ করছেন—'আমি দীক্ষাগুরুর মত সম্মানের পাত্র', সেইটাকে অন্যায় বলা হয়েছে। কেন শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরুর সম্মান পেতে চাচ্ছেন? তোমার একজন গুরুভাই শ্রেষ্ঠ। নিশ্চয় প্রণাম করবে তাঁকে, কিন্তু তোমার গুরুদেবের সম্মুখে নয়—এইটাই বক্তব্য। গুরুদেবের কোন গুরুভাই দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর গুরুভাইকে প্রণাম করব, না—তাঁকে প্রণাম করব? গুরুকে প্রণাম করব—এই হল সিদ্ধান্ত। তিনি যদি বলেন যে, মহারাজকে প্রণাম কর, তাহলে প্রণাম করতে পার। সেটাতে অন্যায় হবে না। আমরা মহাজন-পদাবলীতে পাই,—

"শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে ॥
গুরু-মুখপদ্ম-বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরু-চরণে রতি, এই সে উত্তমা গতি,
যে প্রসাদে পুরে সর্ব্ব আশা ॥
চক্ষু-দান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেম-ভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত ॥"

গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে এখানে কি বলে গেলেন? 'সেই সে পরমবন্ধু সেই

পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥' অতএব এই জগতের যথার্থ পিতা হলেন গুরুদেব।

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেবঃ॥

আমি বৃটিশ আমলে যখন রেঙ্গুন, বার্ম্মাতে প্রচারে গিয়েছিলাম, তখন শ্রীপাদ যাচক মহারাজ ও আমি একসঙ্গে ছিলাম। একদিন "জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'। কৃষ্ণের 'তটস্থা শক্তি' ভেদাভেদ-প্রকাশ॥"—এটা আমি পড়ছি। পড়ে যাচক মহারাজকে বলছি,—মহারাজ! আমি একথা স্বীকার করি না। সেকি! শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন, আর তুমি একথা স্বীকার কর না! আমি একটী প্রবন্ধ লিখে দৈনিক 'নদীয়া প্রকাশ' পত্রিকায় দিলাম। তখন শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ সম্পাদক ছিলেন এবং শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ (শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী) প্রকাশক ছিলেন। আমি তখন 'ভৃত্যের পরিচয়' বলে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তাতে লিখেছিলাম,—'কৃষ্ণের দাস হয় মোর পরিচয়'—কথাটা ঠিক লিখেছেন। কিন্তু এখন আমি এটা স্বীকার করি না। কেন?—কৃষ্ণের সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নাই, আমি তাঁকে দেখি না, চিনি না, কিছু বুঝি না, তাঁকে পাই না। শেষে লিখেছিলাম—'গুরুর দাস হল মোর পরিচয়।' আমার পরিচয় যদি কিছু থেকে থাকে সেটা হল 'আমি গুরুদাস'। প্রভুপাদ সে প্রবন্ধটী পড়ে চোখের জল ফেলে বলেছিলেন,—এইটুকু ছেলে এতবড় কথা লিখল। শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি প্রভুকে বললেন,—তুমি লিখে দাও, গুরুদেব তোমাকে আশীর্ব্বাদ করেছেন তোমার সিদ্ধান্ত পড়ে। ঠিকই ত' আমরা কৃষ্ণকে কোথায় দেখছি। আমরা কৃষ্ণকে পাথর দেখছি। আমার এই যে মাটিয়া বুদ্ধি, জড়ীয় বুদ্ধি, এটা অপসারিত করে দিবেন যিনি, আমার চোখের ছানিটা কাটিয়ে দিবেন যিনি, তিনি হলেন শ্রীগুরুদেব। তাঁর করুণায় ভগবানের দর্শন হবে। অতএব তাঁকে বাদ দিয়ে মহত্বটা কার দেব? আমি অন্যের মহত্ব দেব কিসে?—আমার গুরুকৃপা লাভের জন্য। আমার গুরুকৃপা-বঞ্চিত জীবনে আমি কারও মহত্ব—শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে রাজী নই, তিনি যে কেউ হোন না কেন।

গরুড় শ্রীরামচন্দ্রের কাছে গেছেন। গিয়ে কি বলছেন?—'বংশী ধরিয়ে ছাড়িয়ে ধনুর্ব্বাণ।' গরুড় প্রণাম করছেন না রামচন্দ্রকে। ধনুর্ব্বাণ ছেড়ে দিয়ে বংশী ধর, তবে তোমাকে প্রণাম করব। হনুমান গেছেন কৃষ্ণের কাছে।

গিয়ে বলছেন,—'ছাড়িয়ে বংশীধ্বনি ধরিয়ে ধনুর্ব্বাণ।' নিষ্ঠাটা কোথায়?—

'শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদে পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্ব রামঃ কমললোচনঃ॥'

আমার সর্ব্বস্ব হল শ্রীরাম-কমললোচন। আর আমার কেউ নাই। অতএব নিষ্ঠা—শিষ্যের গুরুনিষ্ঠা রাখতে হবে। গুরুনিষ্ঠার দ্বারা ভগবানের পাদপদ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়। গুরুনিষ্ঠা ব্যতীত কাহারও ভগবানের পাদপদ্ম লাভ হয় না। শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের শিষ্য হয়ে আমি বলছি,—যদি অন্য কেউ শিষ্য করেন, তাঁর শিষ্য গুরুকে যথাযোগ্য সম্মান দিবেন। যদি সম্মান না দেন, তাহলে পরমার্থ জীবনযাপন তার হতে পারে না। এইটাই হল সিদ্ধান্ত।

"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্"

কুহকিনী আশার ছলনায় মোহিত হইয়া মায়াবদ্ধ জীবগণ "দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ" রব তুলিয়া অলীক সুখের সন্ধানে ভবাটবীতে ইতস্ততঃ ঘুরপাক খাইয়া মরিতেছে। তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের মরীচিকায় বারি অনুসন্ধানের ন্যায় তাঁহারা ছলনাময়ী আশা-বিস্তারিত জড়সুখের প্রলোভনের ফাঁদে পা দিতে গিয়া চিরকালের জন্য আত্মসুখ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। মহারাজ বিক্রমাদিত্য এক সময়ে রাক্ষসের প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে বলিয়াছিলেন,—"আশা বৈতরণী নদী।" আশা বৈতরণী নদীর ন্যায়, অপর পারে যাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য অর্থাৎ আশার প্রলোভনের ফাঁদ হইতে মুক্ত হওয়া জীবগণের পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর ব্যাপার। জীবনকল সাধ্যাতীত বস্তুকে লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া বৃথা আয়ুক্ষয় করিয়া থাকে। কথায় বলে,—"আশা করেছেন কাও, পাকলে খাবেন ডেও।" কিন্তু ড্যাঁফল পাকিবার পূর্ব্বেই যদি কাকের মৃত্যু হয়, তবে তাহার কখনও ড্যাঁফল খাইবার আশা পূরণ হয় না। জীবগণের আয়ুকাল অতি ক্ষণস্থায়ী, তাই আশার হাতছানিতে সাড়া দিতে গিয়া আত্মবঞ্চিত হওয়া কি তাহাদের বুদ্ধিমানের কাজ হইবে?

আশার শেষ নাই। দরিদ্র শতপতি হইতে চায়, শতপতি সহস্রপতি হইবার বাসনা করে, সহস্রপতি লক্ষপতি হইতে কামনা করে, লক্ষপতি কোটিপতির ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করে, কোটিপতি রাজা হইতে চায়, রাজা সম্রাট্ হইবার ইচ্ছা করে। তাই এক প্রাকৃত কবি গাহিয়াছেন,—

এ জগতে হায়, সেই বেশী চায়, আছে যার ভুরি ভুরি।
রাজার হস্ত, করে সমস্ত, কাঙ্গালের ধন চুরি॥

মানুষ অধিক আশা করিতে গিয়া নিজের অধঃপতন ডাকিয়া আনে। কথায় বলে,—"আশায় মরে চাষা।" চাষী প্রচুর ফসল পাইবার আশায় চাষ করে, কিন্তু যদি সুবৃষ্টি না হয় তাহা হইলে ফসল জন্মে না, চাষীকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। "আশার অর্দ্ধেক ফল।" কোন কোন ক্ষেত্রে যতটা আশা করা যায়, ততটা লাভ না হইলেও, আংশিক লাভে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। কিন্তু এই আংশিক প্রাপ্য বস্তুও জীবের দুঃখের কারণ হয়। "আশার" স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া কোন এক প্রাকৃত কবি গাহিয়াছেন,—

ধন্য আশা কুহকিনী ; তোমার মায়ায়
মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন॥

ইন্দ্রিয়সুখান্বেষী জীবগণ মৈথুন ধর্ম্মাশ্রয়ে দুঃখ পরিহারপূর্ব্বক সুখের আশায় অগ্রসর হয় এবং ভোগী হইয়া কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বে আত্মনিয়োগ করে। যাঁহারা কর্ম্মফল পূর্ব্বেই দর্শন করিতে পারেন, তাঁহারা এই শ্রেণীর দুর্দ্দশা লক্ষ্য করেন। ইহজগৎ ও কর্ম্মফললভ্য পরলোক—উভয়ই দ্বেষ-হিংসাদিপূর্ণ ও নশ্বর। দেহাভিমানী জীব কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলদ্বারা উত্তরোত্তর দেহধারণের নিমিত্ত বাসনারাশিযুক্ত কর্ম্মসমূহের আচরণসহকারে সুখ-দুঃখাত্মক কর্ম্মফল অনুভব করিয়া সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। কর্ম্মপরবশ জীব দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদি বিবিধ দুঃখপ্রদ গতিলাভ করিয়া ভৌতিক প্রলয়কাল পর্য্যন্ত জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ ভোগ করিতে থাকেন। সুখের জন্য—ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য বদ্ধজীবের সকল অনুষ্ঠানই দুঃখে পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং যে আশায় আশান্বিত হইয়া তাহাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তি, তাহা সুখ প্রসব করিতে না পারিয়া অধিকতর দুঃখ আনয়ন করে।

প্রভু ও দাস, পিতা ও পুত্র, পতি ও পত্নী প্রভৃতি পরস্পরের সহায়তা গ্রহণ করিয়া যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভ করে, তদ্দ্বারা জীবের নিত্য চরমকল্যাণ সাধিত হইতে পারে না, কেবল আপেক্ষিক ধর্ম্মে জীব সংসারে ভ্রাম্যমান হয়। সাংসারিক সুখ ও দুঃখ স্বতঃই লভ্য হয়, আবার অনেক সময় বহু প্রয়াসেও লভ্য হয় না। গৃহ, অপত্য, ধন, আত্মীয় ও পশু প্রভৃতি সকলই অনিত্য বলিয়া কখনও জীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধানে সমর্থ হয় না। কর্ম্মসঞ্চিত বিত্ত সর্ব্বতোভাবে ক্লেশদায়ক হইয়া তাহাদিগকে আত্মঘাতী করায়। ইন্দ্রিয়সমূহ ও বিষয়সমূহ নিত্যকাল স্থায়ী নহে এবং তাহাদের বিনাশ আছে বলিয়া প্রাপঞ্চিক

কষ্টলব্ধ কোন দ্রব্যদ্বারা বাস্তবিক প্রীতি সাধিত হইতে পারে না। উদাহরণস্বরূপে, শ্বশুর বাড়ী স্বর্গের ন্যায় মনোহর স্থান, কিন্তু তিন দিনের বেশী থাকিতে নাই, থাকিলে অপমানিত হইতে হয়। তাই প্রবাদবাক্যে পাওয়া যায়—"One day a guest, two days a guest, three days a pest". আবার ভোগের দ্বারা ভোগপ্রবৃত্তি নিরসনের চেষ্টা হস্তীস্নানের ন্যায় বৃথা। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে যযাতি মহারাজ তাঁহার স্ত্রী দেবযানীকে বলিয়াছেন,—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ (ভাঃ ৯।১৯।১৪)

"ঘৃতদ্বারা অগ্নি যেরূপ নির্ব্বাপিত হয় না, পরন্তু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা ভোগপিপাসা বর্দ্ধিত হইয়া যায়, উপশম প্রাপ্ত হয় না।"

শ্রীহরিভজন করিবার আশাই—প্রকৃত নৈরাশ্য

ভোগময় জড়জগতে ভোক্তার নিত্য অশান্তি বিরাজমান। ত্রিবিধ তাপ শ্রেয়ঃপথের অন্তরালে অবস্থিত থাকিয়া সুযোগ পাইলেই অসতর্ক জীবকে নশ্বর জড়ভোগের ভোক্তা করিয়া তুলে। কর্ম্মফলের আশা জীবের কোন মঙ্গল উৎপাদন করিতে পারে না। তাই নিজ কর্তৃত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করা ও কর্তৃত্বমুখে কর্ম্মফল লাভ করা জীবের মন্দবুদ্ধিরই পরিচয় মাত্র। আত্মদর্শিগণ ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ্যবিষয়সমূহ অনিত্য জানিয়া ঐ সকল বিষয়ের চিন্তা ও উপভোগ করেন না। তিনি জানেন যে, শ্রীহরি-স্মরণ ব্যতীত ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়সমূহের অনুক্ষণ চিন্তায় সংসারবন্ধন ও আত্মনাশ হইয়া থাকে। বিষয়াসক্ত দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে যাহা অত্যন্ত কষ্টজনক, স্বয়ং জরাগ্রস্ত হইলেও যাহা জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় না; সেই দুঃখরাশি—বহনকারিনী ভোগ-পিপাসাকে প্রকৃত সুখাভিলাষী ব্যক্তি অতি শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। রাজা যযাতি বহুবর্ষ পর্য্যন্ত বিষয়ভোগে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু পক্ষদ্বয় উৎপন্ন হইলে, পক্ষীশাবক যেরূপ নীড় পরিত্যাগ করে, সেইরূপ যযাতিও ইন্দ্রিয়সুখের আশা ক্ষণিকের মধ্যে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে,—

যস্য যোগং ন বাঞ্ছন্তি বিয়োগভয়কাতরাঃ।
ভজন্তি চরণাম্ভোজং মুনয়ো হরিমেধসঃ॥ (ভাঃ ৯।১৩।৮)

"হরিবুদ্ধিসম্পন্ন মুনিগণ—'দেহের বিয়োগ হইবে'—এই ভয়ে কাতর

হইয়া দেহযোগ অর্থাৎ দেহগত সুখ বাসনা করেন না, কিন্তু কেবল সেবাসুখ-বাসনায় ভগবৎপাদপদ্ম ভজন করিয়া থাকেন।"

জড়ভোগের আশায় জড়ে প্রতিষ্ঠিত হইবার কু-বাসনা কখনও বদ্ধজীবকে রাবণ, কংস ও জরাসন্ধ বা অঘ-বক-পুতনার আনুগত্য করাইয়া প্রতিষ্ঠাশা-পরায়ণ করায়। জড় জগতের ক্ষণভঙ্গুর আশা-প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া বৈষ্ণবানুগত্যে শ্রীহরিভজনে প্রবৃত্ত হইলে বদ্ধজীবের সমস্ত মঙ্গল করায়ত্ত হয়। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

'হরি' ব'লে দেও ভাই আশার মুখে ছাই রে।
(আশার ত' শেষ নাই রে)।

ফল্গুবৈরাগ্য জীবকে দাম্ভিক করিয়া তুলে; যুক্ত বৈরাগ্যই জীবকে বিশুদ্ধসত্ত্বে বা অপ্রাকৃত বিচারে অবস্থান করায়। জড়ভোগের আশা-ভরসার প্রদীপ নির্ব্বাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীহরিপদপঙ্কজ-সেবায় ভক্তের আশা স্থান লাভ করিতে পারে না।

সংসারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহে মানবের ইন্দ্রিয়গুলি আকৃষ্ট হয়, উহাই বদ্ধজীবের মূঢ়তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সেবা-বিমুখ ব্যক্তি কপটতা করিয়া কিছুকালের জন্য যে ইন্দ্রিয়বৃত্তি স্তব্ধ করেন, তাহা তাহার অমঙ্গলের জন্য সাধিত হয়। নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান-রাহিত্যই এই অমঙ্গলের কারণ। মূঢ়তা-প্রযুক্ত জীবগণই জড়ের ভোক্তৃ পুরুষগণকে স্বীয় প্রভু-জ্ঞানে তাহাদের নিকট হইতে ইন্দ্রিয়-তোষণ কামনা করে। এইরূপ প্রবৃত্তি অদান্তেন্দ্রিয় জীবগণের মোহবিস্তারের কারণ। বিবেক উপস্থিত হইলেই জীবের প্রেয়ঃ পথানুগমন শ্রীহরিভজনরূপ শ্রেয়ঃ পথানুসরণে পরিণত হইতে পারে। অতএব, শ্রীহরি-ভজনের দ্বারাই যে জীবের জড়ীয় আশার একমাত্র নিবৃত্তি সম্ভব, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আলোকে রথযাত্রা

"আনন্দ-লীলাময়-বিগ্রহায় হেমাভ-দিব্যচ্ছবি-সুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেম-রসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥"
"কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন-সঙ্গীত-তরলো
মুদাভীরী-নারী-বদন-কমলাস্বাদ মধুপঃ।
রমা-শম্ভু-ব্রহ্মামরপতি-গণেশার্চ্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥"

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা সমাগত। শ্রীমহাপ্রভু এক নবলীলার উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিয়াছেন এই রথযাত্রা উপলক্ষে। তিনি কাশীমিশ্র, পড়িছাপাত্র ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকটে অনুমতি যাচ্ঞা করিতেছেন শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনের জন্য। ভক্তেরা ভাবিতেছেন—প্রভুর একি লীলা? আমরা থাকিতে তিনি নিজে কেন মন্দির মার্জ্জন করিবেন?

শ্রীমহাপ্রভুর এই নব লীলারহস্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমরা সংক্ষেপে জানিয়া লই,—এই শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ কে? নীলাচলে মহাপ্রভুর কেন এই প্রবল আকর্ষণ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ দর্শনের?

"রাগময়ী ভক্তি প্রচারেচ্ছাই গৌরাবতারের মুখ্য কারণ।" জগন্নাথ-বিগ্রহ প্রেমে বিগলিতবিগ্রহ। নারদের প্রার্থনায় পরমকরুণাময় শ্রীকৃষ্ণ কলিতে এই রূপেই সেবিত হইতেছেন পুরীধামে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে। দ্বারকায় মহিষীগণ যখন সুভদ্রাকে দ্বারে প্রহরায় রাখিয়া রুদ্ধদ্বার-কক্ষে মাতা রোহিণীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বৃন্দাবনলীলা-কাহিনী শ্রবণ করিতেছিলেন, তখন সেই রুদ্ধদ্বারে দাঁড়াইয়া প্রেম কাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ, সুভদ্রা ও বলরাম বিগলিত হইয়া জগন্নাথ-বিগ্রহরূপে রূপান্তরিত হন। কলিতে এই রূপেই সেবিত হইবেন—এই ছিল শ্রীভগবানের ইচ্ছা। এই কারণে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে নীলমাধবরূপে স্বপ্নে দর্শন দিয়াও সেই রূপে তিনি তাঁহাকে ধরা দিলেন না। ধরা দিলেন শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহরূপে।

তাই শ্রীজগন্নাথ সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন। গৌরাবতারে অবতারী শ্রীগৌর-সুন্দর রাধা-ভাব-কান্তি লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। রাধাভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দর দীর্ঘ বিরহান্তে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতেন ব্রজে তাঁহার নিত্যসহচর শ্রীকৃষ্ণরূপে। এজন্য মহাপ্রভু প্রকট জীবনের শেষ অষ্টাদশবর্ষ

বিপ্রলম্ভভাবে বিভোর হইয়া লীলা করিয়াছেন নীলাচলে জগন্নাথদেবের সন্নিকটে।

এবার প্রশ্ন,—মহাপ্রভু কেন জগন্নাথদেবের রথযাত্রার অনুষ্ঠান করিয়াছেন? কেন প্রভুর এত উন্মাদনা রথযাত্রা উপলক্ষে? 'দীর্ঘ বিরহান্তে রাধিকার কৃষ্ণ দর্শনোত্থ ভাবময় প্রভু দর্শন করিতেন জগন্নাথদেবকে।'

"যে কালে করেন জগন্নাথ দরশন।
মনে ভাবেন,—কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন॥" (চৈঃ চঃ)

"কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়া ব্রজবাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে গোপীগণ তথায় গিয়া কৃষ্ণদর্শন-সুখ লাভ করেন। প্রভুর অন্তঃকরণে কৃষ্ণ-বিরহভাব উদ্দীপিত ছিল। কেবল যে যে সময় জগন্নাথ দর্শন করিতেন, সেই সব সময়ে কুরুক্ষেত্র-মিলনভাব তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইত।"

"সেই ত' পরাণনাথ পাইনু।
যাহা লাগি' মদন-দহনে ঝুরি' গেনু॥"

"কৃষ্ণদর্শনোৎসুকা গোকুলবাসিনী ব্রজগোপীসকল কুরুক্ষেত্রে স্বমন্তপঞ্চকে গ্রহণোপলক্ষে গমন করিয়া যেরূপ হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীগৌর-সুন্দরের নীলাচলপতি-দর্শনে তদ্ভাবেরই দ্বিতীয়বার অধিষ্ঠান। গোপললনাগণ যেরূপ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপনোদন করিয়া কৃষ্ণকে গোকুলের মাধুর্য্য আস্বাদনে লইয়া যাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ গৌরহরি কুরুক্ষেত্ররূপ নীলাচল-মন্দির হইতে কৃষ্ণরূপ জগন্নাথদেবকে বৃন্দাবনরূপ গুণ্ডিচামন্দিরাভিমুখী রথের সম্মুখে শ্রীগৌরসুন্দররূপ শ্রীমতী বার্ষভানবীর হৃদয়ের ভাব গান করিয়া পারকীয় বিহারস্থলী গুণ্ডিচায় লইয়া যাইতেছেন।"

এই উদ্দেশ্যেই মহাপ্রভু রথযাত্রার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এবার এই রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে নবলীলা, সেই লীলায় আমরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করি।—

শ্রীমহাপ্রভুর রথযাত্রার পূর্ব্ব প্রস্তুতি :—

শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন করিবার জন্য প্রভু ভক্তগণসহ প্রভাতে যাত্রা করিবেন। একারণে বহু ঘট ও সংমার্জ্জনী আনিতে আদেশ করিলেন। পড়িছা প্রভুর ইচ্ছায় একশত ঘট ও শত সংমার্জ্জনী আনিলেন। প্রভাতে প্রভু সকল ভক্তের অঙ্গে নিজহস্তে চন্দন লেপন করিয়া শ্রীহস্তে এক একটী মার্জ্জনী প্রত্যেককে দিলেন। এইবার সকল ভক্তগণ লইয়া শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে

পৌঁছাইয়া সকল ভক্তসহ প্রভু স্বহস্তে শ্রীনামসহ মন্দির মার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। মন্দিরের ভিতর-বাহির, সিংহাসন সর্ব্বত্র অতি নিখুঁতভাবে পরম যত্নের সহিত প্রভু মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। সে দৃশ্য অতি অপরূপ। ভগবান্ স্বয়ং ভগবন্মন্দির মার্জ্জন করিয়া ভক্তদের শিখাইতেছেন।

"চারিদিকে শত ভক্ত সংমার্জ্জনী করে।
আপনি শোধেন প্রভু, শিখান সবারে॥
প্রেমোল্লাসে শোধেন, লয়েন কৃষ্ণনাম।
ভক্তগণ কৃষ্ণ কহে, করে নিজ কাম॥
ধূলি-ধূসর-তনু দেখিতে শোভন।
কাঁহা কাঁহা অশ্রুজলে করে সংমার্জ্জন॥"

এবার প্রভু ভক্তগণকে মন্দির-অভ্যন্তরের ধূলি-তৃণ-ঝিঁকুর প্রভৃতি জঞ্জাল বাহিরে রাখিতে বলিলেন এবং জঞ্জালের পরিমাণ অনুসারে প্রত্যেকের কার্য্যের তারতম্য করিলেন।

"সবার ঝাঁটান বোঝা একত্র করিল।
সবা হইতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল॥"

পুনরায় প্রভু সূক্ষ্মধূলি-তৃণ-কাঁকর দূর করিবার জন্য মার্জ্জন করিলেন।

"সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল।
দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল॥"

অপর সম্প্রদায়ের ভক্তগণও মন্দির মার্জ্জনে প্রভুর সহিত যুক্ত হইলেন। এইবার শত শত ঘট পূর্ণ করিয়া ভক্তেরা জল আনিতে লাগিলেন মন্দির প্রক্ষালনের জন্য। প্রভু শ্রীহস্তে ভক্তগণসহ মন্দিরের ঊর্দ্ধ-অধো-ভিত্তি, গৃহমধ্য সিংহাসন, সকলকিছু উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিলেন। অতঃপর মহাপ্রভু স্ববস্ত্রে গৃহ ও সিংহাসন মার্জ্জন করিলেন।

"নিজবস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সংমার্জ্জন।
মহাপ্রভু নিজবস্ত্রে মাজিল সিংহাসন
শতঘট-জলে কৈল মন্দির মার্জ্জন।
মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজ মন॥
নির্ম্মল, শীতল, স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে।
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে॥"

প্রভু শ্রীমুখে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে শ্রীহস্তে মার্জ্জন ও প্রক্ষালনের কার্য্য করিয়া চলিয়াছেন। এইরূপে স্বয়ং প্রভু আচরণ করিয়া অপরকে শিখাই-

তেছেন। তাহা ছাড়া সুষ্ঠু সেবকের সেবার প্রশংসাও করিতেছেন। উপরন্তু সুষ্ঠু সেবককে আচার্য্যের কার্য্য করিবার নির্দ্দেশও দিতেছেন।

"তুমি ভাল করিয়াছ শিখাহ অন্যেরে।
এইমত ভাল কর্ম্ম সেই যেন করে॥
এইমত সব পুরী করিল শোধন।
শীতল নির্ম্মল কৈল যেন নিজ মন॥"

শ্রীমহাপ্রভুর গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন লীলা রহস্য, পরম পূজনীয় প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্যের ব্যাখ্যা হইতে আমরা সুন্দরভাবে বুঝিতে পারিব। সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদ এ সম্পর্কে কি বলিয়াছেন তাহা আমরা জানিতে চেষ্টা করি।—

"জগদ্‌গুরু মহাপ্রভু এই লীলাটির দ্বারা এই শিক্ষা দিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে যদি কোন সৌভাগ্যবান্ জীব স্বীয় হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন, তবে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার হৃদয়ের মল ধৌত করা উচিত। হৃদয়টিকে নির্ম্মল, শান্ত ভক্ত্যুজ্জ্বল করা আবশ্যক। হৃদয়ক্ষেত্রে কণ্টকপূর্ণ তৃণ বা আগাছা, ধূলি ও কঙ্করাদিরূপ অনর্থ কিছুমাত্র থাকিলেও পরমসেব্য ভগবান্‌কে বসান যায় না। হৃদয়ের ঐ মল বা আবর্জ্জনাগুলি অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগচেষ্টাদি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

যেখানে ভক্তীতর অন্যাভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম্মযোগ-তপস্যাদি বা ভক্তিপ্রতিকূল-ভাবদ্বারা আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি ভক্তি আবৃত হইয়াছে, সেখানে শুদ্ধভক্তি নাই। শুদ্ধসত্ত্বময়ী শুদ্ধভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণের আবির্ভাব হয় না।

অন্যাভিলাষ অর্থাৎ জগতে যতক্ষণ থাকিব, কেবল নিজ ইন্দ্রিয়ের তর্পণই করিব—এইরূপ ইতর অভিলাষ। উহা কণ্টকময় তৃণের মত শুদ্ধজীবের সুকোমলা হৃদ্‌বৃত্তি কেবলাভক্তিকে বিদ্ধ করে। **কর্ম্মচেষ্টা** অর্থাৎ যাগ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা স্বর্গাদি উচ্চলোকে সুখ বা ইহলোকে সুখভোগ করিব—এরূপ বাসনাময়ী ক্রিয়া; উহা ধূলিসদৃশ। কর্ম্মাবর্ত্তের ঘূর্ণিবায়ুতে বাসনারূপ ধূলিরাশি আমাদের স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হৃদয়-দর্পণকে আবৃত করিয়া দেয়। সৎ ও অসৎ কর্ম্মের বাসনারূপ অসংখ্য ধূলিরাশি হরিবিমুখ জীবের হৃদয়কে কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া মলিন করিয়াছে, তাই তাহাদের কর্ম্ম-বাসনা দূর হইতেছে না।

নির্ব্বিশেষ ও কৈবল্যযোগ বা জ্ঞানযোগাদি চেষ্টা—ঠিক কঙ্করের মত। তদ্দ্বারা শ্রীহরির তোষণ বা সেবা ত' দূরের কথা, শ্রীহরির দেহে শেল

বিদ্ধ করিবারই প্রয়াস করা হয়। সুতরাং ভগবান্ তাদৃশ বিমুক্তাভিমানী জীবের হৃদয়ে আবির্ভূত হন না। সেইজন্য গৌরসুন্দর ঐসকল ধূলি-তৃণ-ঝিঁকুরাদি আবর্জ্জনারাশি ভগবন্মন্দিরের চতুঃসীমানার ভিতরও রাখিলেন না। পরন্তু নিজ বহির্ব্বাসদ্বারা তৎসমুদয় বাহিরে ফেলিয়া দিলেন, পাছে বাত্যার সহায়তায় ঐ সকল জঞ্জাল পুনরায় শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে।

অনেক সময় কর্ম্ম-জ্ঞানাদি চেষ্টা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মল থাকিয়া যায়। উহাকে **'কুটিনাটি'**, **'প্রতিষ্ঠাশা'**, **'জীবহিংসা'**, **'নিষিদ্ধাচার,' 'লাভ-পূজা'** প্রভৃতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। **কুটিনাটি**-শব্দে 'কপটতা'। **প্রতিষ্ঠাশা**-শব্দে নির্জ্জন ভজনাদি বা বুজরুগীদ্বারা নির্ব্বোধ লোক আমাকে একজন বড় সাধু বা মোহান্ত বলুক—এইরূপ জড়ীয় সম্মানাদির আশা অথবা বিষয়-ভোগক্রমে স্বার্থ পূরণোদ্দেশে কাঠিন্যপ্রাপ্ত হৃদয়ে কৃত্রিম বিকারাদি ভাবাভাস প্রদর্শনদ্বারা ভক্ত বা অবতার সাজিবার আশা। **জীবহিংসা**-শব্দে শুদ্ধভক্তিপ্রচারে কুণ্ঠতা বা কৃপণতা, মায়াবাদী কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষীকে প্রশ্রয় দেওয়া বা তাহাদের 'মন' রাখিয়া কথা বলা। **লাভ-পূজা**-শব্দে ধর্ম্মের নামে হরিনাম মন্ত্র, বিগ্রহ-ভাগবতজীবি হইয়া নির্ব্বোধ লোককে ঠকাইয়া ধনাদি অথবা সম্মান-প্রাপ্তি, **নিষিদ্ধাচার**-শব্দে স্ত্রীসঙ্গ এবং কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ বুঝায়।

এইরূপে একবার বহুদিনের সঞ্চিত বড় বড় কাঁকর, তৃণ, ধূলিরাশি প্রভৃতি ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর দুই দুইবার করিয়া মন্দিরের সমগ্রাংশ মার্জ্জন ও জলদ্বারা প্রক্ষালন করিবার পর, যদি কোথাও আবার কোন মুক্তি-কামনারূপ সূক্ষ্মদাগ লাগিয়া থাকে তজ্জন্য তিনি নিজের পরিধেয় শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা ঘষিয়া শ্রীমন্দির ও ভগবৎ-পীঠস্থানরূপ সিংহাসন মার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এত করিয়া প্রক্ষালন, মার্জ্জন, ঘর্ষণাদির পর শ্রীমন্দিরে আর ধূলিকণার, লেশ, এমনকি একটী সূক্ষ্ম দাগও নাই। শ্রীমন্দিরটি স্ফটিকবৎ নির্ম্মল, কেবল তাহাই নহে, আবার সুশীতলও হইল। অর্থাৎ সাধকের হৃদয়টি রবিতপ্ত মরুভূমিসম তাপহীন অর্থাৎ বিষয়ভোগ-বাসনাজনিত আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ানল-জ্বালারহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার হৃদয় হইতে অন্যাভিলাষ ও কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি চেষ্টারূপা ভুক্তি-মুক্তি-কামনা বিদূরিত হইয়া আত্মবৃত্তি—শুদ্ধভক্তি প্রকটিত হইলে উহা এইরূপই শান্ত ও সুশীতল হয়।

এইরূপে শ্রীগৌরসুন্দর কিরূপে সাধক স্বীয় হৃদয়কে বৃন্দাবনরূপে পরিণত

করিয়া স্বরাট্ কৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ বিহারস্থল করিবার জন্য, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছার জন্য মহোৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণার্থে স্বহৃদয় মার্জ্জন করিবেন, তাহা জীবের মঙ্গলার্থে আপনাকে জীবাভিমান করিয়া জগদ্-গুরুরূপে স্বয়ং মহাপ্রভু শিক্ষা দিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু প্রতিভক্তের নিকটে গিয়া হাতে ধরিয়া মন্দির-মার্জ্জন-সেবা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যাহার কাজ ভাল হইতেছে তাহাকে প্রশংসা এবং যাহার সেবা কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিময়ী শ্রীরাধার ভাবসুবলিত প্রভুর নিজ মনমত হইতেছে না, তাহাকেও পবিত্র ভৎর্সনাপূর্ব্বক হাতে ধরিয়া কৃষ্ণসেবা-প্রণালী শিক্ষা দিলেন। শুধু তাহাই নহে, চৈতন্য-শিক্ষানুগত লব্ধভজন-কৌশল, অন্বয়জ্ঞানে ভক্তিযোগযুক্ত শুদ্ধহৃদয় ভক্তগণকে অপর বিমুখ জীবগণের আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্যও আদেশপূর্ব্বক উৎসাহান্বিত করিলেন। আবার যিনি যতবেশী পরিমাণে অভদ্ররাশি হৃদয় হইতে আহরণপূর্ব্বক পরিষ্কার করিতে সমর্থ, তিনি ততবেশী প্রভুপ্রিয় হইবেন এবং যাহার অনর্থ-নিবৃত্তি সামান্যই ঘটিয়াছে, তাহার পক্ষে শান্তিস্বরূপ হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাই বিধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।"

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার পূর্ব্বপ্রস্তুতি মহাপ্রভু এইভাবেই সমাপন করিলেন। এ প্রস্তুতি ব্রজগোপীগণ যে প্রতিদিন বৃন্দাবনকে অপূর্ব্ব নবসাজে সাজাইতেন এই আশা লইয়া যে—বৃন্দাবনচন্দ্র কখন কোনদিন কোনসময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন বৃন্দাবনে, তাঁহাকে আনন্দ দান করিবার জন্য ব্রজগোপীগণ যে প্রস্তুতি লইয়া সাজাইয়া রাখিতেন তাঁহার প্রেমস্বলীকে—সেই প্রস্তুতি। মহাপ্রভু মহাভাব-স্বরূপিণী ব্রজবিলাসিনীর ভাব-কান্তি। সেই কারণেই ত' বহুদিনের বিরহান্তে তাঁহার প্রেমাস্পদকে সুখসাগরে নিমগ্ন করিবার পূর্ব্ব-প্রচেষ্টা তাঁহার গুণ্ডিচামন্দির পরিমার্জ্জন। ভক্তগণ রাধারাণীর নিত্যসঙ্গিনী ব্রজগোপীগণ। গোপীনাথের বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বপ্রস্তুতি তাঁহারা সমাপন করিলেন গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনের মধ্য দিয়া। (ক্রমশঃ)

(আমার পরম আরাধ্যদেব শ্রীশ্রীগুরুদেবের আদেশে লিখিত।)

—শ্রীমতী মায়া সরকার, বসিরহাট (২৪ পরগণা উঃ)

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১১ পৃষ্ঠার পর]

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥

ত্রিগুণান্বিত মায়া। মায়া থেকে ত্রিগুণ এসেছে—সত্ত্ব, রজঃ, তম। ভগবান্ ত্রিগুণের অতীত। সেইকথাই ত' শাস্ত্রে বলা হয়েছে। অথচ আমরা ভগবানকে সেই ত্রিগুণের মধ্যে ফেলতে চাচ্ছি। আমরা বোকা, হতভাগা! সেইজন্য ত' ঐরকম Motive। 'মায়া মিশাইয়া এস ভগবান্।'—কোন কবি প্রার্থনা করছেন। ভগবানকে মায়া মিশিয়ে আসতে হবে কেন? ভগবানের যে নিজস্ব প্রকৃতি, সেই প্রকৃতিকে আশ্রয় করে ত' তিনি এ জগতে অবতীর্ণ হন। সেই কথাই ত' গীতা-ভাগবতে লেখা আছে।—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—অতাত্ত্বিক, নির্ব্বোধ যারা, তত্ত্বজ্ঞানের অভাব আছে যাদের, তারাই মনে করে,—আমি অব্যক্ত ছিলাম, আমি ব্যক্ত হয়েছি।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥

'অবুদ্ধয়ঃ' গালাগালির পরিভাষা। 'অবুদ্ধয়ঃ'-শব্দের অর্থ অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি, অজ্ঞ ব্যক্তি। তারাই মনে করছে—আমি অব্যক্ত ছিলাম, ব্যক্ত হলাম। তা ত' নয়। সূর্য্যদেব এখন Eastern hemisphereএ নাই, Western hemisphereএ চলে গেছেন, তাই বলে আমি যদি বলি—সূর্য্যদেব মরে গেছেন। সেটা বলা চলবে?—না, তিনি সবসময় আছেন। তদ্রূপ ভগবানকে যারা ঐ রকম বলতে চাচ্ছে—চোখের সামনে যখন দেখলাম তখন মানলাম, আর যখন চোখের আড়াল হলেন তখন বললাম মরে গেছেন! বোকা কোথাকার! ভগবান্ অব্যক্ত, তিনি ব্যক্ত হয়েছেন—এই যে বিচার, এটা সম্পূর্ণ ভুল। ভগবান্ চির ব্যক্ত, নিত্য প্রকাশিত তত্ত্ব। অব্যক্ত ভাবটা Negative idea, ওটা positive idea নয়। আগে ব্যক্ত, তারপর অব্যক্ত। গীতায় কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দিয়ে সাবধান করেছেন। অর্জ্জুন! কতকগুলো লোক

কি ভাবছে জান? এই অব্যক্তের যে চিন্তাটা, এটা একটা বিরাট্ সূক্ষ্ম চিন্তা! ভয়ানক দার্শনিক বাহাদুরি এই চিন্তার মধ্যে! বহু বোকা লোক ভাবছে এটা। শ্রীভগবান্ গীতায় 'অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং' যেরূপ বলেছেন, তদ্রূপ বলেছেন,— "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥"

যারা অব্যক্ত-চিন্তায় আসক্ত, তারা সব বোকা লোক, তাদের অধিক ক্লেশ, তারা দুঃখজনক গতি লাভ করে। সূর্য্যদেবের অস্তিত্ব যেরূপ মেনে নিতেই হয়েছে, শ্রীভগবানের অস্তিত্বও তদ্রূপ। আমি জানালার পাশে বসে আছি। একটা সওয়ারী ঘোড়ায় চেপে ছুটে চলে গেল। আমি কি বলব—ঘোড়ার সওয়ারী আদৌ ছিল না, আর পরেও নাই। জানালায় যতটুকু আমার চোখের দৃষ্টি, ততটুকুই আমি দেখতে পেয়েছি। ঘোড়া-সওয়ারীর অস্তিত্ব পূর্ব্বেও ছিল, পরেও থাকবে। তদ্রূপ ভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাব। যারা ভগবানকে অব্যক্ত বলতে চাচ্ছে—ভগবান্ অব্যক্ত, ভগবান্ নির্ব্বিশেষ, ভগবান্ নিরাকার, ভগবান্ নির্গুণ, ভগবান্ নিঃশক্তিক্—এই সব কথা বলে যারা ভগবানের ভগবত্তা উড়িয়ে দিতে চাচ্ছে, তাদের মত চরম নাস্তিক দুনিয়ায় আর কেউ নাই। সমগ্র জগৎকে তারাই ধ্বংস করছে আজ। ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে তারা জগৎকে বিপথগামী করছে। যারা বলছেন—ভগবান্ দুর্নীতিপরায়ণ, ভগবান্ বলে কোন কিছু নাই, আর ভগবান্ ত' মানুষই, তারা অনাসুর। বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানের অস্তিত্ব যখন বিপন্ন তাহলে আমাদের বেপরোয়াগিরি করতে খুব সুবিধা, যথেচ্ছাচারী হতে যথেষ্ট সুযোগ। ভগবান্ বলে মালিক যদি কেউ থাকেন, তাহলে মুস্কি হয়ে যাবে ত'। নাস্তিকের শয়তানি বুদ্ধি রয়েছে এরূপ চিন্তার পিছনে। ভগবান্ বলে একজনকে মেনে নিলে ত' আমাদের নাস্তিক হওয়া যাবে না!

ভগবানের যে আচরণ, জীবের কি সেই একই আচরণ হবে? ভগবানের নিজস্ব কতকগুলি আচরণ আছে—শাস্ত্রে বর্ণনা আছে। পিতার কতকগুলো নিজস্ব আচরণ আছে, আর পুত্র-কন্যারও কতকগুলো নিজস্ব আচরণ আছে। সেটাকে কখনও এক বলে ধরলে হবে না। যিনি পরাৎপরতত্ত্ব ভগবান্, তাঁর নিজস্ব আচরণগুলো জীবশিক্ষার জন্য নয়। শাস্ত্রে লোকশিক্ষার জন্য যে বাণী প্রচারিত হয়েছে সেটা পৃথক্, আর ভগবানের নিজস্ব আচরণ পৃথক্। ভগবানের নিজস্ব আচরণ জীব যদি অনুকরণ করতে যায়, তাহলে জলে পুড়ে মরবে। সেই কথা লেখা আছে শাস্ত্রে, ভুরি ভুরি উদাহরণও আছে।

যখন সমুদ্র মন্থন হয়েছিল, তখন বহু জিনিস পাওয়া গিয়েছিল। ঐরাবত হস্তী, লক্ষ্মীদেবী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, অমৃত ও গরল পাওয়া গেল। কিন্তু এই যে গরল এটা কে গ্রহণ করবেন? উপযুক্ত মানুষ সন্ধান করে পাওয়া গেল শিবঠাকুরকে। তাঁকেই দেওয়া হল গরলটা। তিনি সেই গরল পান করলেন। যদিও তিনি সেই গরল পান করে কিছুক্ষণের জন্য অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, তাহলেও শিবঠাকুর শিতিকণ্ঠ, নীলকণ্ঠরূপে থেকে গেলেন। বিষ খেয়ে হজম করে দেওয়ার মত ক্ষমতা শিবঠাকুরের ছিল। তাই তাঁকে এরূপ ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল।

যারা আজ মনে করছেন,—আমরা সব শিবঠাকুর বনে গেছি, তারা সবাই গরল পান করুন না, খান না এণ্ড্রিন্, দেখা যাক্ কি হয়! Scientific Laboratory-র পটাসিয়াম সাইনাইড আর দরকার হবে না। মানুষ আজ বিভ্রান্ত। সে সবসময় অঙ্ক কষতে চাচ্ছে কিনা ভগবান্ আর আমি—দুই সমান! আগে অধিকার লাভ কর, তারপরে অলৌকিক কিছু বলবে। শিবঠাকুরের অধিকার লাভ না করে যে বিষপান করতে যায়, তার যে অবস্থা হবে, এইসব সাজা ভগবান্ যারা আছেন বা ভগবানের সিংহাসন দখল করার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট যে-সব ব্যক্তি আছেন, তাদের কি সেই অধিকার হবে? তারও ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে।—

শৃগাল বাসুদেব। কৃষ্ণ যখন রাজত্ব করছিলেন, সেই সময় এক ব্যক্তি 'বাসুদেব' নাম নিয়েছিল। বাসুদেব নাম নিয়ে প্রচার করতে লাগল যে, 'আমি কৃষ্ণের সঙ্গে সমান।' তাকে সবাই 'শৃগাল বাসুদেব' বলতে লাগল। সাজা বস্তু কি আসল হবে কোনদিন? একটা কাককে রাজহংসের পালক দিয়ে সুন্দর করে সাজালে সে কি রাজহংস হবে? রাজহংসের আচরণ করতে পারবে সে? যেতে পারবে সে মানস-সরোবরে? তথায় বিচরণ করতে পারবে কি সেই কাক? শাস্ত্রে উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হয়েছে।—

কাকস্য চঞ্চু যদি স্বর্ণযুক্তা, মাণিক্যযুক্তং চরণং চৌতস্য।
একৈক পক্ষে গজরাজমুক্তা, তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ॥

কাকের ঠোঁটটা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হল, মণি-মাণিক্য দিয়ে পা দুখানা মুড়ে দেওয়া হল, আর এক একটা পাখনা তার গজরাজ-মুক্তা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হল। তাহলে কি কাক তার বৃত্তি ছাড়বে? সে কি রাজহংসের কাজ করতে পারবে?—হবে না কোনদিন। সেইজন্য কথাটা আসছে—হে জীব! তুমি কেন ব্রহ্ম হতে চাচ্ছ? তুমি কেন পরব্রহ্মের সিংহাসন দখল

করবার দুরাশা পোষণ করছ? ওটা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি সেবক, আশ্রিত-তত্ত্ব। তুমি সেবা কর, সেবা করে ধন্য হও। আমি চিনি খাব, না—চিনি হয়ে যাব?—সমাজে এরূপ প্রশ্ন আছে। আমি যদি চিনি হয়ে যাই, তাহলে আস্বাদ্য-আস্বাদক কিছুই বুঝা যাবে না। চিনি খেতে বলছেন মানে—সেবা-রস আস্বাদন কর তুমি। "সেবা-কথা-রসমহো নিতরাং পিব ত্বম্"—সেই কথা শাস্ত্রে বলেছেন।

সেবারস আস্বাদন করতে বলেছেন। আমি সেবক বা সেবিকা। আমি সেবারস আস্বাদন করব। ভগবান্ হলেন পরম সংসেব্য বস্তু, আর নিখিল বিশ্বের জীবাত্মা হলেন সেবক বা সেবিকা। যদি জীবকে শক্তি ধরা হয় তাহলে সেবিকা-শব্দই যথাযথ, সেবক-শব্দ আসবে না। কেন বলছেন এটা? —এই জগতে—মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে এখানে পুরুষ এবং স্ত্রী বিচার রয়েছে। কিন্তু চিজ্জগতে একমাত্র ভগবান্‌ই হলেন পরম পুরুষ, আর সবাই শক্তি। সেইজন্য সেখানে বলছেন সবাই প্রকৃতি—জীবরূপ প্রকৃতি। গীতার মধ্যেও সেই কথা কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছেন,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

জীবভূতা প্রকৃতি। তাহলে জীব পুরুষ নহে, প্রকৃতি; ভগবানের শক্তি। গুণবাচক বিশেষ্য। সেইকথাই ত' শাস্ত্রে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। হে জীব! তুমি কেন ভোগী হতে যাচ্ছ? তুমি ভোগ্য, ভোগী নহ। Meterial দুনিয়া কি শিক্ষা দিচ্ছে? আজকাল আমরা সব চার্ব্বাকের শিষ্য হয়ে পড়েছি। চার্ব্বাক্ কি শিক্ষা দিয়েছেন?—"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?" তোমার পয়সা নাই, তুমি ঋণ কর। ঋণ কে শোধ দেবে? আরে! 'মূদলে আঁখি, সবই ফাঁকি', কে আবার শোধ দেবে? এ ত' খুব ভাল Theory! এই নীতি-আদর্শে আমরা গা ভাসিয়ে চলেছি। কে কার ধারদেনা শোধ করবে? আর্ষ শাস্ত্র বলছেন,—যতদিন ছয়টা ঋণ—দেবঋণ, ঋষিঋণ, প্রাণীঋণ, আত্মীয়ঋণ, নৃঋণ ও পিতৃঋণ সামান্য পরিমাণে থেকে যাবে, ততদিন পর্য্যন্ত তোমাকে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে বারবার যাতায়াত করতে হবে। এ ত' মুস্কিলের কথা। মানুষের যতদিন পার্থিব জগতের আশা-আকাঙ্ক্ষা শেষ না হবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাকে

এই ধরাধামে—এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে মহামায়া দুর্গাদেবীর কারাগারে বারবার যাতায়াত করতে হবে। সেইকথাই ত' গীতায় অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ বললেন,—অর্জ্জুন! তুমি যে জন্মগ্রহণ করছ, জগতে আসছ-যাচ্ছ কেন? ভগবানকে—আমাকে যদি তুমি ভালবাসতে পার, তাহলে তোমার এই যাতায়াত বন্ধ হয়। তুমি ত' বাস্তুহারা। আজ যাঁরা পাকিস্তান থেকে ভারতে এসেছেন, বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন, এঁদের সবাইকে বলা হচ্ছে বাস্তুহারা—Displaced persons, Evacuees বলা হচ্ছে। শাস্ত্র আলোচনা করে, গীতা-ভাগবত আলোচনা করে দেখছি, আমরা সবাই বাস্তুহারা। আমরা আমাদের পূর্ব্ব-বাস্তুভিটা হারিয়ে ফেলেছি। কোন্ বাস্তু?—যে বাস্তু ভগবানের নিত্যবাসস্থান, সেইটাই আমাদের সকলের বাস্তু ছিল। এখন সেটা হারিয়ে ফেলেছি। তথাপি আমাদের Permanent settlementএর চিন্তা। Quartersএ যাঁরা আছেন, তাঁদের Permanent ব্যবস্থা নয়, তাঁরা জানেন,—আমাদের চাকুরী গুটালে আবার কোথায় গতি হবে তার ঠিক নাই। কিন্তু বহু ব্যক্তি বসে আছেন যাঁরা Permanent settlement—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চাইছি। মৌরসী পাট্টা নিয়ে থাকতে চাচ্ছি। থাকা ত' যাচ্ছে না। দুরন্ত কাল, দুরন্ত কৃতান্ত সরিয়ে দিচ্ছে আমাদের যথাসময়ে। আমার ইচ্ছা থাকলেও আমি থাকতে পারছি না। যদি অবস্থা তাই হয়, তাহলে পূর্ব্বেই সময় থাকতে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। মহাত্মা তুলসীদাস বলছেন কি?—হে তুলসীদাস! তুমি যখন জগতে এসেছিলে তখন জগতের লোক কি করেছিল? তাদের ঘরে একটা ছেলে জন্মগ্রহণ করেছে বলে তারা খুব আনন্দিত। আর তুলসী, তখন তুমি কেঁদেছিলে। এখন কি করবে জান?—তুমি সাধন-ভজন করে, হাসতে হাসতে এই পৃথিবী থেকে চলে যাও, আর জগৎ তোমার জন্য কাঁদতে থাকুক।—

"তুলসী যব জগ্‌মে আয়ো জগ্ হসে তোম্ রোয়।
অ্যায়সে কাম কর্‌তে চলো কি, তোম্ হসো জগ্ রোয়॥"

কর্ত্তব্য, দায়িত্ব জিনিষটা ত' আজ নাই। যার অভাবে আজ সব জায়গায় গণ্ডগোল। দাবী নিয়ে কাণ ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। কে কার দাবী মানবে? আমি কোনদিন কারও দাবী মেনেছি কি? আমি কারও দাবী মানতে প্রস্তুত আছি কি? তবে না আমার দাবী কেউ কোনদিন মানতে পারে। আমি ত' ওটা চিন্তা করে দেখছি না, কিন্তু বলছি—আমাদের দাবী মানতে হবে। শুনবে না দুনিয়া, শুনবে না কখনও। যদি আমি কখনও কারও দাবী পূরণ

করেছি, কারও দাবী শুনেছি, তখন কেউ আমার দাবী শুনবে, তার আগে নয়। শ্রদ্ধা-ভক্তিলাভে বাধা-বিপত্তি প্রচুর।—

তুলসী ইয়ে সংসারমে, কাহাঁসে ভক্তি ভেট।
তিন বাতোসে লট্‌পাট হ্যায়, দাম্‌ড়ি চাম্‌ড়ি পেট॥

দাম্‌ড়ি, চাম্‌ড়ি ও পেট—ধন, শিশ্ন ও জঠর—এই তিনটাই ত' মুস্কিল করে দিয়েছে আমাদের। কি করব আর, বড় সমস্যা! বহু ব্যক্তি আমাদের কাছে বলছেন,—মহাশয়! ওসব শাস্ত্রের কথা বলে কি হবে? ওতে কি পেট ভরবে?—হ্যাঁ, পেট ভরে, ভরেছে একজন ব্যক্তির। সেই ব্যক্তি তদ্গতচিত্তে ভাগবত শুনছিলেন। সেই পরম ধার্ম্মিক রাজার পেট ভরেছে সত্যিই। ক্ষুধা, তৃষ্ণা তাঁর ছিল না। গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে বসে তিনি এই ভাগবতকথা, ভগবানের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাকথা শ্রবণ করেছেন। তাঁর সত্যই পেট ভরেছিল। সকলের কি আর সমান পেট ভরবে ঘরে খেতে বসে। যার যেমন রুচি—কেউ টক, কেউ ঝাল, কেউ নোন্তা, কেউ তেতো, কেউ মিষ্টি খায়। বিভিন্ন রুচির লোক এক একটা জিনিসে রুচিবিশিষ্ট। সকলের পেট ত' সমান ভরান যায় না। সকলকে ত' সমানভাবে সন্তুষ্ট করা যায় না খাইয়ে। নিজেদের রুচির উপরে নির্ভর করে সেই ক্ষুন্নিবৃত্তি ও সন্তুষ্টি।

বহু ব্যক্তি বলছেন,—আমাদের মুখে অন্ন নাই, অর্থাভাবে অর্দ্ধাহারে, অনাহারে আমরা দিন কাটাচ্ছি। এখন প্রশ্ন হতে হতে পারে,—যে দেশ অর্দ্ধাহারে, অনাহারে কাটাচ্ছে না, যে দেশের কিছু বৈজ্ঞানিক উন্নতি হয়েছে, যে দেশ কিছু খাকা-খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করেছে, সে দেশ ধার্ম্মিক ত'? সে দেশ নীতি-আদর্শপরায়ণ ত'? প্রশ্ন রাখলাম আমি,—খাওয়া, পরা পেলে আমরা নীতি-আদর্শ পরায়ণ হব ত'? আমরা বাড়াবাড়ি করব না ত'?

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্॥

আমরা অপরের ধনে আকাঙ্ক্ষা করব না ত'? অপরের সম্পদ দেখে ঈর্ষা-হিংসা প্রকাশ করব না ত'? এ গ্যারাণ্টী কোথায়? এ গ্যারাণ্টী প্রথমে চাই। আমি যদি পেট ভরে খেতে পাই তাহলে আমি ধার্ম্মিক হব, নীতি-আদর্শ পালন করব, এমন কোন আদর্শ আমার সামনে আছে কিনা? আমি দেখতে পাচ্ছি বরং উল্টো। যারা কিছু ভাল খেতে পরতে পাচ্ছেন, তারাই বেশী দুর্নীতিপরায়ণ। একথা আমি যে ভাগবত নিয়ে বসে আছি, এর ভিতর থেকে প্রমাণ করব। দরিদ্র স্বভাবতঃই অভাবগ্রস্ত, দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট,

তার ভিতরে যে সহজ-সরল ভাবটা থাকে, সেটা বেপরোয়া লোকের মধ্যে থাকে না, থাকতে পারে না, থাকা সম্ভব নয়। সেই কথাই বলেছেন,—

"চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন, ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আসিবিষে দংশেনি যারে ??
যতদিন ভবে, না হবে না হবে, তোমার অবস্থা আমার সম।
ঈষৎ হাসিবে, শুনে না শুনিবে, বুঝে না বুঝিবে যাতনা মম ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের ১০ম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে,—দুর্জ্জন ব্যক্তির পক্ষে দরিদ্রতাই প্রকৃষ্ট অঞ্জন-স্বরূপ। দরিদ্রতা লোকের গর্ব্বান্ধভাব দূর করিয়া যথার্থ দৃষ্টি প্রদান করিয়া থাকে। দরিদ্র ব্যক্তি প্রাণিগণকে নিজের মত প্রকৃষ্টরূপে দর্শন করে। দুর্জ্জন ব্যক্তি কখনই অন্যের ক্লেশ বুঝিতে পারে না। জীবমাত্রেরই দুঃখ সমান—ইহা কোনদিনই তাহার উপলব্ধির বিষয় হয় না। গর্ব্ব-অহঙ্কারশূন্য ঔদ্ধত্য-ভাবমুক্ত দরিদ্র ব্যক্তি ইহলোকে স্বভাবতঃই আহার ও বস্ত্রাদির অভাবজনিত কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে। তাহার পক্ষে সেই কষ্ট পরম তপস্যাস্বরূপ। তপস্যার ন্যায় ঐ দারিদ্র্যই তাহাকে গর্ব্বহীন করিয়া থাকে। অতএব দারিদ্র্যই বস্তুতঃ তপস্যা-স্বরূপ। সমদর্শী সাধুগণও দরিদ্রের সঙ্গই করিয়া থাকেন। দরিদ্রও সাধুসঙ্গবশতঃ বিষয়-বাসনা-নাশে সমর্থ হয় এবং শীঘ্রই তাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে।

কে কার দুঃখ-কষ্ট উপলব্ধি করবে ? আমার পাশের বাড়ীর লোকটা না খেয়ে রয়েছে। কই আমি দেখতে চাচ্ছি না, আমার সে চিত্তবৃত্তি নাই। শুনেও শুনছি না। তাহলে আমি কি করে দেশকে ভালবাসতে যাচ্ছি ! পিতামাতা, Guardian কে ভালবাসি না, ভাই-বোনদের দেখতে পারি না, তাদের সঙ্গে মতের মিল নাই, কিন্তু আমি দেশবরেণ্য নেতা ! কি করে হবে ? "Charity bigins at home"—দানধর্ম্ম আরম্ভ হয় নিজের ঘর থেকে। শিক্ষা ত' ঘরে হবে আগে। ঘরকে আমি ভালবাসতে পারি না, দেশকে ভালবাসতে যাচ্ছি আমি। 'স্বদেশ' মানে কি ? সেই শিক্ষাই ত' শাস্ত্রে রয়েছে। 'ভারতভূমি' 'ভারতভূমি' করছি, ভারতভূমির নীতি-আদর্শ নিচ্ছি কোথায় ? ঋষিগণ হলেন ভারতভূমির নীতি-আদর্শ। ঋষিগণের বাক্য ত' মানছি না, তাহলে দেশকে কি করে ভালবাসব আমি ? ঋষিগণের যে নীতি-আদর্শ, সেই নীতি-আদর্শ যদি কেউ নিতে পারেন, তাহলে দেশকে ভালবাসা হবে। প্রথম কথা হল নীতি-আদর্শ। আমি নীতি-আদর্শপরায়ণ কিনা, তা নির্ভর করছে ভগবানকে ভালবাসা, দেশকে ভালবাসা, অপরকে ভালবাসার উপর।

আত্মবৎ যে আমি দেখব, কি করে দেখব? আমি ত' আমার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কবি গেয়ে গেলেন,—

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি, এ জীবন-মন সকলি দাও।
সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে॥

—কিভাবে প্রমাণিত? আমি ত' ঘরের মধ্যেই খুঁজে পাচ্ছি না—ভগবৎপ্রীতি-ভালবাসা, বাইরের লোককে কি করে ভালবাসব, দেশকে কি করে ভালবাসব? আগে ঘরেই প্রমাণিত হোক সেই মহত্ত্ব-উদারতা, তারপরে বাইরে। (ক্রমশঃ)

প্রাত্যহিক জীবন

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৫ পৃষ্ঠার পর]

শ্রুতির কথা ছাড়িয়া দিয়া স্বার্থপর ব্যক্তিগণের মনঃকল্পিত কথার কখনই আদর হইতে পারে না। 'গুরু যাহাই থাকুন না কেন'—এরূপ দুঃসঙ্গ-বিচার বর্জ্জন করা কল্যাণেচ্ছু পারমার্থিকের বিচার নহে। পরমার্থ-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি তাঁহার প্রাত্যহিক জীবন শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্যের আদর্শে পরিচালিত করিয়া ক্রমশঃ ভজন-রাজ্যে অগ্রসর হন। শাস্ত্রও বলিয়াছেন,—যিনি স্বয়ং শাস্ত্রানুযায়ী আচরণ করিয়া শিষ্যদিগকে আচারে স্থাপন করেন, তিনিই 'আচার্য্য'। উৎপথগামী কখনও 'আচার্য্য' নহেন। অর্থলোভী, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, শোককারী, আচারহীন, স্ত্রী-সঙ্গী ও ভগবানে শরণাপত্তি-রহিত ব্যক্তি কখনই 'গুরু' পদবাচ্য হইতে পারে না। একটী দোঁহায় কোনও একজন ভক্তকবি লিখিয়াছেন,—

"গুরু-লোভী শিখ্ লাল্‌চি, দোনো খেলে যাঁও।
দোনো বপুরা ডুব মরে, চড়হে পথিরকে নাও॥"

অর্থাৎ যে গুরু অর্থলোভী এবং যে শিষ্য সংসারসুখে একান্ত অভিলাষী, ইঁহারা দুইজন যদি একত্র পরামর্শ করিয়া ভবসাগরাভ্যন্তরে পাষাণের ন্যায় দৃঢ় জ্ঞাননৌকায় আরোহণপূর্ব্বক খেয়া লইয়া যান, তাহা হইলেও দুইজনই নিশ্চয়ই ডুবিয়া মরিবেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই ভবসাগরের পারে যাইতে সমর্থ হইবেন না।

শিষ্যের ভক্তিবলে গুরুর দোষও গুণে পরিণত হয়, এরূপ কথা নিতান্ত অসিদ্ধান্তপর। যাঁহার দোষ আছে, তিনি লঘু; তিনি 'গুরু' পদবাচ্যই নহেন। গুরুর কোনই দোষ থাকিতে পারে না। আর 'শিষ্য' বলিতে শাসন-যোগ্য ব্যক্তিকে বুঝায়। যিনি শাসিত হন, তিনি—'শিষ্য', আর যিনি শাসন করেন, তিনি—'গুরু'। গুরু যদি শিষ্যের দ্বারাই শাসিত হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার আর গুরুত্ব কোথায়? অতএব ব্যবহারিক জাতি-কুল, প্রাকৃত পাণ্ডিত্য বা লৌকিক আচার অপেক্ষা না করিয়া পরমার্থ-পিপাসু ব্যক্তি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পারমার্থিক গুরুপাদপদ্মে উপনীত হইবেন।

তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্‌গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈ স্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥

(ভাঃ ১১।৩।২২-২৩)

বেদশাস্ত্রের তাৎপর্য্যজ্ঞ, কৃষ্ণসেবৈকনিষ্ঠ, লোভাদির অবশীভূত সদ্‌গুরুতে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে যাহাতে আত্মপ্রদ হরি পরিতুষ্ট হন, সেইরূপ অনুবৃত্তিদ্বারা গুরুসেবা করিতে করিতে তাঁহার নিকট হইতে শিষ্য ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিবে। গুরুদেবকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন অর্থাৎ ভগবানেরই আশ্রয়-জাতীয় প্রকাশ-বিগ্রহ জানিবে।

অতত্ত্বজ্ঞ হইয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন যে,—'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' 'অবৈষ্ণব কখনই গুরু হইতে পারেন না', এইরূপ কথা বলিয়া অত্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলেই ইহার মর্ম্মার্থ বোধগম্য হইবে। ইহা বোধহয় সকলেই জানেন যে, একমাত্র শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কেহই ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের নিত্যতা স্বীকার করেন না। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী সম্প্রদায়ের মতে ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই। তাঁহারা ভক্তিকে অভীষ্টলাভের উপায় বলিলেও, কেহই 'উপেয়' বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—মুক্তিলাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই ভক্তির আবশ্যকতা। মুক্ত হইলে যখন ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া যাইতে হয়, তখন কে কাহাকে ভক্তি করিবে? ভক্তি স্বীকার করিতে হইলে 'ভক্তি', 'ভক্ত' ও 'ভগবানে'র পৃথক্ অবস্থান ও নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্র—'মুক্তির পরই প্রকৃত ভক্তি আরম্ভ হয়,' ইহাই সিদ্ধান্ত করেন। ভাগবতশাস্ত্র বলেন,—আত্মারাম মুনিগণও শ্রীহরিতে অহৈতুকী

ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন। মুক্ত পুরুষই নিত্য স্বেচ্ছায় শরীরী থাকিয়া ভগবানকে ভজনা করেন। তাঁহারা মুক্তির পরও ভগবান্, ভগবানের অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব, ভগবৎপার্ষদ ও বৈষ্ণবগণের নিত্যত্ব, ভগবদ্ধামের নিত্যত্ব, ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করেন। অতএব শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ই একমাত্র যথার্থ গুরুকে স্বীকার করেন। যে গুরু আজ আছেন, কালে থাকিবেন না, যে প্রতিমার আজ আবাহন ও পূজা হইতেছে, কাল আবার বিসর্জ্জন হইয়া যাইবে অর্থাৎ যাঁহাদের নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই, তাঁহারা কিরূপে নিত্য হতে পারেন? নিত্য পদার্থকে আশ্রয় করিয়া ফলপ্রদই পদার্থ লাভ হয়। অনিত্য বস্তুকে আশ্রয় করিয়া কেহ নিত্য বস্তু লাভ করিতে পারে না। শ্রীগুরুদেব নিত্য পদার্থ, তিনি নিত্যকাল ভগবানের আলিঙ্গিত বিগ্রহ-রূপে অবস্থান করেন। শিষ্য নিত্যকাল তাঁহার আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা করেন। অতএব এইরূপ নিত্যপদার্থ বা বৈষ্ণব গুরুর আশ্রয় করাই কি সকলের কর্ত্তব্য নহে? আবার 'বৈষ্ণব' বলিতে কেহ কেহ যেন বৈষ্ণবের বাহ্যবেশকেই 'বৈষ্ণব' মনে না করেন। রামবাদ্দী অভিনয়-কালে 'নারদ ঋষি' সাজিলেও, সে 'প্রকৃত নারদ' নহে। যিনি সর্ব্বক্ষণ নারদ অর্থাৎ নারদের আনুগত্যে হরি-কীর্ত্তনকারী, নিষ্কপট শুদ্ধভক্ত, তিনিই বৈষ্ণব।

আমরা প্রাত্যহিক জীবনের প্রথম উষায় সর্ব্বপ্রথমে সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় লাভ করিবার জন্য ভগবানের সমীপে ব্যাকুলভাবে নিষ্কপটে কাতর প্রার্থনা জানাইব। শ্রীভগবানই আমার আর্ত্তি ও শুভেচ্ছা দেখিয়া আমাকে শুদ্ধপথে চালিত করিবার জন্য আমার নিকট মহান্ত-গুরু প্রেরণ করিয়া দিবেন। নতুবা আমরা নিজের ক্ষুদ্রবুদ্ধি, বিমুখবৃত্তি ও নিরন্তর আত্মবঞ্চনার প্রচ্ছন্ন প্রবল ইচ্ছায় ভরপুর থাকিয়া কখনও ভোগ-চক্ষে সদ্‌গুরুর দর্শন লাভ করিতে পারিব না। যে ব্যক্তি আমার মন যোগাইয়া চলিতে পারেন, আমার বঞ্চনাপরা বুদ্ধি আমাকে যাহা 'ধর্ম্ম' বা 'সত্য' বলিয়া ধারণা করাইয়া দিয়াছে, অথবা প্রচলিত জনমত বা গতানুগতিক ব্যক্তিগণ যাহাকে 'ধর্ম্মকর্ম্ম' বলে, সেইরূপ ব্যাপারে যে ব্যক্তি আরও ইন্ধন প্রদান করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই 'সদ্‌গুরু' মনে করিয়া আমার জীবন বিপথেই পরিচালিত করিব। তখন "আমার ভিতরে কোন দুষ্টবুদ্ধি বা কপটতা নাই"—বাহ্যজ্ঞানে আমি এইরূপ ভাবিলেও আমাকে বঞ্চিতই হইতে হইবে। আমি হরিসেবার পরিবর্ত্তে প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়তর্পণ খুঁজিতে গিয়া কোন প্রাকৃত সহজিয়ার কণ্ঠস্বর, কৃত্রিম হাবভাব, লোকমুগ্ধকর চরিত্র, প্রাকৃত পাণ্ডিত্য, বক্তৃতা, কথকতা, ব্যাখ্যাপ্রণালী প্রভৃতি লোক-

বঞ্চনাকর বাহ্যবিষয় দেখিয়াই তাহাকে মহাভাগবত, পরমবৈষ্ণব মনে করিব এবং ঐরূপ প্রচ্ছন্ন অবৈষ্ণবকে গুরুপদে বরণ করিয়া শুদ্ধভক্তিপথ হইতে চিরতরে চ্যুত হইব। যিনি নিকপটে সত্য সত্য শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ চান, শ্রীভগবান্ তাঁহার নিকট মহান্ত-গুরুরূপে আবির্ভূত হন। কৃষ্ণৈকনিষ্ঠাই মহান্ত-গুরুর স্বরূপ লক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণগুলি তটস্থ বা আগন্তুক। অনেক সময় কপট, অবৈষ্ণব ব্যক্তিও লোকবঞ্চনা করিবার জন্য কৃত্রিমভাবে ঐ সকল লক্ষণ বাহ্যে প্রকাশ করিতে পারেন।

আমরা প্রাত্যহিক জীবনের প্রথম উষার সর্ব্বপ্রথম মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানটী আজ বিবৃত করিলাম। ক্রমশঃ অন্যান্য অনুষ্ঠানাবলীর কথাও প্রকাশ করিব। "আরম্ভসদৃশোদয়ঃ।"

শ্রীক্ষেত্র দর্শন

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
জয় নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমপূর্ণকায়॥
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত ঈশ্বর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর পরিকর॥
রূপ, রঘুনাথ, গদাধর মহাশয়।
শ্রীস্বরূপ, রামানন্দ, সার্ব্বভৌম জয়॥
ভকতিবিনোদ জয় আমার ঠাকুর।
কেবলা করুণা যাঁর জীবেতে প্রচুর॥
নিখিল দয়ার নিধি শচীর নন্দন।
মায়াপুরে অবতার—শাস্ত্রের বচন॥
মাধুর্য্যপূরিত প্রভু মহা কৃপাময়।
ভক্তের বান্ধব নিত্য ভক্ত ছাড়া নয়॥
ধামের মাহাত্ম্য শাস্ত্র করেন প্রকাশ।
নিত্যধামে নিত্যলীলা করয়ে বিকাশ॥
স্বতন্ত্র প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল।
অপ্রকাশ হয়ে ধাম ছিল বহুকাল॥

ভকতিবিনোদ দেব পতিতপাবন।
গৌরাঙ্গপার্ষদ তিঁহ নিত্য সিদ্ধজন॥
প্রকাশ করিল ধাম গৌরকৃপাবলে।
শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে ধন্য হইলা সকলে॥
মম ভাগ্যে হৈল যবে ধাম দরশন।
সংহতি ছিলেন প্রভু অধমতারণ॥
শ্রীভক্তিবিনোদ দেব মম প্রভুবর।
যাঁহার কৃপায় নাম স্ফুরিল অন্তর॥
জন্মোৎসবে মায়াপুরে করিয়া গমন।
গৌরচন্দ্র মুখ হেরি' জুড়াল নয়ন॥
কিবা সে চাঁচর কেশ দেখিতে সুন্দর।
গলদেশে ফুলমালা অতি মনোহর॥
শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিঃ কিবা, কমল নয়ন।
অধরে অমিয় হাসি ভুবনমোহন॥
বামে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ভক্তিস্বরূপিণী।
দক্ষিণে দাঁড়ায়ে লক্ষ্মী জগত জননী॥
বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ আনন্দিত মনে।
প্রভুজন্ম-মহোৎসব করেন কীর্ত্তনে॥
চৈতন্যচরিতামৃত সিদ্ধান্ত মধুর।
পাঠ করে ভক্তগণ আনন্দ প্রচুর॥
ভক্তসঙ্গে গ্রন্থাস্বাদে অতি সুখোদয়।
শ্রবণ করিয়া মোর প্রফুল্ল হৃদয়॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু জগতের প্রাণ।
অনুভবে দেখাইল নিদয়ার স্থান॥
কেন আজ্ঞা দিল প্রভু না জানি কারণ।
ক্ষেত্র দরশনে মন হৈল উচাটন॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ

———

। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।

শ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে

সাদর আহ্বান

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ তুরা, পিন—৭৯৪০০১
জেলা—ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে সমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে আগামী ১৬ই শ্রাবণ (ইং ২।৮।৯০) বৃহস্পতিবার হইতে ২০শে শ্রাবণ (ইং ৬।৮।৯০) সোমবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা ও ২৮শে শ্রাবণ (ইং ১৪।৮।৯০) মঙ্গলবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে স্বয়ং আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে সমিতির শাখাকেন্দ্র শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ছায়াচিত্র ও বিভিন্ন প্রদর্শনীযোগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাদি প্রদর্শন এবং বিশেষভাবে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারী-জীউর মঙ্গলারাত্রিক, ভোগরাগ ও নন্দোৎসবের দিন সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনগণ উক্ত শুদ্ধভক্তানুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৭

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—

সেবকবৃন্দ,
শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ

দ্রষ্টব্যঃ—কোন বিষয়ে জানিতে হইলে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারীর নিকট উপরোক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

—ঃ শ্রীজন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান-সূচী ঃ—

২৭শে শ্রাবণ (ইং ১৩।৮।৯০), সোমবার—

অধিবাস—সন্ধ্যা ৬ টায়।
কীর্ত্তন—সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত।
শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ—রাত্রি ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত।

২৮শে শ্রাবণ (ইং ১৪।৮।৯০), মঙ্গলবার—

মঙ্গলারতি—ভোর ৪টায়।
নগর সঙ্কীর্ত্তন—মঙ্গলারতি অন্তে ৮টা পর্য্যন্ত নগর পরিক্রমা।
সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী পাঠ—সকাল ৮-৩০টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত।
ধর্ম্মসভা—সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে রাত্রি ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত রামমঙ্গল, তদনন্তর ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন।

২৯শে শ্রাবণ (১৫।৮।৯০), বুধবার—

মঙ্গলারতি—ভোর ৪ টায়।
ভোগারতি—মধ্যাহ্নে।
নন্দোৎসব ও প্রসাদ বিতরণ—দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত।
সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন ও রামমঙ্গল।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে উৎসব-সূচী পরিবর্ত্তনযোগ্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে সেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪২শ বর্ষ | ৯ শ্রীধর, প্রদ্যুম্ন, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ | ৩২শে আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৯৭, ইং ১৭।৭।৯০ | ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

গোপীগণ-দ্বিজবর-কৃতং শ্রীকৃষ্ণ-রক্ষাকবচম্

[শ্রীমদ্‌গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে শ্রীনারদ-বহুলাশ্ব-সংবাদে পূতনা-শকট-তৃণাবর্ত্তমোক্ষে ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশেঽধ্যায়ে]

শ্রীগোপা উচুঃ,—

১। শ্রীকৃষ্ণস্তে শিবঃ পাতু বৈকুণ্ঠঃ কণ্ঠমেব হি।
শ্বেতদ্বীপপতিঃ কর্ণৌ নাসিকাং যজ্ঞরূপধৃক্ ॥ ১৫ ॥

[যশোমতী পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে রোহিণীর ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহার রক্ষাবিধান করিতে লাগিলেন; যমুনার পূতমৃত্তিকা ও জলে তাঁহার দেহ অভিষিক্ত করিয়া তদীয় মস্তকোপরি গোপুচ্ছ ভ্রমণ করাইলেন; গোমূত্র ও গোময়ে স্নান করাইয়া বক্ষমাণ রক্ষাবাক্য বলিতে লাগিলেন।]

গোপীগণ বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ তোমার মস্তক রক্ষা করুন ; বৈকুণ্ঠ তোমার কণ্ঠ, শ্বেতদ্বীপপতি কর্ণদ্বয় এবং যজ্ঞরূপধারী তোমার নাসিকা রক্ষা করুন ॥ ১৫ ॥

২। নৃসিংহো নেত্রযুগ্মঞ্চ জিহ্বাং দশরথাত্মজঃ।
অধরাববতাং তে তু নরনারায়ণাবৃষী ॥ ১৬ ॥

শ্রীনৃসিংহ নেত্রযুগল, দশরথ-তনয় রাম রসনা এবং নরনারায়ণ ঋষি তোমার অধরোষ্ঠ রক্ষা করুন ॥ ১৬ ॥

৩। কপালৌ পাতু তে সাক্ষাৎ সনকাদ্যা কলা হরেঃ।
ভালন্তে শ্বেতবারাহো নারদো ভ্রূলতেঽবতু ॥ ১৭ ॥

সাক্ষাৎ হরির অংশ সনকাদি তোমার কপোলদ্বয় রক্ষা করুন এবং শ্বেত-বরাহ তোমার ললাট ও দেবর্ষি নারদ তোমার ভ্রূযুগল রক্ষা করুন ॥ ১৭ ॥

৪। চিবুকং কপিলঃ পাতু দত্তাত্রেয় উরোঽবতু।
স্কন্ধৌ দ্বাবৃষভঃ পাতু করৌ মৎস্যঃ প্রপাতু তে ॥ ১৮ ॥

কপিল তোমার চিবুক রক্ষা করুন, দত্তাত্রেয় তোমার বক্ষ রক্ষা করুন। ঋষভ তোমার স্কন্ধদ্বয় রক্ষা করুন এবং মৎস্যরূপী হরি তোমার করদ্বয় রক্ষা করুন ॥ ১৮ ॥

৫। দোর্দ্দণ্ডং সততং রক্ষেৎ পৃথুঃ পৃথুলবিক্রমঃ।
উদরং কমঠঃ পাতু নাভিং ধন্বন্তরিশ্চ তে ॥ ১৯ ॥

প্রভূত পরাক্রম পৃথু সতত তোমার ভুজযুগল রক্ষা করুন ; কূর্ম্ম তোমার কুক্ষি রক্ষা করুন এবং ধন্বন্তরি তোমার নাভি রক্ষা করুন ॥ ১৯ ॥

৬। মোহিনী গুহ্যদেশঞ্চ কটিন্তে বামনোঽবতু।
পৃষ্ঠং পরশুরামশ্চ তবোরূ বাদরায়ণঃ ॥ ২০ ॥

মোহিনী তোমার গুহ্যদেশ এবং বামন তোমার কটি রক্ষা করুন। পরশু-রাম তোমার পৃষ্ঠ এবং বাদরায়ণ তোমার উরু রক্ষা করুন ॥ ২০ ॥

৭। বলো জানুদ্বয়ং পাতু জঙ্ঘে বুদ্ধঃ প্রপাতু তে।
পাদৌ পাতু সগুল্ফৌ চ কল্কির্ধর্ম্মপতিঃ প্রভুঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীবলরাম তোমার জানুদ্বয় ও বুদ্ধ তোমার জঙ্ঘাদ্বয় রক্ষা করুন। ধর্ম্মপতি প্রভু কল্কি তোমার পাদদ্বয় ও মনোজ্ঞ গুল্ফ রক্ষা করুন ॥ ২১ ॥

৮-৯। সর্ব্বরক্ষাকরং দিব্যং শ্রীকৃষ্ণকবচং পরম্।
ইদং ভগবতা দত্তং ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মণা শম্ভবে দত্তং শম্ভুর্দুর্ব্বাসসে দদৌ ।
দুর্ব্বাসাঃ শ্রীযশোমত্যৈ প্রাদাৎ শ্রীনন্দমন্দিরে ॥ ২৩ ॥

এই সর্ব্বরক্ষাকর দিব্য পরম শ্রীকৃষ্ণকবচ ভগবান্ প্রথমে নাভিপঙ্কজজাত ব্রহ্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন ; তারপর ব্রহ্মা শঙ্করকে এবং শঙ্কর দুর্ব্বাসাকে প্রদান করেন। তৎপর মহর্ষি দুর্ব্বাসা নন্দমন্দিরে এই কবচ যশোদাকে দেন। [গোপীগণসহ যশোমতী এই কবচদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রক্ষাবিধান করিয়াছিলেন] ॥ ২২-২৩ ॥

শ্রীব্রাহ্মণা উচুঃ,—

১০। দামোদরঃ পাতু পাদৌ জানুনী বিষ্টরশ্রবাঃ ।
ঊরূ পাতু হরির্নাভিং পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৩ ॥

["হে নন্দ ! হে ব্রজেশ্বরি যশোদে ! শোক করিও না, আমরা শিশুকে রক্ষা করিব, এই বালক চিরজীবী হইবে"—দ্বিজবরগণ এইরূপ বলিয়া কুশাগ্র ও নবপল্লবদ্বারা পবিত্র কুম্ভজলে ঋক্-যজু-সামাদি স্তবের দ্বারা উত্তম স্বস্ত্যয়ন এবং যথাবিধি অগ্নিপূজাপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা শিশুর রক্ষাবিধান করিলেন।]

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—শ্রীদামোদর তোমার পাদদ্বয় ও বিষ্টরশ্রবা জানুদ্বয় রক্ষা করুন ; হরি ঊরু এবং স্বয়ং পরিপূর্ণতম তোমার নাভি রক্ষা করুন ॥৫৩॥

১১। কটিং রাধাপতিঃ পাতু পীতবাসাস্তবোদরম্ ।
হৃদয়ং পদ্মনাভশ্চ ভুজৌ গোবর্দ্ধনোদ্ধরঃ ॥ ৫৪ ॥

রাধাপতি তোমার কটি, পীতবাসা উদর, পদ্মনাভ হৃদয় এবং গোবর্দ্ধনধারী তোমার ভুজদ্বয় রক্ষা করুন ॥ ৫৪ ॥

১২। মুখঞ্চ মথুরানাথো দ্বারকেশঃ শিরোঽবতু ।
পৃষ্ঠং পাত্বসুরধ্বংসী সর্ব্বতো ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ ৫৫ ॥

মথুরানাথ তোমার মুখ, দ্বারকেশ তোমার শির রক্ষা করুন। অসুরধ্বংসী তোমার পৃষ্ঠ এবং স্বয়ং ভগবান্ তোমার সর্ব্বাবয়ব রক্ষা করুন ॥ ৫৫ ॥

১৩। শ্লোকত্রয়মিদং স্তোত্রং যঃ পঠেন্মানবঃ সদা ।
মহাসৌখ্যং ভবেত্তস্য ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৫৬ ॥

যে মানব এই শ্লোকত্রয়ময় স্তোত্র সতত পাঠ করেন, তাঁহার মহাসৌখ্য বৃদ্ধি হয়, কুত্রাপি তাঁহার ভয় থাকে না ॥ ৫৬ ॥

———

মনুষ্য-সমাজ ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম (১)

মুক্তজীবের শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম বদ্ধ-জীবে বিকৃত

আমরা বারম্বার বলিতেছি যে,—যাহাকে পবিত্র জৈবধর্ম্ম বলে, তাহারই নাম বৈষ্ণবধর্ম্ম। জীবের নিত্য ধর্ম্মের নাম—জৈবধর্ম্ম। জীব যখন উপাধি-শূন্য হয়, তখন তাহার স্বরূপ—শুদ্ধ চিন্ময়। তখন তাহার নিত্যধর্ম্ম কি?—নিরুপাধিক প্রেম। যখন জড়গ্রন্থিরূপ উপাধিযুক্ত হয়, তখন তাহার ধর্ম্ম—বিকৃতপ্রেম বা জড়োপাধি-মিশ্রিত প্রেম। শুদ্ধজীবের বৈষ্ণবধর্ম্ম বদ্ধজীবে অনেকটা বিকৃতভাবে প্রকাশ পায়।

স্ব-স্বরূপ লাভ করিতে হইলেও জড়বিধি অপরিহার্য্য

বদ্ধজীব জড়দেহে আবদ্ধ হইয়া জড়বিধির অধীন। শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক যতপ্রকার বিধি আছে, সকলই জড়বিধিময়। জড়-সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া স্ব-স্বরূপ লাভ করিতে হইলেও জড়বিধি সহসা পরিত্যক্ত হইতে পারে না। এই জড়শরীরে অবস্থিত ইহাই জীবকে জড়ত্যাগের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। জড়-সম্বন্ধ ভাল নয় বলিয়া জড়দেহ নাশ করিলে কোন লাভ হইবে না। বরং আত্মঘাত-পাপে অধিকতর বন্ধনের আশঙ্কা আছে। অতএব স্ব-স্বরূপ লাভেচ্ছু জীবের পক্ষে দেহরক্ষার কার্য্য নিতান্ত প্রয়োজন। কেবল দেহরক্ষা নয়; দেহের পুষ্টিবর্দ্ধন ও দৈহিক নানাবিধ অভাব নিবৃত্তির জন্যও যত্ন করা আবশ্যক।

নিষ্পাপ দেহ-যাত্রায় আশ্রম ও সমাজের আবশ্যকতা

উত্তমরূপ দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে অর্থোপার্জ্জনের একটী উপায় অবলম্বন করারও নিতান্ত প্রয়োজন। দেহযাত্রা নিষ্পাপরূপে নির্ব্বাহিত হয়, তজ্জন্য একটী আশ্রম ও সংসার স্বীকার করা আবশ্যক। বিবাহিত হইয়া গৃহেই থাকুন বা অবিবাহিত অবস্থায় বৃহদ্ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাসগ্রহণই করুন একটী আশ্রম অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। সেই আশ্রম-উপযোগী একটী সমাজকে অবশ্যই পত্তন করিতে হইবে। অতএব বিষয়ী, মুমুক্ষু ও মুক্ত সকলেরই একটী একটী সমাজ আছে।

বিষয়ী, মুমুক্ষু ও মুক্তভেদে সমাজ তিন প্রকার

কেহ কেহ মনে করেন যে, সামাজিক লোককে বৈষ্ণব বলা যায় না।—

এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রম। সমাজ বাস্তবিক তিন প্রকার অর্থাৎ বিষয়ী-সমাজ, মুমুক্ষু-সমাজ ও মুক্ত-সমাজ। জীব কোন সময়েই সমাজশূন্য হয় না। **জীবের স্বভাব সামাজিক। জড়-মুক্ত হইলে জীবের শুদ্ধ-ভক্ত-সমাজ অনিবার্য্য।** অতএব জীব বনেই থাকুন, বা গৃহেই থাকুন, বা বৈকুণ্ঠে থাকুন, তিনি সর্ব্বদাই সামাজিক। বৈষ্ণব-জীব ও ইতর-জীবে ভেদ এই যে, বৈষ্ণব-জীবের বৈষ্ণব-সমাজ এবং ইতর-জীবের ইতর-সমাজ। এস্থলে এই মাত্র সিদ্ধান্ত হইল যে, **বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব-সমাজের কোন ভেদ নাই।**

বৈষ্ণব-সমাজ ও ইতর-সমাজে ভেদ

বৈষ্ণব-সমাজ ও ইতর-সমাজের ভেদ এই যে, বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র চরম উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রেম এবং ইতর-সমাজের উদ্দেশ্য—স্বার্থপর কাম। ইতর-সমাজে যাঁহারা অবস্থিত, তাঁহারা দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, নীতি, জড়ীয় বিজ্ঞান আলোচনাদ্বারা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকারক বিষয়াবিষ্কার এবং জড়ীয় ক্লেশের ক্ষণিক নিবৃত্তি—এইরূপ কার্য্যকেই জীবনের ও সমাজের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জানেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ মরণান্তর সুখকে, কেহ কেহ পারত্রিক ভোগকে এবং কেহ কেহ জীবের অস্তিত্ব নাশরূপ নির্ব্বাণকে বহুমানন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-সমাজস্থিত জীবসকল দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, বিজ্ঞান নীতি ও জড়সুখ-নিবৃত্তির দ্বারা ভগবৎপ্রীতি অনুশীলনের আনুকূল্য লাভ করেন। উভয় সমাজের আকৃতি এক, কিন্তু প্রকৃতি ভিন্ন।

বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই বদ্ধজীবের সামাজিক ব্যবস্থা

যাঁহারা সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এক বাক্যে ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, **বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা।** বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থিত হইলে জীবের প্রকৃতি লোপ হইতে পারে না, বরং তৎসাহায্যে অনেক অবকাশ ও সুবিধার সহিত ভগবৎ-প্রেমালোচনার কার্য্য হইতে পারে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই বৈষ্ণবের বদ্ধদশায় একমাত্র সমাজ। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কি-প্রকার তাহা **শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে** প্রথম ও দ্বিতীয় বৃষ্টিতে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। অতএব ঐ ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব এস্থলে পুনরালোচিত হইল না। কেবল এইমাত্র জ্ঞাতব্য যে **মনুষ্য নিজের স্বভাববশতঃ একটী বর্ণ** এবং **অবস্থাবশতঃ একটী আশ্রম স্বীকার করিয়া** জীবন নির্ব্বাহপূর্ব্বক ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করিবে। নানা **'কর্ম্ম ও ঘটনা-দ্বারা' স্বভাব নির্ম্মিত হয়। তন্মধ্যে জন্মও একটী 'ঘটনা' বিশেষ।**

জন্ম বা বংশক্রমে বর্ণ-নির্ণয়ে বর্ণাশ্রম অপদস্থ

ঘটনাক্রমে, আপাততঃ কেবল জন্মদ্বারা বর্ণ নির্ণীত হওয়ায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অপদস্থ হইয়াছে। তাহাতে ফল এই হইয়াছে যে, সেই ধর্ম্মে অবস্থিত ব্যক্তিগণের কোন কার্য্যের সাফল্য হয় না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের এই প্রকার ব্যতিক্রম দৃষ্টি করিয়া অনেক সহৃদয় লোকে ভারতের ভাবী মঙ্গলের বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। এইজন্যই কৃতবিদ্য ভারতবাসিগণ বর্ণ-ধর্ম্মের উৎসন্ন কল্পনায় নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমরা দেখিতেছি, বর্ণধর্ম্মের বিনাশদ্বারা জগতের উন্নতি হইতে পারে না। বর্ণধর্ম্মই সামাজিক মানবের জীবনস্বরূপ। বর্ণাশ্রম দূর হইলে মানবের বৈজ্ঞানিক সমাজ বিনষ্ট হইবে। মানব 'পুনর্মূষিকো ভব' এই পুরাতন অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় অবৈধ জীবনের সুবিধা লাভ করিবে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বিনাশ করা কোন 'দেশহিতৈষী' ব্যক্তির অভিপ্রেত নয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই দূর করা কর্ত্তব্য।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপনের ১০টী উপায় নির্দ্দেশ

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে পুনরায় স্বাস্থ্য-লক্ষণে আনিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিধিকে পুনঃ প্রচলিত করিতে হয়, যথা :—

১। কেবল জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা হইবে না।

২। বাল্য-সঙ্গ ও জ্ঞান সংগ্রহক্রমে যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই স্বভাব অনুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।

৩। বর্ণ নির্ণয়-কালে স্বভাব রুচির সহিত পিতামাতার বর্ণ-সম্বন্ধ একটু বিচার করিয়া বর্ণ নির্ণয় করিতে হইবে।

৪। পুরুষের উপযুক্ত বয়স হইলে অর্থাৎ ১৫ বৎসর বয়সের পর কুলপুরোহিত, ভূস্বামী, পিতামাতা ও গ্রামের কতিপয় নিঃস্বার্থ বিদ্বাবান্ ব্যক্তি বসিয়া বর্ণ নির্ণয় করিবেন।

৫। প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষের কি বর্ণ হওয়া উচিত, এরূপে প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না। কিন্তু প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ পিতৃবর্ণ-প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছে কিনা, এইরূপ প্রশ্ন উঠিবে।

৬। যদি দেখা যাইবে যে, পিতৃবর্ণের যোগ্যতা হইয়াছে, তদনুরূপ সংস্কার করা যায়। যদি দেখা যায়, উচ্চবর্ণ-লাভের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাহাতেই তাহার সংস্কার হইবে। যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের অধম বর্ণের উপযোগিতা হইয়াছে, তবে বালককে আর দুই বৎসর সময় দেওয়া যাইবে।

৭। দুই বৎসরের পর পুনরায় পূর্ব্ববৎ বিচারপূর্ব্বক তাহার বর্ণ নিরূপণ হইবে।

৮। প্রতি গ্রামে একটী সমাজ-সংরক্ষক-বিধান ভূস্বামী ও পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক প্রচলিত রাখিতে হইবে।

৯। এই সমস্ত কার্য্য যথাবিধি প্রচলিত থাকে, তজ্জন্য সম্রাটের সাহায্য লইতে হইবে। সম্রাটই বাস্তবিক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের রক্ষক।

১০। যাহার যে বর্ণ হইবে, তাহার তদনুরূপ বিবাহাদি সংস্কার ও অন্যান্য অধিকার হইবে। তদ্ব্যতিক্রমকারীর রাজদণ্ড বিধান করিতে হইবে।

বিশুদ্ধ-বর্ণাশ্রম স্থাপনের বর্ত্তমান প্রতিবন্ধক

এখন দেখা যাউক যে, এইপ্রকার সমাজ-সংস্কার আজকাল হইতে পারে কি না; আমাদের বিবেচনায় এইরূপ কার্য্য হইবার সুবিধা নাই। আদৌ রাজ-সাহায্য পাওয়া কঠিন। দ্বিতীয়তঃ রাজসাহায্য পাওয়া গেলেও তাহা সহসা গ্রহণ করা উচিত নয়; যেহেতু রাজা যে-পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আশ্রয়-গ্রহণ না করেন, সে-পর্য্যন্ত তাঁহার তদ্বিষয়ে নিরপেক্ষ সাহায্য পাওয়া অসম্ভব। নিরপেক্ষ এবং সরল সাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ সংস্কার কোনক্রমেই ঘটিতে পারে না। ভারতবাসীদিগেরও এ বিষয়ে সম্যক্ সাহায্য পাইবার আশা নাই। স্বার্থপরতাক্রমে অনেকে এই প্রার্থনীয় পরিবর্ত্তনে মত দিবেন না; বরং সংস্কার-সময়ে অনেক প্রকার ব্যাঘাত উপস্থিত করিবেন। নিম্নবর্ণের লোকেরা মূর্খতা ও অজ্ঞানভাবশতঃ বর্ত্তমান কুসংস্কারকে সহসা পরিত্যাগে অক্ষম হইবে। অতএব কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি মিলিত হইলেও এই বৃহৎ কার্য্য সহসা ঘটনীয় নহে।

যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই অনুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বর্ণাশ্রম-স্থাপনের অসীম আকাঙ্ক্ষা-সত্ত্বেও বিপদাশঙ্কা ও হুতাশাজ্ঞাপন

এখন দেখুন, দুই দিকেই বিপদ। একদিকে—কুসংস্কার-কীট আমাদের সমাজকে নিঃসার করিতেছে। চুপ করিয়া থাকিলে অমঙ্গল বই মঙ্গল নাই। আমাদের সামাজিক বল-বীর্য্য ও সৌভাগ্য সকলই ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে। যে আর্য্য-বংশের প্রতাপে বহুকালাবধি বসুন্ধরা কম্পমানা ছিল, সেই—

আর্য্য-সন্তানগণ এখন ম্লেচ্ছগণ অপেক্ষাও হীন হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে অধিকতর হীন হইতেছেন। যাঁহার হৃদয় আছে, তিনি এইসকল কথা আলোচনা করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, যাঁহার হৃদয় নাই, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিতেছেন।

অন্যদিকে দৃষ্টি করিলেও নানাবিধ বিপদ দেখা যায়। যদি বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া নূতনরূপে সমাজ স্থাপন করি, তাহা হইলে আর আমাদের আর্য্যত্ব থাকে না। যেহেতু বৈজ্ঞানিক সমাজ তিরোহিত হয়। উদাহরণ-স্থল দৃষ্ট হইবে যে, বৌদ্ধ-সমাজ, জৈন-সমাজ, দেশীয় খ্রীষ্টান-সমাজ প্রভৃতি বর্ণাশ্রম-রহিত ব্যবস্থাসমূহ কখনই ভারতভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল না। বৌদ্ধ-সমাজ ও জৈন-সমাজ পর্ব্বতগুহা মধ্যে লুক্কায়িত হইল। দেশীয় খ্রীষ্টান-সমাজ কেবল ম্লেচ্ছানুগত্যে বৃত হইল, ব্রাহ্ম-সমাজ কুটীরস্থ হইয়া পড়িল! তন্মধ্যে আর কাহারও সামাজিক স্বাধীন জীবন নাই। কোথায় বা বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা, কোথায় বা নববিধান? কেহই কোন কাজে লাগিল না! কখনই এই বিজ্ঞানপীঠ ভারতে কোন কাজে লাগিবে না—যদি আমরা সহসা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সংস্কার আরম্ভ করি, তবে আরও 'হুলস্থুল' পড়িয়া যাইবে। সকলদিকে অন্ধকার দেখা যাইতেছে।

নানাবিধ বিপদ ও প্রতিবন্ধক-সত্ত্বে ভগবানের নিকট দৈববর্ণাশ্রম স্থাপনের প্রার্থনা

এখন উপায় কি? মঙ্গলের প্রয়োজন। কিন্তু মঙ্গল কিসে সহজে লভ্য হয় তাহা বিবেচনা করা উচিত। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যে-পর্য্যন্ত সংস্কৃত হইয়া প্রকৃতিস্থ না হয়, সে-পর্য্যন্ত সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক অমঙ্গলসমূহ আমাদিগকে জর্জ্জরিত করিবে। সমস্ত মঙ্গলের বিধান-স্বরূপ ভগবানই সেই মঙ্গল বিধান করিবেন, সন্দেহ নাই।

সত্য সত্য বর্ণাশ্রম স্থাপনের শাস্ত্রীয় আপত্তি খণ্ডন

পুরাণ অবলম্বনপূর্ব্বক কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, কলির অবসানে শ্রীশ্রীকল্কিদেব অবতীর্ণ হইয়া মরু ও দেবাপি রাজাদ্বয়ের সাহায্যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পুনর্ব্বার সংস্থাপন করিলে সত্যযুগের উদয় হইবে। কিন্তু আমরা বলি যে, এই কলিযুগ সাধারণ কলিযুগ নয়। ইহাকে পূর্ব্ব মহাত্মাগণ **'ধন্য কলি'** বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সাধারণ কলিযুগেই কেবল কলিকালের অবসানে ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয়। **'ধন্য কলিযুগে' আর কল্কি-অবতারের অপেক্ষা নাই।** যে কলিযুগে পরিপূর্ণশক্তি, পরম-কারুণিক, পরমপ্রেম-

মূর্ত্তি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে-কলিযুগের আর কথা কি? **সেই করুণাময় মহাপ্রভুর কৃপায় অবিলম্বে সমস্ত সামাজিক অমঙ্গল দূরীভূত হইবে, সন্দেহ নাই।** অকৃত্রিমরূপে সেই মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করিলে আর কোন বিষয়ের চিন্তা থাকিবে না।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সংস্থাপনই প্রধান ধর্ম্মসংস্কার

এই সংখ্যায় আমরা এই পর্য্যন্ত বলিলাম, সামাজিক মঙ্গল সাধন ও 'বর্ণাশ্রমরূপ প্রধান ধর্ম্মের সংস্কার-বিষয়ে' **যে উৎকৃষ্ট উপায় আছে, তাহা আগামী সংখ্যায় আমরা প্রস্তাব করিব।** আশা করি যে, সহৃদয় পাঠকবর্গ বিশেষ মনোনিবেশপূর্ব্বক আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আগামী সংখ্যায় দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকুন। **যে-বিষয়ে আমরা হস্তক্ষেপ করিলাম তাহা অত্যন্ত গম্ভীর।** সংযত অন্তঃকরণে এই বিষয়টীর আলোচনা করা আবশ্যক। অনেক নিগূঢ় কথা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকিবে। সংক্ষেপতঃ আমরা এই বলি যে, বঙ্গীয় সমাজের পক্ষে আর অধিকতর গুরুতর বিষয় ইহা অপেক্ষা নাই।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগৌর-ভজন

বেদে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের নির্দ্দেশ

গৌর-ভজন করিতে হইলে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত একটু পরিচয় করিতে হয়। 'ভজন' শব্দে সেবাকেই লক্ষ্য করে। সেব্যবস্তুর পরিচয়ের অভাবে অপর বস্তুর সেবা হইয়া পড়ে; সে জন্যই বেদ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটী বিষয়ের আবাহন করিয়াছেন।

শ্রীভগবানই সম্বন্ধ; ভগবান্, ভজন ও ভক্ত পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত

বস্তুবিষয়ক অভিজ্ঞানই সেই বস্তুর সহিত জ্ঞাতার সম্বন্ধ। ভক্তের ভজনে ভগবান্‌ই সম্বন্ধ। ভগবান্, ভজন ও ভক্ত সম্বন্ধজ্ঞান-রহিত হইয়া অবস্থান করেন না। যেখানে সম্বন্ধ ভগবান্ নহেন, তথায় ভক্ত ও ভক্তি নাই। ভোগময় বিচার তর্ক আবাহন করে। যেখানে ভক্তের ইন্দ্রিয় অনিত্য জড় নশ্বর ভোগে ব্যস্ত, তথায় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গৌরসুন্দরের স্বরূপ বদ্ধজীবের

নেত্রে অদৃশ্য। বদ্ধজীবের ভোগের অন্যতম নশ্বর বস্তু-প্রতীতি গৌরসুন্দরে সংবদ্ধ হইলে গৌরাঙ্গকে ভোগ্যজ্ঞান করা হয়—ইহা ভজনের নিতান্ত বিরোধী। ভজনের নামে ইন্দ্রিয়তর্পণ বা নশ্বর ভোগময়ী ধারণামাত্র শোভনীয় নহে। গৌরভক্ত বলিয়া আপনাদিগকে অভিমান করিয়া যাঁহারা নিজেন্দ্রিয়-তর্পণমাত্র সার জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহারা গৌরাঙ্গকে ভজনীয় বস্তু জানিবার প্রতিকূলে নিজ নশ্বর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দগঠিত গৌর কল্পনা করেন মাত্র, তাহাতে শ্রীগৌরভজন হওয়া দূরে থাকুক্, অনর্থময় বিষয়গ্রহণ মাত্র হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—'ভগবদ্বস্তু অধোক্ষজ'।

শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাদ্ ব্রজেন্দ্রনন্দন ও অধোক্ষজ-তত্ত্ব

'অধোক্ষজ'-শব্দে ইহাই বুঝায় যে, যিনি জড়েন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত বস্তু অর্থাৎ বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ভোগের বস্তুমাত্র নহেন। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ সন্দর্ভের কয়েকস্থানেই বলিয়াছেন,—'অধঃকৃতং অতিক্রান্তং অক্ষজং জ্ঞানং যেন সঃ অধোক্ষজঃ'। যেখানে 'অধোক্ষজ' শব্দে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর লক্ষিত হন, তথায় গৌরসুন্দর আমাদের ভোগ্য বস্তু নহেন। অপর ভাষায় বলিতে গেলে, গৌরের রূপ জড়ের রূপ নহে। আমাদের নশ্বর স্থূল ইন্দ্রিয় জড়ের রূপভোগে বা ইন্দ্রিয়-তর্পণ জন্য ব্যস্ত হয়—তাহাতে কৃষ্ণবিস্মৃতি হয় মাত্র। শ্রীগৌরহরির অপূর্ব্বরূপ আর কিছুই নয়—উঁহার দর্শনে আমাদের ভোগ-প্রতীতি উদ্রেক হওয়া দূরে যাক্, ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসা নিত্যকালের জন্য থামিয়া যায়। গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন, তাঁহাতে শ্রীরায়-রামানন্দপ্রমুখ ভক্তগণের সেবনীয় বস্তুবিজ্ঞান উচ্ছলিত হয়, নদীয়া-নাগরীগণের জড় ভোগবাসনা প্রদীপ্ত হয় না। নাগরীগণ জড়-ভোগময়ী ধারণার তাৎকালিক বশবর্ত্তিতায় কামরিপু-চরিতার্থতার জন্য জড় নাগর অন্বেষণ করেন। তাহাতে উত্তরোত্তর জড়কাম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জীবকে হরিভজন হইতে বিষয়ভোগে প্রমত্ত করায়। অহৈতুক নির্ম্মল প্রেম তথায় তিরোহিত হইয়া নিজেন্দ্রিয়প্রীতি-তাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত হয়। আমরা গেলাম নিজের নিঃশ্রেয়ঃ-লাভের জন্য, গমনপথে রিপুহস্তে পতিত হইয়া নিত্যকালের জন্য নিত্য ভজন ধ্বংস করিয়া কর্ম্মকাণ্ডে ভোগের আবাহন করিয়া বসিলাম! গেলাম শ্রীজগদ্গুরুদেবের চরণপ্রান্তে পূজা করিবার জন্য, পড়িলাম ভোগ-গর্ত্তে! নর্ত্তকীদিগের নৃত্য-গীতাদি যেরূপ ইন্দ্রিয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে দুর্ব্বল জীবকে মঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত করে, আমাদিগকেও গৌরভজন করিবার নামে নাগরীর ভোগপিপাসা গ্রাস করিয়া ফেলে।

শ্রীগৌরহরিকে নাগররূপে কল্পনা—গৌর-বিদ্বেষ মাত্র

গৌরহরি ভোগের বস্তুবিশেষ নহেন। তিনি পূজার বস্তু—কৃষ্ণোন্মুখ জীবের ভজনের বস্তু। বিষয়ভোগস্পৃহারত ব্যক্তিগণ কামাদি রিপুষট্‌কের বশবর্ত্তী হইয়া যে দৃশ্য ভোগময় জগতে বিচরণ করেন, গৌরভজনের ছলনায়ও আমাদের তাদৃশ জড়েন্দ্রিয়পরায়ণতাই বৃদ্ধি লাভ করে। জড়ভোগরত আমরা; আমাদের পতি, পত্নী, পুত্র, প্রভু, ভৃত্য ভোগের বস্তু; গৌরাঙ্গ তাদৃশ অনিত্য, অজ্ঞানময় ও নিরানন্দের আধারমাত্র নহেন। তিনি নদীয়ার নাগরীর ভোগের বস্তু নহেন বলিয়াই নিজ স্বরূপ প্রকট করাইয়াছেন। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি তাঁহাকেও জড় ভোগের অন্যতম বস্তুজ্ঞানে নাগর বলিয়া খাড়া করি এবং আমরা ভোক্তা রমণী সজ্জায় নাগরী বলিয়া অভিমান করি, তাহা হইলে উহা ভজন না বলিয়া জড়েন্দ্রিয়তর্পণ নামে অভিধান করাই আমাদের পক্ষে সত্যপ্রিয়তা। অবশ্য বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতিকূলে ভক্তিহীন জড়েন্দ্রিয়-ভোগপ্রবণা শক্তি-উপাসনা ত' অনেকদিন হইতেই আছে। শ্রীগৌরসুন্দরকে কেন্দ্র করিয়া গৌরভক্তি কলঙ্কিত করিবার উদ্দেশে গৌরকে জড়ের রূপ, জড়ের গুণ, জড়ের ক্রিয়ায় সজ্জিত করিয়া ক্ষণকালের জন্য নিজের ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির কল্পনাকে ভজন বলিয়া প্রচার করিতে যাওয়া কি আমাদের গৌরবিদ্বেষ মাত্র নহে? গৌরের নাম ত' জড়বস্তুর সংজ্ঞাবিশেষ নহে, গৌরের রূপ ত' দৃশ্য জড়বস্তুর অন্যতম নহে, গৌরের গুণ ত' প্রাকৃত নশ্বর গুণমাত্রের অন্যতম নহে এবং গৌরলীলা ত' ইন্দ্রিয়পরায়ণের ভজন-ছলনামাত্র নহে।

শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-রূপ-গুণাদি অপ্রাকৃত, তিনি সম্ভোগময় বিগ্রহ নহেন

শ্রীগৌরহরির নাম কৃষ্ণচৈতন্য, গৌরহরির রূপ গৌর, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, নিত্য গৌররূপ বলিয়া কৃষ্ণেতর নহেন, তিনি মহাবদান্য অর্থাৎ নির্ব্বোধের প্রতিও তিনি অসামান্য কৃপাবিশিষ্ট অর্থাৎ কোন কৃষ্ণ কর্ম্মের Black act-এর অনিত্যতা, অজ্ঞান-নিরানন্দরূপ অবরতা তাঁহাতে অবৈধভাবে আরোপ করিতে গেলে তিনি সেই আবরণ হইতে বদ্ধজীবকে কৃপা বিতরণে মুক্ত করেন। তাঁহাকে অবৈধ জড়ভোগ-তাড়নায় নাগর বলিতে নাই। নাগরীভাবে তাঁহার ভজন-সাধনের কল্পিত আবাহন কৃষ্ণভজনের প্রতিকূল পথমাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় শুদ্ধভক্ত শ্রীনিত্যানন্দ-অদ্বৈত প্রভুগণ-

দ্বারা শ্রীরূপ-সনাতনপ্রমুখ গোস্বামিষট্‌কের দ্বারা, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীদ্বারা, শ্রীগদাধর-নরহরি প্রভৃতি প্রেমিক ভক্তদ্বারা, চতুঃষষ্টি মহান্তদ্বারা জড়ভোগমিশ্র অনর্থময় সাধনকালের ভক্তির অনুষ্ঠানে সিদ্ধিকালের ভক্তির অনুষ্ঠান অবৈধভাবে সংমিশ্রণে কতই না বাধা দিয়াছেন! কিন্তু আমরা অপরাধী তর্কনিষ্ঠ-হৃদয়বিশিষ্ট অনর্থময় জীব সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে জড়বস্তুবিশেষ মনে করিয়া তাঁহাকে জড় সম্ভোগের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহরূপে গড়িতে যাইতেছি! ইহা অপেক্ষা আর আমাদের শ্রীগৌরবিদ্বেষ কি হইতে পারে? তাঁহাকে জগদাচার্য্য মুখে বলিয়া জড় কুভোগ-রাজ্যে দুরাচার নাগর বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে যাই বলিয়াই মৃত অক্ষয়কুমার দত্ত, সংস্কৃত 'ভক্তমাল' লেখক চন্দ্র দত্ত, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় ক্ষীণ সমালোচক ও খৃষ্টানদিগের সাময়িক পত্র-প্রচারাখ্য প্রবন্ধাদিতে শ্রীগৌর-বিগ্রহকে অবৈধ প্রচারক মাত্র বলিয়া সজ্জিত করায়।

ভজনামৃত-লেখক ঠাকুর নরহরি ও সিদ্ধ চৈতন্যদাসের প্রতি নাগরীপদ আরোপ সত্যবিরুদ্ধ

বাস্তবিক শ্রীগৌরসুন্দর কি কোন দুরাচার অভিনয় নিজলীলায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে আমরা দুঃসাহসিকতার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে অবৈধ ভোগ্য নাগর বলিতে যাই? পরস্ত্রী-প্রেক্ষণপর, পরস্ত্রী-চিন্তনপর, অবৈধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর নাগররূপে গৌরভক্তগণ কোনদিনই তাঁহাকে কুকর্ম্মরত বলিয়া জানিতে পারেন নাই। তবে নবদ্বীপ-নাগরীবাদ কে উদ্ভাবন করিল, কোন্ সময় এই দুর্নীতি ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করিল, কাহারাই বা এই দুর্নীতিকে অনর্থময় কালে ধর্ম্মের সাধন-ভজন বলিয়া চালাইতে আরম্ভ করিল? 'ঠাকুর নরহরির সহিত কি এই ভজন-সাধনবিরোধী অবৈধ অনুষ্ঠানের কোন সম্বন্ধ আছে?' প্রশ্ন হইলে আমরা বলিতে চাই, যাঁহারা ঠাকুরের 'ভজনামৃত' দেখিয়াছেন, তাঁহাদের এরূপ ভ্রম হইতে পারে না। সিদ্ধ চৈতন্যদাস এই অবৈধ অনুষ্ঠানকে ভজন বলিয়া চালাইয়াছিলেন কিনা, তাহারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। শুদ্ধভক্তগণ বলেন, কতিপয় অবৈধ দুর্নীতিপরচিত্ত ব্যক্তি চৈতন্যদাসের ক্রিয়াকলাপ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে সাধক চৈতন্যদাস বলিতে গিয়া স্বীয় কুনীতি-পুষ্ট চঞ্চল প্রতীতিদ্বারা নিজ ধারণায় সত্যানুষ্ঠানকে বিকৃত করিয়াছেন মাত্র। চিড়িয়াকুঞ্জের সিদ্ধ কৃষ্ণদাসের সম্বন্ধে এই নদীয়া-নাগরীভজনের কথা অন্যায়পূর্ব্বক আরোপ করা সত্যবিরুদ্ধ মাত্র।

আচার্য্যবর্গের প্রতি অবৈধ দোষারোপ পরচর্চ্চা নহে—গুরুসেবা

চৈতন্যদাসের অলৌকিক ভাব বুঝিতে না পারিয়া আমরা যদি তাঁহাকে নদীয়া-নাগরীর দৌরাত্ম্যপূর্ণ অবৈধ সাধক শ্রেণীভুক্ত করি, তাহা হইলে ভক্তের চরণে অপরাধ ব্যতীত আমরা আর কিছুই করিলাম না। ছাগল-হারাণ বুড়ির রামায়ণের কথক ঠাকুরের দাড়ি-সঞ্চালন দেখিয়া ও পাঠ-শ্রবণের মত মহদৎ বৈষ্ণবগণের চরিত্র অনর্থময় আমি বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া নিজ কুবৃত্তিপুষ্ট ভাবের সংযোজন করা আদরণীয় নহে। যাঁহারা গৌরসুন্দরের দাসগণের অলৌকিক চেষ্টা নিজের জড় ভোগময় ভাবের অন্যতমজ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রয়াস পান, তাঁহাদিগকে আমরা নির্ব্বোধ বলিয়া স্থির করিলে আর গৌর-কথার অনুশীলন করিতে বলিতাম না। তাঁহারা নির্ব্বোধ নহেন বলিয়াই নদীয়া-নাগরীবাদের দুর্গন্ধ তাঁহাদিগকে বিজড়িত না করিতে পারে এবং তাদৃশ সাধন-ভজন শুদ্ধভক্তির আদৌ অনুমোদিত নহে বলিয়া জানাইয়া দিবার জন্য সভা-সমিতি-পত্রিকাদিতে আলোচনারূপ কৃষ্ণানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা ছিল ও আছে। ইহা পরচর্চ্চা নহে, আচার্য্য বা গুরুসেবা। এই আচার্য্যসেবা রহিত হইলে বদ্ধজীব পরমার্থ-বিষয়ে নির্ব্বোধ হইয়া পড়েন। দুঃসঙ্গপ্রভাবে শুদ্ধভক্তি হইতে বিচ্যুত হইবার কুচেষ্টাই জীবকে গৌরভক্ত হইতে দেয় না।

ভক্তিবিরোধী কুসিদ্ধান্তের হস্ত হইতে ত্রাণের নিমিত্তই মহাবদান্য গৌরহরির নিজজনগণকে জগতে প্রেরণ

শ্রীগৌরহরি মহাবদান্য বলিয়া কালে কালে ভক্তিবিরোধী সিদ্ধান্তের হস্ত হইতে কুবিষয়-ভোগমত্ত তর্কনিষ্ঠ ভক্তিরহিত গৌরভক্ত প্রতিষ্ঠাকামী জনগণকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে নিজজনসমূহ প্রেরণ করেন। যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, সেইকালে ভগবান্ এবং ভক্তগণ আসিয়া আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং জীবকুলের দুর্ব্বাসনা-গঠিত ভজন-ছলনা হইতে নির্ব্বোধ অশিক্ষিতগণকে উদ্ধার করেন। সত্যসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাভাস-দোষ-দুষ্ট কোন কথাই শ্রীদামোদর-স্বরূপ গৌড়ীয়গণের মঙ্গলের জন্য প্রচারিত হইতে দেন নাই। শুদ্ধ গৌরভক্তগণ সেই গৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীদামোদর-স্বরূপের সিদ্ধান্ত, ছয় গোস্বামীর সিদ্ধান্ত, অতুলনীয় গ্রন্থ শ্রীচরিতামৃত হইতে পাইতে পারিবেন। শুদ্ধভক্ত শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে নদীয়া-নাগরীমতের অকর্ম্মণ্যতা-নিরূপণের যে সূত্র দিয়াছেন, তাহা যাহাদের আলোচ্য বিষয়

হয় না, তাহারা শুদ্ধভক্তি কাহাকে বলে, তাহার সন্ধান কখনই পাইবেন না। হরিভজন বদ্ধজীবের মনগড়া অনুষ্ঠান মাত্র নহে। যাহারা ভগবদ্ভজন না করিয়া অন্য জড় ধারণার সহিত হরিভজনকেও ভোগময় অনুষ্ঠান মনে করেন, তাঁহারাই ভক্তি যাজনের নামে নদীয়া-নাগরীবাদ অন্যায়পূর্ব্বক ভক্তিপথের অন্তর্গত বলিয়া চালাইতে থাকিবেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দের সহিত শ্রীমতী রাধারাণীর একই সিংহাসনে অবস্থিতি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-সম্মত কিনা ?

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা
পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)
ইং ৩১।১৯৬০

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-চরণে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্—

* * * মহারাজ! তোমার ২৫।১২।৫৯ তাং এর পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও তোমার ওখানে ব্যাসপূজায় যাইবার ইচ্ছা ছিল। তবে এবার উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব কিনা সন্দেহ আছে। অন্যত্র কোথাও ব্যাসপূজার বিশেষ অধিবেশনের ডাক নাই। পরে কি হইবে বলিতে পারি না।

তোমার প্রশ্ন সম্বন্ধে লিখিতেছি,—শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাদ্ শ্রীবলদেব অর্থাৎ গুপ্তভাবে বলদেব বিগ্রহই নিত্যানন্দ। সুতরাং লীলাগত বৈশিষ্ট্য থাকায় নিত্যানন্দ প্রভুকে রাধারাণীর সহিত এক সিংহাসনে রাখা হয় না।

রাম-নৃসিংহ-বরাহাদি সকলেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণেরই অংশ বা কলা। তাঁহারা বলদেব তত্ত্বের অংশ বা কলা নহেন। অবশ্য এস্থলে লীলাগত তত্ত্বের কথাই

স্মরণ রাখিতে হইবে। **শালগ্রাম শিলাদ্বারা শক্তি ও শক্তিমৎ তত্ত্বের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়।** তজ্জন্য তিনি অর্চ্চারূপে সর্ব্বত্রই অধিষ্ঠিত থাকিবার অধিকারী। বিশেষতঃ তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ—লক্ষ্মীপতি। শ্রীমতী রাধারাণীকে লক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী প্রভৃতি বলা হয়। সুতরাং **শালগ্রাম শিলার সহিত এক সিংহাসনে রাধারাণীর থাকিতে রসাভাস দোষ হয় না।**

নিত্যানন্দ প্রভু, বলদেব, লক্ষ্মণ প্রভৃতি বিগ্রহগণ সাক্ষাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব হইলেও লীলা ও রসগত বিচারে সবসময়ে একস্থানে অবস্থিতি করিতে পারেন না। **যেখানে রসাভাস দোষের সম্ভাবনা, সেখানে পৃথক্ থাকেন।** লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের কনিষ্ঠভ্রাতা বিষয়ে দেবরস্বরূপে জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর নিকটে স্নেহের পাত্রস্বরূপে অবস্থান করিলে রসাভাস দোষ হয় না।

অধিক জানিতে ইচ্ছা করিলে বা তোমার আরও কিছু জানার থাকিলে পত্র দিবে। ইতি—

শ্রীগৌরজনকিঙ্কর—
—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

পত্রে প্রশ্ন ও তদুত্তর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

যথাবিহিত বৈষ্ণব-সম্মান পুরঃসর নিবেদনমেতৎ—

মাননীয় শরৎবাবু,—*

আপনার সুদীর্ঘপত্র ও প্রশ্নাবলী যথাসময়ে পাইয়াছি। প্রশ্নগুলি বেশ সুচিন্তিত, হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্মস্পর্শী। ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ প্রবেশ না থাকিলে এরূপ প্রশ্নের অবতারণা সম্ভব হয় না।

তারকব্রহ্মনাম (ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র) উচ্চৈঃস্বরে সংখ্যাত বা অসংখ্যাতভাবে কীর্ত্তনীয় কিনা, এই প্রশ্নের শাস্ত্রযুক্তি-মূলে সমাধান চাহিয়াছেন। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহা লইয়া যখন বিদগ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে বহু আলোচনার অবকাশ দেখা দেয়, তখন এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তানু-

---

*শ্রীযুত শরৎচন্দ্র ঘোষ (গ্রাহক নং ৪২৮৯), পোঃ কলামির্দ্ধা, জেলা—ফরিদপুর, পূর্ব্ববঙ্গ (বর্ত্তমান বাংলাদেশ)।

যায়ী মতামত সুদৃঢ়ভাবে স্থাপনের প্রয়োজন মনে করি। আপনি পারমার্থিক সভা-সমিতিতে শ্রীনামের মাহাত্ম্য ও মর্য্যাদা সংরক্ষণে প্রয়াসী হইয়াছেন দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইতেছি। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কথিত "ভূরিদ" শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য।

পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত ষোলনাম-বত্রিশ অক্ষরের উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন বর্জ্জন-ব্যবস্থা কখনই শাস্ত্রীয়যুক্তি ও সিদ্ধান্তসম্মত নহে। এ সম্বন্ধে আমরা নিখুঁত-ভাবে বিরুদ্ধবাদিগণের বিচার খণ্ডন করিব। আপনি মাতামচাঁদ গোস্বামী মহাশয়ের লিখিত নামগ্রহণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন পুস্তিকা থাকিলে সংগ্রহ করিয়া রেজিষ্টার্ড পোষ্টে পত্রিকা অফিসের ঠিকানায় অবশ্যই পাঠাইবার চেষ্টা করিবেন। আমাদের কাজ শেষ হইয়া গেলেই উহা ফেরৎ পাঠাইতে পারিব। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অনেকেই হইতে পারেন। কিন্তু "মহাজনের যেই মত, তাতে হব অনুরত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার" বাক্য অবলম্বন করিলে "সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্যে" পার্থক্য লক্ষিত হয় না। এই তিনেরই বাক্য ও তত্ত্ব অভিন্ন। কখনও কোনক্রমেই পরস্পরের মধ্যে মত-পার্থক্য দৃষ্ট হয় না, তবে বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইতে পারে। পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য এককথা নহে। পার্থক্য বিরোধ আনয়ন করে, আর বৈশিষ্ট্য তত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করে।

"মহামন্ত্র" উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনের বর্ত্তমান যে রীতি প্রচলিত দেখা যায়, উহা সুপ্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। অন্বয় ও ব্যতিরেক পাশাপাশি অবস্থান করে। নাস্তিক আস্তিকেরই বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে। "সাধু-শাস্ত্র" জগতে চিরকালই আছেন ও থাকিবেন এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদীরও অভাব নাই। সুতরাং এজন্য ধর্ম্ম-প্রচারকগণকে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হয়। পূর্ব্ববঙ্গের বৈষ্ণবগণ সকলেই মহামন্ত্র গ্রহণকারী 'লক্ষপতি' নন। "লক্ষপতি" সম্বন্ধে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে। মহাপ্রভু যাহাকে লক্ষপতি বলিয়াছেন তিনি সংখ্যাপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তনকারী; সেইরূপ লক্ষেশ্বর আবার অসংখ্যাতভাবে হরিনাম-মহামন্ত্রের উপদেশ-প্রদানকারী। যাহারা শ্রীনাম-সেবাপরাধী, তাহারাই উহা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনের বিরোধী। তাহারা কষ্টকল্পনা করিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বক্তব্য অনুধাবনে অসমর্থ হইয়াই মহামন্ত্রের পরিবর্ত্তে "হরি-হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ" পদ মহামন্ত্র বলিয়া গাহিতেছেন। কিন্তু ভজন-পরায়ণ রাগমার্গীয় বৈষ্ণবগণ "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র সংখ্যাপূর্ব্বক জপ এবং অসংখ্যাতভাবে ও উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মহামন্ত্র তারকব্রহ্ম-নামের ইহাই একটী বৈশিষ্ট্য।

শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে সিংহাসনের একই প্রকোষ্ঠে স্থাপন করা রসাভাস-দুষ্ট বিচার। অন্ততঃ একই সিংহাসনে পৃথক্ প্রকোষ্ঠে উহাঁদের স্থাপন প্রয়োজন। মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে "জয় জয় রাধাকৃষ্ণ" ইত্যাদি কাল্পনিক নাম বা ছড়াগানের প্রচলন নামাপরাধেরই নামান্তর। উহা বিংশতি বৎসরেরই হউক আর শত বৎসর যাবৎই হউক, যেহেতু উহা কাল্পনিক—মহাজনানুগত নহে। তজ্জন্য সুধী ভক্তসমাজ শাস্ত্রীয় যুক্তি ও সিদ্ধান্ত-সঙ্গত বলিয়া উহা গ্রহণ করিতে পারেন না। তত্ত্বজ্ঞ, রসজ্ঞ, সুধীভক্ত—শ্রীনাম-ভজন-পরায়ণ। সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস-দোষ সম্ভবপর নয়। ঐস্থানে যাঁহারা কাল্পনিক নাম কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া 'মহামন্ত্র' গ্রহণের পক্ষপাতী হইয়াছেন, তাঁহাদের মহতী চেষ্টা শ্লাঘ্যনীয়া। ইহাকে তাঁহাদের স্ব-মত না বলিয়া শাস্ত্রীয় মত বলিয়াই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অশাস্ত্রীয়, মহাজনগণের অননুমোদিত, কল্পিত নাম বা ছড়াগান সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত-সম্মত শ্রীনামগ্রহণ-পদ্ধতি সর্ব্বকালে সর্ব্বসত্যানুসন্ধিৎসু-কর্ত্তৃক সমাদৃত।

প্রশ্ন ঃ—"ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক" তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম সংখ্যা-গতভাবে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয় কিনা?

উত্তর ঃ—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'মহামন্ত্র' শব্দে যে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহার প্রমাণ—

"মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
'কৃষ্ণমন্ত্র' জপ সদা,—এই মন্ত্রসার॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র সার নাম—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥
*　　*　　*
কিবা মন্ত্র দিলা, গোসাঞি, কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায়, নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি, গুরু মোরে বলিলা বচন॥
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে, তা'র কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭২-৭৪, ৮১-৮৩)

জপ ত্রিবিধ :—ত্রিবিধো জপযজ্ঞঃ স্যাত্তস্য ভেদান্নিবোধত।

বাচিকশ্চ উপাংশুশ্চ মানসশ্চ ত্রিধা মতঃ ॥

ত্রয়াণাং জপযজ্ঞানাং শ্রেয়ান্ স্যাদুত্তরোত্তরঃ ॥

যদুচ্চনীচস্বরিতৈঃ স্পষ্টশব্দপদক্ষরৈঃ।

মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্ব্যক্তং জপযজ্ঞঃ স বাচিকঃ ॥ (নৃসিংহ পুরাণ)

জপযজ্ঞ ত্রিবিধ—বাচিক, উপাংশু ও মানস। ইহার মধ্যে মানস জপ শ্রেষ্ঠ। উচ্চ, নীচ ও স্বরিত-নামক স্বরযোগে সুপরিস্ফুত বর্ণদ্বারা স্পষ্টভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হইলে উহাকে "বাচিক জপ" বলে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে "হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ" শ্লোকে যেরূপ বর্ণন করা হইয়াছে, তাহাতে তিনি উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্রের "বাচিক-জপ"-লীলাই প্রদর্শন করিয়াছেন।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু উহা সংখ্যাত; অসংখ্যাত নহে। তদুত্তরে যুক্তি এই যে, মৃদঙ্গ-করতালাদি সংযোগে শ্রীমহামন্ত্র কীর্ত্তন করিবার যে প্রথা উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সময় হইতেই প্রচলন ছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার ও শ্রীচৈতন্যভাগবতকারের লেখনী হইতেই ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন মহাজনগণ উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তনের যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা কি আমাদের গ্রহণযোগ্য নহে? ঠাকুর নরোত্তমাদির পদাবলীতে উচ্চৈঃস্বরে অসংখ্যাতভাবে মহামন্ত্র কীর্ত্তনের উল্লেখ বহুস্থলেই রহিয়াছে।

শ্রীগুরুদেব অপরের শ্রুতির অগোচরে শিষ্যের কর্ণে "মন্ত্র" উপদেশ করেন এবং সেই মন্ত্র অপরের নিকট অপ্রকাশ্য, ইহাও বলিয়া দেন। "সংখ্যা বিনা মন্ত্রজপস্তথা মন্ত্রপ্রকাশনম্" (হঃ ভঃ বিঃ ২।১১৭) অর্থাৎ সংখ্যা ব্যতীত কখনও মন্ত্র জপ করিতে পারিবে না এবং কাহারও নিকট মন্ত্র প্রকাশ করিতে পারিবে না। কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগণকে যে "মহামন্ত্র" উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা কি অপরের শ্রুতির অগোচরে কেবলমাত্র নির্দ্দিষ্ট ভক্তের কর্ণেই বলিয়াছিলেন, না—উহা বহু ভক্তের সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে উপদেশ দিয়াছেন? মন্ত্রের ন্যায় ইহা অপরের নিকট অপ্রকাশ্য বা মনে মনে জপ্য, ইহা কি শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়া দিয়াছিলেন? লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণ ও শিক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহামন্ত্র অপর বিষ্ণু-মন্ত্রের ন্যায় কেবলমাত্র জপ্য নহে, তাহা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয়ও। ইহা যে কষ্টকল্পনা নহে, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ আচরণের মধ্যে বহু ক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

"মন্ত্র" ও "মহামন্ত্রে"র বিচার এই যে, যখন মন্ত্র বীজ ও প্রণব-পুটিত হইবে, চতুর্থ্যন্ত-পদযুক্ত ও নমস্-শব্দ প্রভৃতি যোগ হইবে, তখন ইহা সাধারণ্যে অপ্রকাশ্য এবং যখন ইহা বীজ ও প্রণব-রহিত হইবে, তখন 'মহৎ' বিশেষণে বিশেষিত হউক বা না হউক অথবা নমস্ প্রভৃতি যোগে চতুর্থ্যন্ত পদযুক্ত হউক বা না হউক, তাহা মহামন্ত্ররূপে আখ্যাত হইলেই সাধারণ্যে প্রকাশ্য, এমন কি উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয় বা সংকীর্ত্তনীয়। 'মন্ত্র' শব্দটি মহৎ-শব্দের যোগে মহামন্ত্র হওয়ার দরুণ ইহা মন্ত্রও বটে, মহামন্ত্রও বটে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১১।২০২) বলেন,—"দান, যজ্ঞ, স্নান, জপ ইত্যাদির দেশ, কাল, পাত্রাপাত্র, শুচি-অশুচি প্রভৃতি বিধিবদ্ধ নিয়মাদি রহিয়াছে; কিন্তু কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে কোন বিধিবদ্ধ নিয়মাদি নাই।"

শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে শ্রীমন্ মহাপ্রভু উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন,—

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র শুনহ হরিষে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে,—কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ' গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল' ইথে বিধি নাহি আর॥
দশ-পাঁচ মিলি' নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৭৫-৭৯)

সংকীর্ত্তন কহিল এ তোমা সবাকারে।
স্ত্রী-পুত্রে-বাপে মিলি' কর' গিয়া ঘরে॥
প্রভু-মুখে মন্ত্র পাই' সবার উল্লাস।
দণ্ডবৎ করি' সবে চলে নিজ বাস॥
নিরবধি সবেই জপেন কৃষ্ণনাম।
প্রভুর চরণ কায়-মনে করি' ধ্যান॥
সন্ধ্যা হইলে আপনার দ্বারে সবে মিলি।
কীর্ত্তন করেন সবে দিয়া করতালি॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৮১-৮৪)

এখানে প্রথম পয়ারে শ্রীমন্মহাপ্রভু "মহামন্ত্র" শব্দে কৃষ্ণ-নামকে উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণনাম-শব্দে কেবলমাত্র কলিতারণ মহামন্ত্রেরই উপদেশ করিতেছেন বা বলিতেছেন; কিন্তু সংখ্যাত-জপ করিবার উপদেশ করিতেছেন না। এই কৃষ্ণ-নাম-মহামন্ত্রই যে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক কলি-কলুষ-নাশন নাম, তাহা এই পয়ারের পরবর্ত্তী পয়ারে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উক্তিদ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে। এই মহামন্ত্রই সর্ব্বমন্ত্রের অংশীস্বরূপ। অতএব ইহাতে মন্ত্রত্ব নিহিত আছে, সেইজন্য পরপয়ারে জপের সময়ে সংখ্যাপূর্ব্বক জপের বিধি "স্বয়ং মহাপ্রভুই" দান করিতেছেন:

"ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥"

—অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ বল; সর্ব্বক্ষণ জপ—একথা নহে এবং এই বলার মধ্যে জপ-সংখ্যার ন্যায় কোন বিধি নাই, যেহেতু জপ "নির্দ্ধারণে" বিবিধ ব্যবস্থা রহিয়াছে।

"নাম-লীলা-গুণাদিসমুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্।"
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৬৩)

নাম, লীলা, গুণাদির উচ্চৈঃস্বরে কথনকে কীর্ত্তন বলে। বৈষ্ণব-চিন্তামণি বাক্যেও "ওষ্ঠ-স্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনম্"—এই কথা বলিয়া থাকেন। ওষ্ঠ-স্পন্দন হইলেই কীর্ত্তন হইয়া যায়। আভিধানিক অর্থে সংকীর্ত্তন সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "সম-কৃ-ভাবে—অনট্ অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে উচ্চারণ করাকে সংকীর্ত্তন বলা হয়।" অথবা:—

কায়-মন-বাক্যৈঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈর্বা বহুভির্মিলিত্বা খোল-করতালাদি সংযোগেন যৎ কীর্ত্তনম্ তদেব সংকীর্ত্তনম্।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত-বাণী শিক্ষাষ্টকেও বলিয়াছেন,—"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্।" নাম সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন,—

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল-দেশ-নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
(চৈঃ চঃ অঃ ২০।১৮)

সুতরাং মহামন্ত্র শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই কলিকালের একমাত্র ধর্ম্ম এবং ইহাতে সর্ব্বজীবের অধিকার বর্ত্তমান।

শ্রীতপনমিশ্রের সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নির্ণয়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদেশ,—

রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র।
ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষর এই তন্ত্র॥　(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৪০)

এস্থলে, খাইতে শুইতে মহামন্ত্র লইবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। খাইতে শুইতেও মহামন্ত্র কিরূপে সংখ্যাপূর্ব্বক লওয়া সম্ভবপর? এখানে ত' সংখ্যাপূর্ব্বক ঐ নাম গ্রহণের কোন উপদেশ প্রদত্ত হয় নাই। ইহাতেই 'স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, "সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর" বাক্যে "মহামন্ত্র নির্ব্বন্ধ"-সহকারে জপ, উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন এবং অসংখ্যাতভাবে কীর্ত্তনের ব্যবস্থাও প্রদত্ত হইয়াছে।

"শ্রীকৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র শুনহ হরিষে"—শ্রীচৈতন্যভাগবতের (২৩।৯৯) পয়ারে শ্রীমহাপ্রভু ভক্তগণকে যে মহামন্ত্র উপদেশ করিলেন, ইহা কি সংখ্যাপূর্ব্বক হইয়াছিল, অথবা ইহা তাঁহার নির্ব্বন্ধকৃত শ্রীনামের সংখ্যার মধ্য হইতে একবার বিতরণ করিলেন? যদি তাহা না হয়, তবে এস্থলে অসংখ্যাত-রূপেই শ্রীগৌর-সুন্দর মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন। যদি উহা সংখ্যানির্ব্বন্ধ ব্যতীত জপ বা কীর্ত্তন করা নিষেধ হয়, তবে স্বয়ং প্রভু কেন অসংখ্যাতভাবে ইহা ভক্তগণকে উপদেশ করিলেন? ইহা হইতেও মহামন্ত্র যে অসংখ্যাতরূপে কীর্ত্তনীয় তাহা প্রমাণিত হয়।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (উত্তর খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৫৫ শ্লোক) শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-ঋষি সূতকে "হরিনামসংজ্ঞক পরমার্থসাধক" যে মহামন্ত্র উপদেশ করিলেন, সেই "সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ হরিনামাখ্য মন্ত্র কি" এই প্রশ্নের উত্তরে ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্রই (৫৫ শ্লোক) উপদেশ করিয়াছেন। "তদহং বোভিধাস্যামি মহাভাগবতো হ্যসি" বাক্যে উক্ত হইয়াছে, তুমি ভগবদ্ভক্তের শিরোমণি মহাভাগবত; অতএব তোমায় আমি এই মহামন্ত্র হরিনাম কহিতেছি, শ্রবণ কর।

এস্থলেও শ্রীব্যাসদেব উচ্চৈঃস্বরে অসংখ্যাতভাবে শ্রীসূতকে মহামন্ত্র উপদেশ করিয়াছেন। এই "মহামন্ত্র" পূর্ব্বে ব্রহ্মা অঙ্গিরা ঋষিকে উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং উভয়ক্ষেত্রেই গুরুপরম্পরাক্রমে অসংখ্যাতভাবে উচ্চৈঃস্বরেই উহা উপদিষ্ট হইয়াছে। কেবলমাত্র সংখ্যাপূর্ব্বক জপোদ্দেশেই ইহা কর্ণে প্রদত্ত হয় নাই।

বাক্‌দেবী বৃষভানুরাজকে "হরিনাম শ্রবণ বিনা জীবের কর্ণশুদ্ধি হয় না ; এ-কারণ চরমশ্রেয়জনক হরিনাম মহামন্ত্রের অনুকীর্ত্তন কর" বলিয়া উপদেশ করিলেন। এস্থলে জপ বা সংখ্যাপূর্ব্বক জপের কোনরূপ উল্লেখ করা হয় নাই ; বরং কীর্ত্তন, অনুকীর্ত্তন শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। গুরুর নিকট হইতে এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিবার ব্যবস্থাও প্রদত্ত হইয়াছে।

তন্নাম কীর্ত্তনং ভূয়স্তাপত্রয়-বিনাশনম্।

* * * *

নাম-সংকীর্ত্তনাদেব তারকং ব্রহ্মদৃশ্যতে ॥

* * * *

নাম সংকীর্ত্তনং তস্মাৎ সদাকার্য্য বিপশ্চিতা—(৫৮, ৫৯, ৬০)

ইত্যাদি শ্লোকেও তারকব্রহ্মনাম মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্রই যে জপ্য ও মৃদঙ্গ-করতালাদি-সহযোগে অসংখ্যাতভাবে উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তনীয়, তাহা পূর্ব্ববর্ণিত উক্তিসকল হইতে সুষ্ঠুভাবে প্রমাণিত হয়।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন

বিজ্ঞপ্তি

বেদান্তাচার্য্য-ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীশ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুবরের 'গীতাভূষণ'-নামক ভাষাভাষ্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-ভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত এবং তৎকৃত 'অনুভূষণ'-নাম্নী টীকা সমন্বিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থ-প্রাপ্তিবিষয়ে আগ্রহী গৌরভক্ত ও সুধী পাঠকবর্গকে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ জানান হইতেছে।

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন

২৯ বি, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৯

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৪ পৃষ্ঠার পর]

ব্রাহ্মণ বললেন,—ব্রাহ্মণবিদ্বেষী, কুটিলমতি, লোভী, বিষয়াসক্তচিত্ত রাজার পাপকর্ম্মবশতঃই আমার এই শিশুর মৃত্যু হয়েছে, এতে আমার কোন দোষ নাই। কুটিলতা ও সরলতা দুটো কথা। সরলতার দ্বারা সকলকে ভালবাসা যায়। সরলতার দ্বারা স্নেহ, মায়া, মমতা, প্রীতি, ভালবাসা—সবগুলো সম্ভব। সরলতা কি?—সরলতা হল আন্তরদর্শন, আন্তরদৃষ্টি। এরদ্বারা জগৎকে বশীভূত করা যায়। হিংসাবৃত্তি যে পশুর, সেও বশীভূত হয় স্নেহে। কুটিলতা হল কোট্‌নামি। আমার সরকারের সঙ্গে বিদেশের কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কুটনীতি ভালকথা নয়। গালাগালি একদিক দিয়ে। সুনীতি, সন্নীতি হল—সরলতা। সরলতার অপর নাম স্নেহ-মমতা।

লোভী লোকের কখনও ভাল হয় কি? আমার যতটুকু আছে তাতে আমি সন্তুষ্ট কি? 'যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ'—গীতা বললেন। তাতে আমি সন্তুষ্ট নই। আরও দাও, আরও চাই—এতে চরম অশান্তি মানুষের।

"লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু—শাস্ত্রের বচন।
অতএব কর সবে লোভ সংবরণ॥"

লোভ আসছে কোথা থেকে? Generated হচ্ছে কি করে? গীতার মধ্যে বলেছেন,—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

কামনা, বাসনা, ক্রোধ, লোভ এইভাবে পর পর আসছে। কামনা-বাসনার কোনদিন শেষ আছে কি? সমস্ত পূর্ত্তি কি সম্ভব? কখনই হবে না। ভগবানকে ভালবাসতে গেলে প্রাকৃত কামনা-বাসনা কমাতে হবে। Economics এর Theoryও তাই। আমাদের যে অসীম আকাঙ্ক্ষা, আমাদের যে অভাব বোধ, সেটাকে সীমিত করতে হবে। তবেই মানুষ শান্তি লাভ করতে পারবে। আর এটাকে যত বেশী বাড়িয়ে দেওয়া হবে ততই অশান্ত

জীবন, ততই অশান্তি লাভ। শাস্ত্রে সেই কথাই বলা হয়েছে। কে শান্তি লাভ করবেন? কৃষ্ণ বললেন গীতায়,—

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং, সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে, সঃ শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সঃ শান্তিমধিগচ্ছতি॥

যিনি কামনা-বাসনা কমিয়ে আনতে পেরেছেন, তিনি শান্তি লাভ করবেন। বিষয়াসক্তচিত্ত রাজা। রাজার বিষয় থাকবে না, রাজার রাজত্ব থাকবে না—এ আবার কি কথা! রাজার নিশ্চয়ই রাজত্ব থাকবে, প্রজা থাকবে, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি কত কি থাকবে। কিন্তু এখানে বলছেন,—বিষয়াসক্তচিত্ত রাজা প্রজাগণের কোন কল্যাণ করতে পারেন না। কাকে বলি বিষয়?—'জড়-ভোগাকাঙ্ক্ষা'—অধিক সংগ্রহ পিপাসাকে বলেছেন। সরকার প্রজাগণকে খাওয়াবেন, দাওয়াবেন; তার Food Corporation থাকবে, তা না হলে সরকার খাওয়াবেন কি করে? সে সব অফিস ত' থাকবে। খাদ্য সংগ্রহ পূর্ব্ব থেকে না করলে অসময়ে কি করে চালানো যাবে? আমি খাব, আমি পরব, আমি বাঁচব, অপরের কল্যাণচিন্তা যেখানে নাই—এই জাতীয় চিন্তা-ভাবনাই বিষয়াসক্তি। আমি যদি আত্মকল্যাণ চাই, তাহলে সকলের কল্যাণ আমার প্রার্থনা করা উচিত। তার মধ্যে আমারও কল্যাণ নিহিত। আমি যদি অপরের কল্যাণ না চাই, তাহলে আমার কল্যাণ ব্যাহত হবে। এই Theory শাস্ত্রে বলা আছে।

এখানে ব্রাহ্মণ বলছেন কি? রাজার পাপকর্ম্মবশতঃ আমার শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আমার ছেলে যে মারা যাচ্ছে, এজন্য আমার কোন দোষ নাই।

হিংসাবিহারং নৃপতিং দুঃশীলমজিতেন্দ্রিয়ম্।
প্রজা ভজন্ত্যঃ সীদন্তি দরিদ্রা নিত্যদুঃখিতাঃ॥

হিংসাপরায়ণ, অজিতেন্দ্রিয়, দুঃস্বভাব নৃপতির আশ্রয়ে প্রজাগণ দরিদ্র, নিত্যদুঃখিত ও ক্লেশগ্রস্ত হয়। কথাগুলি ঠিকই। এতে একটুও ভুল নাই। 'রাজার পাপে রাজ্য নাশ'—কথা আছে। Collective যে অন্যায় তার দ্বারাও রাজ্য নষ্ট হয়। প্রজার পাপে রাজ্য নষ্ট হয়, আবার রাজার পাপেও রাজ্য নষ্ট হয়। এই দুটী বিষয় এখানে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন ব্রাহ্মণ। এইরূপে রাজদ্বারে ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মৃত-পুত্র নিক্ষেপ করে ব্রাহ্মণ রাজনিন্দা করতে লাগলেন। এখানে রাজনিন্দা—কৃষ্ণনিন্দা নয়।

তামর্জ্জুন উপশ্রুত্য কর্হিচিৎ কেশবান্তিকে।
পরেতে নবমে বালে ব্রাহ্মণং সমভাষত॥
কিংস্বিদ্ব্রহ্মংস্তন্নিবাসে ইহ নাস্তি ধনুর্দ্ধরঃ।
রাজন্যবন্ধুরেতে বৈ ব্রাহ্মণাঃ সত্র আসতে॥

কদাচিৎ তাঁর নবম বালকের মৃত্যু হলে অর্জ্জুন কৃষ্ণের নিকট থেকে পূর্ব্বের ন্যায় আক্ষেপ-বচন শ্রবণ করে ব্রাহ্মণকে বলতে লাগলেন,—হে দ্বিজবর! আপনি কি জন্য বৃথা রোদন করিতেছেন? এখানে কি এমন একজন অধম ক্ষত্রিয়ও নাই, যিনি আপনার গৃহে থেকে রক্ষকরূপে আপনার সন্তানকে রক্ষা করতে পারেন? ইহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় কেবলমাত্র যজ্ঞে সম্মিলিত হতে পারেন? শুধু মিটিং করতে পারেন, প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন, কাজে কিছু নয়। এই বলে সমালোচনা করলেন।

ধনদারাত্মজাপৃক্তা যত্র শোচন্তি ব্রাহ্মণাঃ।
তে বৈ রাজন্যবেষেণ নটা জীবন্ত্যসুম্ভরাঃ॥

যাহারা বর্ত্তমান থাকতে ব্রাহ্মণগণ স্ত্রী-পুত্র-ধন-বিয়োগে শোকগ্রস্ত হয়েছেন, সেই আত্মপ্রাণ-তর্পণরত নটগণ যেন কেবলমাত্র জীবিকানির্ব্বাহের জন্য রাজবেশ গ্রহণ করেছেন। রাজার সমালোচনাও করলেন অর্জ্জুন। হে ভগবন্! আমি নিশ্চয়ই দুঃখগ্রস্ত আপনাদের সন্তানগণকে রক্ষা করব--প্রতিজ্ঞা করলাম। যদি প্রতিজ্ঞাপালনে অসমর্থ হই, তাহলে অগ্নিতে প্রবেশ করে ব্রাহ্মণের বিলাপ-শ্রবণ-জনিত পাপ হইতে বিশুদ্ধিতা লাভ করব। ব্রাহ্মণ বললেন,—

সঙ্কর্ষণো বাসুদেবঃ প্রদ্যুম্নো ধন্বিনাং বরঃ।
অনিরুদ্ধোঽপ্রতিরথো ন ত্রাতুং শক্নুবন্তি যৎ॥
তৎ কথং নু ভবান্ কর্ম্ম দুষ্করং জগদীশ্বরৈঃ।
ত্বং চিকীর্ষসি বালিশ্যাৎ তন্ন শ্রদ্দধ্মহে বয়ম্॥

সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন এবং অদ্বিতীয় রথী অনিরুদ্ধ, এঁরা যখন আমার পুত্রের সংরক্ষণে সমর্থ হচ্ছেন না, সেখানে তুমি কিরূপে সমর্থ হবে আমার ছেলেকে রক্ষা করতে? তুমি কেবলমাত্র মূর্খতাবশতঃ জগদীশ্বরেরও দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা করছ। জগদীশ্বরেরও দুষ্কর কর্ম্ম, তাঁর পক্ষেও কঠিন। কেন একথা বললেন?—মানুষ কর্ম্মফলে জন্মগ্রহণ করছে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। ভগবান্ কি কারও দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন বা নিয়েছেন কি? এ কথা পেয়েছেন কোথাও আপনারা? তিনি আগের থেকে বলে দিয়ে বসে আছেন আমি প্রজাগণের কল্যাণ নিমিত্ত

আইন করে দিয়েছি। যারা সুষ্ঠুভাবে আইন পালন করছে, তারা সুফল পাবে, আর যারা আইন অমান্য—Violate করছে, তাদের সাজা হবে। আমাকে দোষারোপ কর না বাবা। আমি সবটার মধ্যে আছি, আবার নির্লিপ্ত। গীতায় তাই বলা হয় নাই কি ?—

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥
ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥

কর্ম্ম-কর্ম্মফল আমকে বাঁধতে পারে না। হে অর্জ্জুন! যেমন কর্ম্ম তেমন ফল। আমার উপর দোষারোপ করবে কেন? আইন ত' করে রেখেছি। তুমি আইনটা যথাযথভাবে পালন কর, সুফল তুমি পাবে; আর অন্যায় করলে তোমার সাজা হবে। সেইজন্য ভগবান্ কোন দায়িত্ব নিতে চাচ্ছেন না। তবে জগৎকে দেখাবার জন্য, ভগবান্ আমি সর্ব্বসমর্থ, সেইটা দেখবার জন্য মৃত-পুত্রগণকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ রাখতে পারেন নাই তাঁর নয়টী ছেলেকে। কেন রাখতে পারেন নাই? তাদের কর্ম্ম-কর্ম্মফল ত' পৃথক্, আর ব্রাহ্মণের কর্ম্মফল পৃথক্। পিতার আগে পুত্র চলে যাচ্ছে, মায়ের আগে কন্যা চলে যাচ্ছে, ভ্রাতার আগে ভগ্নী চলে যাচ্ছে। যার যেমন কর্ম্ম সেই অনুসারে ফলভোগ। তুমি কেবল মূর্খতাবশতঃ জগদীশ্বরেরও দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা করছ। আমার এতে বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারবে বলে আমার মনে হয় না, বিশ্বাস হয় না। অর্জ্জুন বললেন,—

নাহং সঙ্কর্ষণো ব্রহ্মন্ ন কৃষ্ণঃ কার্ষ্ণিরেব চ।
অহং বা অর্জ্জুনো নাম গাণ্ডীবং যস্য বৈ ধনুঃ॥

হে ব্রহ্মন্! আমি সঙ্কর্ষণ, কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন বা অনিরুদ্ধ নহি। ভগবানের ক্ষমতার উপরে আরও এককাঠি চড়ে গেল। অহঙ্কার যখন আসে, তখন মানুষের সব শেষ। দর্পহারী মধুসূদন কারও অহঙ্কার রাখেন না। পরন্তু যাঁর গাণ্ডীব নামক অদ্বিতীয় ধনু বর্ত্তমান, আমাকে সেই অর্জ্জুন বলে জানবেন। ব্রাহ্মণকে বলছেন,—আমি সেই অর্জ্জুন, আমি সাক্ষাৎ কৃতান্তকে পরাভূত করে আপনার পুত্রগণকে এনে দেব। মৃত্যুর সময় লড়াই করে আপনার পুত্রকে ফিরিয়ে এনে দেব, আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

এবং বিশ্রম্ভিতো বিপ্রঃ ফাল্গুনেন পরন্তপ।
জগাম স্বগৃহং প্রীতঃ পার্থবীর্য্যং নিশাময়ন্॥

অর্জ্জুনের এইরূপ বাক্যে বিশ্বাসপ্রাপ্ত হয়ে ব্রাহ্মণ তাঁর অসম্ভব ক্ষমতায় সন্তুষ্ট হয়ে গৃহে ফিরে গেলেন। অনন্তর ভার্য্যার প্রসবকাল আসন্ন হইলে দ্বিজবর কাতর-চিত্তে অর্জ্জুনকে স্মরণ করলেন,—হে অর্জ্জুন! তুমি ত' আমার ছেলেকে রক্ষা করবে বলে কথা দিয়েছিলে, কই এখন আসছ না কেন? অর্জ্জুন এসে হাজির হয়েছেন। তিনি নানাবিধ ক্ষেপণাস্ত্র সংযোজিত করে সূতিকাগারকে আবদ্ধ করলেন। ঊর্দ্ধ, অধঃ ও বক্রভাবে শর-পিঞ্জর নির্ম্মাণ করলেন। পুনরায় ব্রাহ্মণ পত্নীর নবম কুমার জন্মগ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে রোদন করতে করতে সশরীরে আকাশপথে অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন ব্রাহ্মণ বলতে লাগলেন,—

তদাহ বিপ্রো বিজয়ং বিনিন্দন কৃষ্ণসন্নিধৌ।
মৌঢ্যাৎ পশ্যত মে যোঽহং শ্রদ্দধে ক্লীবকথনম্॥

অহো! আমার কি মূর্খতা! আমি এই ক্লীব অর্জ্জুনের বাক্যে বিশ্বাসযুক্ত হয়েছিলাম। 'ক্লীব' বলে অর্জ্জুনকে গালাগালি দিচ্ছেন। কোন ক্ষমতা নাই যার সে-ই ক্লীব। সাংখ্যের পুরুষ কে?—ক্লীবব্রহ্ম হলেন সাংখ্যের পুরুষ। সে পুরুষের কোন ক্ষমতা নাই, সেখানে প্রকৃতিই সকল ক্ষমতার অধিশ্বরী। ব্রাহ্মণ বলছেন এখানে,—আমি এই ক্লীব অর্জ্জুনের বাক্যে বিশ্বাসপ্রাপ্ত হয়েছিলাম, ধিক্ আমার! যার সন্তান-রক্ষায় বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, বলরাম এবং স্বয়ং কৃষ্ণও দায়িত্ব গ্রহণ করলেন না, সেই কার্য্য ঈশ্বরাভিমানীর দ্বারা কি সম্পন্ন হতে পারে? স্বয়ং ভগবান্ যখন দায়িত্ব নিচ্ছেন না সন্তানকে রক্ষার, সেখানে প্রতিজ্ঞা করে বসলেন অর্জ্জুন—আমি তোমার সন্তানকে বাঁচাব। এটা কি কখনও সম্ভব?

ধিগর্জ্জুনং মৃষাবাদং ধিগাত্মশ্লাঘিনো ধনুঃ।
দৈবোপসৃষ্টং যো মৌঢ্যাদানিনীষতি দুর্ম্মতিঃ।

যে দুর্ম্মতি মূর্খতাবশতঃ 'দৈবকর্তৃক লোকান্তরে নীত মদীয় পুত্রকে' আনয়ন করতে ইচ্ছুক হয়। ব্রাহ্মণ তাহলে জানেন তাঁর ছেলেদের কি গতি, রাজার উপরে—ভগবানের উপরে তিনি ঠিক দোষারোপ করেন নাই। বললেন কি?—দৈবকর্তৃক লোকান্তরে নীত মদীয় পুত্র। তাহলে ব্রাহ্মণ ত' সমাধান পেয়ে গেছেন। আমার ছেলেগুলো যে মারা যাচ্ছে, তারা তাদের কর্ম্মফলে মারা যাচ্ছে। এজন্য তিনি কারও প্রতি দোষারোপ করছেন না। অথচ এখানে অর্জ্জুন

কেন আমার ছেলেকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন। এরূপ প্রতিজ্ঞা করা কি তাঁর বোকামি হয় নাই? তাদৃশ মিথ্যাবাদী অর্জ্জুন এবং তাদৃশ আত্মশ্লাঘারত ব্যক্তির গাণ্ডীবকেও ধিক্। ব্রাহ্মণ এইরূপ নিন্দা করতে থাকলে অর্জ্জুন বিদ্যাবলে যে-স্থানে যমরাজ বর্ত্তমান, সেই সংযমনী পুরীতে গিয়ে হাজির হলেন। যার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, একটা জায়গা আছে সেখানে গেলে সন্ধান পাওয়া যায়। সেটা I. B. Department এর Headquarter। ওখানে গেলে বহু ব্যবস্থা নেওয়া যায় এবং বহু নূতন নূতন খবর পাওয়াও যায়। সেইখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন অর্জ্জুন। দেখি, এখানে কোন হদিস্ মেলে কিনা ব্রাহ্মণের ছেলেদের—আমি যাদের বাঁচাব। কিন্তু সেখানে নাই তারা, তারা অন্যত্র নীত হয়েছে। কি করে পাবেন অর্জ্জুন? অর্জ্জুন সেখানে ব্রাহ্মণের পুত্রকে না পেয়ে উদ্যত অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক ক্রমে ইন্দ্রলোক, অগ্নিলোক, নির্ঋতলোক, চন্দ্রলোক, বায়ুলোক, বরুণলোক, রসাতল, স্বর্গ এবং অন্যান্য লোকসমূহে গমন করলেন। সব জায়গায় যাচ্ছেন অর্জ্জুন। আর এখন সামান্য কিছু এগিয়ে গেলে ত' আমরা ভগবান্ বনে যাচ্ছি! চন্দ্রগ্রহ, মঙ্গলগ্রহ ইত্যাদিতে বর্ত্তমানে কত কি অভিযান চলছে। ঐসব স্থানে সশরীরে যাওয়া অতি কষ্ট। অনেক সব আয়ুধ, বিধি-ব্যবস্থা নিয়ে যেতে হচ্ছে। গ্যাস-সিলিণ্ডার নিয়ে যেতে হচ্ছে। তা না হলে কোথায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক নাই। অর্জ্জুন তাঁর সাধনবলে স্বাভাবিকভাবে যাচ্ছেন সব লোকে। কিন্তু কোথাও ব্রাহ্মণপুত্রের সন্ধান পেলেন না। প্রতিজ্ঞায় উত্তীর্ণ হতে না পেরে অগ্নিপ্রবেশে উদ্যত হলে কৃষ্ণ তাঁকে নিবারণ করে বলতে লাগলেন,—

দর্শয়ে দ্বিজসূনূংস্তে মাবজ্ঞাত্মানমাত্মনা।
যে তে নঃ কীর্ত্তিং বিমলাং মনুষ্যাঃ স্থাপয়িষ্যন্তি॥

হে সখে! আমি তোমাকে ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে দেখাইব, তুমি মরতে যাচ্ছ কেন? তুমি স্বয়ং নিজকে অবজ্ঞা করিও না। যারা এখন আমাদের নিন্দা করছে, তারাই পরে আমাদের বিমল কীর্ত্তি ঘোষণা করবে।

ইতি সন্ত্রাস্য ভগবানর্জ্জুনেন সহেশ্বরঃ।
দিব্যং স্বরথমাস্থায় প্রতীচীং দিশমাবিশৎ॥

ভগবান্ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলে অর্জ্জুনের সহিত স্বকীয় দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক পশ্চিম দিকে গমন করলেন। অনন্তর তিনি সপ্তপর্ব্বত ও সপ্তসমুদ্রযুক্ত সপ্তদ্বীপ এবং লোকালোক পর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক ঘোর অন্ধকারে

প্রবেশ করলেন। সেই অন্ধকারে শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক-নামক রথাশ্ব-চতুষ্টয় গতিভ্রষ্ট হল। আর রথ অগ্রসর হতে পারছে না, ঘোর অন্ধকার। ভগবান্ তখন সহস্রসূর্য্যতুল্য সুদর্শন-চক্র রথাগ্রে বসিয়ে দিলেন। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্রের গুণচ্যুত বাণ যেরূপ রাবণের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করেছিল, সেইরূপ অতি দ্রুতগামী সুদর্শনও প্রভূত তেজে প্রকৃতির পরিণামসম্ভূত উক্ত নিবিড় ঘোর অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে তন্মধ্যে প্রবেশ করল। অর্জ্জুন চক্রের পশ্চাদ্বর্ত্তী দ্বারপথে উক্ত অন্ধকারের দূরে অবস্থিত সুবিস্তৃত অনন্ত অপার উত্তম ভাগবত-জ্যোতিঃ দর্শনপূর্ব্বক প্রতিহত দৃষ্টি হওয়ায় নেত্রদ্বয় নিমীলিত করলেন। অর্জ্জুন ত' আরও অন্য সময়ে চোখ বুজিয়েছেন। গীতার একাদশ অধ্যায়—যখন বিশ্বরূপ দেখাচ্ছিলেন কৃষ্ণ, সেইসময়ও ত' চোখ বুজিয়েছিলেন অর্জ্জুন। বাবা! সহ্য করতে পারছি না, থামাও থামাও, তোমার দিব্যরূপ দর্শন করাতে হবে না, তুমি ঐ রূপ সম্বরণ কর। অনন্তদেব যেখানে বিরাজ করছিলেন, সেই মহাকালপুরে গিয়ে হাজির হলেন। তিনিই নিয়ে গিয়েছিলেন ব্রাহ্মণের নয়টী ছেলেকে। কেন?—ঐখানে বসেই তিনি কৃষ্ণকে দর্শন করবেন।

ইত্যাদিষ্টৌ ভগবতা তৌ কৃষ্ণৌ পরমেষ্ঠিনা।
ওমিত্যানম্য ভূমানমাদায় দ্বিজদারকান্॥
ন্যবর্ত্তেতাং স্বকং ধাম সম্প্রহৃষ্টৌ যথাগতম্।
বিপ্রায় দদতুঃ পুত্রান্ যথারূপং যথাবয়ঃ॥

সর্ব্বলোকাধীশ্বর ভগবান্ এইরূপ আদেশ প্রদান করলে কৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন 'তথাস্তু' বাক্যে তাহা স্বীকার করে দ্বিজবালকগণকে লইয়া অতিশয় সন্তুষ্টচিত্তে আগমন-মার্গানুসারে নিজধামে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন এবং ব্রাহ্মণের নিকট যথাযথ বয়োরূপশালী পুত্রগণকে ফিরিয়ে দিলেন।

নিশাম্য বৈষ্ণবং ধাম পার্থঃ পরমবিস্মিতঃ।
যৎকিঞ্চিৎ পৌরুষং পুংসাং মেনে কম্পানুকম্পিতম্॥

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ-প্রভাব দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হয়ে জীবগণের যাবতীয় পৌরুষই শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্পাজাত বলে নির্ণয় করলেন।

ইতিদৃশান্যনেকানি বীর্য্যাণীহ প্রদর্শয়ন্।
বুভুজে বিষয়ান্ গ্রাম্যানীজে চাত্যুর্জিতৈর্মখৈঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ এই মর্ত্তলোকে এইরূপে ঈদৃশ অনেক বীর্য্যযুক্ত চরিত প্রকাশ করে লৌকিক-বিষয়-সকলের ভোগ এবং মহাসমৃদ্ধ যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করেছিলেন।

প্রববর্ষাখিলান্ কামান্ প্রজাসু ব্রাহ্মণাদিষু।
যথাকালং তথৈবেন্দ্রো ভগবান্ শ্রৈষ্ঠ্যমাস্থিতঃ॥

ইন্দ্র যেরূপ যথাকালে সর্ব্বত্র বারিবর্ষণ করেন, সেইরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-পদারূঢ় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণের মধ্যে যাবতীয় অভীষ্ট বিতরণ করেছিলেন।

হত্বা নৃপানধর্ম্মিষ্ঠান্ ঘাতয়িত্বাজ্জুনাদিভিঃ।
অঞ্জসা বর্ত্তয়ামাস ধর্ম্মং ধর্ম্মসুতাদিভিঃ॥

তিনি স্বয়ং কংসাদি কতিপয় অধার্ম্মিক নরপতির বিনাশ করিয়া এবং অর্জ্জুন প্রমুখ অনুগত বীরগণদ্বারা তদ্রূপ ব্যক্তিগণের বিনাশসাধন করাইয়া যুধিষ্ঠিরাদিদ্বারা সাক্ষাৎ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেছিলেন।

শ্রীক্ষেত্র দর্শন

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৮ পৃষ্ঠার পর]

নিদয়ার ঘাট দিয়া চৈতন্য ঈশ্বর।
সন্ন্যাস করিল গিয়া কাটোয়া নগর॥
নীলাচলে শেষলীলা নিজ প্রয়োজন।
প্রকাশিলা রহি কাশীমিশ্রের ভবন॥
বুঝিতে না পারি প্রভু করুণা-কৌশল।
জগন্নাথ দরশনে হইনু বিকল॥
বহুদিন হৈতে ইচ্ছা হৃদয়ে প্রবল।
দেখিব সন্ন্যাস স্থান পুরী নীলাচল॥
কৃপা করি এ অধমে করি আকর্ষণ।
তব লীলাস্থান প্রভো করাও দর্শন॥
পতিতপাবন তুমি জগৎ ঈশ্বর।
নিজলীলা স্থানে বাস দেহ নিরন্তর॥
সেইত' আনন্দ ধাম চিন্ময় ভবন।
অধমের ভাগ্যে কিবা হবে দরশন॥

কাশী মিশ্রালয় আর হরিদাস স্থান।
দর্শনে হইবে ধন্য এ পাপ পরাণ॥
হরিদাস সমাধি, সমুদ্র মনোরম।
হেরিয়া অন্তর কবে জুড়াইবে মম॥
এই মত বহু চিন্তা মনোমধ্যে হয়।
কখনও বা ঝরে আঁখি, ব্যাকুল হৃদয়॥

*　　*　　*

কতদিনে ক্ষেত্রধামে করিয়া গমন।
জগন্নাথ মুখচন্দ্র করিনু দর্শন॥
দেখিনু সে মুখচন্দ্র কমল নয়ন।
জগন্নাথ বিশ্বম্ভর ভুবনপাবন॥
বামপার্শ্বে বলদেব সুভদ্রা সহিত।
নীলাচলে শ্রীমন্দিরে নিত্য বিরাজিত॥
বিচিত্র ব্যাপার অতি সেবা রাজোচিত।
শত শত দাসে সুখে করে অবিরত।
গরুড় স্তম্ভ সদন,　　রহি করি দরশন,
জগন্নাথ, জগৎ ঈশ্বর॥
শ্রীক্ষেত্র দ্বারকাপুরী,　　জগন্নাথ রূপ হরি,
দারুব্রহ্মরূপে অবতার॥
বামে শ্রীরোহিণীসুত,　　মধ্যে শ্রীসুভদ্রাযুত,
নিরুপম ঐশ্বর্য্য বিলাস।
সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ তত্ত্ব,　　মহাপ্রসাদ মহত্ত্ব,
রাগাত্মিকা ভক্তি স্বপ্রকাশ।
শ্রীমন্দির শোভা অতি,　　ব্রহ্মা আদি করে স্তুতি,
ভৃত্যগণে সেবে নিরন্তর।
ভোগ হয় অবিরত,　　সেবার বৈভব কত,
সে সৌন্দর্য্য অতি মনোহর॥

নরসিংহ শ্রীদেবতা, কমলা-বিমলা মাতা,
শ্রীমন্দির নিকটে আবাস।
রহি নীলাচল পুরী, স্বীয় প্রভু সেবা করি,
দুঁহু সতী পান প্রেমোল্লাস॥
শ্রীচৈতন্য শ্রীচরণ, চিহ্ন শোভে অতুলন,
মন্দিরের উত্তর অঙ্গনে।
হেরি সেই শ্রীচরণ, কৃতকৃত্য ভক্তগণ,
আলিঙ্গন করে মনে মনে॥
রাধাকৃষ্ণ একরূপ, গৌররূপ অপরূপ,
নবদ্বীপ ধামে অবতার।
সন্ন্যাসীর বেশ ধরি, আসি নীলাচল পুরী,
বিতরিল প্রেমের ভাণ্ডার॥
লুকাইয়া নিজরূপ, রাধাকান্তি অপরূপ,
ধরি করে প্রেম আস্বাদন।
ভক্তসনে সঙ্কীর্ত্তনে, ভ্রমে প্রভু স্থানে স্থানে,
কভু যায় গুণ্ডিচা প্রাঙ্গণ॥
বৃন্দাবনসম বন, দেখি' প্রভু হৃষ্টমন,
ব্রজপ্রেমে করেন রোদন।
লভিতে সে প্রেমধন, কৃষ্ণনাম সুসাধন,
আচণ্ডালে করে বিতরণ॥
সর্ব্ব অবতার সার, শ্রীচৈতন্য অবতার,
সেই পদ করিয়া আশ্রয়।
আমি প্রভু হীন ছার, তব কৃপা বিনা আর,
উদ্ধারের নাহিক উপায়॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আলোকে রথযাত্রা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৬ পৃষ্ঠার পর]

এইবার ধীরে ধীরে অরুণোদয় হইল সেই শুভ দিনের শুভ লগ্নের। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব অদ্য পাণ্ডুবিজয়ে শুভাগমন করিবেন শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে। গোপ-বালাগণ কুরুক্ষেত্রের মিলনে সন্তোষ লাভ করিলেন না। একারণে আকাঙ্ক্ষা করিলেন কৃষ্ণকে ব্রজে লইয়া তাঁহার সহিত ব্রজের মিলন-সুখ আস্বাদন করিতে। শ্রীজগন্নাথের গুণ্ডিচায় গমনকালে প্রভুর ভাব ছিল,—

"এই ধুয়া-গানে নাচে দ্বিতীয় প্রহর।
কৃষ্ণ লইয়া ব্রজে যাই—এভাব অন্তর॥"

এইভাব লইয়া নৃত্যমধ্যে প্রভু একটী শ্লোক পাঠ করিতেন,—

"এইভাবে নৃত্য মধ্যে পড়ে এক শ্লোক।
সেই শ্লোকের অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক॥

যথা :—

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতী-সুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি অত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥"

অর্থাৎ—"যিনি কৌমারকালে রেবাতীরে আমার চিত্তহরণ করিয়াছিলেন, তিনিই আমার এখন পতি হইয়াছেন; সেই মধুমাসের রাত্রিও উপস্থিত; উন্মীলিত মালতীপুষ্পের সৌগন্ধও আছে; কদম্ব-কানন হইতে বায়ুও মধুর-রূপে বহিতেছে; সুরত-ব্যাপার লীলাকার্য্যে আমি সেই নায়িকাও উপস্থিত; তথাপি আমার চিত্ত এ অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া রেবাতটস্থ বেতসী-তরুতলের জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে॥"

এই কারণে মহাপ্রভু অর্থাৎ শ্রীমতী রাধারাণী ভক্তগণের সহিত অর্থাৎ ব্রজগোপীগণ-সহিত "কৃষ্ণ লইয়া ব্রজে যাই"—এই ভাবে ভাবিত হইয়া জগন্নাথদেবকে অদ্য পাণ্ডুবিজয়ে শুভাগমন করাইতেছেন নীলাচল-মন্দির হইতে গুণ্ডিচা-মন্দিরে অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র হইতে বৃন্দাবনের প্রেমস্থলীতে।

এই যাত্রার উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু রাত্রে উঠিয়া নিজগণদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রাতঃস্নান করিলেন ও সকলের সহিত রথযাত্রা দর্শনে যাত্রা করিলেন। স্বয়ং

রাজা প্রতাপরুদ্র পাত্রগণ লইয়া মহাপ্রভুর গণকে বিজয় দর্শন করাইতে আসিয়াছেন। মহাপ্রভু অদ্বৈত, নিত্যানন্দ আদি ভক্তগণসহিত মহাসুখে নীলাচলপতির গমন দর্শন করিতেছেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে শবরদের মধ্যে শ্রীনীলমাধবরূপে ছিলেন। সেই নীলমাধব পরে জগন্নাথে রূপান্তরিত হওয়ায় শবর দয়িতাগণের জগন্নাথের অন্তরঙ্গ সেবার অধিকার জন্মিয়াছে। জগন্নাথদেবকে এই অধিকারে দয়িতাগণ রথোপরি উঠান। স্বয়ং ভগবানকে সিংহাসন হইতে রথে উঠানো তাঁহার নিজ ইচ্ছা ভিন্ন কখনই সম্ভব নয়। বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন হাতীর শক্তিতে হাতাহাতি করিয়া পাণ্ডুবিজয় করান। কেহ স্কন্ধ লাগান, কেহ ধরেন শ্রীপাদ-পদ্ম, আবার কেহ কেহ কটিতটে স্থূল পট্টডোরীদ্বারা বন্ধন করিয়া দুইদিক্ হইতে ধরিয়া তাঁহাকে রথোপরি উঠান। এবার বিশ্বম্ভরের আপন-ইচ্ছায় সে রথ চলিতে আরম্ভ করে। মহাপ্রভু 'মণিমা' 'মণিমা' ধ্বনিতে কাতরস্বরে জগন্নাথদেবকে আহ্বান করিতে থাকেন। আর স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র ঝাড়ুদাররূপে—

"সুবর্ণ মার্জ্জনী লঞা করে পথ-সম্মার্জ্জন॥"

এইভাবে রাজা মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিলেন। অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত রথে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম এইভাবে যাত্রা করিলেন। যাত্রাপথের দুপার্শ্বের শোভা অতি মনোরম,—

"সূক্ষ্ম শ্বেতবালু পথে পুলিনের সম।
দুইদিকে টোটা সব—যেন বৃন্দাবন॥
রথে চড়ি' জগন্নাথ করিলা গমন।
দুইপার্শ্বে দেখি' চলে আনন্দিত মন॥"

গৌড়বাসিগণ মহানন্দে সেই রথরজ্জু আকর্ষণ করিয়া চলিয়াছেন। স্বেচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সেই রথ চালিত হইতেছে।

ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ, ক্ষণে চলে মন্দ॥
ক্ষণে স্থির হঞা রহে, টানিলেহ না চলে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় চলে, না চলে কারো বলে॥

যাত্রাপথে মহাপ্রভু সকল ভক্তগণকে স্বহস্তে মাল্য-চন্দন পরাইলেন। প্রভুর শ্রীহস্তের মাল্য-চন্দনের স্পর্শে ভক্তগণের আনন্দ শতগুণে বাড়িয়া গেল। প্রথমে প্রভু গুরুবর্গকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন। মহাপ্রভু বাইন ও দোহারসহ-কীর্ত্তন-সম্প্রদায়কে চারিটী দলে ভাগ করিলেন।

প্রথম দলে মূলগায়ক শ্রীস্বরূপ-দামোদর, পাঁচজন দোহারসহ নর্ত্তক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য। দ্বিতীয় দলে মূলগায়ক শ্রীবাস পাঁচজন দোহারসহ নর্ত্তক শ্রীনিত্যানন্দ। তৃতীয় দলে মুকুন্দই মূলগায়ক পাঁচজন দোহারসহ নর্ত্তক হরিদাস ঠাকুর এবং চতুর্থ দলে গোবিন্দ ঘোষই মূলগায়ক ও পাঁচজন দোহারসহ বক্রেশ্বরই নর্ত্তক। এই চার সম্প্রদায়ের সহিত কুলীনগ্রামের সম্প্রদায়; শান্তিপুরের সম্প্রদায় ও শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় মিলিয়া মোট সাত সম্প্রদায়ে এই কীর্ত্তন শোভাযাত্রা শুরু হইল। প্রতি সম্প্রদায়ে দুইটী করিয়া মাদল লইয়া চৌদ্দ মাদলের কীর্ত্তনসহ শ্রীজগন্নাথদেব যাত্রা করিলেন।

"জগন্নাথের আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
দুই পাশে দুই, পাছে এক সম্প্রদায়॥
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।
যার ধ্বনি শুনি হৈল বৈষ্ণব পাগল॥"

রথযাত্রায় এই সাত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভুর এইবার একটী অপূর্ব্ব লীলা শুরু হইল।—

কেহ লক্ষিতে নারে প্রভুর অচিন্ত্য-শক্তি।
অন্তরঙ্গ-ভক্ত জানে, যাঁর শুদ্ধভক্তি॥

প্রভুর সে লীলা কেমন?—

সাত ঠাঞি বুলে প্রভু 'হরি' হরি' বলি'।
'জয় জগন্নাথ' বলেন হস্তযুগ তুলি'॥
আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
এককালে সাত ঠাঞি করিল বিলাস॥
সবে কহে,—প্রভু আছেন মোর সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঞি নাহি যান, আমারে দয়ায়॥

শ্রীরাসস্থলীতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যেমন এক হইয়াও বহুরূপে গোপীসঙ্গে নৃত্য করিয়াছিলেন; দ্বারকায় মহিষীবিলাসে শ্রীকৃষ্ণ যেমন 'বহু' বিগ্রহ 'প্রকাশ' লীলা করিয়াছিলেন; সেই শক্তি প্রকাশে মহাপ্রভু প্রত্যেক সম্প্রদায়ে নিজে নৃত্য করিতেছেন এই রথযাত্রায়। প্রত্যেক গোপী যেমন মনে করেন কৃষ্ণ কেবল তাহার নিকটেই আছেন আর কাহারও নিকটে নাই, সেইপ্রকার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরা ভাবিতেছেন,—প্রভু কেবল তাঁহাদের সম্প্রদায়েই আছেন, অন্য সম্প্রদায়ে নাই।

প্রভুর এই অপূর্ব্ব লীলা ও কীর্ত্তন দর্শনে জগন্নাথ হরষিতচিত্তে রথ স্থগিত

করিলেন। প্রভুর কৃপায় রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর এই অলৌকিক লীলা দর্শনে প্রেমময় হইয়া উঠিলেন। রাজার তুচ্ছ সেবায়ই প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এইভাবে কৃপা করিলেন। কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য রাজার সঙ্গ পরিহার করিয়া রহিলেন। মহাপ্রভুর এ লীলা একমাত্র সার্ব্বভৌম ও রাজা দর্শন করিতে লাগিলেন।

"সার্ব্বভৌম-সঙ্গে রাজা করে ঠারাঠুরি।
আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি॥"

এইভাবে প্রভু নৃত্যরঙ্গে সবাইকে প্রেমের তরঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া চলিলেন। নিজে নৃত্য করিয়া প্রভু ভক্তগণকে নাচাইলেন। আপনি মাতিয়া প্রভু সকলকে মাতাইলেন। সাত সম্প্রদায়কে একত্র করিয়া প্রভু স্বরূপের সহিত শ্রীবাস, রামাই, রঘুনাথ, গোবিন্দ, মুকুন্দ, হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব, গোবিন্দ—এই নয়জনসহ উদণ্ড নৃত্য শুরু করিলেন জগন্নাথদেবের সম্মুখে।

"এই দশজন প্রভুর সঙ্গে গায়, ধায়।
আর সব সম্প্রদায় চারিদিকে গায়॥"

এই প্রচণ্ড নৃত্যমধ্যে কখনও প্রভু হুঙ্কার ছাড়িতেছেন, কখনও ঊর্দ্ধমুখে জগন্নাথদেবকে স্তবস্তুতি করিতেছেন, আবার কখনও ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেছেন। সেই সঙ্গে নৃত্যমধ্যে প্রভুর দেহে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার সুস্পষ্ট-ভাবে পরিস্ফুট।—

"স্তম্ভ, স্বেদ, পুলক, অশ্রু, কম্প, বৈবর্ণ্য।
নানা ভাবে বিবশতা, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য॥
আছাড় খাইয়া পড়ে ভূমি গড়ি' যায়।
সুবর্ণ-পর্ব্বত যৈছে ভূমেতে লোটায়॥"

রাধাভাবে বিভাবিত প্রভুকে রক্ষা করিবার জন্য নিত্যানন্দ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া প্রভুকে লোকস্পর্শ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনটী দলে প্রভুকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এ যেন শ্রীরাসস্থলীর মণ্ডলাকৃতি ব্যূহ। প্রথম মণ্ডলে নিত্যানন্দ মহাবল, দ্বিতীয় আবরণে কাশীশ্বর, মুকুন্দাদি এবং রাজা প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্রসহ বাহিরে মণ্ডল রচনা করিয়া লোক নিবারণ করিতেছেন।

প্রভুর এই নৃত্য দর্শনে জগন্নাথদেবই চমৎকৃত হইলেন। তিনি ক্ষণে ক্ষণে রথকে স্থির করিয়া অনিমেষনেত্রে মহাপ্রভুরূপ ব্রজবিলাসিনীর নৃত্য দর্শন করিতেছেন। সুভদ্রা, বলরামেরও মনে পরম-উল্লাস এই নৃত্য দর্শনে।

এই উদণ্ড নৃত্যে প্রভুর অষ্টসাত্ত্বিকভাবের এমন বহিঃপ্রকাশ হইতে লাগিল যে, তাঁহার দেহের রোমবৃন্দ পুলকিত হইয়া মাংসখণ্ড ব্রণাকৃতি লাভ করিল; সর্ব্বাঙ্গে স্বেদবিন্দুর সহিত রক্তোদ্গম হইতে লাগিল। মুখে গদ গদ বচনে তিনি স্পষ্ট জগন্নাথ উচ্চারণ করিতে পারিতেছেন না, বলিতেছেন—'জজ গগ' 'জজ গগ'। প্রভুর অশ্রুজল জলযন্ত্র ধারাবৎ চক্ষু হইতে নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার গৌরবর্ণ দেহকান্তি কখনও অরুণবর্ণ ধারণ করিতেছে, কখনও মল্লিকা-পুষ্পসম রূপ লইতেছে। প্রভু কখনও স্তম্ভবৎ, কখনও শুষ্ক কাষ্ঠসম, কখনও ভূমিতে লুটাইতেছেন, আবার কখনও ভূমিতে শ্বাসহীন-ভাবে মৃতবৎ পড়িয়া রহিতেছেন। সে দৃশ্য দর্শনে ভক্তদের প্রাণ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।

"কভু নেত্রে-নাসায় জল, মুখে পড়ে ফেন।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন।"

এইভাবে বহুক্ষণ তাণ্ডব নৃত্য করিবার পর এইবার অন্যভাবে প্রভুর মন প্রবেশ করিল। তিনি স্বরূপ-দামোদরকে গাহিতে আজ্ঞা করিলেন। প্রভুর ভাব জানিয়া স্বরূপ গাহিতে লাগিলেন।—

"সেই ত' পরাণনাথ পাইনু।
যাহা লাগি' মদন-দহনে ঝুরি গেনু॥"

এই ধুয়া সঙ্গে প্রভু এইবার মধুর নৃত্য করিয়া জগন্নাথের আগে আগে চলিলেন। আর জগন্নাথদেব—যিনি প্রভুর 'প্রাণ বধুয়া'—ধীরে ধীরে প্রভুর সহিত চলিতে লাগিলেন বৃন্দাবন ধামে। ভক্তগণসহ এই নৃত্যকালে প্রভুর নেত্রযুগল জগন্নাথে নিমগ্ন। আর দুহাতে তিনি গীতের অভিনয় করিতে করিতে চলিয়াছেন। এই অবস্থায় রাধাভাবসুবলিত প্রভু এবং জগন্নাথরূপে শ্যামের মধ্যে তখন যে ভাবের ঠেলাঠেলি চলিতেছে, সে ভাব হইল,—

"গৌর যদি পাছে চলে, শ্যাম হয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে, শ্যাম চলে ধীরে ধীরে॥
এইমত গৌর-শ্যাম দোঁহে ঠেলাঠেলি।
স্বরথে শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী॥"

এই ভাবের ঠেলাঠেলির শেষে রাজবেশী কৃষ্ণের প্রতি গোপবধূ রাধিকার উক্তি,—

"অবশেষে রাধা কৃষ্ণে করে নিবেদন।
সেই তুমি, সেই আমি, সেই নব সঙ্গম॥

তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন-চরণ॥"

অবশেষে রাধারাণীর প্রেমই জয়ী হইল—শ্যামসুন্দর বলিলেন,—

মোর ভাগ্য মো-বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে,
সেই প্রেম পরম প্রবল।
লুকাঞা আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমা সনে,
প্রকটেহ আসিবে সত্বর॥

অবশেষে প্রভু রথসহ প্রবেশ করিলেন বৃন্দাবনে। প্রভুর প্রেমের আকর্ষণে প্রাণ-বধুয়ারূপে আসিলেন জগন্নাথদেব।

"আগে নৃত্য করে গৌর লঞা ভক্তগণ।
রথ রাখি' জগন্নাথ করেন দর্শন॥"

এইভাবে অপূর্ব্ব নৃত্য, গীত, ভাব ও লীলার মধ্য দিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা সমাপ্ত হইল।

—শ্রীমতী মায়া সরকার, বসিরহাট (২৪ পরগণা উঃ)

শ্রীচৈতন্যে মর্ত্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ

["শ্রীচৈতন্য অনন্ত জীবনের সত্যান্বেষণ"-নামক পুস্তকের সমালোচনা]

কিছুদিন পূর্ব্বে দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়-লিখিত (প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ সাল) "শ্রীচৈতন্য অনন্ত জীবনের সত্যান্বেষণ"-নামে একখানি পুস্তক আমার হস্তগত হইয়াছে। ঐ পুস্তকের প্রকাশক বিমল কান্তি সাহা, সুবর্ণা প্রকাশনী, ৯২, নিমু গোস্বামী লেন, কলিকাতা—৭০০০০৫। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া হৃদয়ে তীব্র বেদনা অনুভব করিতেছি। বর্ত্তমানে সারা বিশ্বব্যাপী শ্রদ্ধালু জনসাধারণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুকে কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া পূজা করিতেছেন এবং সর্ব্বত্র তাঁহার নাম প্রচারিত হইতেছে। কয়েকশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—"পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ-গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥ (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪।১২৬)

আজ তাঁহার সেই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীরাধা-গোবিন্দ-মিলিততনু বিপ্রলম্ভ-রসবিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতুলনীয় গুণযুক্ত অলৌকিক শক্তি ও মহিমা জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়ায় এবং জনগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ জ্ঞান করত তাঁহার প্রেমধর্ম্মে আকৃষ্ট হওয়ায় লেখক শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবম্বিধ প্রশংসা সহ্য করিতে না পারিয়া এই পুস্তকে অতি কৌশলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তা ও অলৌকিকতাকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। লেখক এই পুস্তকে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাধারণ মানুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। এই পুস্তকের প্রতিবাদ না করিলে ইহার বক্তব্যকে পরোক্ষে সমর্থন করা হইবে এবং লেখকের অন্যায়, অযৌক্তিক, অসামঞ্জস্য, কাল্পনিক ও অশাস্ত্রীয় কথায় লোকে বিশ্বাস স্থাপন করত চৈতন্য-বিমুখ হইয়া পড়িবে—এই আশঙ্কায় শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-কথনে কুণ্ঠা প্রকাশ করা পরহিংসা হইবে ভাবিয়া মাদৃশ বিদ্যা-বুদ্ধিহীন অধম ব্যক্তি পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্মের কৃপাশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করত পুস্তকখানির সমালোচনা লিখিতে প্রয়াসী হইয়াছি। পুস্তকটির বাঁধাই ও প্রচ্ছদ-ছবির সৌন্দর্য্য দেখিয়া উহার অভ্যন্তরে শ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিকত্ব ও ভগবত্তা সম্পর্কে লেখক যে Challenging mood লইয়া লিখিতে পারেন, তাহা চিন্তা করা যায় না।

পুস্তকখানির নামকরণে যে, শ্রীচৈতন্য-লীলার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। 'অনন্ত জীবন' বলিলে যে জীবনের অন্ত নাই অর্থাৎ শেষ বা নাশ নাই, তাহাই বুঝায়। যাহার নাশ নাই, তাহা নিত্য। সৎ বস্তুই নিত্য। গীতায় ২।১৬ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"—অর্থাৎ সৎ বস্তুর অভাব বা বিনাশ নাই এবং অসৎ বস্তুর নিত্যস্থিতি নাই। শ্রীচৈতন্যদেব বাস্তব সত্য বস্তু, তাঁহার লীলার শতকরা শতভাগই সত্য; সেই সত্যের সত্যানুসন্ধান কি হইতে পারে? শ্রীচৈতন্য-লীলাসমূহের নিত্যসত্যত্ব ও সনাতনত্ব সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত-বাণী— "এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব', 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ॥"
(চৈঃ ভাঃ আদি ৩।৫২)

আনন্ত্য-ধর্ম্মে লীলার অনিত্যতা ঘটে না। ভগবান্ ও ভক্তের নিত্যত্ব এবং ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্যের নিত্যত্ব সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত আরও বলিয়াছেন,—

"সত্য সত্য করোঁ তোরে এই পরকাশ।
সত্য মুই, সত্য মোর দাস, তার দাস॥
সত্য মোর লীলা-কর্ম্ম, সত্য মোর স্থান।
ইহা মিথ্যা বলে, মোরে করে খান খান॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২০।৩৯-৪০)

অনন্ত জীবন মানুষের হয় না। অনন্তেরই অনন্ত জীবন হয়। দুগ্ধ ও জল মিশ্রিত করিলে রাজহংস দুগ্ধ গ্রহণ করিয়া জলকে পৃথক্ করিতে পারে অথবা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে Lactometer-নামক যন্ত্রদ্বারা দুগ্ধে কতটা পরিমাণ জল মিশ্রিত করা হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া জানা যায়। যে-দুগ্ধ শতভাগই খাঁটি তাহাতে যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে জল পাওয়া যাইবে না, বরং সমস্তই খাঁটি দুগ্ধ বলিয়া জানা যাইবে। সত্যের সহিত মিথ্যা মিশ্রিত থাকিলে সে-স্থলে সত্য উদ্‌ঘাটন করা যায়। কিন্তু যাঁহার জীবনের সবটাই সুনির্ম্মল ও বাস্তবসত্য, তাঁহার সত্যানুসন্ধান করিতে গেলে পূর্ণ সত্যই প্রকাশ পাইবে। কিন্তু লেখক মহাপ্রভুর জীবনের সত্যতা অনুসন্ধান করিতে গিয়া অলৌকিকতা ও চরিত্রে অসত্য কিছু খুঁজিয়া পাইয়াছেন বলিয়া কৌশলে লিখিয়াছেন এবং জনমনে শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। লেখক নিজে সত্যানুসন্ধানে কতখানি খাঁটি, তাহা তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব—যাঁহার লেখনীতে সদা বিদ্যমান, যিনি কর্ম্মফলবাধ্য মায়াবদ্ধ জীব মাত্র, সেই লেখক কোন্ সাহসে মায়াধীশ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের জীবন-চরিতের সত্যাসত্য যাচাই করিতেছেন? লেখক বাস্তবসত্য সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবন-চরিতের সত্যানুসন্ধান করিতে গিয়া অহেতুক ছিদ্রানুসন্ধানে তৎপর হইয়াছেন। লেখক-কর্ত্তৃক উক্ত পুস্তকের নামকরণেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে সংশয়াপন্ন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

নিম্নে ঐ পুস্তকের মুদ্রিত অংশ হইতে কিছু কিছু অসামঞ্জস্য, কাল্পনিক, অসত্য ও অশাস্ত্রীয় কথার উত্তরে দোষ ত্রুটী উল্লেখপূর্ব্বক সমালোচনামুখে সংক্ষিপ্তভাবে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উত্থাপন করিতেছি;—

(১) লেখক তাঁহার পুস্তকে 'লেখকের নিবেদন' শিরোনামায় দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"গীতার সেই অমোঘ বাণী 'ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ'র উদ্দেশ্যে মানুষ ও তার স্বতোবিরোধী সমাজকে কলুষমুক্ত করতে অবিসম্বাদী চৈতন্যের আবির্ভাব।" (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪২শ বর্ষ | ১১ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৫০৪ | ৩১শে শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৯৭, ইং ১৭।৮।৯০ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

মহামুনি-গর্গাচার্য্যকৃতং শ্রীবলরাম-কৃষ্ণনামকরণম্

[শ্রীমদ্‌গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে শ্রীনারদ-বহুলাশ্ব-সংবাদে
শ্রীসঙ্কর্ষণ-কৃষ্ণনামকরণে পঞ্চদশোঽধ্যায়ে]

শ্রীগর্গাচার্য্য উবাচ,—

১-২। রোহিণী-নন্দনস্যাস্য নামোচ্চারং শৃণুষ্ব চ।
রমন্তে যোগিনো হ্যস্মিন্ সর্ব্বত্র রমতীতি বা॥ ২৫॥
গুণৈশ্চ রময়ন্ ভক্তাংস্তেন রামং বিদুঃ পরে।
গর্ভসঙ্কর্ষণাদস্য সঙ্কর্ষণ ইতি স্মৃতঃ॥ ২৬॥

[শ্রীনারদ বলিলেন,—মহামুনি গর্গাচার্য্য উত্থিত হইয়া বালকদ্বয় ও নন্দ-যশোদাসহ নির্জ্জন গোব্রজে গমনপূর্ব্বক যথাবিধি সযত্নে গণনাথগণের পূজা ও

গ্রহাদির শুদ্ধি-সাধন করত বালকদ্বয়ের নামকরণ করিলেন এবং প্রসন্নহৃদয়ে নন্দরাজকে বলিতে লাগিলেন,—]

শ্রীগর্গমুনি বলিলেন,—এই রোহিণী-নন্দনের নামকরণ করিতেছি, শ্রবণ কর। যোগিগণ ইহাঁতে রমণ করেন বা ইনি সর্ব্বত্র রমমাণ হন এবং ইনি স্বীয় গুণনিচয়ে ভক্তগণকে আনন্দিত করেন, অতএব বিজ্ঞগণ ইহাঁকে 'রাম' বলিয়া বিদিত হন। দেবকীগর্ভ হইতে ইহাঁকে রোহিণীগর্ভে সঙ্কর্ষণ করায় ইহাঁর অপর নাম 'সঙ্কর্ষণ' ॥ ২৫-২৬ ॥

৩। সর্ব্বাবশেষাদ্ যং শেষং বলাধিক্যাদ্বলং বিদুঃ।
সপুত্রস্যাপি নামানি শৃণু নন্দ হ্যতন্দ্রিতঃ।
সদ্যঃ প্রাণিপবিত্রাণি জগতাং মঙ্গলানি চ ॥ ২৭ ॥

সমস্ত শেষ হইলেও ইনি অবশিষ্ট থাকেন বলিয়া 'শেষ' এবং বলাধিক্যহেতু ইনি 'বল' বলিয়া বিদিত। হে নন্দ! অতন্দ্রিত হইয়া এক্ষণে স্বীয় তনয়ের প্রাণিগণের সদ্য পবিত্রতাকারী জগতের মঙ্গলকর নামসমূহ শ্রবণ কর ॥ ২৭ ॥

৪। ককারঃ কমলাকান্ত ঋকারো রাম ইত্যপি।
ষকারঃ ষড়্গুণপতি শ্বেতদ্বীপ-নিবাসকৃৎ ॥
ণকারো নারসিংহোঽয়মকারো হ্যক্ষরোগ্নিভুক্।
বিসর্গো চ তথা হ্যেতৌ নরনারায়ণবৃষী ॥ ২৮ ॥

ককার অক্ষরে কমলাপতি, ঋকার অক্ষরে রাম, ষকার অক্ষরে শ্বেতদ্বীপ-নিবাসকারী ষড়্গণপতি, ণকার অক্ষরে নরসিংহ, অকার অক্ষরে অগ্নিভুক্, বিন্দুদ্বয়ান্বিত বিসর্গ অক্ষরে ঋষি নরনারায়ণ উদ্দিষ্ট ॥ ২৮ ॥

৫। সম্প্রলীনাশ্চ ষট্ পূর্ণা যস্মিন্ শব্দে মহামুনৌ।
পরিপূর্ণতমে সাক্ষাত্তেন কৃষ্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৯ ॥

যে মহামুনি শব্দবাচ্য পরিপূর্ণতমে পূর্ণস্বরূপ এই ছয়জন প্রলীন, তিনি 'কৃষ্ণ'নামে প্রকীর্ত্তিত ॥ ২৯ ॥

৬। শুক্লো রক্তস্তথা পীতো বর্ণোঽস্যানুযুগং ধৃতঃ।
দ্বাপরান্তে কলেরাদৌ বালোঽয়ং কৃষ্ণতাং গতঃ।
তস্মাৎ কৃষ্ণ ইতি খ্যাতো নাম্নায়ং নন্দনন্দনঃ ॥ ৩০ ॥

ইনি সত্যাদি যুগে যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ করেন, দ্বাপরের অবসানে কলির প্রথমে ইনি বালকবেশে কৃষ্ণরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব এই নন্দনন্দন 'কৃষ্ণ' নামে খ্যাত হইবেন ॥ ৩০ ॥

৭। বসবশ্চেন্দ্রিয়াণীতি তদ্দেবাশ্চিত্তমেব হি।
তস্মিন্ যশ্চেষ্টতে সোঽপি বাসুদেব ইতি স্মৃতঃ ॥ ৩১ ॥

বসু-শব্দে ইন্দ্রিয়—তাহার দেবতা ও চিত্ত। ইনি ইন্দ্রিয়াধিপতিরূপে এই ইন্দ্রিয়াদিতে বাস করেন বলিয়া 'বাসুদেব' নামে খ্যাত ॥ ৩১ ॥

৮। বৃষভানুসুতা রাধা যা জাতা কীর্ত্তিমন্দিরে।
তস্যাঃ পতিরয়ং সাক্ষাত্তেন রাধাপতিঃ ॥ ৩২ ॥

বৃষভানুর কন্যা রাধা যিনি কীর্ত্তির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; ইনি স্বয়ং তাঁহার পতি বলিয়া 'রাধাপতি'-নামে অভিহিত ॥ ৩২ ॥

৯-১০। পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্।
অসংখ্য-ব্রহ্মাণ্ডপতির্গোলোকে ধাম্নি রাজতে ॥ ৩৩ ॥
সোঽয়ং তব শিশুর্জ্জাতো ভারাবতরণায় চ।
কংসাদীনাং বধার্থায় ভক্তানাং রক্ষণায় চ ॥ ৩৪ ॥

অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে বিরাজিত। অধুনা তিনি কংসাদির বধে ভূভারহরণ এবং ভক্তগণের পালনের জন্য তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

১১-১২। অনন্তাস্যস্য নামানি বেদগুহ্যানি ভারত।
লীলাভিশ্চ ভবিষ্যন্তি তৎকর্ম্মসু ন বিস্ময়ঃ ॥ ৩৫ ॥
অহো ভাগ্যন্তু তে নন্দ সাক্ষাচ্ছ্রী-পুরুষোত্তমঃ।
ত্বদ্‌গৃহে বর্ত্তমানোঽয়ং শিশুরূপঃ পরাৎপরঃ ॥ ৩৬ ॥

হে ভারত! ইহাঁর বেদগুহ্য আরও নাম আছে; বহুলীলায় তাঁহার সে সকল নাম প্রকাশ পাইবে। ইহাঁর কর্ম্মে কিছুমাত্র বিস্ময় কর্ত্তব্য নহে। অহো নন্দ! তোমার বহু ভাগ্য যে, এই সাক্ষাৎ পরাৎপর পুরুষোত্তম শিশুরূপে তদীয় গৃহে অদ্য বিদ্যমান ॥ ৩৫-৩৬ ॥

———

মনুষ্য-সমাজ ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম (২)

স্ব-নিষ্ঠিত ও পরিনিষ্ঠিত বৈষ্ণবের পার্থক্য

এই বিষয়ে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে, তাহা ক্রমশঃ বলিব। সম্প্রতি কতকগুলি 'সংযোগী বৈষ্ণব' আমাদের ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নন। তৎসম্বন্ধে দুই-একটী কথা বলা আবশ্যক। আমরা 'সংযোগী বৈষ্ণব'-রূপ প্রথার বিরোধী নই; কেবল তাঁহাদের ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম সম্বন্ধে আমাদের যত কথা। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে উক্ত আছে যে,—পরমার্থের জন্য ভগবানকে ভজন করিবে; কিন্তু অন্যান্য প্রাকৃত ফলের জন্য অন্যান্য দেবতার উপাসনা পদ্ধতি। যাঁহারা এইরূপ কার্য্য করেন, তাঁহারা স্বনিষ্ঠ বর্ণাশ্রমী এবং বহুদেবতাশ্রয়ী ও কর্ম্মাশ্রয়ী। যদি সংসারে বর্ত্তমান হইয়া অন্যদেবতা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল একমাত্র অচ্যুতাশ্রিত হইতে পারা যায়, তাহা হইলে পরিনিষ্ঠিত নাম লাভ করা যায়। তাহাদের লক্ষণ ভাগবতে ঐস্থলেই কৃত হইয়াছে; যথা;—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ (ভাঃ ২।৩।১০)

[পূর্ব্বে অকামই থাকুক, সর্ব্বকামই থাকুক বা মোক্ষকামই থাকুক, উদারবুদ্ধি হইবামাত্র মনুষ্য তীব্র শুদ্ধভক্তিযোগে পরম পুরুষ কৃষ্ণের যজন করিবেন।]

তীব্র ভক্তিযোগ-অভাবে সংযোগী বৈষ্ণব নহেন

সংসারী লোক মাত্রেই সর্ব্বকাম। সর্ব্বকাম সত্ত্বেও যদি সেই সেই কামের জন্য কর্ম্মকাণ্ডান্তর্গত বহুদেবতা-ভজন পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র পরম পুরুষকেই যজনা করা যায়, তবে স্বনিষ্ঠগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ শ্রেণীর পক্ষে একটী কঠিন ব্যবস্থা লক্ষিত হয়। 'তীব্রেণ ভক্তিযোগেন' এই শব্দদ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে যে, তীব্র ভক্তিযোগ অভাবে অচ্যুত-গোত্রত্ব সম্ভব হয় না। অনাদি বেদসম্মত যে বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা তাহাতে নিষ্ঠাপূর্ব্বক বর্ত্তমান হইলে মানব-সমাজ নির্দ্দোষী। কিন্তু অচ্যুত-গোত্র লাভ করত তীব্র ভক্তির অভাব হইলে উভয় পদচ্যুত হয়। **'তীব্র-ভক্তিই' একমাত্র অচ্যুতকুলের** জীবন। আমাদের বক্তব্য এই যে, গৃহস্থ-বৈষ্ণব বলিলে 'বর্ণাশ্রমী' ও 'সংযোগী' উভয় বৈষ্ণবই গৃহীত হইবেন; কিন্তু সংযোগীর

পক্ষে কঠিন এই যে, যে সংযোগীর তীব্র ভক্তি দেখা যায় না, তিনি উভয় কূলচ্যুত। কৃষ্ণ-ভক্তির জন্য বর্ণাশ্রম পরিত্যাগে কিছুমাত্র দোষ নাই। কিন্তু বর্ণাশ্রম ত্যাগীর যদি কৃষ্ণভক্তি দূর হয়, তবে তাহাকে কি বলা যাইবে? সে অবশ্য বর্ণাশ্রম-ত্যাগের জন্য দোষী এবং অপকৃষ্ট ফলভোগী হইবে। তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া আদর করা যাইবে না।

তিন প্রকার বৈষ্ণব; তন্মধ্যে 'নিরপেক্ষ'—ত্যাগী ও শ্রেষ্ঠ

সমাজ সম্বন্ধে বৈষ্ণব তিন প্রকার—(১) স্বনিষ্ঠ অর্থাৎ বর্ণাশ্রমে অবস্থিত অথচ কৃষ্ণভক্ত, (২) পরিনিষ্ঠিত অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডত্যাগী অচ্যুতাশ্রিত ব্যক্তিবিশেষ; ইহারা উভয়েই গৃহস্থ। (৩) নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগী। নিরপেক্ষ ব্যক্তিই অগৃহস্থ। ইহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ লক্ষণবিশিষ্ট বৈষ্ণব। কিন্তু কৃষ্ণভক্তি তিনজনেরই জীবন। উত্তরোত্তর কৃষ্ণভক্তির উন্নতিই প্রয়োজন। যে-স্থলে পরিনিষ্ঠিত বা নিরপেক্ষের কৃষ্ণভক্তি লঘু হয়, সেস্থলে তদনুসারে তাঁহাদের পতন স্বীকার করা যায়।

কৃষ্ণ-ভক্তিই বৈষ্ণবতার লক্ষণ

বর্ণাশ্রম স্বীকার, বর্ণাশ্রম ত্যাগ বা ভেকাদি গ্রহণই যে বৈষ্ণবতা, তাহা নয়। একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই বৈষ্ণবতার লক্ষণ। বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে গেলে যে-পরিমাণ কৃষ্ণভক্তি থাকে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করা চাই।

গৃহস্থ বা স্ত্রীসঙ্গীর কৌপীন গ্রহণে অধিকার নাই

ইহাতে আর একটী নিগূঢ় কথা এই যে, স্বনিষ্ঠ ও পরিনিষ্ঠিত উভয়ই গৃহস্থ, অতএব কৌপীন গ্রহণে অনধিকারী। অধিকার না থাকিলে যাহা করা যায়, তাহা দোষ বই গুণ নয়। স্বনিষ্ঠ বৈষ্ণবদিগের পক্ষে কৃষ্ণ-মন্ত্র গ্রহণ পর্য্যন্তই বৈষ্ণবতার পরিচয়। পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তির পঞ্চসংস্কারস্থলে বর্ণাশ্রমান্তর্গত নামান্তর গ্রহণদ্বারা পরিচয় সিদ্ধ হয়। তাঁহাদের কৌপীন গ্রহণ হইতে পারে না। নিরপেক্ষ ব্যক্তির পক্ষে কৌপীন গ্রহণই বৈষ্ণবতার বাহ্য পরিচয়। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধ। পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তির কৌপীন গ্রহণে অপরাধ হয়। কৌপীন গ্রহীতা আর কখনই স্ত্রীসঙ্গ করিতে পারিবে না—ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। অতএব সংযোগী বৈষ্ণবদিগের যে ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়, তাহার সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক। একথা অদ্য আমরা সংক্ষেপে বলিলাম।

ত্যাগী ব্যতীত গৃহস্থের ভিক্ষা নিষিদ্ধ

পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তিদিগের পরিবার-পোষণের জন্য অর্থ সঞ্চয় আবশ্যক। সেই অর্থ সঞ্চয় সম্বন্ধেও বিচার আছে। এইস্থলে (ভাগবত) সপ্তম স্কন্ধোক্ত বর্ণাশ্রম-লক্ষণ-স্বীকার না করিলে তাহাদের ভিক্ষাদ্বারা সংসার-নির্ব্বাহ করার যত্ন সুতরাং সঙ্কটনীয়। তদ্দ্বারা তাঁহারা পতিত হইবেন। যেহেতু নিরপেক্ষ ব্যতীত কাহারও ভিক্ষাধিকার নাই। অতএব পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তিদিগের স্বভাবানুসারে একটী একটী বর্ণ নিরূপণপূর্ব্বক তদ্বৃত্তিদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।

এই সমস্ত বিষয়ের ক্রমশঃ বিশেষ আলোচনা করিব।

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ভাগবত শ্রবণ

ভাগবত অর্থে 'ভগবানের'। ভাগবত বলিতে গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত বুঝায়। যে গ্রন্থরাজে শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যের সম্যক্ আলোচনা হইয়াছে, তিনিই গ্রন্থ-ভাগবত। আর যিনি অনন্ত চিন্তায় অনন্য চেষ্টায় শ্রীভগবানের সেবায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া নিরন্তর গ্রন্থ ভাগবতের আস্বাদ ল'ন, তিনি ভক্ত-ভাগবত। উভয় ভাগবতই তদীয় তত্ত্ব, তত্ত্ববস্তু স্বয়ং শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন। সুতরাং ভাগবত শ্রবণ আমাদের বিষয় কর্ম্মের মধ্যে অন্যতম এক ব্যাপার হইতে পারে না। ভাগবত পাঠ ও ভাগবত শ্রবণদ্বারা আমরা ভগবানের সেবা করিতে পারি। সেবাবুদ্ধির অভাবে পাঠ ও শ্রবণে ফলবিপর্য্যয় ঘটিয়া যায়। ভাগবত না হইলে কেহ ভাগবত কীর্ত্তনে যোগ্য হইতে পারেন না, তাহার অভিনয় করিতে গেলে তাহা বিষয়কর্ম্মই হইয়া যায়। ভাগবতের নিকট ভাগবত শ্রবণ না করিলে তাহাও বিষয়ীর সঙ্গ হইতে ভাগবতের ছলনায় বিষয়-ভোগ চেষ্টাই বর্দ্ধন করে, ভাগবত শ্রবণ হয় না। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ এই যে,—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" অবৈষ্ণবের নিকটে ভাগবত শ্রবণ করিলে ভাগবত শ্রবণ হয় না, তাহার

পরিবর্ত্তে অবৈষ্ণবের চিন্তাস্রোত আমাদের হৃদয়ে প্রবেশাধিকার পায়। তখন আমরা ভাগবত দাস হইতে না পারিয়া অবৈষ্ণবের আনুগত্যে মায়াবাদী বিষয়ী হইয়া যাই, আমাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবত ভগবদ্ভক্তি প্রতিপাদক শাস্ত্রশিরোমণি। ভাগবতরসামৃত-তৃপ্ত পুরুষ ভিন্ন অন্যে ইহার কি মর্ম্ম বুঝিবে! তাই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থরাজে শ্রীপাদ রূপগোস্বামিপ্রভু চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে রসিকজনের সহিত ভাগবতাস্বাদন ভক্তি সাধনোপায় বলিয়াছেন।

এখন রসিক কে? যদি রসিক ভিন্ন অপরের সহিত ভাগবতালোচনা করিতে কেহ যান, তাঁহার ভাগবতরসাস্বাদন কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? আজকাল রসিক বলিতে গেলে আমরা বুঝি যাঁহারা শ্লীলতাবর্জ্জিত হইয়া নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের বিষয় আলাপ করিতে অত্যন্ত আনন্দ পান, সভ্য সমাজের শিষ্টাচার উল্লঙ্ঘন করিয়া বাক্যে বা লেখনীতে স্ব স্ব কামজ ভাবের প্রকাশদ্বারা শ্রোতা বা পাঠকের তাহার উদ্দীপনে প্রয়াস পান, তাঁহারাই আজ আমাদের অধঃপতনের দিনে রসিক আখ্যা পাইয়া থাকেন। আজকাল বলিয়া ইহা দু'দশ বৎসরের কথা নহে, আজ দুইশতাব্দী বা সার্দ্ধ দ্বিশতাব্দী গত সমাজের এইরূপ প্রবণতা হইয়াছে। প্রাচীনকালে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলাকথা একমাত্র ভক্তোত্তমগণেরই আলোচ্য ছিল। সাধারণ শিক্ষিত ভদ্র-লোকে উহার মধ্যে প্রবেশাধিকার না পাইয়া দাম্ভিকতাবশে তদাধার গৃহরূপ গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশগুলির অযথা বলপূর্ব্বক দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বিকৃতভাবে রসা-স্বাদের জন্য ব্যস্ত হন নাই। শ্রীরাস-পঞ্চাধ্যায়, শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীবিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি রসাকরগুলির ভাণ্ডার লুণ্ঠনে অযথা সাহস প্রকাশ করেন নাই। এ ভাণ্ডারের রসরাশি আস্বাদনের যোগ্যতা অতি উচ্চ অধিকার। সকলের সে অধিকার না থাকায় রসচর্চ্চা অত্যন্ত নিভৃত ছিল, সাধারণ লোকের উপাসনার মধ্যে রসের প্রাদুর্ভাব ছিল না। যে-সকল রসশাস্ত্রের উল্লেখ হইল উহাতে উজ্জ্বল রসের বিলাস। সেই উজ্জ্বল রস অপ্রাকৃত বা প্রকৃতি রাজ্যের অতীত তত্ত্ব। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" সেই অপ্রাকৃত রস আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়, প্রাকৃত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের আধিপত্য থাকিতে উপলব্ধ হইতে পারেন না। আমাদের প্রাকৃত চেষ্টাসমূহ লইয়া অধিরোহ-মার্গাশ্রয়ে যদি আমরা অপ্রাকৃত রস লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করি, তাহা হইলে উহা-দ্বারা আমাদের প্রাকৃত রসেরই আলোচনা হইবে, তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যবর্দ্ধনই আমাদের লভ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। তাহার উদাহরণ আমরা সাতিশয় দুঃখের

সহিত সুধী পাঠকবর্গকে নিবেদন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি যে, প্রাকৃত দর্শনে অপ্রাকৃত রসতত্ত্বের আলাপ করিতে গিয়া কাব্যরসাস্বাদপর ব্যক্তিগণ শ্রীপাদ বিদ্যাপতি, শ্রীপাদ চণ্ডীদাস, শ্রীপাদ জয়দেবের নামে নানারূপ কুৎসা রটনা করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। তাঁহাদের বিশ্বাস যাঁহারা জড়রসে মগ্ন নহেন, তাঁহারা কিরূপে ঐরূপ রসগ্রন্থ রচনা করিতে পারেন? আবার কাহারও কাহারও পাষণ্ডতা এত অধিক যে, চরম ঔদার্য্যাবতার বিগ্রহ স্বয়ং অবতারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধেও অচিন্ত্য, অবাচ্য, অকথ্য কথার প্রস্তাব করিয়া তাহারা স্ব স্ব ও অনুগত ব্যক্তির অনন্ত রৌরব আবাহন করিয়া বসিয়াছেন। হায়! হায়! মাদৃশ স্বল্পবুদ্ধি জীবের কি দুর্ভাগ্য যে ঐ সকল দুরাত্মার কল্পনা বাস্তব রস বিজড়িত হইয়া নিজ নিত্য মঙ্গলের পথ রোধ করিয়া বসে। অযথা অনধিকার কালে রসমাধুর্য্য দেখিতে গিয়া আমাদের এই দুর্দ্দশা আরব্য উপন্যাসে যেরূপ রাজকুমার অপ্সরাগণের নিষেধবাণী উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক নিষিদ্ধ গৃহ উদ্ঘাটন করিয়া পক্ষিরাজ অশ্ব দেখিতে পায় ও তাহার অযথা ব্যবহার করিতে গিয়া স্বীয় দুর্ভাগ্য আনয়ন করিয়াছিলেন, অনধিকারীর রসভাণ্ডারে হস্তক্ষেপও ঠিক তদ্রূপ আমাদের দুর্ভাগ্য লক্ষণ।

যতদিন না বঙ্গীয় সমাজ রসশাস্ত্র ব্যবসায়ীর কবল হইতে মুক্ত না হইবে, যতদিন না সমাজ হইতে বেতনভোগী ভাগবতজীবীর সমাদর বিদূরিত হইবে, যতদিন ভাগবত শ্রবণব্যপদেশে স্ব স্ব ইন্দ্রিয় রসায়ন সম্পদের অনুশীলনের বস্তু থাকিবে, ততদিন শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া রহিবে। বেতনভোগিগণ বা 'চুক্তি' করিয়া না লইলেও বেতন আশায় ভাগবতপাঠিগণ ভাগবত পাঠ করেন না, তাঁহাদের মুখে ভাগবত উচ্চারিত হইতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ, তাহা অর্থ বিনিময়ে আদান-প্রদানের বস্তু নহে। অর্থলোলুপের ভাগবতাধিকার নাই, সুতরাং অর্থ ব্যয় করিয়া তাহার মুখে ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিয়া তাহার লোকরঞ্জনের ক্ষমতার প্রশংসা করাও যা, আর যাত্রা-থিয়েটার শুনিয়া বাহবা দেওয়াও তাই। ইহার সহিত ভাগবত শ্রবণের ফল প্রেমোদয়ের সহিত কোন সাক্ষাৎকার নাই।

অনেকে অর্থ বিনিময়ে ভাগবত পাঠ না করিলেও তাঁহাদের ভাগবতালোচনা পূতনার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বিষস্তন্য প্রদানের ন্যায়। তাঁহারা ভাগবতের প্রচ্ছন্ন শত্রু। তাঁহারা পাণ্ডিত্যজাল বিস্তার করিয়া ভাগবতার্থ আচ্ছাদনপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের স্ব স্ব মতপোষক ব্যাখ্যা করিয়া মায়াবাদ প্রচারই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। ইহাদের মধ্যেও বেতনভোগী আছে, অথবা কেহ কেহ

সাধারণতঃ অপাপও থাকিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের নিকট ভাগবত শ্রবণে আমাদের কত সৌভাগ্য অঙ্কুরিত প্রেমবীজ নাশপ্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী করিয়া তুলে। একপক্ষে এই সকল পণ্ডিতাভিমানী মায়াবাদিগণের, অপরপক্ষে চেতনালোলুপ অনধিকারী রসালাপী পাঠকগণের নিকট ভাগবত শ্রবণ নিষেধ করিয়া পরমকরুণাকর শ্রীমহাপ্রভু আমার ন্যায় জীবকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে॥" আমরা কিন্তু তাঁহার এই আদেশবাণী উল্লঙ্ঘন করিয়া কি অধঃপাতেই না যাইতেছি, এস্থলে দেবানন্দ পণ্ডিতের আখ্যান আমাদের বহুবার আলোচ্য। পাঠকগণ আকরগ্রন্থ পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইবেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে রসের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাদৃশ রসলাভ যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারাই 'রসিক' শব্দবাচ্য। নতুবা প্রাকৃত সহজিয়াগণ আপনাদিগকে ললনামোহন রসিক বলিয়া যে পরিচয় প্রদান করেন এবং তাদৃশ পরিচয়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নরকের পথে চলেন এবং আপনাদিগকে ব্যভিচারী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে গিয়া স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণে অযোগ্যতা হইতেও মুক্ত মনে করেন, তাহা তাহাদের ভ্রমমাত্র। উহা সহজিয়াদিগের আদর্শ হইতে পারে, কিন্তু অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম হইতে সুদূরে অবস্থিত। প্রাকৃত রসিকগণ বলেন,—যাঁহারা ব্যভিচারে প্রমত্ত না হইয়া রস লাভের জন্য জড়ে সংযত মাত্র, তাঁহাদের জড় ইন্দ্রিয়তর্পণে অধিকার না থাকায় জড় রসের উপলব্ধি ঘটে না। সুতরাং তাহারা শান্ত রসের অবৈষ্ণব মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে রস শব্দের বিকৃত অর্থ করায় প্রাকৃত সহজিয়া এরূপ ভ্রমে পতিত। রসের সংজ্ঞায় আমরা দেখিতে পাই যে,—

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকার ভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বে জ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসোমতঃ॥

আবার ব্যভিচারীর পাষণ্ডতায় বঞ্চিত হইয়া দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণে যোগ্যতা দেখাইতে গিয়া নিত্যকালের জন্য প্রাকৃত অক্ষজ ভোগের ভোক্তা হইয়া পড়েন।

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

———

ভোগী, দেহারামী, অলস ও ক্রোধীব্যক্তি মঠবাস ও হরিসেবার অনধিকারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ
ইং ১২।৬।৬৩

স্নেহাস্পদেষু—

আপনার ৭।৬।৬৩ তারিখের পত্র পাইয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। বর্ত্তমানে মঠ রক্ষা করিবার মত লোকের অত্যন্ত অভাব। সকলেই সুখ চায়। বিছানায় শুইয়া খাইতে পারিলে উঠিয়া বসিয়া খাওয়া কষ্টকর বোধ হয়! কেহ যদি চিবাইয়া দেয় তাহা হইলে দাঁতের পরিশ্রমও কম হয়!

বর্ত্তমানে ক্রোধী ব্যক্তির সংখ্যা অধিক। তাহাদের ক্রোধের দরুণ পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্রের সহিত বসবাস করা সম্ভব হয় নাই। কাম-ক্রোধ সকলকে পাইয়া বসিয়াছে। আপনিই বা কি করিবেন, আর আমিই বা কি করিব! সংসারের কাজ করিতে পারিলে মঠে আসিবে কেন? সংসারে অচল বলিয়াই অনেকে মঠে আসে। পি-পু ফি-শোর দলই বেশী।

আসামে আপনাকে দেখিয়াই মঠ করিয়াছিলাম। আপনি ওখান হইতে চলিয়া আসিতে চাহেন—ইহা অত্যন্ত নিরাশার কথা। আমার মতে আপনি যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন ঐখানেই থাকুন। নবদ্বীপের জমির টাকা এখনও মজুত রাখিয়াছি। আমার ইচ্ছা, উহা পুনরায় আপনার নিকট ফেরৎ পাঠাই। হরিসেবাই জীবনের উদ্দেশ্য। হরিসেবকের পক্ষে বিপদ-আপদই মঙ্গলজনক। উহা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাহিব কেন?

* * * খুব ভাল ছেলে ছিল। সে টিকিতে না পারায় খুবই মর্ম্মাহত হইলাম। * * * মহারাজকে তাহাকে খুঁজিয়া আনিতে বলিবেন।

পি. ডব্লুকে আপনার জমি ছাড়িয়া দিবেন না। আপনার বহুকালের দখল এবং পি. ডব্লু আসিবার পূর্ব্ব হইতে দখল। কোর্ট হইতে ইঞ্জাংশন জারি করিবেন। পি. ডব্লুর নোটীশ অগ্রাহ্য করিবেন। * * * কে গোলকগঞ্জে রাখিয়া দিবেন। সে পরিশ্রমী ও সরল প্রকৃতির। তাহার উপর যেন কেহ মুখখিস্তি না করে। আগামী পরশ্ব চুঁচুড়ায় রথে যাচ্ছি। * * * মহারাজ ১০/১২ দিন কোথায় চলে গেছে, জানা যায় নাই। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রীক্ষেত্র দর্শন

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯২ পৃষ্ঠার পর]

একদিন আসি প্রভু এই রম্যস্থানে।
জগন্নাথ দরশনে হৈলা অচেতনে॥
সেই সিংহদ্বার সেই মন্দির প্রাঙ্গণ।
গরুড়ের স্তম্ভ সেই ভুবনপাবন॥
শ্রীনৃসিংহদেব আর জগন্নাথ রায়।
এইস্থানে সার্ব্বভৌম দেখিলেন যাঁয়॥
জীবভাগ্যে অদ্যাবধি রয়েছে বিদিত।
তব পাদপদ্ম নাথ পাষাণে নির্ম্মিত॥
পরশিয়া ধন্য হউ এই মূঢ় জন।
অঙ্গুলির চিহ্ন আর তব শ্রীচরণ॥
পাষাণ দ্রবিল প্রভু শ্রীঅঙ্গ পরশে।
কি অদ্ভুত সেই প্রেম না জানি বিশেষে॥

*　　*　　*　　*

জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি এই পরম সুন্দর।
তব লীলাস্থান দেখি জুড়ায়ে অন্তর॥
একাকী অঙ্গনে বসি' স্মরি অনুক্ষণ।
একে একে তব লীলা প্রাণ বিমোহন॥
গৌরলীলা-কৃষ্ণলীলা অচিন্ত্য চিন্ময়।
ভক্তিবলে অনুভব হয় সমুদয়॥
হৃদয় নির্ম্মল যাঁর বিশুদ্ধ ভকতি।
সেই হৃদে গৌরচন্দ্র করে অবস্থিতি॥
অন্তরে প্রবেশি' প্রভু জানায় সকল।
কৃষ্ণনাম নিত্যবস্তু মাধুর্য্য প্রবল॥

নামে রূপ-গুণ স্ফূর্ত্তি আনন্দ হৃদয়।
সাধনে স্বরূপসিদ্ধি মহা প্রেমোদয়॥
বিদ্যুল্লতা সমলীলা স্ফুরে নিরন্তর।
কভু স্ফূর্ত্তি হয় কভু সাক্ষাৎ গোচর॥
এই ত' চিন্ময় ভূমি গৌরভক্ত জন।
অনুভবে নিত্যলীলা করে দরশন॥
বলগণ্ডি উপবনে প্রভু প্রেমাবেশে।
গজপতি আসি পদ সেবিলা বিশেষে॥
মহাপ্রেমে মহারাজ গৌরকৃপা আশে।
রাসগীতা শ্লোক পড়ে, কৃপা অবশেষে॥
সমুদ্রে যমুনা স্ফূর্ত্তি আবেশে পতন।
লীলা অনুভবি' কভু করেন রোদন॥
শ্রীচৈতন্যলীলা হয় গম্ভীর অপার।
অধিকারী ভেদে আছে সিদ্ধান্ত বিচার॥
অহৈতুকী কৃপা পায় ভাগ্যবান্ জন।
রস ভেদে প্রাপ্ত লীলা বিচিত্র কথন॥
অচিন্ত্য অগম্য সেই শাস্ত্র অগোচর।
জড়বুদ্ধিজনে কভু না হয় গোচর॥
সুরম্য সমুদ্রতীরে স্ফূর্ত্তি বৃন্দাবন।
প্রেমোল্লাসে কৃষ্ণনাম করি উচ্চারণ॥
গোবর্দ্ধনভ্রমে চটকের প্রতি ধায়।
ভাবের আবেশে কভু লুণ্ঠিত ধরায়॥
প্রভাত তপন জিনি রূপ মনোহর।
দীন-হীন বেশ, কৃষ্ণ বিরহে কাতর॥
সেই বেশ সেই শিক্ষা ভক্তে আচরণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণনামে ভেদ না জানে সে জন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পদ যাঁর প্রাণধন।
এ সব লীলার অধিকারী সেই জন॥

* * * *

প্রথমে যাইনু মোরা কাশী মিশ্রালয়।
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু রহিলা যথায়॥

স্বরূপ-রামানন্দ সঙ্গে রস আস্বাদন।
রাধাভাবে কৃষ্ণলীলা স্ফূর্ত্তি অনুক্ষণ॥

ব্রজের মধুর ভাব সকল সিদ্ধান্ত।
জানাইলা ভক্তগণে মাধুর্য্যের অন্ত॥

বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস গীত সঙ্কীর্ত্তন।
কর্ণামৃত ভাগবত শ্লোকের পঠন॥
কৃষ্ণরূপ-গুণ-লীলা স্ফূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ।
অধিরূঢ় মহাভাবে কভু অচেতন॥
দেখে যাব সে গম্ভীরা অতীব সুন্দর।
করিলা এ লীলা যথা প্রাণের ঈশ্বর॥
দেখিনু নয়ন ভরি গম্ভীরা ভবন।
মনোহর সেই স্থান অতি সুনির্জ্জন॥
বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ সেই লীলাস্থানে।
স্মরণ মঙ্গল পাঠ করিলা যতনে॥
অমিয় পূরিত স্তোত্র গৌরাঙ্গ স্মরণ।
ভকতিবিনোদ প্রভু করিলা রচন॥
সংহতি ছিলেন তিনি মিশ্রের ভবন।
কহিলেন শ্রীচৈতন্য লীলা বিবরণ॥
গম্ভীরা দর্শনে অতি প্রফুল্লিত মন।
গৌর-রূপ-গুণ-লীলা হইল স্মরণ॥
মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টক শ্লোক অনুসারে।
ভজন নৈপুণ্যে লীলা স্ফুরয়ে অন্তরে॥
গম্ভীরা ভিতরে প্রভু নিজ অভিপ্রায়।
ব্রজরস আস্বাদিলা শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥

তবে রাধাকান্ত দেব করিনু দর্শন।
সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রসুত মদনমোহন॥
সর্ব্ব অঙ্গ নিরুপম লাবণ্য সুন্দর।
নবীন নীরদ জিনি রূপ মনোহর॥
শ্রীঅঙ্গে সৌন্দর্য্য তায় কমল নয়ন।
মধ্যম আকার প্রভু জিনিয়া মদন॥
শ্রীবিগ্রহরূপে তথা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
স্ব স্বরূপে বিহরয় হেন লয় মন॥
হেরিয়া যুগলরূপ আনন্দ অপার।
মহানন্দে মগ্ন হই হেরি বার বার॥
তবে তথা হৈতে মোরা করিনু গমন।
করি সবে শ্রীসিদ্ধবকুল দরশন॥
অতি সুনির্জ্জন সেই হরিদাসাবাস।
ভজনপ্রভাবে নিত্য আনন্দ বিলাস॥
অদ্যাবধি আছে বৃক্ষ অমর অক্ষয়।
শ্রীসিদ্ধবকুল নাম কল্পবৃক্ষপ্রায়॥
তার তলে বসি' মোরা করিনু শ্রবণ।
হরিনাম-চিন্তামণি গ্রন্থ বহুক্ষণ॥
প্রতিপদে সেই গ্রন্থ ভক্তিরসময়।
নামের মাহাত্ম্য যথা শাস্ত্রের নির্ণয়॥
পরিপাটী বিরচন মধুর শ্রবণ।
নামেতে অনন্যভক্তি লভে শ্রোতাগণ॥
শ্রদ্ধায় শুনিলে কৃষ্ণভক্তির উদয়।
অনন্য শরণ হয়ে করে নামাশ্রয়॥
কৃষ্ণকৃপা হয়, অতি স্বল্প দিনে তার।
শ্রীনাম-মহিমা গ্রন্থ অতি সুবিস্তার॥

* * * (ক্রমশঃ)

—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীব্রজমণ্ডলে বৈষ্ণবানুগমনে

"গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥"

সাধু-সঙ্গই তীর্থযাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য। মহাজনগণ বলেন,—"যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই, কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ?"

তীর্থদর্শন বা তীর্থ পরিক্রমার আহ্বান যুগ যুগ ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছে। সুকৃতিবান্ পুরুষ সাধুসঙ্গে সেই সুযোগ গ্রহণ করেন। কলিযুগে চারিসম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্গ ও তাঁহাদের অধস্তন শিষ্যবর্গ তীর্থদর্শন বা পরিক্রমার মাধ্যমে পাদসেবনের সুযোগ দিয়াছেন। তবে বিশেষ সুযোগ তৎকালে ছিল না। জীবের কল্যাণের জন্য শাস্ত্রের আলোচনাই ছিল তাঁহাদের মুখ্য কর্ত্তব্য।

পরবর্ত্তিকালে শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই শ্রীব্রজমণ্ডল বা মথুরামণ্ডল পরিক্রমার প্রথম পথ-প্রদর্শক। স্বয়ং অবতারী পুরুষ হইয়াও আচরণমুখে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য কলিকালে ছন্ন অবতার-লীলা স্বীকার করিয়াছেন। পরিক্রমামুখে তিনি স্বয়ং শ্রীশ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড আবিষ্কার করিয়া শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামীবর্গকে আদেশ করিলেন,—(১) লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, (২) শ্রীবিগ্রহগণের সেবাপ্রকাশ, (৩) ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন ও (৪) ভক্তি-সদাচার প্রচার।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নীলাচলে ভক্তসঙ্গে প্রেমাবেশে আবিষ্ট ছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনে পাই,—

নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন।
বৃন্দাবন যাইতে পথে হইল শতগুণ॥
সহস্রগুণ প্রেম বাড়ে মথুরা-দরশনে।
লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে, ভ্রমেণ যবে বনে॥
অন্য-দেশে প্রেম উছলে "বৃন্দাবন"-নামে।
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৭।২২৬-২২৮)

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পূর্ব্বেও দ্বাপর যুগে দেখা যায়,—কৌরবকুলের বিদ্বৎ মহাবিজ্ঞ সুধীজনের হিতকামী শ্রীবিদুর মহারাজও তীর্থ পরিক্রমা করিয়াছেন।

শ্রীবলদেব প্রভু স্বয়ং লোকশিক্ষার জন্য ভারত-তীর্থ পরিক্রমা করিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ প্রভু শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভুকে সঙ্গে করিয়া তীর্থ পরিক্রমা করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুও তীর্থ পর্য্যটন করিয়া কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জীবকে উৎসাহিত করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীজীবকে সঙ্গে করিয়া শ্রীনবদ্বীপধাম, শ্রীব্রজমণ্ডল ও অন্যান্য তীর্থ পরিক্রমা করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যেও কেহ কেহ শ্রীবৃন্দাবনধাম পরিক্রমা করিয়াছেন, অর্থাৎ তীর্থ পরিক্রমার বিধি পুরাকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। কালের প্রবাহে তাহা মাঝে মাঝে স্তিমিত হইয়া যাইত।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বৃন্দাবন পরিক্রমার আয়োজন দেখিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ 'প্রহেলী' বা সতর্কীকরণ করিয়া বলিলেন,—

যাঁর সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ, কোটি।
বৃন্দাবন যাইবার এই নহে পরিপাটী॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।২৬৬)

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত বিনয় করিয়া বলিলেন,—

'তুমি যাঁহা যাঁহা রহ, তাঁহা 'বৃন্দাবন'।
তাঁহা যমুনা, গঙ্গা, সর্ব্বতীর্থগণ॥
তবু বৃন্দাবন যাহ লোক শিখাইতে।
সেই ত' করিবে, তোমার যেই লয় চিত্তে॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৮০-৮১)

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্ষদবর্গের লীলাসম্বরণের পর এই পরিক্রমার ধারা রুদ্ধ হইয়া গেল। পরবর্ত্তিকালে গৌড়ীয়গগনে পারমার্থিক জগতের ভগীরথ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পরিক্রমার বিধি ও গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গৌড়ীয়-ভক্তগণকে উৎসাহিত করিলেন। বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর স্বয়ং তাঁহার পার্ষদগণসহ ১৯৩২ খৃঃ নিয়মসেবা বা উর্জ্জব্রতকালে চৌরাশীক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ করিলেন। সহস্র সহস্র ভক্ত অংশ গ্রহণ করিয়া সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছিলেন। সে এক বিরাট্ ব্যাপার ছিল। তখন প্রচুর হরিকথার বন্যা বহিয়াছিল। 'সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই। সংসার জিনিতে অন্য কোন বস্তু নাই॥ 'সাধুসঙ্গ' 'সাধুসঙ্গ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥" সেই হেতু, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, প্রণয়ি ভকত

সঙ্গ-ব্যতিরেকে তীর্থ দর্শনের প্রকৃত ফল লাভ হয় না। অন্যত্র তিনি কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"রাধিকা ভাব-গম্ভীর,　　চিত্ত যেবা মহাধীর,
গণ সঙ্গ না কৈল জীবনে।
কেমনে সে শ্যামানন্দ,　　রসসিন্ধু-স্নানানন্দ,
লভিবে বুঝহ একমনে॥"

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের অপ্রকটের পর এই পরিক্রমার ধারা রুদ্ধ হইয়া যায়। পরবর্ত্তিকালে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ শ্রীধাম পরিক্রমা পুনঃ প্রচলন করিয়া অগণিত ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার করেন। তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার আশ্রিতজন পরিক্রমার ধারাকে বজায় রাখিয়াছেন এবং প্রতি বৎসরই ভারত-তীর্থ পরিক্রমার আয়োজন করিয়া থাকেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আশ্রিত শিষ্যগণের সেবকসূত্রে যাঁহারা মঠ পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই পরিক্রমাকে আশ্রয় করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্যকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া চলিতেছেন।

ভারতে অবস্থিত অন্যান্য সম্প্রদায়ও কখনও কখনও তীর্থ পরিক্রমার আয়োজন করিয়া সনাতন ধর্ম্মের ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। ইহা খুবই গৌরবের বিষয়।

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা সম্বন্ধে বহু পণ্ডিত, গুণী, জ্ঞানী, কর্ম্মী, ভক্ত তাঁহাদের লেখনীর মাধ্যমে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই অধম লেখকেরও "শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা" ধারাবাহিক-ভাবে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র 'শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকাতে' প্রকাশিত হইয়াছিল ৩১শ বর্ষের ৯ম সংখ্যা হইতে।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপাতে ভগবৎ-সেবোন্মুখী জীবের চিন্তা ও ভাবধারার পরিবর্ত্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখনীর ধারা ও ভাব পরিবর্ত্তন হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীব্রজমণ্ডলে বৈষ্ণবানুগমনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলাত্মক মাধুর্য্যময়ী কথা ও গুঢ় রহস্য যাহা সাধুমুখে শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাঁহার কিঞ্চিৎ স্মরণ-পথে উদিত হওয়ায় শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিবার যত্ন লইতেছি।

মাদৃশ অধম ও অজ্ঞ ব্যক্তির লেখনীতে পাঠকবৃন্দের আনন্দ নাও হইতে পারে। কারণ, আমার ভাব নাই, ভাষার মাধুর্য্যও নাই। তবুও লিখিতে গেলে ভাবের আনন্দ আসে, স্মৃতিপটে মধুর ব্রজমণ্ডলের বহু দৃশ্যই উপস্থিত হয়। সেইহেতু, শ্রীরূপানুগ-গুরুবর্গের আনুগত্যে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপাকে একমাত্র ভরসা করিয়া লেখনী ধারণ করিলাম।

হে অদোষদর্শী বৈষ্ণবগণ! এ দাসের দোষ-ত্রুটী ক্ষমা করিবেন। সেই মাধুর্য্যসিন্ধুর উচ্ছ্বাসের এক বিন্দু যাহাতে স্পর্শ করিতে পারি, সেই প্রার্থনাই সর্ব্ব বৈষ্ণবচরণে সকাতর নিবেদন করিতেছি।

"শ্রবণে মথুরা নয়নে মথুরা বদনে মথুরা হৃদয়ে মথুরা।
পুরতো মথুরা পরতো মথুরা মথুরা মথুরা মধুরা মথুরা॥" (ক্রমশঃ)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী (ভক্তিভূষণ)

পঞ্চরস সেবা-শিখাদ্বারা গৌড়ীয়ের আরতি

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—পাঁচটী শ্রীকৃষ্ণে মুখ্য ভক্তিরস। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়—সাতটী গৌণ রস। শ্রুতিতে শান্তরস বর্ণন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসিত।" (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১)—এ সমস্তই সেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছে এবং অন্তিমকালে তাঁহাতেই লয়প্রাপ্ত হইবে। অতএব আমরা যাহা কিছু দেখি সকলই ব্রহ্ম অর্থাৎ বস্তুতত্ত্ব-বিচারে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। এই উপাসনা মমতা-গন্ধহীন বলিয়া তাকে শান্তরস বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৬।৪৭ শ্লোকে—"মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ। ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥" দিগম্বর ঊর্দ্ধরেতা, ভিক্ষু, শান্ত, শুদ্ধ, সন্ন্যাসী, ঋষিগণ (ব্রহ্মচর্য্যাদি ক্লেশ স্বীকার করিয়া কোনওপ্রকারে) ব্রহ্মলোকে গমন করেন। শান্তরসে কৃষ্ণে নিরপেক্ষ-ভাব—"স্বর্গ, মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত 'নরক' করি' মানে। 'কৃষ্ণ-নিষ্ঠা', 'তৃষ্ণা-ত্যাগ' —শান্তের 'দুই' গুণে॥ শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতা-গন্ধ হীন। 'পরব্রহ্ম'-'পরমাত্মা'-জ্ঞান-প্রবীণ॥"

"জ্ঞান-যোগ-ভক্তি—তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥" "বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে" অর্থাৎ অনেক তপস্যা, শুষ্কবৈরাগ্য, কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া ব্রহ্মে প্রপন্ন পর্য্যন্তই সাধকের সমাপ্তি। তাতে কবিও নিস্পৃহ—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি? সে আমার নয়।

জ্ঞানীর ব্রহ্মলাভের পর যোগীর পরমাত্ম-বিচার। তাই যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ ত' বটেই। কিন্তু কোন্ যোগী? পাছে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের যোগী হওয়ার উপদেশে ভুল করে ফেলেন, কারণ যোগী ত' নানা প্রকার। তাঁদিগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়,—হঠযোগী ও রাজযোগী। হঠযোগিতায় রুমাল দেখিয়ে বশ করা, মাথার জটা নেড়ে অগ্নি ছিটানো, মাটির ঢেলাকে মণ্ডা মিঠাইয়ে পরিণত করা, জলের উপর দিব্যি হেটে যাওয়া—নানারূপ বুজরুগী। নির্ব্বোধ ব্যক্তির কাছে যিনি বুজরুগী জানেন, তিনিই সাধু। কিন্তু দুর্ল্লভ মানবজন্মে বুজরুগীই যথেষ্ট নয়। তাই অর্জ্জুনের প্রতি সখা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধি-পত্র—যোগিগণের মধ্যে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণগত হইয়া মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা-সহকারে তাঁর ভজন করেন, তিনিই যোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের সুদৃঢ় মন্তব্য। 'শ্রদ্ধা' কি? "শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥" এখান হইতেই শ্রীকৃষ্ণে দাস্যরসের সূত্রপাত।

দাস্যরসে—শান্তরস+সেবা। শান্তরসে কেবল 'স্বরূপজ্ঞান' হয়, কিন্তু দাস্যরসে 'স্বরূপজ্ঞানের' সাথে 'পূর্ণৈশ্বর্য্য-প্রভু-জ্ঞান' অধিক হয়। ঈশ্বরজ্ঞান, সম্ভ্রম-গৌরব প্রচুর নিরন্তর সেবা করে কৃষ্ণে সুখ দান। নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, হনুমান এঁরা দাসাভিমানে কৃতার্থ। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পার্ষদ গদাধর, শ্রীবাস, নিত্যানন্দপ্রভু ও অদ্বৈতাচার্য্যও দাস্যভাবই প্রার্থনা করেন। ব্রজের সখাগণও দাসাভিমান করেন; ব্রহ্মা, শিবাদি লোকপালগণও নিজেদের দাস জেনে পরম সুখী; বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীও শ্রীকৃষ্ণের দাসী হওয়ার জন্য লালায়িতা; শ্রীব্যাস-শুক সবেই দাসাভিমানী; অন্যের কথা কি, পিতা নন্দ-মহারাজও দাসত্ব প্রার্থনা করেন। শ্রীমতী রাধিকাও দাসী অভিমান করেন। শ্রীকৃষ্ণদাস হেন পদবীকে অল্প জ্ঞান করিবে না। "অগ্রে হয় মুক্তি, তবে সর্ব্ববন্ধ নাশ। তবে ত' হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥" বর্ণবিদ্বেষের দারুণ দুর্দ্দিনে সাধারণ সমাজে জন্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র পরিগণিত হয়। কিন্তু ত্রৈকালিক শাস্ত্র-বিচারে গুণ ও কর্ম্মের দ্বারাই বর্ণনিরূপণ যথার্থ। গৌড়ীয়-আচার্য্যগণ জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর চতুর্ব্বিধ উপাধিরূপ ব্যাধি হইতে

নিষ্কৃতি করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমীকে দাসের প্রস্তুতি ও গৃহস্থাশ্রমীকে দাসাধিকারী সম্মান দান করেন।

সখ্যরসে—শান্ত ক্রোড়ীভূত দাস্যরস + বিশ্রম্ভ-মমতা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে —"শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন—সখ্যে দুই হয়। দাস্যের সম্ভ্রম-গৌরব-সেবা, সখ্যে 'বিশ্বাস'ময়॥ কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায়, করে ক্রীড়া-রণ। কৃষ্ণে সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন-সেবন॥ বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য—গৌরব-সম্ভ্রম-হীন। অতএব সখ্য-রসের 'তিন' গুণ—চিহ্ন॥ 'মমতা' অধিক, কৃষ্ণে আত্মসম-জ্ঞান। অতএব সখ্যরসের বশ ভগবান্॥"

বাৎসল্যরসে—দাস্য ক্রোড়ীভূত সখ্যরস + শ্রীকৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান। শ্রীচৈতন্য-চরিতে "বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন। সেই সেই সেবনের ইহাঁ নাম—'পালন'॥ সখ্যের গুণ—'অসঙ্কোচ', 'অগৌরব' সার। মমতাধিক্যে তাড়ন-ভর্ৎসন-ব্যবহার॥ আপনারে 'পালক' জ্ঞান, কৃষ্ণে 'পাল্য' জ্ঞান। 'চারি' গুণে বাৎসল্য-রস—অমৃত-সমান॥"

মধুররসে—দাস্য ও সখ্য ক্রোড়ীভূত বাৎসল্য + নিজাঙ্গদ্বারা সেবা—"মধুর রসে—কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা অতিশয়। সখ্যের অসঙ্কোচ, লালন মমতাধিক্য হয়॥ কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন। অতএব মধুর-রসের হয় 'পঞ্চ' গুণ॥ আকাশাদি গুণ যেন পর পর ভূতে। এক-দুই-তিন-চারি ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥ এইমত মধুরে সব ভাব-সমাহার। অতএব আস্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥" শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ভাবান্বিতা মহিষীগণাপেক্ষা ব্রজের গোপীগণ শ্রেষ্ঠা। "তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা রাধা বিনোদিনী। সর্ব্বাকর্ষী শ্রীকৃষ্ণের হয়েন আকর্ষিণী॥ সেই গোপী আনুগত্য বিনে। ভজিলেহ নাহি মিলে ব্রজেন্দ্র-নন্দনে॥" শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩০।২৮ শ্লোকে আছে—'অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥' মহাকবি জয়দেব তাঁর শ্রীগীতগোবিন্দের ৩য় সর্গের ১ম শ্লোকে তারই আনুগত্যে বলেন,—কংসারিরপি সংসার-বাসনা-বদ্ধ-শৃঙ্খলাম্। রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

———

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[প্রথম অধিবেশন]

[শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ, তুরা (মেঘালয়), তাঃ-২৩।৮।১৯৮১]

আজ আমরা কিছু ধর্ম্মকথা আলোচনা করবার জন্য এই সভায় উপস্থিত হয়েছি। আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব এবং সনাতন ধর্ম্ম।" আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয়গণের মুখ থেকে আপনারা অনেক কথা এতাবৎকাল শুনলেন। সকলের শেষে আমাকে রেখে দেওয়া হয়েছে, যাতে আমি অধিক ভাল কিছু বলতে পারি। কিন্তু বলার কিছু নাই, সব বলা হয়ে গেছে আমার আগে। আমার জন্য যৎসামান্য রয়েছে। তথাপি কিছু বলতে হবে আমাকে। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব নিয়ে আজ আলোচনা করার কথা। প্রথমে আপনারা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব শ্রবণ করলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কে? সেই নিয়ে আমি সর্ব্বপ্রথমে আলোচনা করতে চাচ্ছি।—

কৃষ্ণ হলেন তিনি, যিনি অনন্ত বিশ্বকে সবসময় তাঁর দিকে আকর্ষণ করতে পারেন। তাঁকেই বলা হয়েছে কৃষ্ণ। শুধু এইটুকুই নয়। অনন্ত বিশ্বকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করে অনন্ত বিশ্বের জীবাত্মাকে তিনি প্রেমানন্দের অধিকারী করতে পারেন। সেইজন্যই তাঁর নাম হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ। শাস্ত্রে এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন.—

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চানন্দস্বরূপকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

তাঁকে পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ বলছেন কেন?—তিনি Full magnetic power। অনন্ত বিশ্বকে তিনি সৃষ্টি করেছেন, অনন্ত বিশ্বকে তিনি তাঁর কাছে টেনে রেখেছেন। প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা দিয়ে তাদের লালন-পালন-পোষণ করছেন। প্রয়োজন হলে তিনি শাসনও করছেন তাদের। ঠিক এই যে তত্ত্বদর্শন, একেই বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব।

যদি বলা যায়, তিনি কি আমাদের মত মানুষ, ভুল হবে তাঁকে সাধারণ মানুষ বললে। সেইটুকু বিচার পুনরায় করতে চাই। তিনি লীলা করার জন্য এসেছেন নররূপে, কিন্তু তাঁকে সাধারণ মনুষ্য বললে ভুল হবে। তাঁর প্রাকৃত জন্ম-মৃত্যু নাই। সেইজন্য শাস্ত্র তাঁকে বলছেন 'অজ'। কৃষ্ণ স্বয়ং

নিজে কি তত্ত্ব, আমাদের গীতাশাস্ত্রে তিনি অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে সেই উপদেশ করেছেন। আমরা সেখান থেকে পাচ্ছি—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

'অজোঽপি সন্'—তিনি অজ ভগবান্। আমাদের ন্যায় তাঁর প্রাকৃত জন্ম-মৃত্যু নাই। তথাপি সেই লীলাময় ভগবান্, প্রেমময় ভগবান্ এজগতে আমাদের কাছে অতি নিকটতর হওয়ায় জন্ম জন্মলীলা প্রকাশ করছেন। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয় বলেছেন যে, জন্ম এবং আবির্ভাব—এ দুটোতে তফাৎ কি? সেকথাটা এখানে আলোচনা করবার বিষয়।—

'আবির্ভাব' তখনই বলা চলে যেখানে ভগবানের ঐশ্বর্য্যভাব প্রকাশিত; আর 'জন্মলীলা' সেখানে বলা চলে, যেখানে ভগবানের মাধুর্য্যমণ্ডিত ভাব প্রকাশিত। মাধুর্য্যমণ্ডিত রসের পূর্ণ অধিদেবতা যখন এ জগতে আসছেন, তখনই তাঁর 'জন্মলীলা' এই কথাটী বলা হয়। তফাৎ হল এইখানে। কৃষ্ণ যখন জগতে আসছেন, দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করছেন, তখন তিনি বাসুদেব কৃষ্ণ, চতুর্ভুজ কৃষ্ণ, ঐশ্বর্য্যপর কৃষ্ণ। কিন্তু সাধারণ শিশু যেমন জন্মগ্রহণ করে, তাঁর জন্মগ্রহণ তদ্রূপ নয়। বসুদেব-দেবকী তাঁকে পুত্ররূপে চেয়েছেন, ভগবান্ পুত্ররূপে এসেছেন। কিন্তু শিশুর যেমন জন্ম হয় মাতৃকুক্ষি থেকে, সেভাবে অজ ভগবান্—বাসুদেব কৃষ্ণের জন্ম হয় নাই। বসুদেব দেবকীর সামনে বসেছেন, তাঁরই সামনে অজের জন্মলীলা রহস্য। চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করে রাত্র দ্বিপ্রহরে তিনি আবির্ভূত হচ্ছেন কংসের কারাগার আলোকিত করে। এখানে আবির্ভাব বলছেন কেন?—ঐশ্বর্য্যপর ভাব রয়েছে বলে। সেই ভগবান্ নীত হলেন গোকুলে নন্দ-যশোমতীর গৃহে। সেখানেও ভগবান্ আবির্ভূত হয়েছেন। আপনাদের যাদের শুধু ভাগবত আলোচনা আছে, তাঁরা জেনেছেন যে, কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন কংসের কারাগারে বসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে।

সমস্ত শাস্ত্রের সকল বর্ণনা যদি সুন্দরভাবে আলোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে, কৃষ্ণ দুই জায়গায় জন্মগ্রহণ করেছেন। একবার কংসের কারাগারে বসুদেব-দেবকীর সামনে, আবার কৃষ্ণ পূর্ণস্বরূপে আবির্ভূত হয়েছেন নন্দালয়ে মা যশোদার গর্ভে। সে বর্ণনা হরিবংশাদি শাস্ত্রে রয়েছে। তাই দেখা যায়, বসুদেব বাসুদেব-কৃষ্ণকে নিয়ে যখন গোকুলে গেলেন, সেখানে যা-যশোদা দুটী সন্তান প্রসব করেছেন। যশোদাদেবী বুঝতে পারেন নাই, দুটী সন্তান কি একটী সন্তান। বসুদেব যখন বাসুদেব-কৃষ্ণকে সেই পুত্রের কাছে রেখেছেন,

তখন নন্দনন্দন-কৃষ্ণে-বাসুদেব-কৃষ্ণ একীভূত, মিলিত হয়ে যান। তাহলে তিনটী শিশুর বদলে সেখানে হচ্ছে দুটী। বাসুদেবকে রেখে বসুদেব কন্যাটীকে নিয়ে চলে এলেন। কন্যাটী হলেন যোগমায়া। একই সময়ে অষ্টমী-তিথি থাকতে থাকতে কংসের কারাগারে ভগবান্ বাসুদেব-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন, আবার সেই অষ্টমী-তিথির মধ্যেই গোকুলে নন্দালয়ে মা যশোমতীও কৃষ্ণকে প্রসব করেছেন। এই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে না পেলেও আমরা মহাভারতের পরিশিষ্ট 'হরিবংশের' মধ্যে পাই। সেখানে ৮ মাসে অসম্পূর্ণকালে দুজনে সন্তান প্রসব করলেন বর্ণিত হয়েছে,—

গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ।
দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা॥

অসম্পূর্ণ কাল, অষ্টম মাস, তখনই দেবকী ও যশোদাদেবী সন্তান প্রসব করছেন। একই সময়ে অষ্টমী-তিথির মধ্যে যুগপৎ ভগবান্ দুই স্থানে প্রসূত হয়েছেন, আবির্ভূত হয়েছেন। আর নবমী-তিথি যখন পড়ে যায়, তখনই যোগমায়া দেবীকে প্রসব করেন মা-যশোদা—এইটা বর্ণনার মধ্যে রয়েছে। সুতরাং আবির্ভাব এবং জন্মেতে কোথায় পার্থক্য, সেটা দেখা যাচ্ছে। যেখানে ঐশ্বর্য্যপর বিচার রয়েছে, সেখানে আবির্ভাবের কথা বলা হল—বসুদেব-দেবকীর কাছে আবির্ভাব। মাধুর্য্যমণ্ডিত-বিগ্রহ, বাৎসল্য রসের পূর্ণঅধিদেবতা ভগবান্ যখন নন্দালয়ে মা-যশোমতীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেখানে জন্মলীলা। স্বাভাবিক ব্যাপার। স্বাভাবিক মানে এখানে কোনরকম ধরণের ঐশ্বর্য্যপর ব্যাপার নাই। পূর্ণমাধুর্য্যমণ্ডিত-রসবিগ্রহরূপে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। এইজন্য জন্ম-শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা অনন্যসাধারণকে সাধারণ ভেবে যেন ভুল না করি, যেহেতু জন্ম-শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে অষ্টমী-শব্দের পূর্ব্বে। জন্মাষ্টমী বললে আমরা যেন কোন প্রাকৃত বিচার করে না ফেলি। সে সম্বন্ধে ভগবান্ কৃষ্ণ নিজেই সাবধান করছেন আমাদিগকে। মানুষের মত চেহারা নিয়ে এসেছেন তিনি, এইজন্য ভগবানের কোন দোষ হয় নাই। শাস্ত্রকারগণ কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার করতে গিয়ে বলছেন,—"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ।" ভগবানের আদি যে রূপ সেটাই হল নরাকার। সেইজন্য তাঁকে বলা হচ্ছে 'নরাকার পরব্রহ্ম'।

এ সম্বন্ধে বেদে, উপনিষদে সর্ব্বত্র প্রায় একই ধরণের কথা বলা হয়েছে,—'জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপম্ অতুলম্ শ্যামসুন্দরম্,' 'দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরম্,' 'পরংব্রহ্ম

নরাকৃতিঃ,' 'গূঢ়ং তৎ মনুষ্যলিঙ্গম্।' তিনি যে সাধারণ মানুষ নন, নরাকার হলেও তিনি যে অপ্রাকৃত বপু প্রকট করেছেন এ জগতে, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ প্রকট করেছেন এ জগতে—সেই কথাই বলতে যাচ্ছেন এর মধ্যে। সেই বিচারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, ভগবান্ অপ্রাকৃত রূপবিশিষ্ট। যদি বলা যায়—ভগবান্ মানুষ হয়ে এসেছেন আমাদের মত, সুতরাং ভগবান্=মানুষ, আবার ফের উল্টিয়ে যদি বলা যায় মানুষ=ভগবান্, তাহলে বিচারে ভুল হবে। সেই বিচারটীও শাস্ত্রে যুক্তি দিয়ে বুঝান হয়েছে। আমাদের সনাতন আর্য্যঋষিগণ যে বিচার দেখিয়েছেন, সেখানে বলছেন,—ভগবান্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিজের মত আকার দিয়ে। Original আকারটা হল ভগবানের। ঠিক একই কথা Christianityর মধ্যে দেখা যায়। বাইবেলের মধ্যে ঐ একই কথা এসেছে—"God created man after His own Image". ঠিক একই কথা কোরাণ-শরীফের মধ্যে পাওয়া যায়,—"ইন্নাল্লাহা খালাকাহা মিনসুরাতিহী"—খোদা তাঁর আকারের মত করে মানুষ সৃষ্টি করলেন। এটা Common factor, এগুলোকে বলে Axiomatic Truth, Universal Truth—নিত্যসত্য, বাস্তব সত্য। এগুলো কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না। সেইকথাই জানান হয়েছে।

সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয় যা ব্যাখ্যা করেছেন শাস্ত্রে তাই আছে। সদা+তন্=সনাতন, নিত্যবর্ত্তমানকালে যেটা অবস্থিত, পূর্ব্বে যাহা ছিল, বর্ত্তমানেও তাই আছে, ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। একই অবস্থা, তার কোনরকম হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, পরিবর্ত্তন নাই, পরিবর্দ্ধন নাই। সেই বস্তুকে বলা হয়েছে সনাতন। সনাতন ধর্ম্ম কাকে লক্ষ্য করে হয়েছে, সেই নিয়ে আর্য্যঋষিগণ ব্যাখ্যা করেছেন। ধর্ম্ম-শব্দটা ব্যবহার করা হল। ধর্ম্ম মানে স্বভাব। এই স্বভাব বলতে গিয়ে তিন রকম ধরণের জিনিসকে বিচার করা হল। নিত্যধর্ম্ম, নৈমিত্তিক ধর্ম্ম কাকে বলা হচ্ছে?

দেহের ধর্ম্ম, মনের ধর্ম্ম জড়, তাৎকালিক, ক্ষয়িষ্ণু, ধ্বংসশীল। কিন্তু 'আত্ম'-শব্দটা এসেছে, আত্মার উপর যখন ধর্ম্ম-শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, তখনই সেটা নিত্য, শাশ্বত, সনাতন। এই সনাতন ধর্ম্মের অন্য নাম আত্মধর্ম্ম, ভাগবত-ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম অনন্ত বিশ্বে অনন্ত জীবাত্মার ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের কথা আমাদের বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারতাদিতে বিবৃত হয়েছে। এই ধর্ম্ম বিশ্বের সকলেই গ্রহণ করতে পারেন, সকলেই গ্রহণ করবেন। এটা কোন Creedal Religion নয়, এটা কোন Cultural

Religion নয়। Irrespective of caste and creed—এই ধর্ম্ম সকলেরই জন্য। অনন্ত বিশ্বের অনন্ত জীবাত্মার যে ধর্ম্ম, তাকেই আমাদের সনাতন আর্য্যঋষিগণ ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং এই ধর্ম্ম ত' সবাইয়ের।

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয় বলেছেন যে, হিন্দুধর্ম্ম বলে কোন কিছু আছে কিনা? 'হিন্দু ধর্ম্ম' বললে ওটার মধ্যে একটা তাৎকালিক ভাব এসে যায়, For the time being সৃষ্টি হয়েছে। 'হিন্দু'-শব্দটা কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে, তা নিশ্চয় আপনাদের জানা আছে। আমাদের সনাতন আর্য্যঋষিগণ যখন সিন্ধু নদীর তীরে এসে বাস করছিলেন, সেই সময় অনার্য্যগণ তাদিগকে ঠাট্টার পরিভাষায় 'হেঁদো হেঁদো' শব্দ ব্যবহার করেছে। তার থেকে হিন্দু শব্দটী এসেছে। সুতরাং এটা ত' আমাদের সদ্‌গুণ নয়। আর্য্যঋষিগণের গুণাবলী প্রকাশ করতে গেলে হিন্দু শব্দটা তাঁদের কোন সদ্‌গুণ নয়। ওটা একটা ঠাট্টার পরিভাষা। যদি আমরা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী তা ব্যাখ্যা করতে হয়, তাহলে 'সনাতন'-শব্দ আনতে হবে। কেন বলছি? এর পিছনে একটা যুক্তি আছে। বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত যেখানে খুঁজবেন, কোন জায়গায় 'হিন্দু' শব্দটা নাই। কেন?—হিন্দু-শব্দের উৎপত্তির অনেক আগে থেকে এগুলো আছে।

বেদ অপৌরুষেয়, বেদ ভগবানের নিঃশ্বসিত বাণী, বেদানুগ গীতা-ভাগবত শাস্ত্র ভগবানের শ্রীমুখের সাক্ষাৎ-বাণী। তাহলে হিন্দু-শব্দের উৎপত্তির বহু আগে থেকে রয়েছে আমাদের আর্য্যঋষিগণের সনাতন শাস্ত্র। তার ভিতরে হিন্দু-শব্দ পাওয়া যায় না। তাহলে কোন্ শব্দ পাওয়া যায়?—সনাতন-শব্দ পাওয়া যায়। সমস্ত শাস্ত্রে এই সনাতন শব্দটী দেখা যায়। সেই সনাতন ধর্ম্মের কথা আর্য্যঋষিগণ আমাদের জানিয়েছেন। তার ভিতরে কোনরকম প্রাদেশিকতা নাই, তার ভিতরে কোনরকম ভাষাগত বৈষম্য বা ভাষাবিদ্বেষ নাই, তার ভিতরে বিভেদ সৃষ্টির কোন কথা নাই। আছে সেখানে মিলন।

আজ রাজনীতিতে তিনটী শব্দ ব্যবহার হচ্ছে—Equality—সাম্য, Liberty—স্বাধীনতা ও Fraternity—মৈত্রী। কিন্তু এই তিনটী শব্দ রাজনীতি ধার করেছে কোথা থেকে?—ধর্ম্মনীতি থেকে ধার করা হয়েছে এই শব্দ তিনটী। আর্য্যঋষিগণের শাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে এই তিনটী শব্দ। তাঁরাই এর সমাধান দিয়েছেন কি করে বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী। Equal Distribution কি করে হতে পারে, Co-existance কি করে হতে পারে, সেটা আর্য্যঋষিগণের ইতিহাসে সমাধান করা আছে। রাজনীতির

ভিতরে এটা কখনই সম্ভব হয় না। কেননা, যেহেতু রাজনীতি হল কুটনীতি। ধর্ম্মনীতি সরলনীতি। সরলনীতি কাকে বলে?—আন্তরবৃত্তি, হৃদয়ের সহজ, সরল বৃত্তি। তাকেই বলা হয়েছে সনাতন ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম, ভগবানকে ভালবাসা।

জীবাত্মা কে?—ভগবানের অংশ। ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশকে বলে জীবাত্মা। জীবাত্মার স্বরূপ কি?—ভগবানের সঙ্গে মিলন, ভগবানের সেবা। জীবাত্মা যে পরমাত্মা ভগবানকে ভালবাসবে, সেটাই হল সনাতন ধর্ম্ম। তাকেই সনাতন ধর্ম্ম বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভক্ত ভক্তির দ্বারা প্রেমময় ভগবানকে ভালবাসবেন—এইটাই সনাতন ধর্ম্ম। 'এষ ধর্ম্ম সনাতনঃ'। যেখানে ভগবান্ বলছেন,—আমি প্রাকৃত মানুষের মত জন্মগ্রহণ করি না, প্রাকৃত মানুষের মত আমার মৃত্যু নাই, সেইটীকে বোঝাচ্ছেন অর্জ্জুনকে দিয়ে,—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

আমি সকলের ঈশ্বর, আমার থেকে সকলের সৃষ্টি হয়েছে, নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে।

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥

তাহলে ভগবান্ যদি Cipher হন, ভগবান্ যদি সাংখ্যের পুরুষ—নিষ্ক্রিয় পুরুষ হন, তাহলে সৃষ্টি কি করে আসে এ জগতে? প্রশ্ন—ভগবানকে যদি আমরা নিরাকার, নির্ব্বিশেষ বলি, নির্গুণ বলি, তাহলে এ সৃষ্টি কোথা থেকে এল? ভগবান্ নিজমুখে বলছেন,—'মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।' সৃষ্টি কোথা থেকে হয় তাহলে? সেই যে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ তাঁর সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে, তিনি সর্ব্বশক্তিসমন্বিত তত্ত্ব, সেই কথাই বুঝাতে চাচ্ছেন। তাঁর সব ক্ষমতা আছে, সৃজনী শক্তি আছে, তাই না তাঁর সৃষ্টি। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যুগপৎ তিনি সাধন করছেন।—

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।

'দুর্গা' কাকে বললেন?—দুর্গাশক্তি—মায়াশক্তি—বহিরঙ্গা শক্তি। কিন্তু অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারাই ত' সব অপ্রাকৃত সৃষ্টি হচ্ছে।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

ভগবানের যে সেই অচিন্ত্যশক্তি, অনন্তশক্তি, তার ক্ষণিকমাত্র তাতে এই অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টি হচ্ছে। 'একাংশেন স্থিতো জগৎ' তাতেই অবস্থিত। সুতরাং সেই যে ভগবান্ তিনি নিষ্ক্রিয় পুরুষ, সাংখ্যের পুরুষ, Non-Entity—এটা বলা চলবে না। তিনি Positive something—সেই কথাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে। তাঁর সব ক্ষমতাই আছে। সর্ব্বশক্তিমান্ বলা হয়েছে ভগবানকে। তাঁর প্রাকৃত জন্ম-মৃত্যু নাই। তাঁর আসা-যাওয়া সবই তাঁর ইচ্ছাধীন। তিনি স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করে এ জগতে আসেন—কথাটী বলা হয়েছে। সেখানে কোন্ প্রকৃতি কথাটা আসবে?—ভগবানের প্রকৃতি দুরকম—অন্তরঙ্গা প্রকৃতি ও বহিরঙ্গা প্রকৃতি। বহিরঙ্গা প্রকৃতিকে বলে মায়া, মায়াশক্তি। আর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারাই সব কিছু অন্তর্জগতের ক্রিয়া (লীলা) প্রকটিত হচ্ছে। ভগবান্ যে লীলা প্রকাশ করছেন, সেটা যোগমায়া শক্তির দ্বারা প্রকাশিত। আর মহামায়া শক্তির দ্বারা সমগ্র জড়জগৎ পরিচালিত হচ্ছে। সেই ভগবান্ তিনি ত' নিরাকার নন। তাঁর আকার আছে। কি আকার?—সচ্চিদানন্দাকার। সৎ-চিৎ-আনন্দময় বস্তু সেই ভগবান্।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

অনাদি-আদিকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ ত' দ্বাপর যুগে জন্মগ্রহণ করলেন। তাহলে তাঁকে 'আদি' বলা হবে কেন? (ক্রমশঃ)

"অবৈষ্ণব-মুখোদ্‌গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্ শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যম্"

চৌষট্টী প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম প্রধান অঙ্গ—শ্রীহরিকথা শ্রবণ। শ্রবণ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত না হইলে কেহই শ্রীহরিকীর্ত্তন করিবার অধিকার লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণব ব্যতীত অন্যান্য যে-কোন ব্যক্তির মুখে হরিকথা শ্রবণ করা হউক না কেন, তাহা জীবের পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গল-জনক অর্থাৎ শ্রেয়স্কর নহে। ভক্তিভরে ভক্তগণ যেখানে ভগবানের নামকীর্ত্তন করেন, ভগবান্ সেইখানেই আবির্ভূত হন। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নামই

হরিভজন। যাহারা হরিভজনকেও ইন্দ্রিয়তর্পণের একটী আশ্রয়স্থল-বিশেষ মনে করেন, তাহারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয় রাজ্য হইতেই আনন্দ অর্থাৎ মজা লুটিবার জন্য চেষ্টাযুক্ত। কিন্তু একইসঙ্গে দুই দিক রক্ষা হয় না বলিয়া ইহাদের কোনকালে মঙ্গল হয় না। অনেকে বহু সাধন-ভজন ও সেবার অভিনয় করিয়াও ফললাভ করিতে না পারিয়া ভক্তির প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়েন। অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন না করিলে কখনও হরিভজনে উন্নতি বা ফললাভ করা যাইতে পারে না।

শুদ্ধবৈষ্ণবের মুখে হরিকথা শ্রবণ বাদ দিয়া অনেকে দূরদর্শনের (T. V.) পর্দায় রামায়ণ ও মহাভারতের দৃশ্য দর্শন করিয়া তাহা হইতে ধর্ম্মশিক্ষা গ্রহণ করিবার অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইরূপ রামায়ণ ও মহাভারত দর্শনে দর্শকের মনোরঞ্জন হয় মাত্র। ইহাতে বাস্তবিক পক্ষে আত্মার কোন কল্যাণ হয় না। কারণ রামায়ণ ও মহাভারতের রাম, কৃষ্ণ, ভীষ্ম প্রভৃতি চরিত্রের অভিনয়কারীরা কেহই বৈষ্ণব বা সদাচার পালনকারী সাধক নহেন। তাই T. V. দর্শনে দর্শকের অসৎসঙ্গ হইয়া পড়ে। T. V. প্রকৃতপক্ষে T. B. ব্যাধির ন্যায় সংক্রামক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দুগ্ধ অতি পবিত্র বস্তু, উহা সেবনে তুষ্টি, পুষ্ট ও ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। কিন্তু ঐরূপ উৎকৃষ্ট দুগ্ধ সর্পোচ্ছিষ্ট হইলে যেমন দুগ্ধের ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে বিষের ক্রিয়াই করিয়া থাকে, তদ্রূপ শুদ্ধ বৈষ্ণবের মুখে পবিত্র হরিকথামৃতপানে জীবের ভক্তিবৃত্তির উন্মেষ হয়, কিন্তু নামাপরাধী অবৈষ্ণব ব্যক্তির মুখোদ্গীর্ণ বাহ্য আকারে হরিকথার ন্যায় দেখাইলেও উহা 'নামাপরাধ' মাত্র। শ্রবণ ও দর্শনের নামে এইরূপ 'নামাপরাধ' আবাহন করা কখনই সাধকের কর্ত্তব্য নহে। উহা শ্রবণ ও দর্শন করিলে মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় জীবের অমঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। তাই অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন না করিলে সাধকের কৃষ্ণপ্রেম লাভ—সুদূরপরাহত। শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥ (চৈঃ চঃ আদি ৮।১৬)

আজকাল অষ্টপ্রহর, চব্বিশ প্রহর, আটচল্লিশ প্রহর প্রভৃতি সংকীর্ত্তন যজ্ঞের বহুল প্রচলন দেখা যায়। গায়ক চোখে গ্লিসারিণ মাখিয়া বা কৃত্রিম অশ্রুবন্যার সৃষ্টি করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের নয়নে বারিধারা আনয়ন করিয়া বিশেষ গৌরব বোধ করেন। T. B. রোগীর যুগপৎ ঔষধ ও আফিং সেবনের ন্যায় তাহারা শাস্ত্রনিষিদ্ধ বস্তু (ধূমপান, মদ্য-মাংসাদি) সেবন ও হরিনাম একই

সঙ্গে গ্রহণপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া থাকেন। ইহাতে তাহাদের ও শ্রোতৃবৃন্দের কখনও মঙ্গল হয় না। কোন শুদ্ধভক্তই ভগবানের দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাইবার জন্য ভগবানকে কৃত্রিম ভাবসহকারে ডাকেন না। ইহা ভগবানের সেবা নহে, ভগবান্‌কে ভোগ করিবার চেষ্টা মাত্র। সেবার উন্মুখতা না হইলে সেব্য-বস্তুর সেবা না হইয়া অসেব্য বস্তুর সেবা হইয়া যায়। "নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়।" নাম ও নামী অভিন্ন। সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ জ্ঞানের অভাব থাকিলে কেহই ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণপ্রেমের সন্ধান পান না।

"চক্ষুর্বিনা যথা দীপং যথা দর্পণমেব চ।
সমীপস্থং ন পশ্যন্তি তথা বিষ্ণুং বহির্ম্মুখাঃ॥ (পাদ্মোত্তর ৫০ অঃ)

ভগবদ্ভক্তিহীন ভাড়াটিয়া গায়ক, পাঠক, বক্তা, লেখক, সাহিত্যিক, কীর্ত্তনীয়া বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকামী সুবিধাবাদি-ব্যক্তিগণের হরিবিমুখ-গণের মনোরঞ্জন করিয়া নিজ নিজ সুখ-সুবিধা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা ভগবৎসেবা নহে—উহা তাহাদের ভণ্ডামি। হরিনামকে পণ্য ব্যবসায়ে পরিণত করিয়া তাহার বিনিময়ে যাহারা টাকা-পয়সা, যশোলাভ এবং অপরের বা নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করিবার চেষ্টা করে, তাহাদের "শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবার" চেষ্টা। যাহারা কৃষ্ণসেবার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণের সম্পত্তি ভোগ করিবার চেষ্টা করেন, তাহাদের চেষ্টা ভক্তির ন্যায় মনে হইলেও, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভক্তি-বিরোধী।

আত্মবঞ্চিত ও লোক-বঞ্চকেরাই খাঁটি দুগ্ধ পরিত্যাগ করিয়া চুণ-গোলা গ্রহণের ন্যায় বিদ্ধা বা ছলভক্তিকেই শুদ্ধভক্তি মনে করিয়া তাহাকেই সর্ব্বান্তঃ-করণে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহ জগতে নকল ও কৃত্রিম দ্রব্যগুলি প্রকৃত দ্রব্য অপেক্ষাও অধিকতর সুন্দর ও উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। একই ক্ষেতে শালি-ধান ও শ্যামা ঘাস জন্মে, ইহাদের উভয়ের দল (পত্র), কাণ্ড প্রভৃতি দেখিতে একই রূপ; তাই কেবল আকার দেখিয়া সাধারণ লোক ইহার পার্থক্য নিরূপণ করিতে পারে না, শস্যের দ্বারা উভয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জনগণ প্রকৃত সাধুকে পরিত্যাগ করিয়া ভণ্ডকেই ভক্ত ও সাধু বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণনামযজ্ঞ সর্ব্বযজ্ঞের সার। তাই শাস্ত্রে উল্লেখিত আছে,—

সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য॥

সেই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব-যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৩।৭৭-৭৮)

পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দরের বিহিত কীর্ত্তনদ্বারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে সুষ্ঠুভাবে কৃষ্ণসেবন-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। মেধাবিশিষ্ট জনগণই 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয়ের সংকীর্ত্তনমূলক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এতৎপ্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের উক্তি,—"এমন যে গৌরসুন্দর, তাঁহাকে ভক্তগণ কি কি উপায়ে আরাধনা করেন? তদুত্তরে বলিতেছেন,—তাঁহাকে 'যজ্ঞ' অর্থাৎ পূজা-সম্ভার দ্বারাই আরাধনা করেন; যেহেতু 'ন যত্র যজ্ঞেশমখাঃ'' ইত্যাদি (ভাঃ ৫।১৯।২৩) দেবগণের গীতবাক্যই তাহার প্রমাণ। তাহাতে "সংকীর্ত্তন-প্রায়ৈঃ" এই বিশেষণদ্বারা সেই যজ্ঞকেই অভিধেয়রূপে ব্যক্ত করিতেছেন, তন্মধ্যে 'সংকীর্ত্তন' অর্থাৎ একত্র সম্মিলিত হইয়া বহুলোকের যে শ্রীকৃষ্ণনাম গান, সেই সংকীর্ত্তন প্রায়শঃ অর্থাৎ প্রধানভাবে বর্ত্তমান যাহাতে, এবম্বিধ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনবহুল যজ্ঞাদিদ্বারা এবং তদীয় আশ্রিতগণের মধ্যেই সংকীর্ত্তনের প্রাধান্য দৃষ্ট হয় বলিয়া, সেই সংকীর্ত্তন-যজ্ঞই যে এইস্থলে অভিধেয়, ইহা স্পষ্ট-ভাবেই সিদ্ধান্তিত হইল।"

কেবলমাত্র বৈষ্ণবগণই শ্রীহরির সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের অধিকারী। বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোকটি স্মরণ করিয়া বৈষ্ণবগণের মুখে নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ করিলেই জীবের প্রকৃত কল্যাণ হয়—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা, ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ, সুরেশলোকোঽপি ন বৈ সঃ সেব্যতাম্ ॥

(ভাঃ ৫।১৯।২৩)

"যে-স্থানে ভগবৎকথারূপ সুধাসরিৎ প্রবাহিত নাই, যে-স্থানে সেই বৈষ্ণবী-নদীতটাশ্রিত ভক্ত-ভাগবতগণের অধিষ্ঠান নাই, যে-স্থানে নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি মহোৎসব-সহকারে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির সংকীর্ত্তনযজ্ঞে আরাধনা নাই, ব্রহ্মলোক হইলেও সুমেধাগণ সেই স্থান কখনও আশ্রয় করিবেন না।"

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

———

শ্রীচৈতন্যে মর্ত্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২০০ পৃষ্ঠার পর]

এক্ষণে গীতার ঐ শ্লোকটি হইতেছে,—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" (গীতা ৪।৮)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—অন্যের অসাধ্য তিনটী কারণ, যথা—সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতিবিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন, তথা আমার ঐকান্তিক অর্চ্চন-ধ্যানাদি লক্ষণযুক্ত শুদ্ধভক্তি যোগরূপ পরমধর্ম্ম স্থাপনের নিমিত্ত আমি স্বয়ং যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

যুগে যুগে এই উক্তির দ্বারা কলিকালেও ভগবানের অবতার স্বীকৃত হইতেছে। তাই এখানে 'ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ'র উদ্দেশ্যে অবিসম্বাদী চৈতন্যের আবির্ভাব বলিতে লেখক শ্রীচৈতন্যদেবকে ঈশ্বররূপে অবতীর্ণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছেন।

আবার 'নিবেদনের' শেষাংশে লেখক লিখিয়াছেন,—"পরিশেষে সেই মহান মানুষটির কথায় আবারো ফিরে আসি। আমি যখন ছিলাম না, তখন তিনি ছিলেন। আমি যখন এলাম তখনো তিনি ছিলেন। আমি যখন থাকবো না তখনো তার উজ্জ্বল উপস্থিতি ভক্ত কবির ছন্দে ছন্দে ছড়িয়ে পড়বে শাপলা-শালুক ধান সিঁড়ি আর শঙ্খচিল ওড়া বাঙলার আকাশে বাতাসে।

'অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

এস্থলে 'মহান্ মানুষ' বলিতে শ্রীচৈতন্যদেবই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন; আবার 'অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়' বলিতে শ্রীচৈতন্যলীলার নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, শ্রীবেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রেও লিখিয়াছেন,—"লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্।" লীলা—কৈবল্য স্বরূপ অর্থাৎ নিত্য। শ্রীচৈতন্যদেব নিত্য ও সত্য। তাই তাঁহার লীলা লৌকিকের ন্যায় দেখা গেলেও তাহা নিত্য। মানুষ অণুচৈতন্য জীব, সে সর্ব্বজ্ঞ ও পরমেশ্বর নহে। মানুষ মহান্ হইলেও সে ভগবদ্দাস মাত্র। ভগবান্ যাহা জানেন, মহান্ মানুষের পক্ষেও

তাহা সম্পূর্ণ জানা অসম্ভব। মানুষের ভুল হয়, কিন্তু অবতার-পুরুষ বা ঈশ্বরের ভুল হয় না। ঈশ্বর-বাক্য—দোষচতুষ্টয়-রহিত।

"ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥ (চৈঃ চঃ আদি ৭।১০৭)

সৃষ্টির পূর্ব্বে ও পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অধিষ্ঠানের প্রমাণস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-বাণী,—

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥" (ভাঃ ২।৯।৩২)

"শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমি ছিলাম। সৎ, অসৎ এবং অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অন্য কিছুই আমা হইতে পৃথগ্‌রূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এ সমুদয় স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব।"

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥" (গীতা ১০।৮)

"আমি সকলের উৎপত্তির হেতু, আমা হইতেই সকলের সকল চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হয়, ইহা অবগত হইয়া পণ্ডিতগণ ভক্তিসহকারে আমাকে ভজন করিয়া থাকেন, আর যাহারা করেন না, তাহারা অপণ্ডিত।" সুতরাং এই পৃথিবীতে ভগবান্ সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন, এখন আছেন এবং পরেও থাকিবেন। শ্রীচৈতন্যদেবই স্বয়ং অবতারী শ্রীকৃষ্ণ,—

"সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥"
(চৈঃ চঃ আদি ২।১০৯)

চৈতন্যলীলার নিত্যতা কেন? অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে নিত্যই একটী না একটী লীলা বর্ত্তমান, এজন্য লীলার 'নিত্যতা',—

"কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।
তাতে লীলা 'নিত্য' কহে আগম-পুরাণ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩৯৫)

সার্ব্বকালিকী শ্রীচৈতন্যলীলা নিত্য বলিয়া লীলার প্রপঞ্চে অবতরণ এবং প্রপঞ্চ হইতে অভিযান-দর্শনে তাঁহাকে 'কালক্ষোভ্য' বিচার করা উচিত নহে। জড়ভোগমত্ত কর্ম্মী ও প্রাকৃত-সহজিয়াগণ চৈতন্যলীলা-দর্শনে বঞ্চিত হয়,

পরন্তু ভগবৎকৃপালব্ধ শুদ্ধভক্তগণ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণকীর্ত্তন-লীলা সর্ব্বদাই দর্শন করেন।—

"এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব, তিরোভাব—এই কহে বেদ॥
অদ্যাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যখনে যাহারে করে দৃষ্টি-অধিকারে॥
সেই দেখে,—আর দেখিবারে শক্তি নাই।
নিরন্তর ক্রীড়া করে চৈতন্য-গোসাঞি॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ ২৮৩-২৮৫)

শ্রীচৈতন্যদেবের পরমবৈচিত্র্য চমৎকারময় অচিন্ত্যভাব তর্কাতীত—

"অচিন্ত্য, অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য বিহার।" (চৈঃ চঃ আদি ১৭।৩০৬)

প্রকৃতির অতীত বা মায়াতীত যে তত্ত্ব, তাহাই অচিন্ত্য লক্ষণ।—

"এইমত গীতাতেহ পুনঃ পুনঃ কয়।
সর্ব্বদা ঈশ্বর-তত্ত্ব অচিন্ত্য শক্তি হয়॥" (চৈঃ চঃ আদি ৫।৮৮)

শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই প্রকাশিত। তাই শ্রীচৈতন্যদেব 'মহান্ মানুষ' মাত্র নহেন, তিনি অচিন্ত্যশক্তিমান্ ভগবান্। লেখক 'নিবেদনে' ধর্মসংস্থাপনার্থং উদ্দেশ্যে —গীতার বাণী স্মরণ করিয়া চৈতন্যদেবকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতেছেন এবং তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে লীলার নিত্যতাও স্বীকার করিতেছেন। তথাপি আবার শ্রীচৈতন্যদেবকে মহান্ মানুষ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। মহান্ মানুষ ত' ঈশ্বরাধীন জীব মাত্র। যদি বলা যায় মনুষ্যত্বের চরম বিকাশই মহান্ মানুষের পরিচয়, তথাপি সেই মানবত্ব পূর্ণ পরমেশ্বরের সর্ব্বোচ্চ পারমার্থিক প্রকাশ নহে। তাই ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি সেই মানবত্বের মধ্যেও থাকিতে পারে না বা সেই মহান্ মানুষ ভগবানের সমানও হইতে পারেন না। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবকে মহান্ মানুষের পর্য্যায়ভুক্ত করা অন্যায় ও অযৌক্তিক। যিনি ঈশ্বর, তিনি আবার ঈশ্বরাধীন জীবরূপে কথিত হইতে পারেন কি? তবে শ্রীচৈতন্যলীলার ঘটনাবলীতে ভগবানের ভগবত্তা তাঁহার সচ্চিদানন্দ মানুষীতনুতে সুন্দররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, বলা যাইতে পারে।

(২) লেখক তাঁহার পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"একজোড়া প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারীর যৌন সাহচর্যের (Sexual Companionate) ফলস্বরূপ কোন জাতক বা জাতিকার জন্ম হয়ে থাকে।" "কোন মানুষের ঘরে মানুষের

সন্তান-সন্ততিরূপে মানুষই জন্মগ্রহণ করে থাকে। এর থেকে মহান্ বা মহত্তর পরিচয় আর কিই বা থাকতে পারে। ধন নয়, মান নয়, একজন মানুষের শেষ বা শ্রেষ্ঠতর পরিচয় হওয়া উচিত সে মানুষ। ক্ষেত্রবিশেষে মানুষ ঈশ্বরের চেয়েও বড়ো। কেননা ঈশ্বর মানুষেরই সৃষ্টি। ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষ নয়।"

"উপরোক্ত কথাগুলি বলার প্রয়োজন ছিল এজন্য যে, মানবপুত্র মানব চৈতন্যকে আমরা ঈশ্বর বলে ঘোষণা করেছি। আর এ' অতি কাল্পনিক অপবাদ তাঁর মাথায় বর্তেছে জন্ম লগ্ন থেকেই।"

লেখক 'ঈশ্বর' ও 'মানুষ'—শব্দের অর্থ না বুঝার জন্যই ঐরূপ অবান্তর কথা লিখিয়াছেন। ঈশ্বর কে? ইহার উত্তরে শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়—"কর্ত্তুমকর্ত্তুম্ অন্যথা কর্ত্তুং যঃ সমর্থঃ স ঈশ্বরঃ"—অর্থাৎ খেয়াল-খুশীমত যাহা ইচ্ছা করিতে যিনি সমর্থ, তিনিই ঈশ্বর। আর 'মানব' বলিতে মনু-শব্দের উত্তর 'ষ্ণ' প্রত্যয় করিয়া 'মানব' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; অর্থাৎ যাহারা মনুর অনুগত তাহারাই মানব। 'মনোরপত্যং পুমান্'—মনুরই সন্তান মানব জাতি। মহাভাগবত মনুই ঈশাবাস্য বা আত্মাবাস্য শ্রুতি কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার বংশধরগণের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। মনু ঈশ্বরের অনুগত। যাঁহারা মনুর অনুগত তাঁহারা ঈশ্বরের ও অনুগত হইবে, ইহাই সিদ্ধান্ত। মানুষদের উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥" (ভাঃ ১১।৯।২৯)

"বহু জন্মান্তরের পর আমাদের এই সুদুর্ল্লভ মনুষ্য শরীর লাভ হইয়াছে। ইহা অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ, পরম শান্তিপ্রদ। ইন্দ্রিয়-তর্পণাদি সুখের বিষয়সকল প্রতি-জন্মেই লাভ হয়; কিন্তু ভগবদ্ভজন মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোনও জন্মে সম্ভবপর নহে। অতএব মৃত্যু পর্য্যন্ত ধীর ব্যক্তি শীঘ্রই পরম শান্তিময় পুরুষ ভগবানের ভজন কর।"

জীব ও ঈশ্বরে ভেদ বর্ণনা করিয়া চৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

"জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু নহে সম।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের 'কণ'॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১১৩)

জীবের স্বরূপ বিচারে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বাণী,—

"জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস।" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১০৮)

সুতরাং ঈশ্বরের সংজ্ঞা কি মানুষে প্রযোজ্য হইতে পারে? মানুষের শক্তি ও যোগ্যতা কতটুকু? ঈশ্বর মায়াধীশ, আর মানুষ মায়াবশ। জীব তথা মানুষ মুক্ত ও বদ্ধ সর্ব্বাবস্থাতেই মায়াধীশ পরমেশ্বরের নিত্যবশ্য। ঈশ্বর কর্ম্মফল-প্রদাতা, আর মানুষ কর্ম্মফলভোক্তা। কোন ক্ষেত্রেই মায়াবশ্য মানুষ কি মায়াধীশ ঈশ্বরের চেয়েও বড় হইতে পারে?

আর মানুষ ঈশ্বরকে সৃষ্টি করে নাই, বরং ঈশ্বরই মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥" (গীতা ৯।৮)

"স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রাচীন কর্ম্মনিমিত্ত প্রকৃতির বশ হেতু কর্ম্মপরতন্ত্র এই সমগ্র ভূতসমূহকে আমি পুনঃ পুনঃ সৃজন করি" শ্রীমদ্ভাগবতে অবধূত সংবাদে (১১।৯।২৮ শ্লোকে) বর্ণিত হইয়াছে,—

"সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপ-পশূন্ খগ-দন্দশূকান্।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়
ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদামাপ দেবঃ॥"

"ঈশ্বর নিজশক্তিভূতা মায়াদ্বারা বৃক্ষ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী এবং হিংস্র প্রাণীরূপ বিবিধ শরীরের সৃষ্টি করিয়া তৎসমুদয়ে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া পরিশেষে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের উপযোগী জ্ঞানযুক্ত এই মনুষ্য-শরীর সৃষ্টি করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।"

খৃষ্টানদের Bibel-এ আছে—"God created man after His own Image" অর্থাৎ ঈশ্বর তাঁহার নিজ আকারের মানুষ সৃষ্টি করিলেন। লেখক 'নিবেদনে' স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ অবিসম্বাদী চৈতন্যের আবির্ভাব। যে চৈতন্যদেব ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনি কি মানব হইতে পারেন? ধর্ম্মসংস্থাপন-কার্য্য কি মানবের দ্বারা সম্ভব? গীতার যে শ্লোকটি হইতে লেখক "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ" শব্দটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকটি এস্থলে আলোচনা করিতেছি;—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥" (গীতা ৪।৭)

"হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন তখন আমি আমাকে প্রকট করি।" অতএব কালদোষে বেদবিরুদ্ধ অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে সেই দোষ নিবারণ করিতে ভগবান্ ব্যতীত আর কেহ সমর্থ হন না; তাই ইচ্ছাময় ভগবান্ জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। ঐ শ্লোকে 'ধর্ম্মস্য' একবচন পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনই ভগবান্ লোকসমক্ষে প্রকটিত হন। সেই ধর্ম্মটি কি? সেই ধর্ম্ম ভাগবত ধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম। 'ধর্ম্ম' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধৃ+মন্=ধর্ম্ম, অর্থাৎ যাহা ধরিয়া থাকে। এক্ষণে ধর্ম্ম বলিতে স্বভাব বুঝাইতেছে। বস্তুর ধর্ম্মের দ্বারাই বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। জীবের ধর্ম্ম বা স্বভাব বিচারের দ্বারাই জীব বস্তুটিকে জানা যায়। জীবাত্মার স্বভাবই ভগবানের সেবা করা। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,—প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক বস্তুকে আকর্ষণ করিতেছে। সম্বন্ধ বস্তুসকলকে আকর্ষণ করে। যেখানে সম্বন্ধ নাই, সেখানে আকর্ষন নাই।

যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত (জৈবজগৎ) জাত হইয়াছে, যাঁহাকর্ত্তৃক জাত হইয়া সমস্ত জীবিত আছে এবং যাঁহাতে গমন ও প্রবেশ করে তাঁহার সহিত প্রত্যেক বস্তুর সম্বন্ধ রহিয়াছে, তিনিই সর্ব্বকারণকারণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জীবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্মই আত্মধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ আকর্ষক, জীবাত্মা আকৃষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ ও জীবাত্মার মধ্যে যে আকর্ষণ ব্যাপার রহিয়াছে তাহাই ভক্তি। শ্রীমদ্ভাগবত (১।১৯।২৭) বলেন,—"ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ" -তাই শ্রীকৃষ্ণদাস্যই জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম। জীবের ন্যায় ভগবানের দেহ-দেহী ভেদ নাই এবং কর্ম্মফলজনিত দেহসংযোগরূপ জন্ম হয় না। কূর্ম্মপুরাণ বলেন,—"দেহদেহিবিভাগশ্চ নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।" তাঁহার নিত্যসিদ্ধ স্বরূপাভিন্ন দেহকে তিনি প্রাকৃত ধাতু-সম্বন্ধ বা শুক্র-শোণিত সম্বন্ধ ব্যতীতই স্বেচ্ছায় এই জগতে প্রকট করেন। ভগবানের দেহ মনুষ্যদেহের ন্যায় পাঞ্চভৌতিক নহে। তাই ভগবানের পৈত্রিক ধাতু সম্বন্ধীয় জন্মাদি না হইয়া আবির্ভাবাত্মক জন্ম হইয়া থাকে। লেখক 'নিবেদনে' গীতার বাণী মান্য করায় গীতা হইতেই ভগবানের জন্ম-কর্ম্মের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ উল্লেখ করিতেছি;—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥" (গীতা ৪।৬)

"ভগবান্ বলিতেছেন,—আমি জন্মরহিত, অব্যয়াত্মা, সর্ব্বভূতগণের ঈশ্বর

হইয়াও স্বীয় শুদ্ধা সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে স্বীকারপূর্ব্বক আত্মমায়ার আশ্রয়ে আবির্ভূত হই।"

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥" (গীতা ৪।৯)

"হে অর্জ্জুন! যিনি আমার এইরূপ অলৌকিক জন্ম এবং কর্ম্ম তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি দেহত্যাগ অন্তে আর পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন না। অধিকন্তু আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন।"

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥" (গীতা ৯।১১)

"সর্ব্বভূতের মহেশ্বর আমার পরমতত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া মূর্খগণ আমাকে মনুষ্য-শরীরধারী বলিয়া অবজ্ঞা করে অর্থাৎ প্রাকৃত মনে করে।"

শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নরলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাই বলিয়া তাঁহার সচ্চিদানন্দময় বপুতে প্রাকৃত বুদ্ধি করা বা জড়ীয় শৌক্র বিচার আরোপ করা অপরাধ। শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীবাসী জনৈক বিপ্রকে বলিয়াছিলেন,—

'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণস্বরূপ'—দুই ত' সমান॥
'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাহি,—তিন 'চিদানন্দরূপ'॥
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।
জীবের ধর্ম্ম নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ'॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩০-১৩২)

এমতাবস্থায় ভগবানের নিত্যশরীর যে মানবের ন্যায় নহে তাহা প্রমাণিত হইল। অতএব 'ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ'র উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইয়া থাকিলে তাঁহাকে কখনই মানব জ্ঞান করা যায় না। অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ভগবানের এই নরলীলার তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে পারে না।

লেখকের উক্ত পুস্তকের ৩০ পৃষ্ঠার বক্তব্যে বুঝা যায়, লেখক সাধারণ মানবের ন্যায় চৈতন্যদেবের জন্ম হইয়াছে, এইরূপ ভাবিয়া তাঁহার লীলার সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লেখকের কথানুসারে যদি চৈতন্যদেবকে মানুষ হিসাবেই ধরা হয়, তথাপি তাঁহার সম্বন্ধে জানিতে হইলে তাঁহার সঙ্গী-পার্ষদের নিকট হইতেই জানিতে হইবে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে,—A man is known by the company he keeps অর্থাৎ একটী মানুষকে জানিতে হইলে তাঁহার সঙ্গীদের দ্বারাই জানা যাইবে। যিনি যেমন ব্যক্তি,

তিনি সেইরূপ ব্যক্তির সঙ্গ করিয়া থাকেন। সঙ্গীদের দেখিয়া ও সঙ্গীদের নিকট শুনিয়া ব্যক্তিটির চরিত্র ও ব্যবহার ধারণা করা যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গী কাঁহারা? শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামী প্রমুখ ভাগবতগণ তাঁহার সঙ্গী-পার্ষদ। তাঁহাদের লেখনীতেই চৈতন্যলীলার সঠিক তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশিত। অতএব রূপানুগজনের নিকটই শ্রীচৈতন্যদেবের সম্পর্কে সঠিক বিবরণ জানা যাইবে। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মলীলা সম্পর্কে শ্রীরূপানুগাচার্য্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—"শ্রীশচী-জগন্নাথের নিত্যসিদ্ধত্ব-হেতু তাঁহাদের হৃদয় ও দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়—কখনই সাধারণ প্রাকৃত জীবের ন্যায় নহে। বিশুদ্ধসত্ত্বের নাম 'বসুদেব', বসুদেবেই চিদ্‌বিলাসী বাসুদেব প্রকটিত। জড়েন্দ্রিয়-তর্পণময় প্রাকৃত-রক্ত-মাংসময়-দেহ স্ত্রী-পুরুষের কামক্রীড়া ও গর্ভের ন্যায় শ্রীজগন্নাথ ও শচীদেবীর মিলন এবং শ্রীশচীদেবীর গর্ভ সঞ্চার হয় নাই। সুতরাং মনে মনে এরূপ চিন্তা করাও অপরাধ। ভগবৎ-সেবোন্মুখী চিত্তে বিচার করিলে শুদ্ধসত্ত্বময়ী শ্রীশচীদেবের অপ্রাকৃত গর্ভ-মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ভাঃ ১০।২।১৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—'মন আবিবেশ মনসি আবির্ব্বভূব, জীবানামিব ন ধাতু সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ।' এ সম্বন্ধে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু লঘু ভাগবতামৃত-গ্রন্থে বলিয়াছেন,—কৃষ্ণ প্রথমে বসুদেবের হৃদয়ে প্রকট হন। তৎপরে বসুদেবের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে প্রকট হন।"

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরুবর্গের নিকট কৃপা প্রার্থনা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বসিরহাট
শ্রীগুরু-পূর্ণিমা
৮।৭।৯০

শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ স্মরণসহ সকল শিক্ষাগুরুবর্গের শ্রীচরণে শ্রীগুরু-পূর্ণিমার অনন্তকোটি দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপনে নিবেদন :—

পরম পূজনীয়—

শ্রীল বামন মহারাজ! সর্ব্বপ্রথমে আজ শ্রীগুরু-পূর্ণিমায় আমার সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ-প্রণতি কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন।

আজিকার এই তিথিবরাতেই ত' শ্রীগুরুদেবের বিরহের সুর শিষ্যের হৃদয়ে নূতন করিয়া বিভিন্ন রাগ-রাগিণীতে বাজিতে থাকে। সেই সুরের মূর্চ্ছনায়

হৃদয় আকুলি-বিকুলি করে গুরুদেবের সান্নিধ্যের লালসায়। যিনি অপ্রকট, তিনি কিভাবে প্রকট হইয়া সান্ত্বনা দিবেন ?

আজিকার শুভদিনে আপনার প্রেরিত প্রীতি-উপহার—"শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট"-গ্রন্থখানি শ্রীপাদ শ্রীসত্যানন্দ প্রভুর হস্তে পাইয়া হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

চৈত্যগুরুরূপে শ্রীগুরুদেব জানাইয়া দিলেন—'সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ' রূপে যিনি আমারই গুরুপাদপদ্ম, তিনিই জগতে সকল সদ্‌গুরু-হৃদয়ে একই-ভাবে প্রকট হইয়া একইভাবে কৃপা করিয়া আমার ন্যায় অজ্ঞানান্ধ জীবের সকল দুঃখ দূর করেন। আমার সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মই শ্রীহরির অভিন্নবিগ্রহ-রূপে আপনার মধ্যে বিরাজিত থাকিয়া আমার ন্যায় মায়াকৃষ্ট কীটকে জানাইতে ও সান্ত্বনা দিতে আজ শ্রীগুরু-পূর্ণিমায় এই উপহার পাঠাইয়া দিলেন। ইহা কি অপূর্ব্ব কৃপা শ্রীগুরুপাদপদ্মের। আর শুধু কি উপহারের কৃপা ? প্রকট থাকাকালীন যেভাবে তিনি অনুপ্রেরণা দিয়া তাঁহার ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়াশক্তিরূপে এই অধীনাকে দিয়া লিখাইবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু যাঁহার অপ্রকটের পর আমি ভাবিয়াছিলাম,—"আমি মরিয়া গিয়াছি, আমার লেখনী স্তব্ধ হইল শ্রীগুরুদেবের শক্তির অভাবে"—সেই গুরুদেবই আপনার মাধ্যমে একইভাবে এতদিনে পুনরায় অনুপ্রেরিত করিতেছেন, লেখনী চালাইবার জন্য। শ্রীগুরুদেবের কি অপূর্ব্ব লীলা !

কিন্তু আমার শক্তি কোথায় ? আমি ত' জড়ের ন্যায়। একে চালনা করিতে হইলে সকল সদ্‌গুরুর মধ্যে যে অখিল শ্রীহরির অভিন্ন গুরুশক্তি বিরাজিত, সেই শক্তির সঞ্চালনের প্রয়োজন। তাই আজ শ্রীগুরু-পূর্ণিমায় সকল সদ্‌গুরুর হৃদয়ের সেই অভিন্ন গুরুশক্তিকে এবং সেই শক্তির প্রতিনিধিরূপে আপনি যে আমাকে জাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন,—সেই আপনাকে আমার হৃদয়ের সশ্রদ্ধ অনন্তকোটি দণ্ডবৎ-প্রণতি জানাইতেছি। আপনি কৃপা করিয়া তাহা গ্রহণ করুন এবং আমাকে শক্তি সঞ্চার করুন, তবেই আপনার আদেশ আমি গ্রহণ করিতে পারিব। ইতি—

শ্রীগুরু-কৃপাপ্রার্থিণী—

—(শ্রীমতী) মায়া সরকার

———

শ্রীকৃষ্ণ-বন্দনা

কর কৃপা অভাজনে।
বিনয় করিহে হরি ডাকি তোমায় ঘনে ঘনে॥
শ্রীকৃষ্ণ করুণাময়, তব নামে ঘুচে ভয়,
অনাদি অনন্ত তুমি বলে মুনি-ঋষিগণে।
বনমালী চক্রপাণি, করি আমি যুক্তপাণি,
অসংখ্য প্রণতি করি চাহ করুণা নয়নে॥
লক্ষ্মীকান্ত বংশীধারী, ভব-জলধি কাণ্ডারী,
দিবানিশি ভজে তোমায় বিধি-শেষ-পঞ্চাননে।
রাধানাথ জনার্দ্দন, তুমি মদনমোহন,
সর্ব্বঘটে স্থিতি তব বলে থাকে বিজ্ঞজনে॥
মধু-কৈটভ-নাশন, পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ,
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু বলে খ্যাত ত্রিভুবনে।
কুমতি করিয়া নাশ, সুমতি দাও শ্রীনিবাস,
এই আকিঞ্চন প্রভু করি কায়-প্রাণ-মনে॥
মাধব শ্রীমধুসূদন, নমো পতিতপাবন,
অন্তর্যামী চিন্তামণি বন্দি রাতুল চরণে।
রসরাজ দর্পহারী, ওহে মুকুন্দ মুরারি,
এসে চিত্ত-নবকুঞ্জে মম হৃদি বৃন্দাবনে॥

—শ্রীবলরাম কুমার,
সাহিত্যরত্ন, কবি পদ্মরাগমণি (গোল্ড মেডালিস্ট) পি. এইচ. ডি.
কাড়রু (পুরুলিয়া)

ভ্রম-সংশোধন

সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২য়	৫৭	১০	Transparament	Transparent
৩য়	৯১	১৯	(নিয়মিত)	(নিয়ন্ত্রিত)
৫ম	১৬২	৫	বসনা	রসনা
,,	১৮৬	১৯	প্রবত্ত	প্রবৃত্ত

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে সেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪২শ বর্ষ | ১২ পদ্মনাভ, সঙ্কর্ষণ, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ
৩১শে ভাদ্র, সোমবার, ১৩৯৭, ইং ১৭।৯।৯০ | ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীচতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মকৃতং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলস্তোত্রম্

[শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে শ্রীনারদ-বহুলাশ্ব-সংবাদে
শ্রীরাধিকা-বিবাহবর্ণনে ষোড়শেঽধ্যায়ে]

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

১। অনাদিমাদ্যং পুরুষোত্তমোত্তমং
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রং নিজভক্ত-বৎসলম্।
স্বয়ং ত্বসঙ্খ্যাণ্ডপতিং পরাৎপরং
রাধাপতিং ত্বাং শরণং ব্রজাম্যহম্॥ ২১॥

[শ্রীনন্দ নিজক্রোড়ে বালক শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া গোচারণ করিতে করিতে নিজাবাসের দূরদেশে যমুনাতীরস্থ ভাণ্ডীরবনে গমন করিলেন। তখন

ভগবদিচ্ছায় বন অত্যন্ত অন্ধকারময় হইল ; কৃষ্ণ নন্দের ক্রোড়ে ভয়ে ক্রন্দন করিতে থাকিলে নন্দও ভয়ার্ত্ত হইয়া পরেশ শ্রীহরির শরণ লইলেন। নন্দরাজ হঠাৎ শত শশধর কান্তি দীপ্তরাগমধ্যে বৃষভানু-নন্দিনী রাধাকে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—আমার ক্রোড়স্থ শিশু সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম, আর তুমি তাঁহার সর্ব্বদা প্রধানা প্রিয়কারিণী —আমি গর্গমুনির নিকট হইতে গুপ্তভাবে ইহা শুনিয়াছি ; অতএব আমার ক্রোড় হইতে নিজনাথকে গ্রহণ কর। তুমি আমায় রক্ষা কর, ভূতলে অনন্য-দুর্ল্লভ অভীষ্ট প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার। অনন্তর রাধা নন্দের ক্রোড় হইতে নিজপ্রিয় হরিকে গ্রহণপূর্ব্বক ভাণ্ডীরবনে প্রবেশ করিলেন। তখন সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম শ্রীহরি কৈশোর দেহ ধারণ করিলেন। তিনি পীতাম্বর কৌস্তুভরত্ন-ভূষিত বংশীধারী ও মদনমোহন মূর্ত্তি হইলেন এবং প্রিয়াকে করদ্বয়ে গ্রহণপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে সুন্দর বিবাহ-মণ্ডপমধ্যে প্রবেশ করিলেন। উত্তম সিংহাসনে দম্পতি শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত হইলে চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মা আকাশপথে পরম-পুরুষের সম্মুখে সমাগত হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রণতঃ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বক্ষ্যমাণ চারুবাক্যে স্তবমুখে বলিতে লাগিলেন,—]

শ্রীব্রহ্মা বলিলেন,—তুমি অনাদি, আদ্য, পুরুষোত্তমোত্তম, নিজভক্ত-বৎসল, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি, পরাৎপর সাক্ষাৎ রাধাপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ; তোমার চরণে শরণাপন্ন হইলাম ॥ ২১ ॥

২। গোলোকনাথস্ত্বমতীব লীলো
লীলাবতীয়ং নিজলোকলীলা।
বৈকুণ্ঠনাথোঽসি যদা ত্বমেব
লক্ষ্মীস্তদেয়ং বৃষভানুজা হি ॥ ২২ ॥

হে গোলোকনাথ! তুমি অনন্ত লীলাময় ; আর এই রাধাও স্বীয় লোকলীলায় অসীম লীলাবতী। তুমি যখন বৈকুণ্ঠপতি, তখন এই বৃষভানুসুতা রাধা তোমার লক্ষ্মী ॥ ২২ ॥

৩। ত্বং রামচন্দ্রো জনকাত্মজেয়ং
ভূমৌ হরিস্ত্বং কমলালয়েয়ম্।
যজ্ঞাবতারোঽসি যদা তদেয়ং
শ্রীদক্ষিণা স্ত্রী প্রতিপত্নিমুখ্যা ॥ ২৩ ॥

তুমি রামচন্দ্র, ইনি জনকনন্দিনী সীতা ; তুমি হরি, আর রাধা

কমলালয়া; তোমার যখন যজ্ঞরূপে অবতার হয়, তখন ইনি ত্বদীয় দক্ষিণারূপা মুখ্যপত্নী ॥ ২৩ ॥

৪। ত্বং নারসিংহোঽসি রমা হৃদীয়ং
নারায়ণস্ত্বঞ্চ নরেণ যুক্তঃ।
তদা ত্বিয়ং শান্তিরতীব সাক্ষা-
চ্ছায়েব যাতা চ তবানুরূপা ॥ ২৪ ॥

তোমার নরসিংহাবতারে ইনি তোমার হৃদ্‌গতা রমা; নরনারায়ণ অবতারে ইনি ছায়ার ন্যায় তোমার অত্যন্ত অনুগতা শান্তি ॥ ২৪ ॥

৫। ত্বং ব্রহ্ম চেয়ং প্রকৃতিস্তটস্থা
কালো যদেমাঞ্চ বিদুঃ প্রধানম্।
মহান্ যদা ত্বং জগদঙ্কুরোঽসি
রাধা তদেয়ং সগুণা চ মায়া ॥ ২৫ ॥

তুমি ব্রহ্ম, ইনি তটস্থা প্রকৃতি; তুমি কাল, ইনি প্রধান। তুমি যখন জগতের বীজস্বরূপ মহান্, তখন এই রাধা তোমার সগুণা মায়া ॥ ২৫ ॥

৬। যদান্তরাত্মা বিদিতশ্চতুর্ভি-
স্তদা ত্বিয়ং লক্ষণরূপবৃত্তিঃ।
যদা বিরাট্‌দেহধরস্ত্বমেব
তদাখিলং বা ভুবি ধারণেয়ম্ ॥ ২৬ ॥

চারিপ্রকার অন্তঃকরণদ্বারা তুমি যখন পরমাত্মা বলিয়া বিদিত হও, তখন ইনি তোমার সেই সেই অন্তঃকরণের লক্ষণরূপা বৃত্তি। তুমি যখন বিরাট্ দেহধারী, তখন ইনি পৃথিবীতে ধারণারূপে অবতীর্ণা ॥ ২৬ ॥

৭। শ্যামঞ্চ গৌরং বিদিতং দ্বিধা মহ-
স্তবৈব সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমোত্তম।
গোলোক-ধামাধিপতিং পরেশং
পরাৎপরং ত্বাং শরণং ব্রজাম্যহম্ ॥ ২৭ ॥

হে সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমোত্তম! শ্যাম ও গৌর—তোমার এই দ্বিবিধ তেজ; তুমি গোলোকধামপতি, পরেশ ও পরাৎপর; আমি তোমার শরণ লইলাম ॥ ২৭ ॥

৮। সদা পঠেদ্ যো যুগলস্তবং পরং
গোলোকধামপ্রবরং প্রয়াতি সঃ।

ইহৈব সৌন্দর্য্য-সমৃদ্ধি-সিদ্ধয়ো
ভবন্তি তস্যাপি নিসর্গতঃ পুনঃ ॥ ২৮ ॥

যে ব্যক্তি শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই পরমস্তব সতত পাঠ করেন, তাঁহার সর্ব্বধাম-প্রবর গোলোকে গতি হইয়া থাকে; আর ইহলোকেও আপনা আপনি সৌন্দর্য্য, সমৃদ্ধি ও সিদ্ধিসমূহ লাভ হয় ॥ ২৮ ॥

৯। যদা যুবাং প্রীতযুতৌ চ দম্পতী
পরাৎপরৌ তাবনুরূপরূপিতৌ।
তথাপি লোকব্যবহার-সংগ্রহা-
দ্বিধিং বিবাহস্য তু কারয়াম্যহম্ ॥ ২৯ ॥

আপনারা সনাতন পরাৎপর ও প্রীতিযুক্ত দম্পতি এবং পরস্পর অনুরূপ; তথাপি আমি লোকব্যবহার রক্ষার জন্য ভবদীয় ইচ্ছানুযায়ী বিবাহ-বিধির অনুষ্ঠান করিতেছি ॥ ২৯ ॥

[স্বয়ং হরি শ্রীকৃষ্ণ বিধিকে বলিলেন,—তুমি যথেপ্সিত পুরোহিত-দক্ষিণা প্রার্থনা কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে প্রভো! তোমার পাদপদ্মে যেন আমার ভক্তি থাকে, এই দক্ষিণা আমাকে দান কর। শ্রীহরি তখন 'তাহাই হউক' বলিলে ব্রহ্মা শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরমশুভদ শ্রীচরণকমলে করদ্বয় ও মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্বগৃহে গমন করিলেন।]

মনুষ্য-সমাজ ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম (৩)

ধর্ম্ম ও সমাজের দুর্গতির কারণ

সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত মানব-সমাজের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ, তাহা প্রথম প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি ভারতবর্ষে যে-প্রকার সমাজ প্রচলিত, তাহাতে সনাতন-ধর্ম্মের যথেষ্ট ব্যাঘাত হইতেছে। কেবল জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় ব্যবস্থাপিত হওয়ায়, সনাতন-ধর্ম্মের যে কতদূর অবনতি হয়, তাহা বলা দুঃসাধ্য। উপযুক্ত পাত্র উপযুক্ত কার্য্য না পাইলে—না দেশের উন্নতি, না পাত্রের উন্নতি হয়। এইজন্য ধর্ম্মের এত দুর্গতি। অতএব সমাজ-সংস্কারের নিতান্ত প্রয়োজন।

সমাজ-সংস্কারে শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু ও বীরভদ্র প্রভু

পরম কারুণিক চৈতন্যপার্ষদ প্রভু নিত্যানন্দ সমাজের এইপ্রকার দুর্দ্দশা দেখিয়া এই বঙ্গভূমিতে একটী অচ্যুতবর্ণের বীজ বপন করিয়াছিলেন। সেই বীজ প্রভু বীরচন্দ্রের হস্তে অঙ্কুরিত হয়। ক্রমশঃ সেই অঙ্কুর আজকাল একটী বৃক্ষরূপে বর্ত্তমান আছে। হে পাঠকবর্গ! আপনারা যে একটী বৈষ্ণব-জাতির কথা শুনিয়া আসিতেছেন, তাহাই আমাদের উল্লিখিত বৃক্ষ।

জাতি-বৈষ্ণবের আচার, ক্রিয়া-কলাপ ও উপজীবিকা

জাতি-বৈষ্ণব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের গুণ-দোষ হইতে পৃথক্। ইঁহারা পতি-পত্নীরূপে সংসারে বর্ত্তমান হইয়া সন্তানাদি উৎপন্ন করেন। ইঁহাদের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সম্মত দশবিধ সংস্কার নাই। সংস্কার উপলক্ষে ইঁহাদের যে ক্রিয়াসকল আছে, তাহা বর্ণাশ্রমীদের ক্রিয়া হইতে বিলক্ষণ। বৈষ্ণব-জাতির মধ্যে কোন ব্রাহ্ম-কর্ত্তৃক ক্রিয়া হয় না। তাহারা সকল কর্ম্মই কৃষ্ণ-সম্বন্ধে করিয়া থাকেন। অন্য দেবদেবীর পূজা, হোম, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কিছুই করেন না। মৃতাশৌচ ও জাতাশৌচ অঙ্গীকার করেন না। বিবাহে কেবল মাল্য বদল করেন। কোন বৈষ্ণব-পরিবারের মধ্যে ক্রমশঃ বর্ণাশ্রম-নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি ক্রিয়া, দেবদেবীর আরাধনা এবং স্ত্রীলোক-পরম্পরা কতকগুলি ব্যবস্থা দেখা যায়। এইসকল বৈষ্ণবদিগের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের সেবা, পর্ব্বদিনে উৎসব, বিশেষ বিশেষ কার্য্যে মহোৎসব, হরিবাসর প্রভৃতির অনুষ্ঠান দেখা যায়।

এই বৈষ্ণব-জাতি প্রায়ই ভিক্ষাদ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করে। কোন কোনস্থলে উহারা অন্যান্য ব্যবহার দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করে। কোন কোন প্রদেশে উহারা কৃষিকার্য্য করে, কোন কোন প্রদেশে অন্যান্য বণিক-ব্যবসায় দ্বারা দিনপাত করে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই গীত-বাদ্যাদি অভ্যাস করত তদ্দ্বারা উদর পালন করে।

কীর্ত্তন ব্যতীত বৈষ্ণব-জাতির অন্য ব্যবসায়ে দোষ নাই

প্রভু বীরচন্দ্র যে-সময়ে সংযোগী বৈষ্ণবের পত্তন করেন, তখন তাঁহার এইমাত্র অনুমতি ছিল যে, তোমরা যদিও ইন্দ্রিয়-পরবশ হও, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনদ্বারাই সংসার নির্ব্বাহ করিবে। কেহ কেহ বলেন,—তাঁহার সময় কেবল বারশত নেড়া-নেড়ী ছিল। কিন্তু আজকাল সেই বারশত নেড়া-নেড়ীর স্থলে আমরা সমস্ত বঙ্গভূমিতে বহু বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী দেখিতেছি। বারশত ব্যক্তির অবশ্যই গান-কীর্ত্তন ব্যবসায় দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ হইতে পারিত। কিন্তু বর্ত্তমানের জীবনযাত্রা কেবল কীর্ত্তন ও ভিক্ষার দ্বারা রক্ষা পাইতে পারে না।

অতএব বৈষ্ণব-জাতি যে অন্যান্য ব্যবসায় করিতেছে, তাহা তাহাদের পক্ষে দূষণীয় নয়।

বৈষ্ণব-জাতির সামাজিক অবস্থিতি কোথায় ?

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম স্বাস্থ্য-অবস্থায় থাকিলে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত তাহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকিত। সেই ধর্ম্মে কতকগুলি উৎপাত উপস্থিত হওয়ায়, সমাজ-সংস্কারের আবশ্যকতা হইয়াছে। বৈষ্ণব-জাতিও যদি সেই বর্ণ-ধর্ম্মের মূল আকর্ষণ করে, তবে এই জাতির উভয় কুল নষ্ট হয়। অতএব বৈষ্ণব-জাতি সর্ব্ববিষয়ে পবিত্র না থাকিতে পারিলে, সকল সমাজের অধম হইবে—সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব-জাতি হয় সর্ব্ব সমাজের নমস্কৃত সমাজ হইবে, নতুবা সকল সমাজের হেয় হইয়া পড়িবে। এই বৈষ্ণব-জাতির কোন মধ্যবর্ত্তী অবস্থান নাই। কিরূপে থাকিলে এই বৈষ্ণব-জাতি সর্ব্বোচ্চ জাতি হইতে পারে, তাহা বিচার করা যাউক। আমাদের বিবেচনায় নিম্নলিখিত বিধি-বিধানমত কার্য্য করিলে তাহারা পূজনীয় হইবে।

বৈষ্ণব-জাতির সর্ব্বোচ্চতা-লাভের উপায়

১। তাঁহাদের সমাজটীকে একমাত্র কৃষ্ণসেবার যন্ত্র-স্বরূপ করিয়া রাখুন। বহির্ম্মুখ-জ্ঞান-কর্ম্ম একেবারে দূর করুন। কৃষ্ণসেবার বাধক হইতে পারে না—এরূপ যে-সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াও ব্যবহার আছে, তাহা সতর্কতার সহিত অবলম্বন করুন।

২। সমাজে থাকিতে হইলে সমাজ অবশ্য বৈজ্ঞানিক গঠন-বিধি পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সনাতন বর্ণ ও আশ্রম-বিধান গ্রহণ করুন। বিশের সতর্ক থাকা উচিত যে, কোনপ্রকারে সমাজ যেন জন্মদ্বারা নির্ণীত, অথবা বর্ণবিধি ও অনধিকার-দূষিত আশ্রম-বিধি গ্রহণ না করে।

৩। এই পত্রিকার (সজ্জনতোষণী) ১২৩ পত্রে এক দুই ক্রমে যে দশটী বিধির সঙ্কলন হইয়াছে, সেই বিধিগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত পালিত হউক।*

৪। আশ্রম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিধি প্রতিপালিত হউক ; যথা :

(ক) বিবাহযোগ্য স্ত্রী-পুরুষ মহাজনগণের অনুমোদন সহকারে বিবাহিত হইয়া একপত্নী, একপতি-ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক সংসার নির্ব্বাহ করুন।

---

* বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ১৬৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।—প্রকাশক

(খ) বিদ্যার্থী ব্যক্তি দেশ ভ্রমণার্থে ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুকুলে বাস-দ্বারা বিদ্যা উপার্জ্জন করুন। এবম্বিধ অবস্থায় সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াও তিনি শুদ্ধ থাকিতে পারিবেন।

(গ) অধিক বয়সে অবস্থা বিবেচনাপূর্ব্বক বাণপ্রস্থ অবলম্বিত হউক।

(ঘ) ব্রাহ্মণ-লক্ষণযুক্ত পুরুষের কৃষ্ণভক্তি-জনিত বিরক্তি উদিত হইলে সন্ন্যাসাশ্রম অর্থাৎ ভেকাশ্রম স্বীকৃত হউক।

(ঙ) সাঙ্কর্য্য লক্ষিত হইলে স্ত্রী বা পুরুষ সমাজ-বহিষ্কৃত হইবেন।

৫। যে কেহ সরলতা-সহকারে এই বৈষ্ণব-সমাজে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি গৃহীত হইবেন।

৬। সমাজের উন্নতির জন্য কৃষ্ণভক্তির সাধক সমস্ত পার্থিব ও পারমার্থিক বিদ্যা ও শিল্পের অনুশীলনদ্বারা জাতীর মূল উন্নতির চেষ্টা করা যাউক।

মনুষ্য-সমাজ সংস্কারের জন্য নির্দ্দেশ

বৈষ্ণব-জাতি এইরূপে সংস্থাপিত হইলে আর এতদ্দেশে কোন ক্লেশ থাকিবে না। বোধ হয়, সকল আর্য্য-সন্তানগণ অল্পকালের মধ্যেই এই জাতিকে পুষ্ট করিবেন। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ, উপযুক্ত ক্ষত্রিয়, উপযুক্ত বৈশ্য ও উপযুক্ত শূদ্র-দ্বারা ভারতের মুখশ্রী পুনরায় উজ্জ্বল হইবে। ইহা হইলেই সত্যযুগ আসিয়া জগতে পুনরায় রাজ্য করিবে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় আমরা এই উন্নতির বীজ লাভ করিয়াছি। **এখন প্রার্থনা করি যে, সমস্ত সহৃদয় পুরুষ এ বিষয়টির বিশেষ আলোচনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করুন।**

বর্ত্তমান ভারতের কর্ত্তব্য-নিরূপণে ঠাকুরের নির্দ্দেশ

এই বিষয়ে যত্ন করিলে ভারতবাসীর, বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর সকল লাভই হইবে। জাতি-সংস্কার, বিবাহ-বিধি-সংস্কার, ধর্ম্ম-সংস্কার ও শরীর-সংস্কার সম্বন্ধে আজকাল যে-সকল খণ্ড উদ্যম হইতেছে, সে-সকল উদ্যমের আর প্রয়োজন থাকিবে না। বৈষ্ণব-সমাজকে যথোচিত উন্নত করিয়া তাহাতে সকলের প্রবেশ করাই কর্ত্তব্য। তাহাতে সমস্ত ভাল কথাই পাওয়া যাইবে। বৈষ্ণবগণই জগৎভূষণ। তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক এ বিষয়ে সাহায্য করুন। তাঁহাদের চরণে দণ্ডবৎ করিয়া এইস্থলে নিবৃত্ত হইলাম।

(সজ্জনতোষণী ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

———

অনাত্ম জ্ঞান

"দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।" (চৈঃ চঃ)

দেহে আত্মবুদ্ধিই আমাদের প্রধান ভ্রম। আমরা যখন ভগবৎ-সাম্মুখ্য বর্জ্জন করিয়া ভোগবুদ্ধি আবাহনপূর্ব্বক আমাদের তটস্থ অধিকারের অপব্যবহার ও মায়ার বশ্যতা স্বীকার করি, তখনই আমাদের আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। তখন 'আমি কে?' তাহা ভুলিয়া অনাত্ম-বস্তুতে আত্মবোধ করিয়া বিবর্ত্তের আশ্রয় গ্রহণ করি। এই বিবর্ত্তের আশ্রয়েই আমাদের যাবতীয় ক্লেশরাশি। প্রথমে সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনকে আত্মবুদ্ধি করিয়া 'সমস্ত তত্ত্বই আমাদের মনোবলের আয়ত্ত' এই অহংকার আমাদের প্রবল হয়, তাহাতে আমরা আম্নায়-পারম্পর্য্যক্রমে প্রাপ্ত অপৌরুষেয় জ্ঞানকে উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অক্ষজ জ্ঞানেরই অধিক সমাদর করিয়া যুক্তিবাদী হইয়া দাঁড়াই বা আরোহপন্থী হইয়া উঠি। অধোক্ষজ-সেবা-জ্ঞান অর্থাৎ অবতরণ-মার্গ বা অবরোহ-পন্থা আমাদিগের প্রীতিকর থাকে না, গুর্ব্বজ্ঞাই আমাদের তখন কৃত্য হইয়া পড়ে। মনের নেতৃত্বে আমরা বিভোর হইয়া গুরু লঙ্ঘন করিতে করিতে ভগবদ্বৈমুখ্য-বর্দ্ধনশীল হইয়া ভগবদ্বিস্মৃতি লাভ করি বা নরক প্রাপ্ত হই, ইহা অপেক্ষা জীবের আর কি অমঙ্গল হইতে পারে? ক্রমশঃ ভগবৎ-সান্নিধ্য হইতে যত বিচ্যুত হইতে থাকি, ততই আমাদের চিত্ত চিৎ হইতে অচিৎ বা জড়ে অনুপ্রবিষ্ট হইতে থাকে। ক্রমে দেহাত্মবুদ্ধিই প্রবল হয়। তখন দেহেই আমিত্ব আরোপ করিয়া দেহ-সম্পর্কেই সমস্ত আপন পর বিচার করিতে বসি। যাহারা আমাদের দেহের তুষ্টিসাধন করিতে পারে, তাহারাই আমাদের প্রিয়; যাহারা তাহা করে না, তাহাদিগের প্রতি আমরা উদাসীন, আর যাহারা এই দেহের কোনরূপ অসুবিধা সংঘটন করে, তাহারা আমাদের শত্রু—এই ধারণাই বলবতী হয়। তখন আমরা বিচার করি না যে, এই যে দেহরূপী আমি, ইহার সারবত্তা কতটুকু, ইহার স্থায়িত্ব কতক্ষণের, ইহার পরিণাম কি, ইহার গঠনে কি? তখন এই পাঞ্চভৌতিক দেহ অনিত্য সুখের নিলয় দেখিয়া আমরা দিশেহারা হইয়া পড়ি, আমরা তাহারই সেবায় সকল সময় নিয়োগ করিয়া আমাদের নিত্য মঙ্গলের কথায় উদাসীন হইয়া যাই! এই দেহ এখন এরূপ আছে, কয়েক বৎসর মধ্যে ইহার বিকৃতি সাধিত হইবে—শিথিল চর্ম্ম, পলিত ক্লেশ, গলিত দন্ত আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ দেহের অস্থায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেও আমরা তাহাতে কর্ণপাত করিতে প্রস্তুত হই না! প্রত্যহ শত শত ব্যক্তির দেহাত্যয় দেখিয়াও দেহের ভঙ্গুরত্ব সম্বন্ধে নিরন্তর প্রমাণ পাইয়াও আমরা দেহকে 'আমি' জ্ঞান করা ছাড়িতে পারি না—আমাদিগের ন্যায় গোখর বা বুদ্ধিহীন ভারবাহী গর্দ্দভ আর কে হইতে পারে? প্রাণবিচ্যুত শত শত দেহকে দুর্গন্ধ-আবাস দেখিয়া, শৃগাল-শকুনির ভক্ষ্যে

পরিণত জানিয়াও আমাদের কি কোন জ্ঞানোদয় হইতেছে—আমরা কি দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতেছি? বরং দার্শনিক সাজিয়া দেহ-তত্ত্বের ভাবুক হইয়া দেহকেই সকল পুরুষার্থের ক্ষেত্র মানিয়া তাহারই সেবায় উত্তরোত্তর যত্নপর হই।

মনোরূপী সূক্ষ্ম ও বাহ্যে স্থূল দেহে 'আমি' বুদ্ধি যতদিন না আমাদিগকে ত্যাগ করিবে, যতদিন না আত্মজ্ঞানী নিরন্তর ভগবৎ-সেবাতৎপর সাধু মহাপুরুষের চরণাশ্রয়ে আমাদের এই দুই প্রকার দেহাত্ম-বুদ্ধির হাত হইতে অবসর না পাই, ততদিন নরকবাসীই থাকিয়া যাইব, আমরা নিজেদেরই মঙ্গল লাভে যত্ন করিতে উৎসাহবিশিষ্ট হইব না।

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে বৈষ্ণবগণের চাষ-আবাদ অবৈধ নহে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া
হুগলী (পঃ বঃ)
ইং ৮।১০।৬০

স্নেহভাজনেষু—

* * *! বৈষ্ণবের চাষ-আবাদ সম্বন্ধে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসের সংখ্যাতেই প্রবন্ধ দিবার চেষ্টা করিতেছি। আমার নির্দ্দেশ-অনুসারে এবং শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে অনেক জায়গায় বৈষ্ণবগণ চাষ-আবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং তোমাদের ওখানেও বৈষ্ণবগণ চাষ-আবাদ করিলে কোন প্রকারে অন্যায় হইবে না।

যাহারা বৈষ্ণবগণের চাষ-আবাদ অবৈধ মনে করিবে এবং বৈষ্ণবগণকে চাষ করিতে বলপূর্ব্বক নিষেধ করিবে, তাহারা ভণ্ড এবং পাষণ্ড। ঐরূপ ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবতা বা বৈষ্ণবধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা তাহারা জানে না। সুতরাং তাহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশুদ্ধ উপদেষ্টা হইতে পারিবেন না বা তাহাদিগকে তৎশ্রেণীভুক্ত বলিয়া স্বীকার করা হইবে না।

জনমত আর বাস্তব-সত্য এককথা নহে। যাঁহারা ভগবদ্ভজন করেন, তাঁহাদের সহিত জনমতের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—
—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রীক্ষেত্র দর্শন

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৪ পৃষ্ঠার পর]

তথা হৈতে গৃহে আসি সে রাত্রি বঞ্চিয়া।
প্রভাতে সমুদ্রতীরে উপনীত হয়া॥
সমাধি দিলেন হরিদাসে গৌররায়।
সমুদ্রে যমুনা জ্ঞানে হৃদয় জুড়ায়॥
সমাধি অঙ্গনে বসি হরিনাম গাই।
আনন্দে উন্মত্ত চিত্ত ফিরিতে না চাই॥
তবে টোটা গিয়া দেখি বলদেব সাথ।
সেবিলা পণ্ডিত যথা প্রভু গোপীনাথ॥
শাস্ত্র-সাধুমুখে শুনি প্রভু গৌররায়।
ভক্তসঙ্গে ভাগবত শুনেন তথায়॥
নিভৃত টোটায় গৌর-গদাধর সনে।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস করে আস্বাদনে॥
গোপীনাথ শ্রীচৈতন্য একই স্বরূপ।
ন্যাসিরূপ বংশীমুখ ভিন্নমাত্র রূপ॥
সুবর্ণের রেখা আছে জানুর উপরে।
লুকাইলা গৌর গোপীনাথ কলেবরে॥
একদিন বহু নৃত্য উচ্চসঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম প্রেমানন্দে ভরিত অঙ্গন॥
অঙ্গন পবিত্র প্রভু শ্রীপাদ পরশে।
দেখি ধন্য হই এবে লীলা অবশেষে॥
তিন্তিড়ীর শাক যথা পণ্ডিতঠাকুর।
ভোগ দিত গোপীনাথে অতি সুমধুর॥
গৌরচন্দ্র সেই শাক করি' আস্বাদন।
পণ্ডিতের মহাপ্রেমে মগ্ন সর্ব্বক্ষণ॥

গোপীনাথ দক্ষিণেতে শ্রীরোহিণীসুত।
দেখিয়া গুণ্ডিচা গৃহে হৈনু উপনীত॥
কি অদ্ভুত সেই স্থান অতি মনোরম।
বৃন্দাবনসম বন শোভা অনুপম।
নানাজাতি বৃক্ষ সব শোভে চারিভিত।
গুল্মলতা ফুলদলে সে স্থান বেষ্টিত॥
বৃক্ষোপরি পক্ষিগণ আনন্দেতে গায়।
বহু লতাকীর্ণ স্থান জনশূন্য প্রায়॥
রত্নময় শ্রীমন্দির সুন্দর প্রাঙ্গন।
মন্দির মার্জ্জনলীলা হয়ত' স্মরণ॥
গুণ্ডিচা মন্দির প্রভু করি প্রক্ষালন।
কীর্ত্তন করিলা লয়ে নিজ ভক্তগণ॥
প্রভুর পূরব লীলা করিয়া স্মরণ।
নয়নে আনন্দ অশ্রু বহে অনুক্ষণ॥
হা গৌরাঙ্গ দয়াময় পতিতপাবন।
ক্ষেত্রধামে তব লীলা বিচিত্র কথন॥
সেই জগন্নাথদেব গুণ্ডিচা মন্দির।
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর নরেন্দ্রের তীর॥
সেই পথ সেই জ্যোৎস্না সমুদ্রের কুল।
চটক পর্ব্বতরাজ সুষমা অতুল॥
আইটোটা রাজপথ সেই উপবন।
জগন্নাথ বল্লভের সুন্দর কানন॥
বহু নৃত্য ভক্তসঙ্গে ভ্রমণ উদ্যানে।
সর্ব্বত্র লীলার চিহ্ন আছে বর্ত্তমানে॥
হরিদাস সিদ্ধিস্থান নিকট ভবন।
ভজন কুটীর নাম প্রসিদ্ধ এখন॥
সেইস্থানে প্রভু সঙ্গী নিজ ভক্তগণ।
থাকিত সমুদ্রকুলে শুনি' বিবরণ॥

তদবধি সিদ্ধভক্ত কভু কভু রয়।
ভজন কুটীর নাম বিজ্ঞজন কয়॥
সে স্থানে ছিলেন এবে ভক্ত মহাজন।
শ্রীভক্তিবিনোদ নাম বিখ্যাত ভুবন॥
নবদ্বীপ গাদিগাছা জাহ্নবী নিকটে।
স্বানন্দসুখদকুঞ্জ সরস্বতী তটে॥
বহুদিন তথা বাস করি' প্রভুবর।
বহুগ্রন্থ কৃষ্ণনাম প্রকাশি' বিস্তর॥
চৈতন্যের শেষ লীলা ভূমিতে গমন।
রহিয়া সমুদ্রতীরে করিলা ভজন॥
তাঁহার শ্রীমুখে লীলা করিয়া শ্রবণ।
নীলাদ্রি কাহিনী এই করিনু বর্ণন॥
ভক্তগণ অধমের ক্ষমি' অপরাধ।
লীলা পাঠে কর দীনে উত্তম প্রসাদ॥
আমারে করুন্ দয়া চৈতন্য ঈশ্বর।
শ্রীধামে হউক মোর বাস নিরন্তর॥
শ্রীমন্দির সন্নিকটে নরেন্দ্রের কুল।
রাধাকুণ্ডলীলা স্ফূর্ত্তি সর্ব্বসুখমূল॥
অচিরে তথায় বাস হউক আমার।
জগন্নাথ দেহ দানে সেই অধিকার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পদ যার প্রাণধন।
এ অধম জীব সেই অতি অকিঞ্চন॥

—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীব্যাসপূজা

শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠান হয়। গুরুদেব সেই তিথিতে মন্ত্রদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা করিয়া অনুগতজনের জন্য শ্রীব্যাসের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। কারণ শ্রীগুরুদেব ব্যাসাভিন্ন। 'অভিন্ন' শব্দে ভিন্ন নহেন। শ্রীল বেদব্যাস জীবের আত্মকল্যাণলাভের জন্য বেদ বিভাগ, বেদান্ত সূত্রের প্রকাশ, মহাভারত ও পুরাণাদির প্রণয়ন করিয়া কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাইবার যে ভাবনা ও যত্ন করেন, শ্রীগুরুদেব সেই নীতি ও আদর্শ হইতে ভিন্ন নহেন। মূলে শ্রীল বেদব্যাস স্বয়ং নারায়ণ। 'শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ম্।'

আচার্য্য শঙ্কর যেমন স্বয়ং শিবঠাকুর, তেমনই শ্রীল ব্যাসদেব স্বয়ং নারায়ণ। 'নারায়ণ' শব্দে 'নার' অর্থে সমগ্র জীবসমষ্টি এবং 'অয়ন' অর্থে আশ্রয়, অর্থাৎ সমগ্র জীবের যিনি আশ্রয়। যিনি জীবের সুখশান্তির জন্য মঙ্গল চিন্তা করেন এবং জীব যাঁহার আশ্রয়ে সুখশান্তি লাভ করেন, তিনিই নারায়ণ। কৃষ্ণবিরহিণী গোপীগণের নিকট চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তিও গুরুতত্ত্ব, প্রেমাস্পদ শ্রীভগবৎতত্ত্ব নহেন। তাই তাঁহাদের প্রার্থনা—"নমো নমো নারায়ণ, করহ প্রসাদ। কৃষ্ণসঙ্গ দিয়া মোদের ঘুচাও বিষাদ॥" স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দনই সুখশান্তির পরম বিষয়বস্তু। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার স্তবে শ্রীকৃষ্ণই মূল-নারায়ণ। শ্রীগুরুদেব সেই বিষয়ের আশ্রয় বা পাত্র। শ্রীগুরুদেবের শরণাগত চরণাশ্রিত জন সেই ভগবৎবিষয়ের সেবাসুখ লাভ করিতে পারেন। যাঁহার মাধ্যমে জীব শ্রীভগবানের সেবাসুখের সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারেন—শিক্ষা পান, তিনি 'ব্যাস' পদবাচ্য। 'কৃষ্ণলীলার ব্যাস শ্রীবেদব্যাস। চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস॥ বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যভাগবত। যাহার শ্রবণে ঘুচে অন্তর পাষণ্ড।'

সনাতন ধর্ম্মে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন 'অধোক্ষজ,' 'অতীন্দ্রিয়,' 'অবাঙ্‌মনসোগোচর'—বাক্য, মন, এমন কি, চক্ষুরও গ্রাহ্যবস্তু নহে। যাঁহাকে জানিতে ব্রহ্মা-শিবাদিও ভুলক্রমে আগুনকে জল এবং জলকে মাটি বুদ্ধি করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়গণের অতীত সেই শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান ধিক্কার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যখন জীবাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভজনোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা প্রার্থনা করেন, তখন তাহারই নিকট সেই পরমাত্মা তাঁহার প্রকাশ-তনু চৈত্যগুরুকে প্রকট করেন। চৈত্যগুরুর প্রেরণায় জীব বিচার করিবার

বিবেক-বুদ্ধি প্রাপ্ত হন। বাহিরে সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হন।

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই সাধকের মূল লক্ষ্য বা কেন্দ্রবিন্দু। একটী বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া ছোটবড় বহু বৃত্তচাপ রেখা অঙ্কন করা যায়। রেখা একাধিক বিন্দুর পাশাপাশি অবস্থান। চিত্রকরের দ্বারা অঙ্কনযন্ত্রের সাহায্যে কেন্দ্রবিন্দু যেরূপ বৃত্তের স্রষ্টা, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের অধ্যক্ষতায় কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু প্রথম পুরুষের দ্বারা জড়মায়া প্রকৃতির সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডগুলির সৃষ্টি। তাহাতে জীবরূপ বীজপ্রদানকারী 'অহং বীজপ্রদপিতা'—শ্রীকৃষ্ণ। চতুর্দ্দিকস্থ ব্রহ্মাণ্ড-গুলির কেন্দ্রস্থ শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত জীবরূপ বিন্দুর সমষ্টি-বৃত্তের স্রষ্টা।

বৃত্তস্থ কোন বিন্দুর কখনও কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার অভিলাষ করা উচিত নহে। যদি বৃত্তের বিন্দু কেন্দ্রবিন্দু বলিয়া দাবী করে, তবে তাহার বৃত্তস্থ বিন্দুও তাহাকে অনায়াসে অস্বীকার করিতে পারিবে। বৃত্তের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কেন্দ্রবিন্দুগামী বিস্তৃত সরল রেখাকে 'ব্যাস' বলিয়া থাকি। কেন্দ্রবিন্দুর সম্বন্ধহীন বৃত্তস্থ বিস্তৃত সরলরেখাকে আমরা 'জ্যা' বলিয়া জানি।

কেন্দ্রবিন্দুর সম্বন্ধযুক্ত বিস্তৃত সরলরেখা ব্যাস—'গুরু'। 'গুরু-ব্যাস' অপেক্ষা 'জ্যা' লঘু, যেহেতু জ্যা কেন্দ্রবিন্দুগামী নহে। 'জ্যা' বৃত্তস্থ দুইটী বিন্দুর সম্বন্ধ ঘটাইতে পারে। লৌকিক পার্থিব গুরু খাওয়া-পরা, বাঁচা-বাড়ার আপাত মনোহর চারুবাক্যের সান্ত্বনা দিতে পারেন, কিন্তু অশোক-অভয়-অমৃত-আধার-শাশ্বত শান্তির আলয় শ্রীকৃষ্ণচরণের সম্বন্ধ ঘটাইতে পারেন না। কেন্দ্রবিন্দুর সম্বন্ধহীন জ্যা-তুল্য শ্রীকৃষ্ণবিমুখ ব্যক্তি ব্যাস বা গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন না। ব্যাসতুল্য শ্রীগুরুদেবই কি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ? না, কেন্দ্রবিন্দু যেমন 'ব্যাস' নহে, ব্যাসও তেমন 'কেন্দ্রবিন্দু' নহে। পক্ষান্তরে, কেন্দ্রবিন্দুর সম্বন্ধ লইয়াই ব্যাস, ব্যাসের মধ্যেই কেন্দ্রবিন্দু। ঠিক তদ্রূপ, শ্রীগুরুদেব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নহেন, শ্রীকৃষ্ণও গুরুদেব ছাড়া নহেন। কারণ, ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-গুরু-পরম্পরায়—'শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি- বাদরায়ণ - সংজ্ঞকান্'। শ্রীকৃষ্ণ আদিগুরু। ব্রহ্মা—গুরু, শিবও—গুরু। কিন্তু আমার দীক্ষা-শিক্ষাদাতা গুরুদেব—একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতে পারেন না। যেমন, জনক—পিতা, তাই বলিয়া পিতা, জনক নহেন।

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত সঃ পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥"

যে ব্যক্তি শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দেবতার সহিত সমান মনে করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।

সাধু-সজ্জনগণ নর ও দেবকুলের মান্য 'ঈশ্বর'-আখ্যাপ্রাপ্ত ব্রহ্মা ও শিবকে গুরু বলিয়া জানেন। 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ' 'শিব-বিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্', 'দাসস্তে হর-নারদ-প্রভৃতয়ঃ' বাক্যে ব্রহ্মা ও শিবেরও আরাধ্য হরিহর একাত্মা —সদাশিব বিষ্ণুতত্ত্ব। শিবের গুরু সঙ্কর্ষণ অস্ত্রধৃতিভেদে শঙ্খ-পদ্ম-গদা-চক্রধারী নারায়ণ। শঙ্খ—বৈদিকজ্ঞান, পদ্ম—লীলাসঞ্চালন, গদা—কুমুদ বিতরণ ও চক্র—কুদর্শন-নাশের প্রতীক। শঙ্খ-পদ্ম-গদা-চক্রধারী সেই নারায়ণের আবেশাবতার শ্রীল ব্যাসদেব।

শ্রীল ব্যাসদেব ব্রহ্মা ও শিবাদির আরাধ্য নারায়ণ হইলে, আরাধক ব্রহ্মা ও শিবের পুত্র ও শিষ্য-স্থানীয় নারদকে কি করিয়া গুরুত্বে বরণ করিতে পারেন? শ্রীল ব্যাসদেব সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরু শিষ্যকে 'গুরু' করিতে পারেন। সদ্‌গুরুর ভাবনায় জগতের সকল জীবই শ্রীকৃষ্ণের দাস। ভাগ্যবান্ জীব তাহা মানিয়া লইতে পারেন। জীবের শ্রীকৃষ্ণদাস্য ভাবনা না থাকা—চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। তবে, কেহ শ্রীকৃষ্ণকে মানুক বা নাই মানুক, অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে জগতের সকলের কাছেই তাঁহার শিক্ষার বিষয় আছে। তাই সদ্‌গুরুই জগদ্‌গুরু। স্বয়ং গুরু-অভিমানী অপরকে 'গুরু' করিতে পারে না। জীবনে কাহারও ছাত্র না হইলে, যেমন কেহ আদর্শ শিক্ষক হইতে পারেন না, পরমার্থ-বিদ্যার ক্ষেত্রে বৈদিক শাস্ত্রীয় শাসনযোগ্য শিষ্য না হইলে কি করিয়া সদ্‌গুরু হইতে পারেন? শ্রীল ব্যাসদেব দেবর্ষি নারদকে গুরুত্বে বরণ করিয়া ভক্তের মহিমাই প্রচার করিয়াছেন।

শাস্ত্রার্থ—অর্থাৎ শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সম্যক্‌রূপে সংগ্রহ করিয়া অপরকে আচারে স্থাপন এবং স্বয়ং শাস্ত্রাদেশ আচরণ করেন বলিয়া আচারবান্ তত্ত্ববিৎ পুরুষ 'আচার্য্য' নামে কীর্ত্তিত। 'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ' শ্লোকে যথার্থ অনুশীলন-কারিগণ মহর্ষি মনু ও শ্রীল ব্যাসদেবের অভিহিত ও কীর্ত্তিত প্রামাণিক শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের অনুগমন করেন। আচার ও প্রচার-পরায়ণ আচার্য্য সকলের গুরু হওয়ার যোগ্য ও জগতের পূজ্য। সেই কথাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায়—

আপনে আচরে কেহ, না করেন প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥

আচার-প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥

আচার্য্যের আচরণীয় ও শিক্ষণীয় বিষয় কি? তাহাই আচার্য্যের লীলাভিনয়কারী শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরণ ও শিক্ষা—"আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে।" শ্রীমন্মহাপ্রভু আচার্য্যের আচরণ করিলেও, তিনি শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদির প্রমাণে শ্রীভগবৎতত্ত্ব। ক্ষুদ্র জীবকে স্তাবকগণ শ্রীভগবৎ-লীলাভিনয় করাইলেও শাস্ত্রপ্রমাণাভাবে ভগবান্ ত' দূরের কথা, শাস্ত্রদর্শীর নিকট সদ্‌গুরু আখ্যারও অযোগ্য হইয়া পড়েন। ভগবানের আসন দখল করায় অপরাধে ভগবৎকৃপা হইতে আত্মবঞ্চিত ও জগৎবঞ্চকরূপ দোষে তাহাদিগকে দুষ্ট হইতে হয়। অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন মানব-সমাজে ইহাদিগকে অশাস্ত্রীয় নিত্য নূতন অবতারের বিচ্ছিন্নভাবাদে পরস্পরকে কলহে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

সনাতন ধর্ম্মের প্রাচীন মুনি-ঋষিগণের শ্রোত, জ্ঞেয়, দৃষ্ট ও অনুভূতির শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে অস্বীকার করিয়া নূতন কিছু পাইবার ও সমাজকে দিবার আশা করিলে সত্যস্বরূপ আদর্শ দর্শাইবার কিছু থাকে না। তাই সুধীজনগণ শ্রীল ব্যাসদেবের শ্রৌতপন্থায় বৈদিকধর্ম্মের আচারবান্ প্রচারককেই 'গুরু' বলিয়া জানেন। গুরু, শিষ্য ও শাসনবাণী বৈদিক শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় যথাক্রমে দ্রষ্টা, দর্শনার্থী ও দৃশ্যবস্তু। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষণীয় বিষয়।

দ্রষ্টা না থাকিলে, দর্শনার্থীকে দৃশ্যবস্তু কে দেখাইবেন? আবার দর্শনার্থী না থাকিলে, দ্রষ্টা দৃশ্যবস্তু কাহাকে দেখাইবেন? আর দৃশ্যবস্তু যেখানে নাই, সেখানে দ্রষ্টা দর্শনার্থীকে কি-ই বা দেখাইবেন? অতএব দ্রষ্টা, দর্শনার্থী ও দৃশ্য—এই তিনটীর যে কোন একটীর অভাব হইলে বৈদিক দর্শনে ব্যাঘাত ঘটে। এ প্রসঙ্গে শ্রুতি সদ্‌গুরু ও সৎশিষ্যের দুর্ল্লভতা স্মরণ করায়—

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥ (কঠ ১।২।৭)

যদি বলি—'আমি চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি, আমার দ্রষ্টার প্রয়োজন নাই, আমিই দেখিয়া লইব।' তাহা হইলে, সদ্‌গুরু প্রথমেই দুর্ব্বুদ্ধিকে দর্শাইয়া দেন—'চক্ষু থাকিলেই দেখা যায় না; কাণ ব্যতীত।' প্রমাণ? আমরা দিবসের

সূর্য্যালোকে বৃক্ষ-লতা, ঘর-বাড়ী, কাগজ-কলম, আসবাবপত্র প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় দেখি। রাত্রের অন্ধকারে আমরা দেখি না কেন? অন্য বিষয়বস্তু ত' দূরের কথা, নিজের শরীরটাকেও দেখি না। তখনও ত' বিষয়বস্তুগুলি থাকে, আমাদের দেখার গর্ব্বের বিষয়—চক্ষুও থাকে, কিন্তু দেখি না কেন? আলোর অভাব। যদি দেখতে চাই, তবে আলো জ্বালাইতে হইবে, আলোর জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই যদি আলো ছাড়া চক্ষু দিয়া দেখা না যায়, তবে অতীন্দ্রিয়, অধোক্ষজ বিষয়কে চক্ষুদ্বারা দেখার গৌরব চরম মূর্খতা। অতএব, চক্ষুষ্মান্ গাব্বত ব্যক্তিকে স্বীকার করিতে হইবে,—'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ'।

যদি বলি—'যাহার চক্ষুতে স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি নাই, তাহার সম্মুখে হাজার শক্তির আলোক জ্বালাইলেও সে দেখিতে পারে না। অতএব, অন্ধের দিনরাত্রি সমান। সুতরাং আলো যেমন দ্রষ্টা, চক্ষুও তদ্রূপ দর্শনের সহায়ক।

তাহার জবাব—দিন-দুপুরে একটী চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে, দেহাত্মবুদ্ধি-পরায়ণের মৃতের দেহটী কি কিছু দেখে? না তাহার চক্ষুতে কোন যন্ত্র দর্শনের সহায়ক হয়? তবে দেখে না কেন? দর্শনার্থী জীবাত্মা দেহে নাই। শ্রুতিতে আত্মাকেই দর্শনার্থী বা দর্শক, শ্রবণকারী ও বক্তা বলিয়াছেন। অতএব আত্মতত্ত্বই শ্রোতব্য, দ্রষ্টব্য ও মন্তব্য। অন্ধেরও পাঠশালা আছে, সেখানে শিক্ষকের চাতুর্য্যে শিক্ষণীয় বিষয়ের স্ফুরণ ঘটানো হয়। আর জ্ঞানালোকেরই সেখানে প্রবেশাধিকার। অতএব 'সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণ ধর্ম্মান্ধ'—এ কথা অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন জীবের অর্ব্বাচীনতা।

হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র ও নারদ-পঞ্চরাত্রে সেই আত্মদর্শনের আলো আছে। আত্মজ্ঞান-লাভেচ্ছুক জীবাত্মা শ্রীভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলে পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হন। কঠোপনিষদের 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ'—মন্ত্রে তাহাই উক্ত। শ্রীভগবানই আত্মজ্ঞান লাভেচ্ছুক জীবের প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহার আত্ম-পার্ষদকে সদ্‌গুরুরূপে প্রেরণ করেন। অথবা জীবের অন্তরে সদ্‌গুরুর নিকট যাইবার প্রেরণার সঞ্চার করেন।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

যিনি জীবের অন্তরে সৎ ও অসৎ বিচার করিবার বিবেকশক্তির প্রেরণা যোগান, তিনি 'চৈত্ত্যগুরু'—পরমাত্মার প্রকাশ। বাহিরে সদ্‌গুরু শিক্ষাদাতা

ও দীক্ষাদাতারূপে দুইপ্রকার। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে যদু-অবধূত ব্রাহ্মণ-সংবাদে অবধূত ব্রাহ্মণের (২৪) চব্বিশজন শিক্ষাগুরুর স্বীকৃতি পাই। অতএব শিক্ষাগুরু বহু, কিন্তু দীক্ষাগুরু একজনকেই করার বিধান। হিন্দুধর্ম্মে সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব-পঞ্চোপাসনার ক্রম-পদ্ধতিতে পরিশেষে বৈষ্ণব-গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণের উপদেশ আছে। জড়বিদ্যার ক্ষেত্রেও কোন ছাত্রের প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হইলে তাহার শিক্ষক যদি আরও উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ না দিয়া পূর্ব্বোক্ত পাঠশালাতেই রাখিতে চাহেন, তবে উহা শিক্ষকের আদর্শ নহে। সৌর, গাণপত্য, শাক্ত ও শৈব-মন্ত্রোপাসক গুরুগণ অনুগতজনকে বৈষ্ণব-গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়া শিক্ষাগুরুর আদর্শ রক্ষা করিবেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল রামানন্দ রায়-মুখে

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাধ্য-সাধন রসকথা প্রচার

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্য-দেবং
শ্রীরাধা-কৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

রাগময়ী ভক্তির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর রাগময়ী ভক্তি প্রচারেচ্ছায় সপার্ষদ অবতরণ করিলেন শ্রীরাধার ভাব ও দ্যুতি লইয়া।

"নানামতে ভক্তমুখে, ভক্তি-কথা শুনি' সুখে,
জীব শিক্ষা দেন সুযতনে॥"

অন্তর্যামিরূপে তিনি ভক্ত-হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া বিভিন্ন ভক্তমুখে বিভিন্ন তত্ত্বকথা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীহরিদাসের মুখে নাম-মাহাত্ম্য, শ্রীসার্ব্বভৌমমুখে

মুক্তি-তত্ত্বকথা ; শ্রীরামানন্দ রায়মুখে সাধ্য-সাধন রসকথা ও শ্রীরূপের মুখে রসবিচার করিয়া মহাপ্রভু বিভিন্ন সময়ে আনন্দ লাভ করিয়াছেন। শ্রীরামানন্দ রায়ের শ্রীমুখে মহাপ্রভু প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যে চরম সাধ্য-নির্ণয় ও সাধন-প্রণালী এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্বের রসভাণ্ডারের সন্ধান দিয়াছেন, সে রস কিঞ্চিৎ পরিমাণেও গ্রহণ করিতে হইলে আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের একান্ত অনুগত হওয়া আবশ্যক। শ্রীগুরুদেব যদি কৃপা করিয়া অন্তর্যামি-চৈত্ত্যগুরুরূপে হৃদয়ে সে তত্ত্ব প্রকাশ করান, তাহা হইলেই কিছু রসগ্রহণে সক্ষম হইব।

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজো-বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও লয় যে তত্ত্ব হইতে হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় হয়, অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা বিচার করিলে যিনি সমস্ত অর্থ বা ব্যাপারে একমাত্র পরম 'জ্ঞ-তত্ত্ব' অর্থাৎ 'স্বরূপতত্ত্ব' বলিয়া স্থির হন ; যিনি দৃশ্যমান জগতে একমাত্র স্বরাট্ অর্থাৎ স্বতন্ত্ররাজা ; যিনি আদিকবি ব্রহ্মাকে অন্তর্যামিরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন ; যাঁহাতে সমস্ত বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতের মুহুর্মুহু মোহ জন্মিয়া থাকে ; যাঁহাতে তেজোবারিমৃত্তিকা প্রভৃতি ভূতনিচয়ের বিনিময় অর্থাৎ পৃথকরূপ সত্তা ; যাঁহাতে তিন প্রকার সৃষ্টি অর্থাৎ চিদ্বয়রূপ সৃষ্টি, জীবপ্রাকট্যরূপ সৃষ্টি ও মায়িক ব্রহ্মাণ্ডরূপ সৃষ্টি সত্যরূপে বর্ত্তমান ; সেই আত্মশক্তিদ্বারা নিত্য-কুহকশূন্য পরমসত্য-তত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ধ্যান করি।"

যিনি সেই আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, তিনিই রামানন্দ-হৃদয়ে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক চরমতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া শ্রবণ করিয়াছেন।

প্রভু কহে,—"পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।"
রায় কহে,—"স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥"

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সংসারচক্রে আবর্ত্তিত কর্ম্মফলাহত ত্রিতাপজ্বালায় জর্জ্জরিত জীবের চরমকল্যাণ লাভের উপায় যে সাধ্যবস্তু, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য শ্রীরামানন্দ রায়কে শ্লোক পড়িতে বলিলেন। প্রথম শ্লোকে রায় জীবের জন্ম অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সঠিকভাবে পালন করাকেই জীবের সাধ্যতত্ত্ব বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ভগবানের সন্তুষ্টিই সাধ্যতত্ত্ব। মানবের স্বীয় কর্ম্মানুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটী বর্ণধর্ম্ম এবং বেদনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মচর্য্য,

গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারিটী আশ্রমধর্ম্ম সঠিকভাবে পালন করিলেই ভগবান্ বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন। ইহার অন্যথা হইলেই নরকগমন অনিবার্য্য। পরমার্থপথ অনুসরণ করিতে হইলে এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মজীবনই প্রথম সোপান। একারণে রায় সাধ্য-নির্ণয় করিতে গিয়া প্রথম উত্তর করিলেন—'স্বধর্ম্মাচরণ'। মহাপ্রভু ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া রায়কে ইহার উপরে কি আছে, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন।

প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"
রায় কহে,—"কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণ—সর্ব্বসাধ্যসার॥"

গীতায় বলিয়াছেন,—"হে কৌন্তেয়! যাহাই কর, যাহাই ভক্ষণ কর, যাহাই হবন কর, যাহাই দান কর এবং যে তপস্যাই কর, সে-সমস্তই আমি কৃষ্ণ, আমাতে অর্পণ কর।"

মহাপ্রভুর স্বধর্ম্মাচরণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধ্য-নির্ণয়ের প্রশ্নে রায় এবার উত্তর করিলেন,—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অন্তর্গত সকল কর্ম্মকে যখন শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করা হয় তখনই প্রকৃত সাধ্যবস্তু লাভ হয়।

কিন্তু মহাপ্রভুর প্রশ্ন এইখানেই স্থগিত হইল না। তাঁহার প্রশ্নের উত্তর ইহারও উর্দ্ধে। অতএব—

প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"
রায় কহে,—"স্বধর্ম্ম ত্যাগ—এই সাধ্যসার॥"

শ্রীভগবদ্গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমি যে ভগবান্, আমার শরণাপন্ন হও। তাহা হইলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না।

সাধ্য-নির্ণয়ে মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরেও রায় এবার তাহাই বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণের উর্দ্ধে তিনি নির্দ্দেশ করিলেন স্বধর্ম্ম ত্যাগকে। অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত সমস্ত কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ যেমন সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, অপর বর্ণসকলও তদনুসারে বৈরাগ্য-লক্ষণ প্রকাশ করিয়া গৃহত্যাগ করিবেন। এই ত্যাগধর্ম্মে শ্রীহরি পরিতোষ লাভ করেন।

কিন্তু প্রভু রায়ের এই উত্তরকেও বাহ্য বলিয়া প্রকাশ করিলেন এবং রায়কে আরও উত্তম উত্তর দিতে কহিলেন।

প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"
রায় কহে,—"জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি—সাধ্যসার॥"

প্রভুর প্রশ্নে এবার রায় জ্ঞানমিশ্রাভক্তিকে সাধ্যসার বলিয়া বর্ণনা করিলেন।

গীতায় বলিয়াছেন,—"অভেদব্রহ্মবাদরূপ জ্ঞানচর্চ্চাদ্বারা স্বয়ং প্রসন্নাত্মা, শোক ও বাঞ্ছা-রহিত ও সর্ব্বভূতে সমভাবযুক্ত ব্রহ্মতা লাভ করিয়া পরে আমার পরা ভক্তি প্রাপ্ত হয়।"

ইহার পূর্ব্বপর্য্যন্ত কর্ম্মমিশ্রাভক্তির উল্লেখ ছিল। প্রথমে সকাম কর্ম্ম, তৎপরে নিষ্কামকর্ম্ম, সর্ব্বশেষে কর্ম্মত্যাগ। এবার শ্রীরামানন্দ রায় প্রবেশ করিলেন—জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে। কর্ম্মমিশ্রাভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানমিশ্রাভক্তি যে উৎকৃষ্ট ইহা স্বীকার করিয়াছেন মহাপ্রভু। কিন্তু তাঁহার প্রশ্ন রায়ের এ উত্তরকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। জ্ঞানমিশ্রাভক্তিকেও তিনি বাহ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ ইহাও ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত। "শ্রীভগবান্ গৌরহরি নিজধাম বৈকুণ্ঠের বা গোলোকের বহিঃরাজ্যে অবস্থিত ব্যক্তির বাহ্যানুভূতিকে বাহ্য-সাধ্য বলিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে বলিলেন।" আবার প্রশ্ন করিলেন,—

প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"
রায় কহে,—"জ্ঞানশূন্যা ভক্তি—সাধ্যসার॥"

প্রভুর প্রশ্নে এবার রায় উত্তর করিলেন,—জ্ঞানশূন্যা ভক্তিই সাধ্যগণের সার।

শ্রীভাগবতে ব্রহ্মা ভগবানকে কহিলেন,—"হে ভগবন্! নির্ভেদব্রহ্মচিন্তারূপ জ্ঞানচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া যে ভক্তগণ সাধুমুখ-বিগলিত আপনার কথা শ্রবণ করেন ও কায়মনোবাক্যে সাধুপথে স্থিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রৈলোক্য-মধ্যে আপনি দুর্ল্লভ হইয়াও তাঁহাদের নিকট সুলভ হইয়া পড়েন।"

রায়ের উত্তরে 'জ্ঞানশূন্যা ভক্তির' কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন,—এবারে সাধ্য নির্ণীত হইল; কিন্তু ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যাহা আছে তাহা বলিতে নির্দ্দেশ করিলেন। "কেবল বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপালন অপেক্ষা কর্ম্মার্পণ শ্রেষ্ঠ, কেবল কর্ম্মার্পণ অপেক্ষা স্বধর্ম্মত্যাগ অর্থাৎ স্বীয় বর্ণধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা ব্রহ্মানুশীলনরূপ জ্ঞানমিশ্রাভক্তি শ্রেষ্ঠ হইলেও, সে সমুদয়ই বাহ্য; কেননা, সাধ্যবস্তু যে শুদ্ধভক্তি, তাহা সেই চারিপ্রকার সিদ্ধান্তে নাই।

সেই শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এই যে, তাহা অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত। আনুকূল্যভাবে কৃষ্ণানুশীলন ; উহাই সাধ্যবস্তু।"

কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিতে জীবের গতি—চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে। কর্ম্ম-অনুসারে জীব এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডই পরিক্রমা করিয়া থাকে। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে জীবের গতি মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ছাড়াইয়া বিরজা পার হইয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত। কিন্তু সেখানেও আত্মসুখ থাকিয়া যায়—ব্রহ্মে লীন বা নিজের মুক্তি কামনায় জীবের মূল-উদ্দেশ্য থাকে, শ্রীহরির পরিতোষ মুক্তি-কামনার মধ্যে থাকে না। ফলে চিৎধামে প্রবেশাধিকার ঘটে না। একারণে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি পর্য্যন্ত মহাপ্রভু বাহ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানশূন্যা ভক্তিকে তিনি সাধ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন,—

প্রভু কহে,—"এহো হয়, আগে কহ আর।"
রায় কহে,—"প্রেমভক্তি—সর্ব্বসাধ্যসার॥"

প্রভুর এই প্রশ্নের উত্তরে রায় কহিলেন,—প্রেমভক্তিই সর্ব্বসাধ্যসার। কিন্তু শুদ্ধভক্তি প্রথমে শান্তভক্তি-অবস্থায় উদিত হয়। একারণে প্রেমের প্রগাঢ়ত্বে পৌঁছাইতে প্রেমভক্তির সঙ্গে রসযোজনার প্রয়োজন হয়। প্রেমের বিষয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। আশ্রয়ের সাহায্যে তিনি এই প্রেম আস্বাদন করেন। আশ্রয়ের রসের তারতম্য অনুসারে বিষয়ের আস্বাদনেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এবারে মহাপ্রভু রায়কে প্রশ্ন করিতে থাকিলেন—প্রেমের সেই চরম অভিব্যক্তিতে পৌঁছাইবার জন্য।

প্রভু কহে,—"এহো হয়, আগে কহ আর।"
রায় কহে,—"দাস্যপ্রেম—সর্ব্বসাধ্যসার॥"

শান্ত-অবস্থায় শুদ্ধাভক্তিতে কৃষ্ণের প্রতি মমতা বোধ থাকে না। ফলে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। "ভগবানই আমার প্রভু—এইরূপ মমতাভাব যুক্ত হইলেই সাধারণ প্রেম দাস্যপ্রেম হইয়া পড়ে। ইহা সাধারণ প্রেম অপেক্ষা উচ্চ।" সাধারণ প্রেম হইতে দাস্যপ্রেমে আসিলে ভগবান্ "মমতা" রূপ একটী ভাবের দ্বারা সেবিত হন।

প্রভু কহে,—"এহো হয়, কিছু আগে আর।"
রায় কহে,—"সখ্যপ্রেম—সর্ব্বসাধ্যসার॥"

রায়ের এই উত্তর শুনিয়া প্রভু কহিলেন,—ইহাও হয়, কিন্তু আরও একটু চলিলেই আমরা চরমসাধ্যে পৌঁছাইব।

তাহার উত্তরে রায় সখ্যপ্রেমকে সাধ্যসার বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

এই সখ্যপ্রেমে আসিয়া দুটী ভাবের সংযোজন হইতেছে। মমতা এবং কৃষ্ণ ও সখাদের মধ্যে সমতা-ভাব। দাস্যপ্রেমে মমতা থাকিলেও ভগবান্ যে প্রভু, —এই বুদ্ধির জন্য একটা ভয় বা সম্ভ্রম থাকিয়া যায়। এই ভয় বা সম্ভ্রমকে দূর করিয়া বিশ্রম্ভ বা একান্ত বিশ্বাসকে বরণ করিতে পারিলেই তাহা সখ্যপ্রেম হইয়া যায়।

কিন্তু এ উত্তরের পরেও প্রভু রায়কে আরও অগ্রসর হইতে বলিলেন।

প্রভু কহে,—"এহো উত্তম, আগে কহ আর।"
রায় কহে,—"বাৎসল্যপ্রেম—সর্ব্বসাধ্যসার॥"

প্রভুর প্রশ্নে এবার রায় বাৎসল্যপ্রেমকেই সর্ব্বসাধ্যসার বলিয়া উল্লেখ করিলেন। সখ্যরসের যে বিশ্রম্ভাত্মক প্রেম, তাহাতে অধিকতর স্নেহসংযুক্ত হইলে "বাৎসল্যরসের" উদয় হয়।

প্রভু কহে,—"এহো উত্তম, আগে কহ আর।"
রায় কহে,—"কান্তভাব—প্রেমসাধ্যসার॥"

"প্রভু কহিলেন,—ইহা পর পর হইয়া উত্তম হইয়াছে বটে, তথাপি ইহাকে অতিক্রম করিয়া আর একটী রস আছে, যাহাকেই সাধ্যসার বলিতে পার। রায় উত্তরে কহিলেন,—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কান্তভাবই প্রেমের পরাকাষ্ঠারূপ সাধ্যগণের সার। তাৎপর্য্য এই, সাধারণ প্রেমে 'মমতার' অভাব। দাস্য-রসে 'বিশ্রম্ভ' বা 'বিশ্বাসে'র অভাব, সখ্যরসে 'স্নেহাধিক্যে'র অভাব এবং বাৎসল্যরসে 'নিঃসঙ্কোচ-ভাবে'র অভাবহেতু সাধ্যপ্রেমের পূর্ণতা তত্তদ্-রসে হয় নাই। কৃষ্ণে যখন কান্তভাবের উদয় হয়, তখনই ঐ সকল অভাবশূন্য সকল সাধ্যের সার একটী অখণ্ড প্রেমতত্ত্ব পাওয়া যায়।" (ক্রমশঃ)

—শ্রীমতী মায়া সরকার, বসিরহাট, (২৪ পরগণা উঃ)

"রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই ঋষিনীতি অবলম্বিত হইলেই সকল সমস্যার সমাধান হইবে। ঋষিনীতি অবলম্বন করিতে হইলে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থরাজি আলোচনা ও অধ্যয়ন করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে শিক্ষা-বিভাগের ঔদাসীন্য পরিহার করা প্রয়োজন।"

—শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

রূপ ও সৌন্দর্য্য

মানবমাত্রেই সৌন্দর্য্যের পূজারী। চিরকালের জন্য সুন্দরকে বরণ করিয়া লইবার জন্য তাহার চেষ্টার অন্ত নাই। তাহার পক্ষে সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ত' স্বাভাবিক। কারণ তিনি যে সৌন্দর্য্যময় ভগবানের সন্তান। আজকাল বেশীরভাগ নর-নারীই বিকৃত অর্থাৎ অস্থায়ী সৌন্দর্য্যকে প্রকৃত সৌন্দর্য্য মনে করিয়া ভুলের ফাঁদে পা রাখিয়া অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। জড়ীয় রূপের মোহ তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গলজনক ও আত্মবিনাশক। রূপের মোহই জনক-জননীকে সম্পূর্ণরূপে সন্তান-সন্ততি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে; আপনজনকে 'পর' উপাধি দান করিতেছে। ভোগবুদ্ধিতে নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ বিষ্ণুমায়া-রচিত জগতের ভোগাকাঙ্ক্ষী হইয়া অগ্ন্যালোকমুগ্ধ পতঙ্গের ন্যায় আপনাকে ভোক্তা মনে করে এবং জড় ভোগের আগার বলিয়া উহাতেই আবদ্ধ থাকিবার প্রয়াস করে। সেই অসংযত চঞ্চল বদ্ধজীবগণ অগ্নির উজ্জ্বল আলোকময় রূপের মোহে প্রধাবিত পতঙ্গের ন্যায় অগ্নিতে বা অন্ধকারেই পতিত হইয়া আত্মবিনাশ প্রাপ্ত হয়—ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে আজকাল "রূপ ও প্রসাধন" বিভাগে জড়দেহের সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা বজায় রাখিবার জন্য কতপ্রকারই না পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা রহিয়াছে। পত্র-পত্রিকা ছাড়াও বাজারে রূপ-সৌন্দর্য্যের অন্যান্য পুস্তকেরও কোন অভাব নাই। প্রাকৃত জীব ও ভক্তের সৌন্দর্য্য উপলব্ধির মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। ভক্ত ভগবানের সৌন্দর্য্যসুধা পান করিবার জন্য ঐহিক সুখের মুখে ছাই প্রদান করেন। স্বয়ং শিবঠাকুর কৃষ্ণ-নামের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া "ভবভোলা" নাম ধারণপূর্ব্বক দিগম্বর বেষে নৃত্য করেন।

প্রাকৃত সৌন্দর্য্য—ক্ষণস্থায়ী ও দুঃখজনক

প্রাপঞ্চিক উন্নতিকামী অভাবগ্রস্ত জনগণ ভ্রান্তিবশে মনে করেন যে, বিদ্যা, ধন, রূপ, যশ ও বংশমর্য্যাদা—সকলই প্রয়োজন তত্ত্ব। এই সকল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক, এইপ্রকার বাসনা তাঁহারা মনে পোষণ করেন। তাঁহাদের মন্দভাগ্য—ভগবানের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যে লোভের সঞ্চার হয় না। বদ্ধজীব খণ্ডকালরূপ সর্পের দংশনের যোগ্যতা লাভ করিয়া শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের অনিত্য ভোক্তা হয়। উহাই সংসাররূপে পতিত হইবার কারণ।

অনেকে বলেন,—"Beauty is full and symmetrical development of nature". অর্থাৎ সৌন্দর্য্য অর্থে প্রাকৃতিক পূর্ণ ও সামঞ্জস্যযুক্ত গঠন। কিন্তু কাহারও প্রাকৃত দেহের সৌন্দর্য্য ও বল নিত্যকালের জন্য থাকিবে না। ধন, পরিজন এবং যৌবন এ সকলই জোয়ারের জলের ন্যায় অস্থায়ী। "ধন জন যৌবন জোয়ারের জল।" কোন এক প্রাকৃত কবিও গাহিয়াছেন,—

যৌবন বসন্তসম সুখময় বটে,
দিনে দিনে উভয়ের পরিণাম ঘটে।
কিন্তু পুনঃ বসন্তের হয় আগমন,
ফিরে না ফিরে না আর ফিরে না যৌবন॥

পদ্মপত্রের জলের ন্যায় জীবের জীবন চঞ্চল। পুরুষের চিত্তহারী রমণীর এবং রমণীর চিত্তহারী পুরুষের যৌবনধন ক্ষণস্থায়ী। রূপ ও যৌবনের জন্য বৃথা অহংকার অত্যন্ত মূর্খামির পরিচায়ক। "গরব কর যৌবনের ভরে, কাঁদতে হবে অঝ্‌ঝর ঝোরে।" তাই বৈষ্ণব ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

দেহের সৌন্দর্য্য-বল—নহে চিরদিন।
অতএব তাহা ল'য়ে,　　না থাক গর্ব্বিত হয়ে,
তোমা' প্রতি এই অনুনয়॥

তিনি অন্যত্রও গাহিয়াছেন,—

রূপের গৌরব কেন ভাই।
অনিত্য এ কলেবর,　　কভু নহে স্থিরতর,
শমন আইলে কিছু নাই।
এ অঙ্গ শীতল হবে,　　আঁখি স্পন্দহীন রবে,
চিতার আগুনে হবে ছাই॥
যে মুখসৌন্দর্য্য হের,　　দর্পণেতে নিরন্তর,
শ্ব-শিবার হইবে ভোজন।

জীবের স্থূলশরীর গৃহের সহিত সমান। যেরূপ স্তম্ভ ও ছত্রের দৈর্ঘ্যপ্রস্থের কাষ্ঠগুলি গৃহের সহায়, তদ্রূপ মানবের স্থূলশরীরের অস্থি, মাংস, লোম, নখ প্রভৃতি বস্তুর দ্বারা নির্ম্মিত। এরূপ শরীরের পরিণতিক্রমে মলমূত্রাদি বিসর্জ্জনের যোগ্যতা আছে। সুতরাং নশ্বর পরিণামশীল জগতের বস্তুগুলির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যাঁহারা কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহব্রত হইয়া পড়েন, তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের তুলনা নাই।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত সৌন্দর্য্যের উৎস

ভগবান্ শব্দে সৌন্দর্য্যময়। 'ভগবৎ' শব্দে 'সৌন্দর্য্য' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ স্বীয় 'সৌন্দর্য্যে ভক্তগণকে আকর্ষণ করেন। ভক্তগণের ভজন-সৌন্দর্য্যই ভগবান্‌কে আকৃষ্ট করে। সৌন্দর্য্যবিহীন বস্তুতে জীবের রুচি হয় না। সৌন্দর্য্য দর্শনের অভাবেই জীবগণ অসুন্দর-বস্তুদর্শন-বিচারে অপেক্ষাকৃত সৌন্দর্য্য দেখিয়াই তথায় ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টী সমৃদ্ধিকে জড়ভোগে আবদ্ধ করে এবং এই ছয় প্রকার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ভগবান্‌কে বিস্মৃত হন। যেই কালে তিনি এই ছয়টী সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা ভগবানেই লক্ষ্য করেন, সেই সময় ভোগের অসৌন্দর্য্য তাঁহার উপলব্ধির বিষয় হয়। ভগবানের সৌন্দর্য্য দর্শনাভাবে জীবগণ মায়িক জগতে ষড়ৈশ্বর্য্যকে সৌন্দর্য্যের আধার বলিয়া ভ্রান্ত হন। ভগবৎসৌন্দর্য্য-দর্শনে জীবের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গুলি সেবোন্মুখ হইলে ভগবানই একমাত্র সৌন্দর্য্যের আকর—এইরূপ নিত্য উপলব্ধি হয়।

আত্মিক অর্থাৎ ভগবানের সেবাসৌন্দর্য্যই—ভক্তগণের একমাত্র কাম্য

ভক্তিপথের পথিক ভক্তগণ বিদ্যা, ধন, রূপ, যশঃ ও কুলমদে অন্ধ হইয়া জড় বিষয়ানুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন না। কারণ তাঁহারা জানেন,—

কি করিবে বিদ্যা, ধন, রূপ, যশ, কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি' সব পড়য়ে নির্ম্মূলে॥ (চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।২৩৪)

প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের দ্বারা ভক্ত কখনও আকর্ষিত হন না। তাই লক্ষহীরা বেশ্যার অপরূপ সৌন্দর্য্যও নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের মনকে বিচলিত করিতে সক্ষম হয় নাই। ভক্ত সৌন্দর্য্যময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করেন না। ভাগবতে (১০।৬০।৪৫ । রুক্মিণী দেবী প্রাকৃত রূপমোহ-গ্রস্ত ব্যক্তিগণকে ধিক্কার দিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—"যে স্ত্রীলোক কখনও ভবদীয় পদকমলমকরন্দ আঘ্রাণ করে নাই, সেই রমণীই চর্ম্ম, শ্মশ্রু, রোম, নখ, কেশাচ্ছন্ন ও অভ্যন্তরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত, বায়ুময় জীবিত শবতুল্য শরীরধারী পুরুষাধমকে স্বামীজ্ঞানে সেবা করিয়া থাকে।" কবি কীটস্ বলিয়াছেন,—"Beauty is truth, truth is beauty" —অর্থাৎ সুন্দরই সত্য, সত্যই সুন্দর। উক্তিটি পারমার্থিক জগতের বিচারে সত্য। কিন্তু কীটস্ তাঁহার উক্তিটিকে পার্থিব জগতের উর্দ্ধে লইয়া যাইতে

সক্ষম হন নাই বলিয়া তাহা নশ্বর ও ভ্রান্তিমূলক। প্রাকৃত জগতের গণ্ডির সীমাবদ্ধতার মধ্যে সুন্দর কখনও সত্য নহে, আবার সত্য কখনও সুন্দর নহে। ভক্ত "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমে"র উপাসক। ভগবানের সেবাই তাঁহার নিকট সত্য ও সুন্দর।

প্রকৃত সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইতে হইলে আত্মার সৌন্দর্য্য একান্ত আবশ্যক। কেবলমাত্র ব্যায়ামে শরীরকে পুষ্ট করিতে পারে, কিন্তু সুন্দর করিতে পারে না। আত্মার সৌন্দর্য্য বা পবিত্রতা ভগবৎসেবা হইতে সংরক্ষিত হয়। আত্মার সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা বাহিরের পুষ্টিকে একটী অপূর্ব্ব কমনীয়তা ও মনোজ্ঞ জ্যোতি প্রদান করিয়া থাকে—তাহার ফলে দেহটীকে একদিকে সুগঠিত এবং অন্যদিকে সুন্দর করিয়া থাকে।

কৃষ্ণসেবার রূপই রূপ এবং কৃষ্ণসেবার সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য। এই সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইলে উহা বাহিরে প্রতিফলিত হইতে কয়দিন সময় লাগে? অন্যদিকে যতই ব্যায়াম করা হউক না কেন, যতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন না কেন, যতই বেশভূষা ও পারিপাট্যের দ্বারা সুসজ্জিত হউন না কেন, সৌষ্ঠব, কমনীয়তা ও পবিত্র জ্যোতির অভাবে দেহের মনোজ্ঞতা অথবা কান্তি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। প্রকৃত সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইলে কদাকার দেহেও উহা ফুটিয়া উঠে। "Nothing ill can dwell in that temple"—অর্থাৎ এ প্রকার পবিত্র দেবমন্দিরে কোনও দুষ্ট জিনিস থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষের পূতাত্ম ঋষি, ভক্ত ও তপস্বিগণ এজন্যই এত কমনীয় হইতেন। আত্মার পবিত্রতার ফলে তাঁহারা বাহিরে অনিন্দ্যসুন্দর দেখাইতেন।

অব্যবসায়ী চঞ্চল-হৃদয় রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদি ভোগে নিযুক্ত থাকায় নানাপ্রকার ধারণা পোষণ করে। তজ্জন্য প্রাকৃত জগতের গুণ-দোষ প্রভৃতি চিন্তনীয় বিষয়সমূহ তাহার উপর বিক্রম প্রকাশ করে। বিভিন্নদিকে প্রবহমান বায়ু যেরূপ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, তদ্রূপ প্রাকৃতরূপ ও সৌন্দর্য্য জীবের সংযম-ধর্ম্মকে বিনাশ করিয়া গুণ-দোষাদিতে ব্যাপৃত হয়। সুতরাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি গ্রহণ করিয়া একায়ণ পদ্ধতিতে হরিসেবা করিলেই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি করা সম্ভব—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—শ্রীবল্লভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২৭ পৃষ্ঠার পর]

তাঁর আগে ত' ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র এসেছেন। তাঁরও আগে অন্যান্য অবতারগণ এসেছেন। তাহলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পরে এসে Fountain Source, Supreme Lord, Almighty Lord-এর বিশেষণ কি করে পাচ্ছেন, প্রশ্ন আসে। তার সমাধান করেছেন শাস্ত্রে। একই ব্যক্তি বার বার স্টেজে Part play করতে আসেন। তাহলে একই ব্যক্তি পূর্ব্বে ও পরে বার বার করে আসছেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রাচীন, সুপ্রাচীন; পুরাণ-পুরুষ সেই ভগবান্। তিনি Supreme Lord। ত্রেতাযুগে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যে এলেন, তাঁকে কি বলা হবে?—বিশেষণে বলা হয়েছে তিনি 'মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম'। আর শ্রীকৃষ্ণকে বলা হল 'লীলা-পুরুষোত্তম'। কিন্তু বিচারক্ষেত্রে বলছেন—একজন অবতারী, আর একজন অবতার। একজন হলেন অবতারের মূল, আর একজন হলেন অবতার। সেইকথাই ব্রহ্মাজী স্তবে বলেছেন, ব্রহ্ম-স্তবের মধ্যে রয়েছে,—

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অন্যান্য অবতার সব পরে এসেছেন, কিন্তু কৃষ্ণ আদি, অনাদি, Main Fountain Source। শ্রীমদ্ভাগবতে সব অবতার-সংস্থান বর্ণনা করেছেন। তার ভিতরে কৃষ্ণ হচ্ছেন অবতারী। সেই কথাটী পরিষ্কার করে বুঝাবার জন্য কবি শ্রীজয়দেব গোস্বামী 'দশাবতার-স্তোত্রম্' রচনা করলেন। প্রত্যেক Stanza'র শেষের দিকে রয়েছে,—'কেশবধৃত মীন-শরীর জয় জগদীশ হরে, কেশবধৃত রাম-শরীর জয় জগদীশ হরে, কেশবধৃত কল্কি-শরীর জয় জগদীশ হরে।' সেখানে একই কথার প্রতিধ্বনি। পাছে লোকের ভুল বুঝাবুঝি হয় এইজন্য "দশাবতার-স্তোত্রম্" লিখে শেষের দিকে কবি জয়দেব আবার একটী পৃথক্ শ্লোকে স্তব করেছেন।—

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যান্ দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।

পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥

কৃষ্ণ অবতারী। সুতরাং সেই যে কৃষ্ণ, তিনি আগেই আসুন, আর পরেই আসুন, বার বার করে আসুন, তিনি সুপ্রাচীন, পুরাণ-পুরুষ। সেই কথাই শাস্ত্রে বলছেন সব জায়গায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাধারণের ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন না, অসাধারণ জন্ম তাঁর দেখাচ্ছেন যখন দেবকীর কাছে আবির্ভূত হয়েছেন। দেবকীর গর্ভস্তুতি করতে এসেছেন দেবতারা। তাঁর গর্ভস্থ ভগবান্ শ্রীবাসুদেবকে তাঁরা স্তব-স্তুতি করছেন।—

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্যযোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥

দেবতাগণ সত্যস্বরূপ ভগবান্‌কে কেবল 'সত্য'-শব্দ দিয়ে তাঁর বন্দনা করেছেন। প্রত্যেকটী 'সত্য'-শব্দের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ রয়েছে। তুমি সত্য-স্বরূপ, তুমি সত্যবাক্, তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রভৃতি। সত্য তোমার থেকে এসেছে। সত্য-মিথ্যা এজগতে কোথা থেকে এল? সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি কি? ভগবান্ হলেন সত্যের মূল নীতি-আদর্শ।

সত্য কাকে বলা হবে? মিথ্যা কাকে বলা হবে? একজন বলছেন,—মহাশয়! আমি ভগবান্‌কে মানি। কিরকম মানেন?—ভগবান্‌কে মানি, নীতি-আদর্শ মানি। এই জগতে যে ঈশ্বরসৃষ্ট প্রাণী, তার ভিতরে যে মানুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর্য্যঋষিগণ পরিস্কারভাবে বলেছেন শাস্ত্রে,—মানুষই হল শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—Best creation of God। একজন কবি বলেছেন,—'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' 'More than a man you cannot be'—মেকলে বলেছেন। তার ব্যাখা রয়েছে শাস্ত্রে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—কথাটা কেন বলেছেন? মনুষ্যত্বের যে চরম বিকাশ সেইটীই কবি দেখাতে, বুঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু ডারউইন সাহেবের Evolution Theory আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই,—From ape to man। সেই বিচারের সঙ্গে সনাতন আর্য্যঋষিগণের বিচারের একটা পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। কোথায়?—ডারউইন সাহেব বললেন, এই যে মানুষ এই হল চরম, এর পরে আর কিছু নাই। কিন্তু আর্য্যঋষিগণ বললেন, এর পরেও কিছু কথা আছে। 'More than a man you can not be'—তার পরেও কিছু কথা আছে। কি?—'Manliness is next to godliness'—তাহলে একটু উপরের কথা হল। মানব দেবত্ব লাভ করে।

'Manliness is next to godliness, but not Supreme Godliness'—সেকথা আমাদের শাস্ত্রে রয়েছে। সেদিক দিয়ে এটা প্রমাণিত। ঋষিগণ যখন এটার একদিক দেখিয়েছেন, আবার আর একদিকে দেখাচ্ছেন যে, এই মানুষ যদি মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশটা না দেখাতে পারে, যদি মনুষ্যত্বের অপব্যবহার করে, তাহলে তার পুনরায় Diversion—অবনতি, অধঃপতন। সেকথাও কৃষ্ণই গীতায় বলেছেন,—'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।' এরূপ বিচার বর্ণিত হয়েছে ভাগবতেও। গীতার মধ্যেও আপনারা শ্লোক পাচ্ছেন—যেখানে ভগবান্ কৃষ্ণ দৈবাসুরসম্পদ বিভাগযোগ ব্যাখ্যা করেছেন, সেই গীতার ষোড়শ অধ্যায়েও আসুরিক সম্পদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার চরম ক্ষেত্রে বলছেন,—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥

এই হল তাদের Diversion—অধঃপতন। মানুষ যদি তার মনুষ্যত্বের বিকাশ, প্রকাশ, অস্তিত্ব প্রমাণ করতে না পারে, তখন তার অধঃপতন অনিবার্য্য, শাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং আমাদের ঋষিগণের নীতিটা নিতে হবে। ঋষিগণ বলছেন যে, এই মানুষ অবস্থা-বিশেষে উন্নতি লাভ করতে পারে, আবার অবনতিও তার আছে। উন্নতি ও অবনতির যথেষ্ট উদাহরণ আছে।—

আমাদের দেশের একজন রাজা কুকলাস হয়ে গেলেন, অহল্যা পাষাণী হয়ে গেলেন, সুদর্শন বিদ্যাধর সর্প কুলে জন্মগ্রহণ করলেন, ধনকুবেরের দুই পুত্র নলকুবের ও মণিগ্রীব বৃক্ষজন্ম লাভ করলেন—যমলার্জ্জুন বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করলেন। এগুলো নিশ্চয়ই অধঃপতনের উদাহরণ। ঠিক ঐ রকম ধরণের উন্নতিরও উদাহরণ আছে। সুতরাং আর্য্যঋষিগণের যে বিচার তার উপরে কারও কোন কথা নাই, বলবার কোন ক্ষমতা বা অধিকার নাই। তাঁরা বিচার-যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন সবকিছু। ভগবান্ এ জগতে আসছেন, সেটা অজের জন্মলীলা রহস্য। আজ যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, সেটাকে ব্যাখ্যা করেছেন শাস্ত্রে অজের জন্মলীলা রহস্যরূপে। সত্যই রহস্য এটা। যিনি জন্মগ্রহণ করেন না, যাঁর প্রাকৃত জন্ম-মৃত্যু নাই, তিনি আবার কি করে জন্মগ্রহণ করছেন মানুষের মত? আকারটা নরাকার, কিন্তু সাধারণ

মানুষের যে দোষ-ত্রুটী, অসম্পূর্ণতা, অজ্ঞতা—এগুলো সেই ভগবানের নাই। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্, আমরা অজ্ঞ। তিনি Omnicient Lord, Omnipresent Lord, Omnipotent Lord—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্। তিনি সেইজন্য অর্জ্জুনকে বললেন,—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

আমি অজ হয়েও জন্মলীলা প্রকাশ করছি। কেন?—জগজ্জীবের পরে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা প্রকাশ করার জন্য প্রেমময় ভগবানের—এই আবির্ভাব। শাস্ত্রে কৃষ্ণ নিজে বলছেন যে, আমার জন্মের সঙ্গে সাধারণ মানুষের জন্ম এক কর না, ভুল হবে, অপরাধ হবে, অন্যায় হবে। There is a great difference between my birth and that of others. I come to this world accordingly as I desire, whereas the Jeevas are hurled down into this world and born under the influence of my Deluding Energy Maya. I am the Lord of Maya, but the Jeevas are under her clutches. এই ত' পার্থক্য। ঈশ্বরের আবির্ভাবে এই পার্থক্য দেখাচ্ছেন। সাধারণ মানুষের জন্ম ওরকম নয়। প্রাকৃত বলে পার্থক্য রয়েছে সেখানে। ভগবানের আবির্ভাবেরও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সুতরাং সেই যে প্রেমময় ভগবান্ তাঁর নাম-রূপ-গুণ-লীলা সবটাই Identical প্রমাণ করছেন। ভগবান্ এবং ভগবানের নাম দুই-ই এক। যদি ভগবানের নাম ধরে আমরা আহ্বান করি, তাহলে স্বয়ং ভগবান্ আমার সামনে আবির্ভূত হয়ে আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন দেন। প্রাকৃত জগতের যে শব্দ, সে শব্দে যদি আমি সম্বোধন করি, সে শব্দে ঠিক সাড়া পাচ্ছি না। কিন্তু ভগবানের যে কোন মুখ্যনাম যদি উচ্চারণ করি, সেই নামে ক্রন্দন করি, তাহলে ভগবান্ সাধক-সাধিকাকে সাক্ষাৎ দর্শন দেন। তফাৎ হচ্ছে ঐখানে। Identity রয়েছেন সেখানে। ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা সবটাই Identical স্বয়ংরূপ ভগবানের সঙ্গে।

শাস্ত্রে নামতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। Absolute Sound—শব্দব্রহ্ম—নামব্রহ্ম। ব্যাখ্যা করেছেন পরব্রহ্মের কথা,—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম॥

পরব্রহ্ম ভগবান্ কে? তিনি যে Non-Entity নন, তাঁর যে সব ক্ষমতা

আছে, সেটাই দেখাচ্ছেন। আর সেই ভগবানের যে নাম আর নামী দুইই অভিন্ন, সেটাও দেখাচ্ছেন।—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

এই কলিকালে স্বয়ং ভগবানের দর্শন মেলে না, তজ্জন্যই নামের সাধনের কথা বলছেন। নামের সাধনই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র মাধ্যম—Medium। নামের সাধনের কথা কেন বলছেন?—নামের সাধনের দ্বারা পরব্রহ্ম সাক্ষাৎ ভগবানের দর্শন লাভ হবে। সেইজন্য এই কলিকালে নামই হল—Proper Medium—উৎকৃষ্ট মাধ্যম, উপযুক্ত মাধ্যম। এর থেকে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম আর নাই। গীতা, ভাগবত প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রে দেখবেন এই কথাই আছে।—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

সত্যযুগে ধ্যান-ধারণা, তপস্যা করে মানুষ ভগবানকে লাভ করত, ত্রেতাযুগে যাগ-যজ্ঞের দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যেত, দ্বাপরযুগে বিশেষতঃ পূজা-অর্চ্চনের দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যেত। 'কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ'—কলিকালে একমাত্র হরিনাম কীর্ত্তনে সেই ফল লাভ হয়।—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

এছাড়া গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই। এখানে হরি-শব্দ আছে, কৃষ্ণ-শব্দ আছে। যখন শৌনকাদি ৬০ হাজার ঋষি নৈমিষারণ্যে ভাগবত-সভায় বসে আছেন, সেইখানে ৬০ হাজার ঋষি প্রশ্ন করছেন সূত গোস্বামীর নিকট,—এই কলিকালে আমাদের উপায় কি হবে? কেন আপনাদের এত চিন্তা-ভাবনা কিসের, এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন আপনারা? দারুণ কলিকাল এসে যাচ্ছে, দ্বাপর যুগের শেষের কথা, ঋষিগণ খুব চিন্তিত, ভাবিত—আমরা আমাদের সাধন-ভজন কি করে রক্ষা করব? তাঁরা খুব উদ্বিগ্ন। শ্রীসূত গোস্বামী বললেন,—এই একই প্রশ্ন ত' আমার গুরুদেবের নিকট করেছিলেন পরীক্ষিৎ মহারাজ। শ্রীশুকদেব গোস্বামী এই প্রশ্নের সমাধান করেছেন, উত্তর দিয়েছেন। আমি এখানে আর নূতন করে কি বলব? সেই প্রশ্নের সমাধানটা আপনাদের কাছে বলি পুনরায়। সেখানে উত্তর দিয়েছেন কি?—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

কলি অশেষদোষের আকর সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঋষিগণ আপনারা যাহা বলেছেন, কথাটা ঠিক। কলি মানে বিবাদ-বিসম্বাদ, মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য্য। সেই কলিকাল সর্ব্বতোভাবে ঘৃণিত। কিন্তু কলির অশেষ দোষ থাকলেও একটা মহৎগুণ আছে। মহৎগুণ কি?—"কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥" —কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের দ্বারা, ভগবানের নাম-কীর্ত্তনের দ্বারা কলিজীব উদ্ধার লাভ করবেন। সুতরাং আপনাদের ব্যবস্থা ত' হয়ে আছে। হে ঋষিগণ! আপনারা চিন্তা করছেন কেন? আপনারা অহরহঃ নিরন্তর সেই ভগবানের নাম করুন। তাহলেই ত' আপনাদের জন্য সবকিছু আছে।

'মুক্তি' সম্বন্ধে যে ধারণা দিয়েছেন শাস্ত্রে, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ। কেউ 'মুক্তি' বলতে ভাবছেন—ভগবানের সঙ্গে মিশে যাব। নির্ব্বিশেষবাদী যারা 'নেতি নেতি' করছেন, তাদের বিচার—ভগবানের সঙ্গে মিশে ভগবান্ হয়ে যাব। ভগবানের নাম করতে করতে ভগবানের সেবা করা উচিত, সেবা করতে না গিয়ে আমি ভগবান্ হয়ে গেলাম, সেবা ত' হল না! ওটাকে কি 'সেবা' বলা হবে?—ওটা Anarchism। এটাকে নিঃসন্দেহে Anarchism—রাষ্ট্রদ্রোহিতা, রাজদ্রোহ বলা চলবে। সুতরাং রাজদ্রোহী হয়ে আমাদের লাভ নাই। ঈশ্বরের ভজন-সাধন করতে গিয়ে তাঁর সেবা করা উচিত। তাঁর সেবায় ধন্য হওয়া উচিত। তাঁর সেবারূপ যে অমৃত, সেইটা আস্বাদন করা উচিত। সেইটা শাস্ত্রে বললেন। সুতরাং ভগবানের সঙ্গে আমরা মিশে যাব—Dialuted হয়ে যাব, কি স্বয়ং ভগবান্ হয়ে যাব, কি ভগবানের সিংহাসন দখল করব—এ আশা কখনই ভজনপ্রয়াসী ভক্ত পোষণ করেন না। ভক্তের প্রার্থনা,—হে ভগবান! আমি তোমার সেবা করতে চাই, আমি তোমার সেবা করে ধন্য হতে চাই।

তাই আপনারা লক্ষ্য করবেন—আর্য্যঋষিগণের বিচার। পাশ্চাত্ত্য দেশে Christianity তে বলুন, আর মুসলিম ধর্ম্মেই বলুন, সেখানে শান্ত রসের সেবা, দাস্যভাবে সেবা আছে মাত্র। Christianity তে কি বলা হয়েছে?—"Fatherhood of Godhead". তার মানে হে ভগবান্! তুমি আমাদের রুজি-রোজগার দাও। God! give us our daily bread. ভগবান্ যদি আমাদের father হন—পিতা হন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের Maintain করবার জন্য—ভরণ-পোষণের জন্য বাধ্য আছেন।

Sonhood of Godhead—এই নিয়ে আজ আলোচনা। আজ যে

আমাদের জন্মাষ্টমী-তিথি, এটা Sonhood of Godhead এর বিচার। ভগবান্ স্বয়ং পুত্রত্ব স্বীকার করে এসেছেন বসুদেব-দেবকীর, নন্দ-যশোদার। আমরা সেবা করে ধন্য হতে চাই। মা-যশোদা প্রার্থনা করেছেন—তুমি আমার পুত্র হও, আমি তোমার সেবা করব। আর্য্যঋষিগণের শিক্ষা এর উপরে আরও কথা রয়েছে। মধুর রসের কথা যেখানে বলছেন, আরও উচ্চ ধরণের কথা Consorthood of Godhead—ব্রজগোপীগণ যেভাবে কৃষ্ণসেবা করেছেন। এসব বিচারগুলো আর্য্যঋষিগণের অবদান। যাঁরা সামান্য বিচারের মধ্যে আবদ্ধ নন, তাঁরা বলছেন ভগবানের সেবা করতে হবে আমাদের। ভগবানকে দিয়ে খাটিয়ে নেব না। ভগবান্, তুমি আমাদের জন্য দিবানিশি খাট, পরিশ্রম কর, এটা Fatherhood of Godhead এর মধ্যে চিন্তা আছে। কিন্তু Sonhood of Godhead এর মধ্যে ও চিন্তা নাই, সেখানে বাৎসল্যরসের সেবাচিন্তা আছে। Consorthood of Godhead—মধুররসের মধ্যে বিশেষ সেবাচিন্তা আছে। উন্নত ধরণের বিচার দেখিয়েছেন ঋষিগণ। এটা আমাদের আর্য্যঋষিগণের অবদান। (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্যে মর্ত্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৮ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১৩ পরিচ্ছেদে আমরা পাই,—

'জগন্নাথ মিশ্র কহে—স্বপ্ন যে দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময় ধাম মোর হৃদয়ে পশিল॥
আমার হৃদয় হৈতে তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়ে॥"

সুতরাং সাধারণ মানবের জন্মের ন্যায় শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গী-পার্ষদ ও তদনুগত জন ব্যতীত আর কাহারও লেখনী বা বক্তব্যের উপর নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। ভক্ত না হইলে কি ভগবানকে চেনা যায়? ভক্ত ব্যতীত আর কেহই তাঁহাকে চিনিতে সমর্থ হয় না। জহুরীতেই জহর চেনে। ভক্তের সংস্পর্শে না আসিলে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-বৈশিষ্ট্যাদি বুঝা যাইবে না।

লেখক 'নিবেদনের' ২য় পৃষ্ঠায় ধর্ম্মসংস্থাপনার্থর উদ্দেশ্যে চৈতন্যের আবির্ভাবাত্মক জন্ম স্বীকার করায় তাঁহার জন্ম যে মানুষের ন্যায় পৈত্রিক ধাতু সম্বন্ধীয় জন্মাদি হইতে পারে না, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। কর্ম্মফল-বাধ্য মানুষের জন্মকে ত' আবির্ভাব বলা হয় না। আবার লেখক ২০ পৃষ্ঠার বক্তব্যে মানব চৈতন্যকে 'ঈশ্বর' বলিয়া ঘোষণা কাল্পনিক অপবাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লেখক পুস্তকের ২৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"সেই চিরশাশ্বত সূর্য হ'লো 'মানুষ চৈতন্য'। 'ভগবান চৈতন্য' সেই সূর্যকে প্রচ্ছন্ন রাখার কৃত্রিম মেঘ-স্বরূপ আভরণ মাত্র।"

লেখকের ঐ 'নিবেদনে'র ২য় পৃষ্ঠার বক্তব্যের সহিত ২০ পৃষ্ঠা ও ২৯ পৃষ্ঠার বক্তব্যের সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য হইতেছে কি? গীতার অমোঘ বাণী ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ যাঁর অবিসম্বাদী আবির্ভাব, তাঁহাকে ঈশ্বর না বলিয়া মানুষ বলাই যদি সমীচীন হয়, তাহা হইলে গীতার 'ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ' শব্দটি যে শ্লোকে আছে, সেই ৪।৮ শ্লোকের অর্থ যথাযথ নির্ণীত হয় কি? সুধী ভক্তপাঠকগণ ইহা বিচার করিবেন।

(৩) আবার ১৯ পৃষ্ঠায় লেখকের বক্তব্য—"এ প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস তাঁর গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

'সর্ব্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবন দাস।
অবশেষ-পাত্র-নারায়ণী-গর্ভজাত॥'

(চৈঃ ভাঃ ৩।৬।২২১)

এবং চরিতামৃতের রচয়িতা কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন,—

'নারায়ণী-চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভোজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥'

[চৈতন্যচরিতামৃত ১।৮।৩৭]

কিন্তু উচ্ছিষ্ট পান খেয়ে কোন রমণী সন্তান হয় কেমন করে এ বিজ্ঞানের যুগে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে।"

লেখকের উক্ত বক্তব্যের উত্তরে জানাইতেছি যে,. লেখক 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' হইতে যে শ্লোকটি লিখিয়াছেন তাহা ছাপা ভুল আছে; উহা নিম্নরূপ হইবে ;—

"নারায়ণী-চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৮।৪১)

শ্রীবৃন্দাবনদাসের জননী নারায়ণী শিশুকাল হইতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ভোজনাবশেষ প্রাপ্ত হইতেন।

ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা—বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজন-শেষ প্রভু করে দান॥
পরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ।
সকল বৈষ্ণব তাঁরে করে আশীর্ব্বাদ॥
ধন্য ধন্য এই সে সেবিল নারায়ণ।
বালিকা-স্বভাবে ধন্য ইহার জীবন॥
খাইলে প্রভুর আজ্ঞা হয়—'নারায়ণী।
কৃষ্ণের পরমানন্দে কান্দ দেখি শুনি॥"
হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব।
'কৃষ্ণ' বলি' কান্দে অতি বালিকা-স্বভাব॥
অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে এই ধ্বনি।
'গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী॥'

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০।২৯১-২৯৭)

শ্রীচৈতন্যভাগবতের উপরোক্ত পয়ার শ্লোকগুলির মর্ম্মানুসারে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জননী নারায়ণীদেবী শিশুকাল হইতেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনান্তে ভোজন-উচ্ছিষ্ট প্রাপ্ত হইতেন। অতএব চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট পান খাইয়া নারায়ণীর গর্ভবতী হওয়ার কথা লেখক যাহা লিখিয়াছেন তাহা অবান্তর। কেননা অপ্রাপ্তবয়স্ক সম্পর্কে ঐ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখা মানেই সেই ব্যক্তিই চরিত্রহীন। সুতরাং ঐরূপ মিথ্যা কথা লিখিয়া লেখক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি অবৈধ দোষারোপ করিয়াছেন।

'চৈতন্যচরিতামৃত' আদি ৮।৪১ শ্লোকের অনুভাষ্যে শ্রীরূপানুগাচার্য্য পরমহংসকুল-চূড়ামণি শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন, —"শ্রীনারায়ণীদেবী সম্বন্ধে শ্রীকবি কর্ণপুর শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ দীপিকায় লিখিয়াছেন,—"অম্বিকায়াঃ স্বসা যাসীন্নাম্না শ্রীল-কিলিম্বিকা। কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং প্রভুঞ্জানা সেয়ং নারায়ণী মতা॥" শ্রীকৃষ্ণের স্তনদাত্রী—'অম্বিকা', তাঁহার ভগিনী—'কিলিম্বিকা'। তিনি কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন। ইনিই শ্রীগৌরাবতারে 'নারায়ণী দেবী'।

শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর গর্ভজাত সন্তানই ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনদাস। জননী ঠাকুরাণী শ্রীগৌরসুন্দরের বিষসাশী বা কৃপাপাত্রী। তাঁহার পরিচয়েই ঠাকুর মহাশয় পরিচিত, সুতরাং পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় বৈষ্ণবের পরিচয়ে আবশ্যক নহে বলিয়া উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি ১৭শ পরিচ্ছেদের অনুভাষ্যে শ্রীরূপানুগাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন,—"কোন কোন চরিত্রহীন পাষণ্ড-প্রকৃতি প্রাকৃত-সহজিয়া ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনদাসকে প্রাকৃত বুদ্ধিবশে নিন্দা ও বিদ্বেষ করিবার নিমিত্ত বলেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট বা তাম্বূল ভোজন-ফলে শ্রীমতী নারায়ণীর বিধবাবস্থায় ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের জন্ম হয়। এরূপ নিন্দা-প্রলাপ নিতান্ত অপরাধময়, সুতরাং অশ্রাব্য।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জীবনী হইতে কিয়দংশ বিবৃত করিতেছি,—"শিশুকালেই ঠাকুরের পিতৃবিয়োগ হওয়ায় এবং পিতাঠাকুর মহাশয় শ্রীভগবান্ চৈতন্যচন্দ্রের সেবা-নিরত হইবার পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করায় তাঁহার কথা বিশেষভাবে কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে হরিপাদপদ্ম আশ্রয় না করায় পিতৃবংশের পরিচয়ে শ্রীবৃন্দাবনদাসের পরিচয় হয় নাই।"

উপরোক্ত অবস্থায় প্রমাণিত হয় যে, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার পিতৃদেব বৈকুণ্ঠ বিপ্রের জীবদ্দশাতেই জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার শিশুকালে তাঁহার পিতা পরলোক গমন করেন। সুতরাং পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠায় নারায়ণীদেবীর গর্ভবতী হওয়া সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত।

(৪) লেখক ঐ পুস্তকের ২৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"সেই চির শাশ্বত সূর্য হলো 'মানুষ চৈতন্য'। 'ভগবান চৈতন্য' সেই সূর্যকে প্রচ্ছন্ন রাখার কৃত্রিম মেঘ-স্বরূপ আভরণ মাত্র।

একটি প্রত্যক্ষ উদাহরণ : নীলাম্বর চক্রবর্তী চৈতন্যের জন্ম-পত্রিকা গণনা করে চৈতন্যকে সাক্ষাৎ ভগবান (নারায়ণ) বলে রায় দিয়েছেন।

"বিপ্র বোলে, "এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ইহা হইতে সর্ব্বধর্ম্ম হইবে স্থাপন॥"

[চৈতন্যভাগবত ১।২।২৬৬]

এখানে দুটি জিনিস লক্ষ্যণীয়। প্রথমত, চৈতন্য 'সাক্ষাৎ নারায়ণ'। এবং দ্বিতীয়ত, চৈতন্য কর্তৃক 'সর্ব্বধর্ম্ম স্থাপন'। ধরেই নিলাম এ' বক্তব্য 'হানড্রেড পার্সেন্ট' নীলাম্বর চক্রবর্তীর। বেশ। কিন্তু এই যদি জ্যোতিষী নীলাম্বর

চক্রবর্তীর বক্তব্য হয়, তাহলে, ভাগবতের 'সাক্ষাৎ নারায়ণ,' 'চৈতন্য চরিতামৃতে' এ স্বীকৃত হলেন না কেন ?"

লেখক আবার ৩০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"জ্যোতিষী নীলাম্বর যদি চৈতন্যকে "স্বয়ং নারায়ণ" বলে স্থাপন করেন। তা'হলে সেটা তো ইতিহাস-সত্য কথা। তা নীলাম্বর চক্রবর্তী শত কল্পনাপ্রসূত হয়ে বললেও।

* * * *

সুতরাং নীলাম্বর চক্রবর্তী কথিত চৈতন্য 'স্বয়ং নারায়ন' কথাটি যদি সর্বান্ত সত্যি হতো, তাহলে, সে কথা শুধুমাত্র চৈতন্য ভাগবতে থাকতো না, মুরারির 'কড়চা'তেও থাকতো। এবং সেক্ষেত্রে কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃতেও চৈতন্যকে একাধিকবার ভগবান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তা ভক্তের তুলিতে আঁকা নিছক ভগবানের ছবি।"

লেখকের লিখিত 'চৈতন্য ভাগবতের' পয়ার শ্লোকটি আদি ৩।১৬ হইবে। উহা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর উক্তি নহে। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী শ্রীচৈতন্যের লগ্ন-বিচারে সর্ব্বসমক্ষে অতীব বিস্ময়কর কথা বর্ণনা করিতে থাকিলে তথায় একজন পরমার্থবিৎ-মহাজন ব্রাহ্মণরূপে উপস্থিত হইয়া শিশু চৈতন্যকে সাক্ষাৎ নারায়ণ, শুদ্ধ সনাতন ভাগবতধর্ম্ম-সংস্থাপক ও আরও অলৌকিক গুণের অধিকারী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। লেখকের লিখিত চৈতন্যভাগবতের 'বিপ্র বলে ; এ শিশু'—শ্লোকটির পূর্ব্বশ্লোক পাঠ করিলে ইহা সহজেই বুঝা যায়—

"সেইখানে বিপ্ররূপে এক মহাজন।
প্রভুর ভবিষ্য-কর্ম্ম করয়ে কথন॥"

[চৈঃ ভাঃ আদি ৩।১৫]

অতএব লেখক ঐ ২৯ পৃষ্ঠায় চৈতন্যভাগবতের যে শ্লোকটি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী-কথিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। বরং ঐ শ্লোকটি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর বক্তব্য না হইয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে এক বিপ্রের বক্তব্য হইতেছে। এক্ষেত্রে বিপ্র-কথিত 'চৈতন্য সাক্ষাৎ নারায়ণ' কথাটি লেখক ইতিহাস-সত্য কথা বলিয়া মান্য করিবেন কি ?

উক্ত পৃষ্ঠায় লেখকের আরও বক্তব্য—'চৈতন্যভাগবতে'র 'সাক্ষাৎ নারায়ণ,' 'চৈতন্য চরিতামৃত'-এ স্বীকৃত হইলেন না কেন ? (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

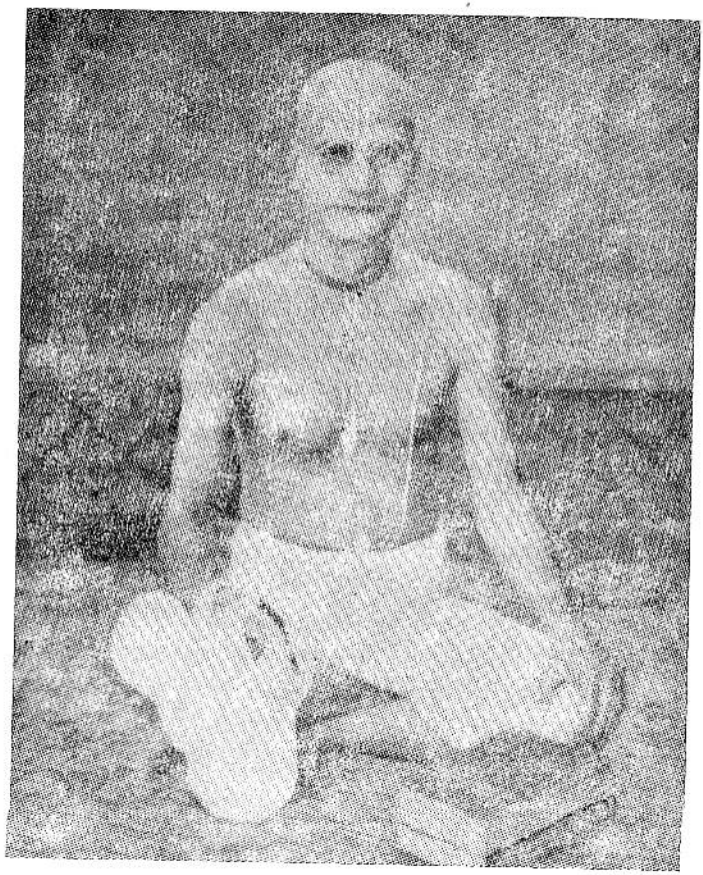
॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

২২শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব



নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
১২ পদ্মনাভ, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ২৯শে পদ্মনাভ, ১৭ই আশ্বিন, '৯৭ (৪।১০।৯০) বৃহস্পতিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ২২শ বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি সবান্ধবে যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—৩১শে ভাদ্র, ১৩৯৭

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী ঃ—

১৭ই আশ্বিন (ইং ৪।১০।৯০), বৃহস্পতিবার—

প্রাতে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্নে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে "সাধারণ-সম্পাদক"-এর নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪২শ বর্ষ | ৪ দামোদর, কারণোদশায়ী, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ
৩১শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৯৭, ইং ১৮।১০।৯০ | ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীদুর্ব্বাসামুনিকৃতং শ্রীশ্রীনন্দনন্দন-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে শ্রীনারদ-বহুলাশ্ব-সংবাদে
শ্রীনন্দনন্দন-স্তোত্রবর্ণনে বিংশোঽধ্যায়ে]

শ্রীদুর্ব্বাসামুনিরুবাচ,—

১। বালং নবীন-শতপত্র-বিশালনেত্রং
বিম্বাধরং সজলমেঘরুচিং মনোজ্ঞম্।
মন্দস্মিতং মধুর-সুন্দর-মন্দযানং
শ্রীনন্দনন্দনমহং মনসা নমামি॥ ২৪॥

[দুর্ব্বাসাঋষি বিরজা পার হইয়া গোলোকধামে প্রবিষ্ট হইলেনঃ; তথায় বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন ও যমুনাপুলিন দর্শনপূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া গোপ-গোপীগণাবৃত,

গোগণ-সমন্বিত নিকুঞ্জমধ্যে জ্যোতির্ম্ময়মণ্ডলস্থ দিব্য লক্ষদলপদ্মে গোলোকপতি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডনাথ রাধাপতি হরি পরিপূর্ণতম পুরুষোত্তম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান প্রত্যক্ষ করিলেন। বালক শ্রীকৃষ্ণ তখন হাসিতেছিলেন; দুর্ব্বাসা পুনরায় যমুনা-সমীপে মহাবনের পুণ্য রমণীয় সৈকতে বালকগণসহ ভগবান্ বিচরণ করিতেছেন দেখিলেন। ঋষি দুর্ব্বাসা তাঁহাকে পরাৎপরতত্ত্ব বলিয়া জানিতে পারিয়া নন্দনন্দনকে বারবার প্রণাম করিয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন,—]

শ্রীদুর্ব্বাসামুনি বলিলেন,—বালক নবীন কমলতুল্য বিশাললোচন, বিম্বাধর, সজলজলদকান্তি, মনোজ্ঞ মন্দহাস্যকরী মধুর-সুন্দর, মন্দগামী শ্রীনন্দনন্দনকে আমি মনে মনে প্রণাম করি ॥ ২৪ ॥

২। মঞ্জীর-নূপুররণন্নব-রত্নকাঞ্চী
শ্রীহারকেশরিনখ-প্রতিযন্ত্রসঙ্ঘম্।
দৃষ্ট্বার্ত্তিহারি-মসিবিন্দু-বিরাজমানং
বন্দে কলিন্দতনুজাতট-বালকেলিম্ ॥ ২৫ ॥

শব্দায়মান মঞ্জীর ও নূপুরযুক্ত উজ্জ্বল রত্নকাঞ্চীধারী সংগ্রথিত সিংহনখ-শ্রেণীর হার-ভূষিত দুঃখহারক-দৃষ্টিকারী, মসিবিন্দু-শোভিত, যমুনাতীরে বালক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি ॥ ২৫ ॥

৩। পূর্ণেন্দুসুন্দর-মুখোপরি কুঞ্চিতাগ্রাঃ
কেশা নবীনঘন-নীলনিভাঃ স্ফুরন্তঃ।
রাজন্ত আনতশিরঃ-কুমুদস্য যস্য
নন্দাত্মজায় সবলায় নমো নমস্তে ॥ ২৬ ॥

যাঁহার পূর্ণেন্দু-সদৃশ সুন্দর বদনের উপর কুঞ্চিতাগ্র কেশকলাপ নবীন মেঘের নীলপ্রভা বিচ্ছুরিত করত শোভিত হয়, যিনি আনতমস্তক, সেই কুমুদবদন নন্দনন্দনকে বলরামের সহিত বারবার প্রণাম করি ॥ ২৬ ॥

৪। শ্রীনন্দনন্দন-স্তোত্রং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
তন্নেত্রগোচরো যাতি সানন্দো নন্দনন্দনঃ ॥ ২৭ ॥

যে মানব শ্রীনন্দনন্দনের এই স্তোত্র প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগান্তে পাঠ করেন, নন্দনন্দন সানন্দে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হন ॥ ২৭ ॥

শ্রীনারদ উবাচ,—

৫। ইতি প্রণম্য শ্রীকৃষ্ণং দুর্ব্বাসা মুনিসত্তমঃ।
তং ধ্যায়ন্ প্রজপন্ প্রাগাদ্বদর্য্যাশ্রমমুত্তমম্ ॥ ২৮ ॥

শ্রীনারদ বলিলেন,—মুনিসত্তম দুর্ব্বাসা শ্রীকৃষ্ণকে এইপ্রকারে প্রণাম করিয়া কৃষ্ণচিন্তা ও কৃষ্ণনাম জপ করিতে করিতে উত্তম বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন ॥ ২৮ ॥

[এই অদ্ভুত গোলোকখণ্ড পরমগুহ্য ; শ্রীকৃষ্ণ গোলোকের নিকুঞ্জমধ্যে রাসমণ্ডলে শ্রীমতী রাধার নিকট ইহা প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তন করেন। রাধা আমাকে ইহা দান করেন ; আমি সর্ব্বার্থপ্রদ এই উত্তম গোলোকখণ্ড তোমাকে দান করিলাম ও শ্রবণ করাইলাম। বিপ্র ইহা পাঠ করিলে সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেন ; ক্ষত্রিয় শুনিলে সাক্ষাৎ প্রচণ্ড বিক্রম রাজচক্রবর্ত্তী হন ; বৈশ্য শুনিলে ধনপতি এবং শূদ্র শ্রবণ করিলে বন্ধনমুক্ত হইয়া থাকে। জগতে কেহ যদি নিষ্কামভাবে ইহা শ্রবণ করেন, তবে তিনি জীবন্মুক্ত হন। যিনি ভক্তিভাব-সমন্বিত হইয়া ইহা নিত্য সম্যক্ পাঠ করেন, তিনি প্রকৃতির অতীত শ্রীকৃষ্ণের গোলোকধামে গমন করিয়া থাকেন।]

পরমার্থী কে ?

পরমার্থের স্বরূপ-নির্ণয়ে পূর্ব্বপক্ষ

পরমার্থ কি ?—এই প্রশ্ন অনেকে করিবেন ; অতএব অগ্রেই ইহার উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে অনেকেই মানবগণকে স্মার্ত্ত ও পরমার্থ —এই দুইটী ভাগে বিভক্ত করেন। তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিলে বোধ হয় যে, যাঁহারা স্মার্ত্ত-বিধিসকল মানেন না, কেবল হরিভক্তিবিলাস-মতে ব্রতাদি ধারণ করেন—তাঁহারাই পরমার্থী। অন্য কোন স্থানে আমরা এরূপ শুনিয়াছিলাম যে, যাঁহারা মাংস-ভোজনে বিরত, তাঁহারাই পরমার্থী ; কোন সময় কোন পুরাতনকল্প লোক বাহ্যলিঙ্গ-সকলকেই পরমার্থ-চিহ্ন বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রকার সিদ্ধান্তদ্বারা মূল পরমার্থ-তত্ত্ব বহুদিবস হইতে আচ্ছাদিত হইয়া আসিতেছে। অতএব 'পরমার্থ' শব্দের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে আমরা যত্ন করিতেছি।

'পরম' ও 'অর্থ' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা ও প্রতি কর্ম্মই 'অর্থ'-যুক্ত

'পরমার্থ'-শব্দে 'পরম' ও 'অর্থ' এই দুইটী সংযোজিত আছে। 'পরম' শব্দে শ্রেষ্ঠ এবং 'অর্থ' শব্দে প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য বুঝায়। কর্ম্ম-মাত্রেরই একটী না একটী নিকট উদ্দেশ্য আছে। বাস করাই গৃহের উদ্দেশ্য; ভোজন করাই রন্ধনের উদ্দেশ্য; জ্ঞান সংগ্রহ করাই পাঠের উদ্দেশ্য; পুণ্য সঞ্চয় করাই সৎকর্ম্মের উদ্দেশ্য।—এই সকল উদ্দেশ্য ঐ ঐ কর্ম্মের অর্থ। যাহাকে এক 'কর্ম্মের' অর্থ বলিয়া লক্ষ্য করি, তাহা আবার 'কর্ম্ম' না হইয়া অন্য 'অর্থ' প্রসব করে। ক্ষুন্নিবৃত্তি আবার কর্ম্মরূপী হইয়া কার্য্যক্ষমতা ও শরীর-পুষ্টিরূপ ফলোৎপত্তি করে।

কর্ম্ম 'অর্থ'হীন অর্থাৎ উদ্দেশ্য-শূন্য হইলে পরমার্থ হয়

এবম্বিধ কর্ম্ম ও অর্থ-শৃঙ্খলরূপে ক্রমান্বয়ে অবশেষে জীবন-যাত্রারূপ একটী 'অর্থ'কে প্রাপ্তি করায়। জীবন-যাত্রাও পরে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসারূপ অর্থকে উদ্দেশ করিতে পারে। এইরূপ 'কর্ম্ম' ও 'অর্থ' পর্য্যায়ক্রমে চলিতে চলিতে অবশেষে যে অর্থ উদয় হয়, অর্থাৎ যে অর্থের কর্ম্মরূপতা ও অন্যার্থ উৎপাদকতা থাকে না—সেই অর্থই পরমার্থ। পরমার্থই সর্ব্ব কর্ম্মের চরমার্থ। যাঁহারা অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক কর্ম্ম করেন, তাঁহারাই অর্থী। যাঁহারা পরমার্থানুসন্ধানপূর্ব্বক কর্ম্ম করেন, তাঁহারা পরমার্থী।

অর্থী ও পরমার্থীর ভেদ

অর্থী ও পরমার্থীর কোনপ্রকার বাহ্যভেদ নাই, কেবল অন্তর্নিষ্ঠার ভেদ মাত্র। যথা, ভাগবতে—

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥
বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ (ভাঃ ১।২।৯-১১)

সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ! অনেকেই ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম ও কামের ফল সুখ—ইহা বলিয়া জীবসকলকে ধর্ম্মে প্রলোভিত করেন। কিন্তু পরমার্থী লোক এরূপ সকৈতব সিদ্ধান্ত করেন না।

অপবর্গ ধর্ম্মই পরমার্থ

তাঁহারা বলেন যে, আপবর্গ্য ধর্ম্মই ধর্ম্ম। যে-ধর্ম্মের চরমার্থ অপবর্গ অর্থাৎ জীবের স্ব-স্বরূপে পুনরবস্থিতি, তাহাকে আপবর্গ্য ধর্ম্ম বলি। নীতি-ধর্ম্মের ন্যায় ঐ ধর্ম্মের ফল কেবল অর্থ, অর্থের ফল কাম—এরূপ নয়। ধর্ম্মাচরণে অর্থ অবশ্য উৎপন্ন হইবে এবং উৎপন্ন অর্থ অবশ্য কামকে প্রসব করিবে; কিন্তু কাম প্রসূত হইয়াও ইন্দ্রিয়-প্রীতিরূপ ফলকে উদ্দেশ করিবে না। অর্থাৎ আপবর্গ্য-ধর্ম্মশীল পুরুষের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম সমস্তই জীবন-নির্ব্বাহকরূপে আদৃত হয়। জীবন রক্ষিত হইলে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসারূপ পরমার্থ লাভ হইবে। অন্বয়-জ্ঞানকে তত্ত্ববিৎ পুরুষেরা তত্ত্ব বলেন। সেই তত্ত্ব ত্রিবিধ অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নিজ পরিচয়

আমরা নিজ পরিচয় দিতে গিয়া তিন প্রকারে পরিচয় দিয়া থাকি। যখন স্থূল শরীরের পরিচয়ে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি, তখন স্থূল শরীরটা যেরূপভাবে পাইয়াছি সেই স্থূলভাবই পরিচয়ের বিষয় হয়। আবার স্থূলের অভ্যন্তরে অপ্রকাশিত হইয়া যে বৃত্ত বা স্বভাব অন্তর্নিহিত থাকে, তাহার পরিচয় দিতে আরম্ভ করি—ইহাই আমাদের দ্বিতীয় জন্ম বা সূক্ষ্মবৃত্তগত পরিচয়। আবার স্থূল ও সূক্ষ্ম পরিচয় ব্যতীত আমাদের আত্মগত পরিচয় আছে। আত্মগত পরিচয় সূক্ষ্মাবৃত হইলেই বৃত্তগত জন্ম এবং সূক্ষ্মাবৃত জীবের স্থূল ভূমিকায় দৃশ্য জগতের বস্তু-অভিমানেই স্থূল-সূক্ষ্মাবৃত শৌক্র জন্ম।

বদ্ধজীবমাত্রেই শৌক্রজন্ম লাভ করেন। যে-সকল শৌক্রজীবের স্থূল শরীর স্ব স্ব অন্তর্নিহিত বৃত্ত বা স্বভাবে অপরাপর শৌক্রজাত জীবের সহিত পার্থক্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়, তাহাদেরই সংস্কার আবশ্যক হয়। যাহার সংস্কার আবশ্যক হয় না, তাহারা সংস্কারহীন শূদ্র এবং যাঁহারা বৃত্তগত পরিচয়ের উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তাঁহাদের সমাজ বাল্যকাল হইতেই সংস্কার প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে দ্বিজাতি করান। ইহাই বালকের উপনয়ন। আর

ব্যক্তিবিশেষের বয়ঃপ্রাপ্তিতে ন্যূনাধিক বৃত্তগত স্বভাব পরিস্ফুট হইয়া লক্ষণ-দ্বারা যে বৃত্ত-পরিচয়ে উপনীত হইবার ব্যবস্থা, তাহা অস্ফুটবৃত্ত বালকের উপনয়নমাত্র নহে। এরূপ বৃত্তগত পরিচয় কালে কালে পরিবর্ত্তিত হয়। দ্বিজ সংস্কাররহিত হইলে শূদ্রতা লাভ করেন, দ্বিজ বণিক্ বাণিজ্য-বিনিময়াদি পরিত্যাগ করিলে সমাজরক্ষণ, শাসন, করগ্রহণ প্রভৃতি স্বভাবদ্বারা ক্ষত্রিয় হন এবং দ্বিজ ক্ষত্রিয় নিজ বংশগত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অধ্যাপন, যাজন, প্রতিগ্রহ প্রভৃতি স্বভাবদ্বারা ব্রাহ্মণ হন। ব্রাহ্মণ ক্ষাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় হন, বণিক্-স্বভাব স্বীকার করিয়া বৈশ্য হন; ক্ষত্রিয় ও বণিক-স্বভাব গ্রহণ করিয়া বৈশ্য হন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ত্রিবিধ দ্বিজাতি ভৃতক হইয়া শূদ্রতা লাভ করেন। ভৃতক শূদ্র ভৃত্য-স্বভাব ছাড়িয়া দ্বিজ-স্বভাব গ্রহণ করিলে দ্বিজ হইতে পারেন এবং সংস্কার গ্রহণ করেন। 'অষ্টবর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন' এই প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণতা ব্রাহ্মণের শুভানুধ্যায়ী স্থূল শরীরগত সমাজেয় অভিলাষমাত্র। অনেক সময়ে সেই অভিলাষ ভবিষ্যতে পূরণ না হইতেও পারে। কিন্তু গুণকর্ম্মদ্বারা ব্যক্তিবিশেষের স্বভাব পরিস্ফুট হয়, তখন গুণকর্ম্মদর্শী বিজ্ঞ আচার্য্য লক্ষণদ্বারা বর্ণনির্ণয়-বিচার পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শৌক্র-পরিচয়ের প্রস্তাবিত বর্ণদ্বারা ব্যক্তিবিশেষের বর্ণবিধান করেন না। তাঁহার স্থূল শরীরের বয়ঃকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চৌড়, কর্ণভেদ মন্ত্রদ্বারা নিষ্পন্ন করিতে পরাঙ্মুখ হন এবং মূর্খতাবশে তত্তৎ সংস্কারোচিত চিহ্নাদি-ধারণের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন। বয়োব্যবস্থাকাল অতিক্রান্ত হইলেও তত্তদ্বৃত্ত-যোগ্যতা লক্ষিত হইবার পরেও সংস্কার-চিহ্নাদি দেওয়া হইবে না বলিয়া মিথ্যা ওজর আপত্তি উত্থাপন করেন। বৃত্তবিচার অনেক স্থলে না হওয়ায় উপনীত দ্বিজকে ভৃতকের কার্য্য করিতে দেখা যায়। ভৃতকের কার্য্য দোষাবহ কি গুণাবহ, তাহার বিচার পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতেও দেখা যায়। ভৃতককার্য্যে নিপুণ মন্ত্রজীবী, ভাগবত-জীবী, অর্চ্চন-জীবী দেবল শাস্ত্রালোচনার ভার বহন করিয়াও ভৃতককার্য্যের দোষ বুঝিতে পারেন না ও তাদৃশ শূদ্রোচিত ব্যবসা অবাধে শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া মূর্খের চক্ষে ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় ভ্রান্তি উৎপন্ন করেন। বেদের অনুশাসন না মানিয়া স্মৃতির বিধি উৎসাদিত করিয়া শাস্ত্রীয় কথা গোপনপূর্ব্বক উচ্চ দ্বিজাতি হইতে নামিয়া আসিয়া সংস্কারহীন শূদ্র বা ভৃতক হইতে লজ্জাবোধ করেন। আর প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তির লক্ষণসমূহ দেখিয়া শুনিয়াও নীচ

স্বার্থাবলম্বনে সত্যের অমর্য্যাদায় সিদ্ধহস্ত হন—ইহারই নাম কলিকাল বা সত্য-বিপর্য্যয়ের ভূমিকা। বৃত্ত বা স্বভাব-দর্শনে বর্ণ নির্দ্দেশ করিতেও উপনয়ন-সংস্কার আবশ্যক। তাহা অষ্টবর্ষ প্রভৃতি কালের দ্বারা আবদ্ধ নহে। যেরূপ প্রাপ্তবৃত্ত ব্যক্তির শৌক্র বালক সন্তানকে জ্ঞানের অভ্যুদয়ে অষ্টমবর্ষেই উপনয়ন প্রদত্ত হইবার ব্যবস্থা, সেরূপ বৃত্তবিচারক্রমে যে কোনকালে বাজসনেয়ি-শাখার কাত্যায়ন সূত্রানুসারে সংস্কার-প্রদানের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। তবে শৌক্র-পদ্ধতিতে বর্ষের বিচার অবশ্যই গ্রহণীয়। শৌক্রজন্ম বা সাবিত্র্যজন্মের ন্যায় ব্রাহ্মণের তৃতীয় জন্ম আছে। উহাই দৈক্ষ জন্ম। আর অবরোহ-বাদাবলম্বনে দৈক্ষের উত্তরকালে সাবিত্র্য-বিধানের ব্যবস্থা বেদের শাখা-বিশেষেই দেখিতে পাওয়া যায়। নিজ নিজ শাখার কথা অপর-শাখানিপুণের প্রতিবাদের বিষয় হওয়া উচিত নহে—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। একায়ন শাখা-বিরোধী শ্রীঅপ্যয়দীক্ষিতাদির কুমত বিশিষ্টভাবে কাশ্মীরাগম-বিচারেই খণ্ডিত আছে।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

নিষ্ঠাবান শুদ্ধবৈষ্ণবের পক্ষে সংস্কারবিহীন অদীক্ষিত ব্যক্তির পাচিত অন্নগ্রহণ অনুচিত; শিষ্যের পক্ষে গুরুপাদপদ্মের বিচারধারা গ্রহণ ও তদনুকূল আচরণ কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা
পোঃ—চুঁচুড়া (হুগলী)
ইং—৩১/৩/৬৩

স্নেহাস্পদেষু—

* * * প্রভো! আপনার ২২।৩।৬৩ তারিখের পত্র ২৫।৩।৬৩ তাং নবদ্বীপে বিলি হইয়াছে। আমি তাহার পূর্ব্বেই চুঁচুড়ায় আসিয়াছি। বামন মহারাজ আপনার পত্র লইয়া ২৭।৩।৬৩ তাং আমাকে দিল। সেইদিন ১৩ই চৈত্র বুধবার। সুতরাং আপনাকে পত্র দিলে ১৪ই চৈত্র তারিখের পূর্ব্বে পাইবার সম্ভাবনা ছিল না।

সুতরাং আপনাদের * পড়ুয়ার বাড়ীতে তাম্রলিপ্ত সমিতির অধিবেশনে যোগদান করা সম্বন্ধে আমার কোন মতামত দিবার সুযোগ হয় নাই। তবে এই সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই আপনাদিগকে জানাইয়াছি যে, আপনারা অধিবেশনে যোগদান করিবেন এবং * মহারাজের দীক্ষিত ব্যক্তিকে সংস্কার না দেওয়া সম্পর্কে আলোচনা করিবেন এবং আপনারা সংস্কারহীন অদীক্ষিত ব্যক্তির পাচিত অন্নগ্রহণ করিবেন না।

বাসন-পত্রাদি দিয়া সহানুভূতি করিতে কোন আপত্তি নাই। কারণ আমাদের সম্প্রদায়ের লোকের দ্বারাই নিরামিষ রান্না হইলে কোন দোষের হইবে না। তবে আপনারা আমার পত্র না পাওয়া সত্ত্বে আমার পূর্ব্বকথিত উক্তপ্রকার নিয়ম পালন করিয়াছেন কিনা জানাইবেন। গজেন্দ্রমোক্ষণ প্রভুকেও আমি এই সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম। আপনারা কি করিয়াছেন, আমাকে জানাইবেন।

দ্বিতীয় কথার উত্তর এই যে—অর্থাৎ * মহারাজ আমাদের নবদ্বীপ মঠের হোম করিলেন কেন? তৎসম্বন্ধে আমি সঠিক সংবাদ জানাইতেছি—

* মহারাজকে শ্রৌতী মহারাজ আমার নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া হোমে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আমি নিযুক্ত করি নাই। আমি নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া যখন মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রবেশ করিলাম, তখন * মহারাজকে হোমের ওখানে বসিয়া স্বস্তিবাচন পাঠ করিতে শুনিলাম। মন্দিরের মধ্যে শ্রৌতী মহারাজ ছিলেন। আমি তখনই শ্রৌতী মহারাজকে বলিলাম,—আপনি কেন * মহারাজকে হোমের কার্য্যে বসাইলেন? তিনি ত' প্রভুপাদের আচার-বিচার মানেন না। আমি এরূপ ব্যক্তির দ্বারা হোম করাইতে ইচ্ছা করি না। আপনি জানেন, আমি এসব বিষয়ে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করিয়া থাকি।

তখন শ্রৌতী মহারাজ আমাকে বলিলেন,—আপনি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন কেন? আমি তদুত্তরে বলিলাম,—আমি * মহারাজকে নিমন্ত্রণ করি নাই। আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারেন। আমি যেরূপ আপনাদিগকে পৃথক্ পত্র দিয়াছি, * মহারাজকে সেরূপ পত্র দিই নাই। মামুলী ছাপান পত্র সকলের নিকট পাঠান যেরূপ হয় সেইরূপ হয়ত পাঠান হইয়া থাকিবে। কিন্তু তৎসম্বন্ধে আমি জ্ঞাত নহি।

তবে আমি শুনিতে পাইলাম, * মহারাজ কালনায় তাহার বার্ষিক উৎসবের সময় আমার অবিদ্যমানে নবদ্বীপ হইতে একটা তাঁবু ও সামিয়ানা লইয়া গিয়াছিলেন এবং যখন উহা ফেরৎ দিয়া যান, তখন বামন মহারাজ

ভদ্রতা করিয়া * মহারাজকে পরিক্রমা ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় যোগদান করিতে বলেন। তদনুসারেই তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। আমি তাহাকে স্পেশাল অর্থাৎ বিশেষ আমন্ত্রণ পত্র দিই নাই।

শ্রৌতী মহারাজ ইহা শুনিয়া বলিলেন,—আমি ত' ইহা জানি না। যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, কে হোম করিবে? আমি তখন বলিলাম,—পণ্ডিত রাঘবচৈতন্য হোম করিবে। তিনি তখন গর্ভমন্দির হইতে বারান্দায় আসিয়া * কে স্বস্তিবাচন হোম ইত্যাদি করিবার জন্য বসাইয়া দিলেন। আপনারা সকলেই দেখিয়াছেন, হোমের নিকটে * মহারাজের বামপার্শ্বে রাঘবচৈতন্য বসিয়া হোম করিয়াছে। সৎক্রিয়াসার-দীপিকাগ্রন্থ উভয়ের হস্তেই ছিল।

তৎপরে * মহারাজের দ্বারা কোন কার্য্যই করান হয় নাই। গঙ্গাজল ও পঞ্চামৃতে অভিষেক ও স্নান ইত্যাদি আমি স্বয়ংই করিয়াছি। বিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা মন্দিরের অভ্যন্তরে আমি করিয়াছি। শ্রৌতী মহারাজ পৌরহিত্য করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজ মন্দিরের দারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। * মহারাজ পৃথক্ ঘরে বসিয়া একাকী প্রসাদ পাইতেছিলেন, তখন আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম,—আপনি সমাজে না বসিয়া একঘরে হয়ে প্রসাদ পাইতেছেন? তাহার পর চলিয়া আসিলাম। * মহারাজ প্রসাদ পাইয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান নাই।

তথাপি আমরা তাঁহার কল্যাণ কামনা করি অর্থাৎ তিনি যাহাতে শ্রীল প্রভুপাদের বিচারধারায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন এবং তদনুকূল আচরণ অবলম্বন করিতে পারেন, তজ্জন্য চেষ্টিত আছি। এমনকি, বামন মহারাজ তাঁহার সঙ্গে আমাদের মঠের কথা আলোচনা করেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের মঠের আচার-বিচারের প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং আমাদের '**শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'র নিরপেক্ষতার প্রশংসা করিয়া গৌড়ীয়-পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ দিয়াছেন।** আমরা গৌড়ীয়-পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিয়াছি ও করিতেছি। তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিবেন। তিনি পণ্ডিত লোক এবং লেখালেখির বিষয়ে বিশেষ সুপটু। তাহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

গৌরগোবিন্দ প্রভু অনেকদিন নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে তিনি বাতের চিকিৎসা করিবেন—এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বাড়ীতে পৌঁছিয়াছেন কিনা ও তাহার শরীর কিরূপ পত্রপাঠ জানাইবেন।

ভেটুরিয়ার আপনার একটা জমি বিক্রয় করিয়া পিছলদায় জমি কেনার কথা ছিল। তাহার কি হইল জানাইবেন। আমি সুন্দরবনে প্রচারে যাইব। তথা হইতে ফিরিয়া আসাম যাইব। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রীব্রজমণ্ডলে বৈষ্ণবানুগমনে

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৮ পৃষ্ঠার পর]

"কৃষ্ণগুণাখ্যানে করে সর্ব্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণলীলা-স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২৩।৩১)

শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলী শ্রীমথুরা ধাম-প্রসঙ্গে কথঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিতেছি। শাস্ত্র বলেন,—

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মথুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ড মিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥
"বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা "মথুরা"-নগরী।
জনম লভিলা যথা কৃষ্ণচন্দ্র হরি॥"

সেই মথুরা-নগরীর কথায় এক্ষণে আসিতেছি। 'মথুরা' সম্বন্ধে শাস্ত্রবিৎ ও ঐতিহাসিকগণ বহু আলোচনা করিয়াছেন। মথুরা-নগরীর ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণনপ্রসঙ্গে দু'-একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন, তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রনাভ। দ্বারকালীলার অবসানে যদুবংশ লোকলোচনের অন্তরালে চলিয়া গেলে বজ্রনাভ ও তাঁহার মাতা ঊষাদেবী হস্তিনাপুরে আগমন করেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে বজ্রনাভকে শূরসেন-রাজ্যে (মথুরামণ্ডলে) অভিষিক্ত করেন। মুনি-ঋষিগণের আদেশক্রমে বজ্রনাভ চৌরাশী ক্রোশব্যাপী শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাস্থলীর মধ্যবর্ত্তী গ্রামসমূহের লীলানুযায়ী নামকরণ করেন। অদ্যাপিও গ্রামসমূহের সেইসব নামকরণ প্রচলিত রহিয়াছে।

বজ্রনাভ শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, শ্রীকেশবদেব, শ্রীহরিদেব, গোপালজীউ (শ্রীনাথজী), সাক্ষিগোপাল, বৃন্দাদেবী ও মহাদেব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরবর্ত্তিকালে ভারতে ক্ষাত্রশক্তি ক্ষয় পাইতে থাকে এবং দেশ বহুরাজ্যে বিভক্ত হইয়া বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই দুর্ব্বলতার সুযোগে বৈদেশিক আক্রমণকারিগণ ক্রমে ক্রমে ভারতে প্রবেশ করে। শক, হূণ, গ্রীক্ আক্রমণের পর জৈন ও বৌদ্ধযুগের অভ্যুদয় হয়। পরে ভারতবর্ষে মুসলমানগণ প্রবেশ করে। ১০১৮ খৃঃ মামুদ গজ্‌নী কাবুল হইতে আসিয়া মথুরা আক্রমণ, লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে। পাঠান-বংশীয় ফিরোজ শা চতুর্দ্দশ খৃঃ মথুরা আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করে।

এরপর ১৫২৬ খৃঃ পাণিপথের যুদ্ধাবসানে মোগল বংশীয় সম্রাটগণ দিল্লী অধিকার করে। তাহাদের সময়ে আবার মথুরা-সহর নির্ম্মিত হয়। জাহাঙ্গীর বাদশাহের সময়ে ১৫২৭ সালে কৃষ্ণদাস কর্পূর ,শ্রীমদনমোহনজীউর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ১৫৯০ সালে রাজা মানসিংহ-কর্ত্তৃক শ্রীগোপীনাথের মন্দির নির্ম্মিত হয়। ১৬১০ সালে জাহাঙ্গীর বাদশাহের সময়ে বীরসিংহদেব বহু অর্থব্যয়ে আদিকেশবদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। পুনরায় ১৬৬৯ খৃঃ ঔরঙ্গজেব-কর্ত্তৃক উক্ত মন্দিরগুলি ধ্বংস হয়। আদিকেশবের মন্দির যে-স্থানে ছিল ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে সে-স্থানে বাহ্যদর্শনে মন্দিরাদির কোন অস্তিত্ব ছিল না। কেবল ভগ্নাবশেষ ও উচ্চ ভিটামাত্র দৃষ্টিগোচর হইত। তাহারই সংলগ্নস্থানে বিপুলাকার এক মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ মস্‌জিদ এখনও বর্ত্তমান আছে।

বর্ত্তমানে যে আদিকেশবের মন্দির আছে, তাহা গোয়ালিয়রের জমিদার-কর্ত্তৃক ১৮৫০ খৃঃ নির্ম্মিত হয়। ঔরঙ্গজেবের আক্রমণের সময় শ্রীনাথজী গোপালদেব রাজপুতনার নাথদ্বারে চলিয়া যান। ১৬৭০ খৃঃ জয়পুরের মহারাজার সাহায্যে শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধা-দামোদর, গোকুলানন্দ, শ্রীরাধামাধব-বিগ্রহাদি জয়পুরে গমন করেন। বর্ত্তমানে শ্রীমদনমোহনজীউ করৌলিতে অবস্থান করিতেছেন।

এইসকল বিগ্রহগণ আর বৃন্দাবনে বা মথুরামণ্ডলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তাঁহাদের প্রতিভূ বা প্রতিমূর্ত্তি দিল্লী-অধিপতি মহম্মদ শাহের সময়ে ১৭৩৮ খৃঃ বৃন্দাবনে স্থাপিত হয়। ১৭৫১ সালে নাদির শাহ মথুরা আক্রমণ করে এবং তাহার সেনাপতি আমেদ শাহ দুরানী মথুরায় ঔরঙ্গজেবের পর যাহা কিছু

অবশিষ্ট ছিল সমুদয় ধ্বংস করে। এই প্রকারে মথুরা-সহর চারিবার মুসলমান-কর্ত্তৃক ধ্বংস হয় এবং চারিবারই হিন্দুগণ মথুরা-সহর নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমানে বৃন্দাবনে শ্রীগোপীনাথ ও মদনমোহনের যে মন্দির আছে, তাহা কলিকাতার শ্রীনন্দকুমার বসু-কর্ত্তৃক ১৮১৯ খৃঃ নির্ম্মিত হয়।

শ্রীরামায়ণ-গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মধুদৈত্য মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া মথুরা বা মধুপুরী প্রতিষ্ঠা করেন। সূর্য্যবংশীয় রাজা হর্য্যক মধুদৈত্যের কন্যাকে বিবাহ করিয়া এইস্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। মহাভারতের যুগে প্রবল যদুবংশীয়গণ আধিপত্য লাভ করেন। পিতা উগ্রসেনকে পরাজিত করিয়া কংস মথুরার রাজা হইয়াছিল। এর পরবর্ত্তী ঘটনা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী (ভক্তিভূষণ)

শ্রীব্যাসপূজা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৮ পৃষ্ঠার পর]

যদি কেহ বলেন, আমার গুরুদেব 'সর্ব্বজ্ঞ', তাই তিনি পাঁচজনকে পাঁচ প্রকার মন্ত্র দিতে পারেন। তাহার উত্তরে বলা যায়, উহা দীক্ষা-শিক্ষা নীতি নহে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও একজন শিক্ষক একই সময়ে পাঁচটী শ্রেণীতে পাঁচটী বিষয়ে পড়াইতে পারেন না। তাই সময়কে ভাগ করিয়া শিক্ষকের সুবিধার্থে পাঠের বিষয় বিচারপূর্ব্বক প্রধান-শিক্ষক মহাশয় বিভিন্ন শিক্ষক নিযুক্ত করেন। যদি কোন শিক্ষক পাঁচবারে পাঁচটী শ্রেণীতে একাই পাঁচটী বিষয় শিক্ষা দিতে চাহেন, তবে অপর শিক্ষকের কোন বিষয়ের বিশেষত্বকে অস্বীকার করা হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে প্রধান-শিক্ষক বা তাঁহার অপর সহকারী পাঠ্যক্রম চালাইয়া লইতে পারেন, সে কথা স্বতন্ত্র। বৈষ্ণবগুরু শিবাদি দেবতার নিন্দা করিবেন না, নিত্য বন্দনাও করিবেন না। শিবাদি দেব-মন্দিরে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ সেবাধিকারের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণভক্তি বর প্রার্থনা করিবার উপদেশ দিবেন।

সৌর-শিবাদি মন্ত্রের উপদেশককে সৌর, শাক্ত, শৈব বলা যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণ বলা যায় না।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দের ভক্ত বৈষ্ণবই ব্রাহ্মণ।

ন শূদ্রাঃ ভগবদ্‌ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতা।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রাঃ যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

যাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তাঁহারা শূদ্র নহেন। শাস্ত্র তাঁহাদিগকে 'ভাগবত' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যও যদি জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা না করেন, তবে তাঁহারা শূদ্র।

ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্র-তন্ত্র-বিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥

যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ষট্‌কর্ম্মনিপুণ এবং মন্ত্রতন্ত্র-বিশারদ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণও গুরু হইতে পারেন না; কিন্তু চণ্ডালকুলে প্রকটিত বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ বৈষ্ণব গুরু হইবার যোগ্য। বৈষ্ণবই সর্ব্ববর্ণাশ্রমীর গুরু,—

বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যাশ্চ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাম্।
শূদ্রাশ্চ গুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎপ্রিয়াঃ॥

বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণের গুরু হইতে পারেন—ইহাই সাধারণ বিধি। কিন্তু ভগবৎপ্রিয় অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ শূদ্রকুলে অবতীর্ণ হইলেও উক্ত ত্রিবিধ বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকুলোদ্ভূত ব্যক্তির শ্রীগুরুদেব। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষাদাতা শ্রীগুরুদেব—আচার্য্য।

উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥

যে ব্রাহ্মণ শিষ্যকে উপনয়ন প্রদান করিয়া যজ্ঞবিদ্যা ও উপনিষদ্ সহিত সমগ্র বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করান, মুনিগণ তাঁহাকে 'আচার্য্য' নামে অভিহিত করেন।

উদ্ধবের নিকট স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগুরুদেবের পরিচয় করাইতেছেন,—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

উক্ত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের কথা আচার্য্য গুরুদেবকে 'মাং বিজানীয়াৎ' মৎস্বরূপ, আমাকে জানিবে। 'আমিই আচার্য্য' ইহা বলার অভিপ্রায় নহে। হইলে 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ' না বলিয়া 'অহমেবাচার্য্য' বলিতে পারিতেন।

প্রিয়ত্বে অভেদক্ষেত্রে একে অপরের প্রতি ভরসা করিয়া বলিতে পারেন,—তিনি ও আমি, আমরা এক। 'এক' শব্দে 'এ' স্বরবর্ণ, 'ক' ব্যঞ্জনবর্ণ। একটীর উচ্চারণ নিরপেক্ষ, অপরটী স্বরবর্ণের আপেক্ষিক। 'নিরপেক্ষ' মানে নিশ্চিতরূপে অপরের জন্য অপেক্ষা যাঁহার গৌরবোজ্জ্বল, চমৎকার। স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণকে উচ্চারণ করাইয়া গৌরবান্বিত, ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্যে উচ্চারিত হইয়া ধন্য, কৃতার্থ। একটী আশ্রয়, অপরটী আশ্রিত।

ভক্তশ্রেষ্ঠ জগদ্‌গুরু আচার্য্য সমগ্রজীবকে লইয়া ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানের আশ্রয়ে সুখী হইতে চাহেন। শ্রীভগবান্‌ও তদ্রূপ ভক্ত সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে সুখে থাকেন। সদ্‌গুরুর ভাবনায়,—আমি কিছু পাইলে উহা শ্রীভগবানে সমর্পণ করিব। শ্রীভগবানের ভাবনায়,—সদ্‌গুরুকে কেহ কিছু দিতে চাহিলে, আমি উহা অবশ্যই পাইব। সদ্‌গুরু জানেন,—শ্রীভগবানই একমাত্র উপযুক্ত ভোক্তা, আমাদের সেবাচেষ্টা তাঁহার প্রিয়ভোগের উপকরণ। শ্রীভগবান্‌ও জানান—'তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং'। দানের বস্তু যদি কিছু থাকে, সদ্‌গুরুকেই দিবে, তাঁহার নিকট হইতেই উপদেশ লইবে। কারণ সদ্‌গুরুর নিজেকে ভোক্তা ও আরাধ্যাভিমান নাই। তিনি সর্ব্বদাই শ্রীভগবানের সেবকাভিমানী-নিত্যপার্ষদ—আরাধক—শুদ্ধজীব। শ্রীকৃষ্ণসেবাসুখ হইতে নিজে বঞ্চিত ও অপরকে বঞ্চক কর্ম্মফলবাধ্য বহির্ম্মুখ জীব নহেন বলিয়া গুরুকে সাধারণ মনুষ্য বুদ্ধি করিতে নিষেধ। গুরুকে মর্ত্ত্যমনুষ্য বুদ্ধি না করিতে সতর্কতার কারণ? সর্পে রজ্জুভ্রম বা রজ্জুতে সর্পভ্রম হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু অশ্বত্থবৃক্ষের ভ্রম হইতে পারে না। গুরুকে কখনও মনুষ্যবুদ্ধি হইতে পারে, তজ্জন্য সতর্কতার উপদেশ। কিন্তু গুরুদেব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীরাম—এরূপ বুদ্ধি হওয়া সাধু-সজ্জনের পক্ষে অসম্ভব।

'সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ' অংশে গুরুদেবই ব্রহ্মা, গুরুদেবই বিষ্ণু, গুরুদেবই মহেশ্বর এবং গুরুদেবকেই পরমব্রহ্ম বলিলে, আরাধক ব্রহ্মা ও শিবকে আরাধ্য পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ সদাশিব বিষ্ণুতত্ত্বকে সমান বিচার করার অপরাধে পাষণ্ডী আখ্যায় নারকী হইতে হয়।

তাহা হইলে শ্রীগুরুদেব কি করিয়া সর্ব্বদেবময় হন? তাহাই বিচার্য্য। পূর্ব্বে বলিয়াছি, রেখা একাধিক বিন্দুর পাশাপাশি অবস্থান। বৃত্তস্থ কেন্দ্রবিন্দুগামী ব্যাস-নামক সরলরেখাও বহু বিন্দুর সমষ্টি। এই বিন্দুগুলির অবস্থান বৃত্তস্থ বিন্দু হইতে পৃথক্। ব্যাসস্থ বলিয়া প্রতিটিই গুরুপদবাচ্যের একে অপরের সহায়ক। বৃত্ত হইতে কেন্দ্রবিন্দু পর্য্যন্ত এবং কেন্দ্রবিন্দু হইতে

বৃত্ত পর্য্যন্ত বিন্দুগুলি পর পর সরল রেখাক্রমে ব্যাসের সম্পূর্ণতা। সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সনাতন ধর্ম্মের অন্যান্য গুরুবর্গ। তন্মধ্যে 'হরিভক্তি আছে যাঁর, সর্ব্বদেব বন্ধু তাঁর।' বৈষ্ণবগুরুই সর্ব্বদেবময়—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাস্তি ধাবতো বহিঃ॥

(ভাঃ ৫।১৮।১২)

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কাম সেবা-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাহাতেই সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিবিমুখ ব্যক্তি অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগরত বা গৃহাসক্ত। সুতরাং তাহাতে কেবলাভক্তি নাই। মনোধর্ম্মের দ্বারা সে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত। তাহাতে মহদ্‌গুণসমূহের সম্ভাবনা কোথায়? গীতায় 'কামৈস্তৈস্তৈ হৃতজ্ঞানা প্রপদন্তে অন্যদেবতা' বাক্যে দেখা যায়,—কামনা-বাসনার দ্বারা আত্মজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলে জীব কৃষ্ণেতর ব্রহ্ম-শিবাদি দেবদেবীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধিতে শরণাগত হয়। 'আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন'—উপদেশে জন্ম-কর্ম্ম-মৃত্যুর অকিঞ্চিৎকরতা দর্শাইয়া 'বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে' বাক্যে শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতির পরম উৎকর্ষ বুঝাইয়াছেন। শিবানীর প্রতি শিবের উপদেশ,—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি, তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

অর্থাৎ সূর্য্যাদি আরাধনাপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ এবং বৈষ্ণবের আরাধনা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু হে দেবি! 'তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্' অংশে 'তৎ' মানে? সেই কৃষ্ণ-বিষ্ণুর আরাধনা কেহ না করিলে 'তদীয়' হইতে পারে না। 'সমর্চ্চনম্'-শব্দে সম্যক্‌রূপে অর্চ্চন। অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে বৈষ্ণব-গুরুর অর্চ্চন এবং তাঁহার আনুগত্যে বা শিক্ষায় বিষ্ণুর আরাধনা। সৌর, গাণপত্য, শাক্ত ও শৈব-গুরুর শিক্ষায় বৈষ্ণবগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার আনুগত্যে বিষ্ণু-আরাধনা 'সম্যক্'—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আরাধনা পদ্ধতি।

সনাতন-ধর্ম্মের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ কেন্দ্রবিন্দুস্থ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। 'অদ্বিতীয়' শব্দে 'ন তৎ সমশ্চ অধিকশ্চ দৃশ্যতে' 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্' 'ওঁ কৃষ্ণ বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ কৃষ্ণ আদিপুরুষঃ হা উ কর্ম্মাদিমূলং' প্রভৃতি সিদ্ধান্তে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই অদ্বিতীয়। তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি নারায়ণ বা বিষ্ণু অথবা রাম-নৃসিংহ

প্রভৃতি লীলাবতার কেহ অংশ এবং কেহ বা অংশের অংশ কলা,—'এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' সনাতন ধর্ম্মে শ্রীভগবানের বিভিন্নরূপ আছে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের অদ্বিতীয়ত্ব বা সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীতে ধর্ম্মনামে যে-সকল কথা চলিতেছে, তাহার কতকগুলি সনাতন-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ, আর কতকগুলি সনাতন ধর্ম্মের পরিচয় দিতে চাহে; যেমন—'ঈশ্বরের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীল', নরবপু তাঁহার স্বরূপ।' কোন কোন ধর্ম্মে 'নরবপু তাঁহার স্বরূপ' বাক্যাংশের অনুবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরের সর্ব্বোত্তম নরলীলা, খেলা ও খেলার সাথী স্বীকৃত হয় নাই। সেইজন্য 'অদ্বিতীয়' আখ্যারও অযোগ্য।

'একমেব'-শব্দে সনাতন ধর্ম্মের আদি-মধ্য-অন্ত্যে 'সৎ' বস্তুবিষয়ে ত্রিসত্য অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করায়। 'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব' 'জনক-জননী-দয়িত-তনয়। প্রভু-গুরু-পতি তুহুঁ সর্ব্বময়॥' প্রভৃতি ভক্তের প্রার্থনায় শ্রীভগবানের নিত্যলীলার বর্ণনা। 'সর্ব্বময়'-শব্দে প্রাচুর্য্যার্থে ও বস্তুনির্দ্দেশার্থে 'ময়ট্' প্রত্যয়। প্রাচুর্য্যার্থে যেমন—লোকময়, জলময়, বালুময়, অরণ্যময় প্রভৃতি। বস্তু নির্দ্দেশার্থে—'হিরণ' স্বর্ণের যাহা হিরণ্ময়, 'মৃৎ' মাটির যাহা মৃন্ময়, 'চিৎ' অপ্রাকৃত-অজড়-চেতন বস্তুর যাহা 'চিন্ময়'। কিন্তু শ্রীভগবান্ 'সর্ব্বময়'। সেই সর্ব্বময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মূল-সঙ্কর্ষণ হলধর শ্রীবলদেব প্রভুর পুরুষরূপে প্রকাশ। তাঁহা হইতে চতুর্ব্যূহ গদা-শঙ্খ-চক্র-পদ্মধারী বাসুদেব, গদা-শঙ্খ-পদ্ম-চক্রধারী সঙ্কর্ষণ, চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্মধারী প্রদ্যুম্ন ও চক্র-গদা-শঙ্খ-পদ্মধারী অনিরুদ্ধের প্রকাশ। দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ সঙ্কর্ষণের সদাশিব তত্ত্ব হইতে কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু প্রথম-পুরুষ। ইনি শ্রীকৃষ্ণের অধ্যক্ষতায় মায়া-প্রকৃতির সাহায্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। সেইসকল ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয়-পুরুষ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও অন্যান্য অবতার। "বৈকুণ্ঠ-জগতে হয় সবার অবস্থান। মর্ত্ত্যে অবতরি ধরে অবতার নাম॥" অবতার ছয় প্রকার—(১) পুরুষাবতার—প্রথম-পুরুষ কারণাব্ধিশায়ী বিষ্ণু, দ্বিতীয়-পুরুষ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও তৃতীয়-পুরুষ জীবান্তর্যামী ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণু—এই পুরুষত্রয়। (২) যুগাবতার—চারিযুগে শুক্ল (হংসমূর্ত্তি), রক্ত (যজ্ঞমূর্ত্তি), কৃষ্ণ (নন্দনন্দন), পীত (জগন্নাথ-সুত গৌরহরি)। (৩) মন্বন্তরাবতার, (৪) গুণাবতার—সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণান্বিত বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর—সৃষ্টি, স্থিতি (পালন) ও সংহারার্থে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। (৫) লীলাবতার—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথী রাম, বলরাম, বুদ্ধদেব (শাক্যসিংহ বুদ্ধ নহেন) ও কল্কি। (৬)

শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার পৃথু ও ব্যাস। সমস্ত অবতারের অবতারী বা উৎস মূল-সঙ্কর্ষণ বলদেব প্রভু। ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ, গৌরলীলায় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যপার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মূল-গুরুতত্ত্ব। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় গুর্ব্বষ্টকের সপ্তম স্তবকে—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্য প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রে শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ হরি বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছেন, সাধু-সজ্জনগণও তাঁহাকে তদ্রূপই জানেন; কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়জন। আমি সেই গুরুদেবের চরণকমল বন্দনা করি। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ প্রিয়জন? কৃষ্ণ তাহাই তাঁহার প্রিয়সখা উদ্ধবকে বলিতেছেন,— ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥

হে উদ্ধব! ব্রহ্মা, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী বা স্বয়ং আমিও আমার তত প্রিয় নহি, যেরূপ তুমি আমার ভক্ত, আমার প্রিয়।

নোদ্ধবোঽণ্বপি ন্যূনো যদ্‌গুণৈর্নার্দিতঃ প্রভুঃ॥

আমা হইতে উদ্ধব কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূন নহেন; যেহেতু ইনি গোস্বামী—জড় বিষয়দ্বারা ক্ষুব্ধ হন না।

"গচ্ছোদ্ধব, ব্রজং সৌম্য।"

হে সৌম্যদর্শন উদ্ধব! তুমি ব্রজে গমন কর। বাক্যে মাথুর-বিরহকাতর ব্রজবাসীজনের এবং ব্রজবিরহকাতর কৃষ্ণের সাথে সন্দেশ বার্ত্তার যোগ্য বাহক।

সেই উদ্ধব হইতেও ব্রজবাসিগণ শ্রেষ্ঠা। উদ্ধবও ব্রজদেবীগণের চরণরেণু প্রার্থনা করেন,—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

অহো! আমি যেন ব্রজসুন্দরীগণের পাদপদ্মসেবী বৃন্দাবনের গুল্মলতা অথবা ঔষধির মধ্যে কোন একটীরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারি। যেহেতু তাঁহারা দুস্ত্যাজ্য স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় মুকুন্দ-পদবী ভজনা করিয়াছেন।

ব্রজগোপীগণ ব্রহ্মা, শিব ও নারায়ণপ্রিয়া লক্ষ্মীরও শ্রেষ্ঠা—

ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ পার্থিব।
ন চ লক্ষ্মী র্ন চাত্মা চ যথা গোপীজনো মম ॥ (আদিপুরাণ)

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—হে অর্জ্জুন! ব্রজদেবীগণ মহালক্ষ্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। শিব, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী এবং আমার শ্রীবিগ্রহ—এ সকল আমার তত প্রিয়তম নহে, গোপীগণ আমার যত প্রিয়তম।

তন্মধ্যে পদ্মপুরাণে শ্রীরাধিকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা,—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥

শ্রীমতী রাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, শ্রীরাধাকুণ্ডও তাঁহার সেইরূপ প্রিয়স্থান। সমস্ত গোপীবর্গের মধ্যে রাধাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, শ্রীমতী রাধাও তেমনই সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী। অগ্নি ও তাহার দাহিকায় যেমন ভেদ নাই, সূর্য্য ও তাহার কিরণে যেমন ভেদ নাই, মৃগমদ কস্তুরী ও তাহার গন্ধে যেমন ভেদ নাই, তেমন সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে মুখ্য শক্তি রাধারও ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণের সেবাসুখের জন্য সখীরূপা গুরু বা সখীর দাসীরূপা মঞ্জরী গুরুতত্ত্ব রাধার বামে থাকেন। সদ্‌গুরুর ভাবনায় মাথুর-বিরহকাতর ব্রজদেবীর চরণরেণুই চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়।

গোপী আনুগত্য বিনা কেবল ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥
'শ্রীরাধার কৃপা বিনা যুগলের সেবা।
বল না কোনকালে পাইয়াছে কেবা ॥'

কিন্তু শাস্ত্রেই আছে,—গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥

অর্থাৎ গুরুর মাধ্যমেই কৃষ্ণের কৃপা শিষ্যের নিকট পৌঁছে এবং শিষ্য গুরুর কৃপাতেই কৃষ্ণের নিকট পৌঁছিয়া যুগলসেবার অধিকার পান। তাই বলিয়া সদ্‌গুরু শিষ্যের নিকট ভোক্তা কৃষ্ণ নহেন এবং শিষ্যও সদ্‌গুরুর নিকট কৃষ্ণভোগ্যা রাধা নহেন। 'গুরুই কৃষ্ণ' বিচার যেমন শাস্ত্রবিরুদ্ধ, 'শিষ্যই রাধা' তদ্রূপ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-বিরোধী। গুরুই কৃষ্ণ, উপদেশে যেমন কৃষ্ণকে দূর করিয়া গুরু শিষ্যের ভোক্তা হয়, তেমন শিষ্যই রাধা-বিচারে কৃষ্ণের নিত্য-সহচরী রাধাকে দূর করিয়া শিষ্য ভোগ্যের অধিকার চায়। সাধু-সজ্জনগণ এ দুই শ্রেণীকেই দুঃসঙ্গ জানিয়া বর্জ্জনপূর্ব্বক 'যুগলমূরতি দেখিয়া মোর পরম আনন্দ হয়'—উপদেশক সদ্‌গুরুর শুদ্ধভক্তির উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

উপদিষ্ট শিষ্যের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলসেবার পূর্ব্বেই শ্রীগুরুদেবের অর্চ্চন করিবেন। যেহেতু 'মন্ত্রমূলং গুরুর্মন্ত্র, পূজা মূলং গুরুপূজা।' গুরুর চরণে তুলসী অর্পণ সম্বন্ধে শ্রীঅনন্তসংহিতার সিদ্ধান্ত,—

তুলস্যা বিষয়ং তত্ত্বং বিষ্ণোরেব সমর্চ্চয়েৎ।
সা দেবী কৃষ্ণশক্তির্হি শ্রীকৃষ্ণবল্লভা মতা॥
অতস্তাং বৈষ্ণবীং দেবীং নান্যপদে সমর্পয়েৎ।
অর্পণে তত্ত্বহানিঃ স্যাৎ সেবাপরাধ এব চ॥
অতত্ত্বজ্ঞস্তু পাষণ্ডো গুরুক্রুবস্য পাদয়োঃ।
অর্পয়ন্ তুলসীং দেবীমর্জ্জয়েন্নরকং পদম্॥

শ্রীকৃষ্ণশক্তি কৃষ্ণবল্লভা তুলসীদ্বারা বিষয়বিগ্রহ বিষ্ণুর সম্যক্ অর্চ্চন করিবে। অতএব বৈষ্ণবী তুলসীদেবীকে আশ্রয়বিগ্রহ গুরুর চরণে কখনও অর্পণ করিবেন না। অর্পণ করিলে তত্ত্বসিদ্ধান্তের হানি হইবে এবং সেবাপরাধ ঘটিবে। অতত্ত্বজ্ঞ পাষণ্ড গুরুক্রুবের পদে তুলসী অর্পণে ঘোর নরকে পতিত হইতে হয়।

শ্রীমতী রাধারাণীরও চরণে তুলসী অর্পণে নিষেধ,—

পূর্ণাশক্তি-স্বরূপা চ শ্রীমতী বার্ষভানবী।
বৈভবরূপিণী তস্যা বৃন্দাদেবী প্রকীর্ত্তিতা॥
নিত্যং শ্রীতুলসীদেবী সেব্যতে বার্ষভানবীম্।
অন্যোন্যমেষ বিশ্রম্ভভাবস্তয়োরবস্থিতঃ॥
দদ্যাৎ শ্রীতুলসীং তস্মাৎ শ্রীদেব্যাঃ করপল্লবে।
শুদ্ধো হি বৈষ্ণবো নিত্যং পাদয়োর্ন কথঞ্চন।
মোহাৎ প্রবর্ত্তমানস্তু ভবেত্তত্রাপরাধবান্॥

পূর্ণশক্তি-স্বরূপা শ্রীবৃষভানুনন্দিনী রাধার বৈভব তুলসীদেবী। বৃন্দাসখী নিত্যই শ্রীরাধার সেবা করেন, রাধাও বৃন্দার আদর-পরিচর্য্যা করেন, উভয়েই পরস্পরের প্রতি বিশ্রম্ভভাবে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী। সেইজন্য সদ্‌গুরু ও তাঁহার অনুগতজন শ্রীমতী রাধার শ্রীহস্তে তুলসী অর্পণ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ সেবাদানের অধিকারিণী শ্রীরাধা তুলসীকে শ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পণ করিবেন। শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবগণ কখনও রাধার পায়ে তুলসী দিবেন না। মোহবশে যদি কেহ তুলসীকে নিজপদে গ্রহণ করেন বা অনুগতজনের নিকট সে রীতি প্রবর্ত্তন করেন, তবে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই অপরাধী হইবেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী সখী অনুগামী শ্রীগুরুর প্রীতির জন্য তাঁহার সেব্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলের সেবায় গুরু ও রাধার পদে পুষ্প এবং শ্রীহস্তে তুলসী অর্পণ করিবেন।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল রামানন্দ রায়-মুখে

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাধ্য-সাধন রসকথা প্রচার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬৩ পৃষ্ঠার পর]

এই পর্য্যন্ত শ্রীরামানন্দ রায় কৃষ্ণপ্রাপ্তির বহুবিধ উপায় কহিলেন। সাধন-অবস্থায় যাহার যাহা ভূমিকা, সেই অবস্থায় সেই সাধকের পক্ষে শ্রেয়ঃ। বিশেষ করিয়া রস-চতুষ্টয়ের মধ্যে যিনি যে রসের অধিকারী, তাঁহার পক্ষে সেই রসই উত্তম। আপন ভূমিকা ত্যাগ করিয়া উচ্চ রস আস্বাদন করিতে যাওয়া সাধকের পক্ষে অতীব অকাল-পক্কতার নিদর্শন। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে হইলে ইহাদের মধ্যে তারতম্য আছে।—

পূর্ব্ব পূর্ব্ব-রসের গুণ—পরে পরে হয়।
এক-দুই-গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি-রসে।
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥

এইকারণে ভাগবত বলেন,—"মধুর রসোৎফুল্ল প্রেমে কৃষ্ণ নিতান্ত বশ হন।" কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা—যে তাঁহাকে যেভাবে ভজনা করেন, তিনি তাঁহাকে সেই ভাবে ভজনা করেন। অন্যান্য রসের প্রতিদান দিতে কৃষ্ণ সমর্থ হন। "কিন্তু মধুররসোৎফুল্ল প্রেমে ভজনের অনুরূপ প্রতিভজন না দেখিতে পাইয়া কৃষ্ণ কহিলেন,—হে ব্রজসুন্দরীগণ! আমি তোমাদের ঋণ শোধ করিতে পারিলাম না।"

যদ্যপি সৌন্দর্য্য—কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য্য॥

শ্রীকৃষ্ণের আপন সৌন্দর্য্য যত অতুলনীয়—যত চিত্তাকর্ষকই হউক না কেন, শ্রীরাধাবিহীন কৃষ্ণসৌন্দর্য্য মাধুর্য্যহীন। একারণে মধুররসের কোন ভক্তই রাধাহীন কৃষ্ণের ভজনে প্রয়াসী নহেন। একারণে **গোপীজনবল্লভ-প্রেমই সর্ব্বভক্তের সাধ্যসার, সর্ব্বজীবের একমাত্র প্রয়োজন।**

মহাপ্রভু রায়কে এই সাধ্যসারের উপরে যদি আর কিছু থাকে, তাহা ব্যাখ্যা করিতে কহিলেন। রায় তখন শ্রীরাধার প্রেমকেই সাধ্যশিরোমণি বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন।

শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ।
তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥

এবার প্রভু রায়কে কৃষ্ণ, রাধা, রস ও প্রেমের স্বরূপ-তত্ত্ব বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলেন।

রায় কহে,—"ইহা আমি কিছুই না জানি।
তুমি যেই কহাও, সেই কহি বাণী॥"

কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া রায় প্রথমেই বলিলেন,—

পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ-প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ, আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহাঁ.—সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দ-তনু, ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরস-পূর্ণ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বকারণের কারণ। তাঁহা হইতেই সব কিছুর উৎপত্তি। তিনি সর্ব্ব-অবতারের অবতারী। তাঁহার স্বরূপ সচ্চিদানন্দময়, তিনিই সর্ব্বৈশ্বর্য্যের, সর্ব্বশক্তির এবং সর্ব্বরসের মালিক। তিনিই একমাত্র ভোক্তাপুরুষ। তিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন। আবার তিনি—

বৃন্দাবনে 'অপ্রাকৃত নবীনমদন'।
কামগায়ত্রী, কামবীজে যাঁর উপাসন।

নিত্যধাম চিন্ময়ধাম শ্রীবৃন্দাবনধাম। সেই বৃন্দাবনধামে 'অপ্রাকৃত নবীন-মদন'—"জড় বা প্রাকৃত ও তদ্বিপরীত চিন্ময় বা অপ্রাকৃত, উভয় অবস্থাতেই কাম বর্ত্তমান বটে; তবে জড়কাম কালদ্বারা ক্ষুব্ধ হয় অর্থাৎ প্রকাশকালেই ইহার অনুভূতি এবং পরক্ষণে মলিন হয় ও থাকে না, আর অপ্রাকৃতকাম—নিত্য নবনবায়মান অর্থাৎ কালে তাহার সমাপ্তি নাই, সর্ব্বদাই উজ্জ্বল থাকে।"

"চিন্ময়ধামরূপ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ—প্রকৃতির অতীত অভিনব মদনরূপে বিরাজমান। কৃষ্ণসম্বন্ধতত্ত্ব জানিতে পারিলে জীবের অপ্রাকৃত চিন্ময় অবস্থাতে অবস্থিতি হয়। সেই অবস্থা দুইপ্রকার—স্বরূপগত ও বস্তুগত। তত্ত্বপ্রতীতি হইয়াছে, কিন্তু 'বস্তুতঃ' এখনও জড় সম্বন্ধ বিগত হয় নাই, এমত অবস্থায় চিন্ময়-তত্ত্বের কথঞ্চিদুদয় হইলে 'স্বরূপতঃ' বৃন্দাবনে অবস্থিতি হয়। স্বরূপাবস্থিতিতে সাধনা আছে, সেই সময় চিন্ময়ী কামগায়ত্রী ও চিন্ময় কামবীজে কৃষ্ণের

উপাসনা হইতে থাকে। পুরুষ বা স্ত্রী, স্থাবর বা জঙ্গম, সকলকেই সেই সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক মন্মথমন্মথস্বরূপ কৃষ্ণ আকর্ষণ করিয়া থাকেন।"

শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্ব-চিত্তহর॥

শৃঙ্গার রসরাজময় শ্রীকৃষ্ণ এমনই চিত্তাকর্ষক যে তাঁহার নিজেকে পর্য্যন্ত নিজের রূপ আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। গৌর-অবতারের মুখ্য কারণের মধ্যে ইহা পড়িয়া থাকে।

আপন-মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন॥

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের সংক্ষেপে কিছু আভাষ দিয়া এবার রায় রাধাতত্ত্ব বর্ণন আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন,—কৃষ্ণের অনন্তশক্তি থাকিলেও, তিনটীই প্রধানশক্তি—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থাশক্তি। ইহার মধ্যে অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তিই সকলের উপরে। এই স্বরূপ বা চিৎশক্তির আবার তিন প্রকার রূপ।

আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী'।
চিদংশে 'সম্বিৎ', যারে জ্ঞান করি' মানি॥

চিচ্ছক্তির এই হ্লাদিনী অংশই কৃষ্ণকে পরম আনন্দদান করিয়া থাকেন।

হ্লাদিনীর সার অংশ, তার 'প্রেম' নাম।
আনন্দচিন্ময়রূপ রসের আখ্যান॥
প্রেমের পরম-সার 'মহাভাব' জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা-ঠাকুরাণী॥

অতএব রাধাতত্ত্ব বর্ণন করিতে বসিয়া রায় প্রথমেই কহিলেন,—আনন্দাংশের সারতত্ত্বের সার মহাভাবরূপা রাধারাণী। প্রেমই তাঁহার স্বরূপ, প্রেমের দ্বারাই তিনি অনুক্ষণ ভাবিত। একারণে তিনি কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত। কৃষ্ণের সুখবিধান করাই তাঁহার অষ্টক্ষণের চিন্তা, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের এই প্রেমকে পুষ্ট করিতে প্রয়োজন সখীগণের। একারণে বলা হইয়াছে,—

মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী—তাঁর কায়ব্যূহরূপ।

শ্রীরাধাবিগ্রহ-বর্ণনে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে' নিম্নরূপভাবে কহিয়াছেন।—

রাধারাণী—"মহাভাবে উজ্জ্বলচিন্তামণি-ভাবিত-বিগ্রহ। কৃষ্ণপ্রতি সখীর

যে প্রণয়, তাই সদ্গন্ধকুঙ্কুমাদিদ্বারা সুন্দর কান্তিপ্রাপ্ত ॥ ১ ॥ পূর্ব্বাহ্নে কারুণ্যামৃতে, মধ্যাহ্নে তারুণ্যামৃতে ও সায়াহ্নে লাবণ্যামৃতে স্নাত যাঁহার বিগ্রহ ॥ ২ ॥ লজ্জারূপ পট্টবস্ত্রপরিধান, সৌন্দর্য্যরূপ কুঙ্কুমশোভিত শ্যামবর্ণ, শৃঙ্গাররসরূপ কস্তুরীদ্বারা চিত্রকলেবর ॥ ৩ ॥ কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, গদ্গদ স্বর, রক্ততা, উন্মাদ ও জড়তারূপ নয়টী উত্তমরত্নে অলঙ্কৃত ॥ ৪ ॥ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি গুণসকল পুষ্পমালারূপে যাঁহার শরীরে বিরাজমান ; ধীর ও অধীরাভাবকে তিনি পট্টবাস অর্থাৎ কর্পূরাদিদ্বারা পরিষ্কৃত করিয়াছেন ॥৫॥ প্রচ্ছন্নরূপে মানই যাঁহার ধম্মিল্ল অর্থাৎ বন্ধকেশপাশ (খোঁপা), সৌভাগ্যরূপ তিলকে যাঁহার কপাল উজ্জ্বল ; কৃষ্ণনাম বা যশঃশ্রবণই যাঁহার কর্ণভূষণ ॥ ৬ ॥ অনুরাগরূপ-তাম্বুলদ্বারা যাঁহার ওষ্ঠ রক্তিমায় রঞ্জিত ; প্রেম-কৌটীল্যকেই যিনি কজ্জলরূপে ধারণ করিয়াছেন ; নর্ম্ম অর্থাৎ উপহাসহেতু মৃদুহাসিরূপ কর্পূরদ্বারা যিনি সুবাসিত ॥ ৭ ॥ সৌরভরূপ অন্তঃপুরে যিনি গর্ব্বরূপ পর্য্যঙ্কে শায়িত হইলে বিপ্রলম্ভরূপ-হার প্রেমবৈচিত্ত্যরূপ তরলরূপে দোলায়িত ॥ ৮ ॥ প্রণয়ক্রোধরূপ কাঁচুলীদ্বারা যাঁহার স্তনযুগল আবৃত ; সপত্নীগণের মুখবক্ষঃশোষণকারী যশঃশ্রীই যাঁহার কচ্ছপী-বীণা ॥ ৯ ॥ যিনি যৌবনরূপ-সখীর স্কন্ধে স্বীয় লীলারূপ করকমল রাখিয়াছেন ; যিনি বহুগুণযুক্তা হইয়াও কৃষ্ণ কন্দর্পীনন্দি মধু পরিবেশন করিতেছেন ॥১০॥"—এইসকল ভাবভূষণ শ্রীরাধার সর্ব্বঅঙ্গে বিরাজিত। তাঁহার গুণাবলী কৃষ্ণ নিজেও গণনা করিতে পারেন না। এই রাধা ভিন্ন কৃষ্ণকে পূর্ণ আনন্দদান করিবার শক্তি কাহারও নাই।

এপর্য্যন্ত রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ববর্ণন করিয়া রায় এবার রসপ্রেম-তত্ত্বে প্রবেশ করিলেন।—রায় কহে,—কৃষ্ণ হয় 'ধীর ও ললিত'।

নিরন্তর কামক্রীড়া—যাঁহার চরিত ॥
রাত্রিদিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধা-সঙ্গে।
কৈশোর-বয়স সফল কৈল ক্রীড়া-রঙ্গে ॥

প্রভু কহিলেন,—"হে রামানন্দ! তুমি যে সাধ্য-নির্ণয় করিলে, রাধাকৃষ্ণের বর্ণন করিলে এবং উভয়ের বিলাস-মহত্ত্ব বলিলে, তাহাই সত্য ; কিন্তু ইহার পর আর যে কিছু আছে তাহা বল। রায় কহিলেন,—ইহার পর বুদ্ধির আর গতি দেখিতে পাই না। তবে 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত' বলিয়া একটী ভাব আছে, তাহা বলিতেছি ; ইহা শুনিয়া তোমার সুখ হয় কিনা, বলিতে পারি না। তাৎপর্য্য এই,—এ পর্য্যন্ত আমি 'প্রেমবিলাসের স্বরূপ' বর্ণন করিলাম। প্রেমবিলাসতত্ত্বে দুইপ্রকার ভাব আছে অর্থাৎ সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ।

বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের স্ফূর্ত্তি হয় না। বিচ্ছেদের নামই 'বিপ্রলম্ভ'; তাহাই প্রেমবিলাসের বিবর্ত্ত অর্থাৎ বিচ্ছেদকালে অধিরূঢ়ভাব-বশতঃ সম্ভোগাভাবেও সম্ভোগ-স্ফূর্ত্তি। রায় রামানন্দ নিজকৃত ঐ রসের একটী সঙ্গীত গান করিতে না করিতে মহাপ্রভু স্বীয়ভাবে বিহ্বল হইয়া তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিলেন। গীতটী—বিচ্ছেদকালে শ্রীমতীর উক্তি, সুতরাং বিপ্রলম্ভ-দশায় সম্ভোগ-স্ফূর্ত্তি।"

সম্ভোগের পরে বিপ্রলম্ভ না আসিলে প্রেমের পরিপূর্ণতা হয় না। যেখানে যত বিরহ সেখানেই তত মিলন। মহাপ্রভুর মহাভাবে বিপ্রলম্ভের চরম অবস্থায় শেষ জীবনে কাটিয়েছেন। রাধারাণীর 'মাদনাখ্য-মহাভাবে' এই অবস্থার চরম অভিব্যক্তি।—

শ্রীরায় রামানন্দের গীত :—

পহিলেহি রাগ নয়নভঙ্গে ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল॥
না সো রমণ, না হাম রমণী।
দুহুঁ-মন মনোভব পেষল জানি'॥
এ সখি, সে-সব প্রেম কাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি'॥
না খোঁজলুঁ দূতী, না খোঁজলুঁ আন্।
দুঁহুকো মিলনে মধ্যে পাঁচবাণ॥
অব্ সোহি বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুষ-প্রেমক ঐছন রীতি॥

এই অবধি শুনিয়া প্রভু কহিলেন,—

প্রভু কহে,—'সাধ্যবস্তুর অবধি' এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিলুঁ নিশ্চয়॥
সাধ্যবস্তু 'সাধন' বিনা কেহ নাহি পায়।
কৃপা করি' কহ, রায়! পাবার উপায়॥

প্রভু চরমসাধ্যবস্তু পাইবার উপায় রায়কে জিজ্ঞাসা করায় রায় উত্তরে কহিলেন,—"দাস্য-বাৎসল্যরসে এই গূঢ়তত্ত্ব পাওয়া যায় না; ব্রজসখী বিনা এই লীলায় অন্যের প্রবেশ অসম্ভব; ব্রজসখীর ভাব গ্রহণপূর্ব্বক সখীর আনুগত্যে সাধন করিতে পারিলে রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবারূপ সাধ্যবস্তু পাওয়া যায়, অন্য উপায় নাই।"

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলারস সখীগণভিন্ন বিস্তার বা পুষ্টিলাভ করে না। সখীগণের নিজ ইন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাই। রাধাকৃষ্ণের মিলনদ্বারাই তাঁহাদের অধিক সুখ হয়।

রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা।
সখীগণ হয় তাঁর পল্লব-পুষ্প-পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃত যদি লতাতে সিঞ্চয়।
নিজ-সুখ হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥

সুতরাং দুর্ল্লভ মানব-দেহধারী সকল জীবের কর্ত্তব্য—সখীরূপা শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে ভজন-মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবায় প্রবেশ করা।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
"প্রভু কহে—কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা 'জপ' গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
অনুক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥"

—শ্রীমতী মায়া সরকার, বসিরহাট, (২৪ পরগণা উঃ)

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭৪ পৃষ্ঠার পর]

Lord Shri Krishna বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি এখানে আর একটী শব্দ লাগাতে চাচ্ছি—Supreme Lord, Almighty Lord, Omnipotent Lord, Not only Lord। কেননা শাস্ত্রে আছে,—He is Lord of Lords। ভগবান্ সবটার স্রষ্টা, স্বয়ংরূপ বস্তু তিনি। সেটা প্রমাণিত হয় কিভাবে? উপনিষদের ভিতরে বর্ণনা রয়েছে,—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥

সেই ভগবান্ কারও সঙ্গে সমান নন—সকলের ঊর্দ্ধে অবস্থিত তিনি, সেই ভগবানের সমান কেউ নাই এ জগতে, তাঁর অধিক কেউ নাই এ জগতে। 'ন

তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ'—তিনি হলেন ভগবান্। সেই ভগবান্ ঈশ্বরেরও ঈশ্বর।

ত্বমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, ত্বং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥

হে ভুবনপূজ্য ভগবান্! তোমায় আমি প্রণাম করি। কে তুমি?—'ত্বমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্'—তুমি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর অর্থাৎ পরমেশ্বর। Supreme Command, Supreme God. তুমি নিখিল বিশ্বে যত ঈশ্বর আছেন তাঁদেরও ঈশ্বর—অধিপতি। তাঁর পরে কোন কথা নাই। 'ঈশ্বর' কাকে বলা হচ্ছে?—আধিকারিক দেব-দেবীকে god-goddess বলা হয়, কিন্তু সেই 'g' হল Small letter, আর যখন God এর 'G' Capital letter লিখি আমরা, তখন নিশ্চয়ই Supreme Lord, Almighty Lord এইরূপ অর্থ হয়। 'ত্বং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্'—তুমি নিখিল দেবতারও দেবতা, সুতরাং তুমি পরমদেবতা। 'পতিং পতিনাম্'—এই জগতে পতি-পত্নীর সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু হে ভগবান্! তুমি অনন্ত বিশ্বপতি, তুমি জগৎপতি—জগন্নাথ, অনন্ত জগতের সকলের উপরওয়ালা তুমি। 'পরমং পরস্তাৎ'—এই জগতে যাহা পরম শ্রেষ্ঠ—Superlative degree, তাহলে ভগবান্ হলেন—Superlativeএরও Superlative degree। Superlative এর Superlative—এরূপ ব্যবহার আছে কি?—হ্যাঁ, কবি-জগতে, কাব্য জগতে আছে। বিশ্ব-বিখ্যাত Poet, Novelist, Dramatist Shakespeare বলেছেন,—Most unkindest। Most unkindest-শব্দের যদি ব্যবহার আছে, তাহলে 'পরমং পরস্তাৎ' কেন হবে না? সুতরাং Superlativeএর Superlative degreeর ব্যবহার আছে, দেখা যায়। সেই যে পরতত্ত্ব ভগবান্, তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নাই। সেই পরাৎপরতত্ত্ব ভগবানকে প্রণাম করছেন।

সেই যে পরতত্ত্ব ভগবান্ তিনি অনন্ত জীবকে তাঁর দিকে সর্ব্বক্ষণ আকর্ষণ করছেন, তাকে প্রেমানন্দের অধিকারী করছেন। এইটাই তাঁর সব থেকে বাহাদুরী। হরি ত' তিনি। 'হরি' মানে হরণ করেন। কি হরণ করেন?—ভব-পাপ-তাপ তিনি হরণ করেন, তিনি জীবের দুঃখ মোচন করেন। সেই ভগবানের নাম হল 'রণছোড়'। আজ সেই রণছোড়রায়েরই জন্মদিন—জন্মাষ্টমী। 'রণ' মানে দুঃখ, যিনি দুঃখ হরণ করেন, দুঃখ বিদূরিত করেন, দুঃখ মর্দ্দিত ও মথিত করেন, তিনি হলেন হরি, জনার্দ্দন। 'হরি'-শব্দের কি শুধু এইটুকু ব্যাখ্যা? সেই ভগবানের কি আর কোন বিশেষ

সদ্‌গুণ নাই? শাস্ত্র বলছেন,—আরও কিছু বিশেষ গুণ আছে— "হরতি হৃদয়গ্রন্থিং বাসনারূপমিতি হরিঃ।" যিনি জীবের বাসনারূপ হৃদয়গ্রন্থি হরণ করেন, তিনিই হরি। যিনি জীবের যাবতীয় পাপ-তাপ, শোক-দুঃখ সবকিছু মোচন করেন, তিনিই হরি। এরপরে কি আছে?—যিনি জীবকে প্রেমানন্দ দান করেন, তিনিই হলেন হরি। এইটী হল হরিনামের বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা।

ভগবান্—শ্রীমুকুন্দ। 'মুক্তিং দদাতি যঃ স মুকুন্দঃ'—যিনি মুক্তি দান করেন, তিনি মুকুন্দ। বলি—এইটুকুই শুধু? তিনি শুধু মুক্তিদান করবেন, আর কিছু নয়?—"মুক্তিসুখং তুচ্ছং কৃত্বা প্রেমানন্দং দদাতি যঃ স মুকুন্দঃ।" —মুক্তি-সুখকে তুচ্ছ করে যিনি প্রেমানন্দ দান করেন জীবকে, তিনিই হলেন ভগবান্ শ্রীমুকুন্দ। শাস্ত্রে সবটার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। আমাদের কেবল part part করে ব্যাখ্যা দিতে হবে। কে ভগবান্, কে প্রেমময় ভগবান্, তিনি বিশ্বের কি কল্যাণ-চিন্তা করেন, তিনি কি মানুষের মধ্যে কোন বিভেদ রেখেছেন, তিনি কি মানুষের ভিতরে ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্য্য বাড়িয়ে তুলেছেন? আমাদের সনাতন আর্য্যঋষিগণ কি কেবল ঝগড়া-বিবাদ-বিসম্বাদ বাড়িয়ে তুলেছেন, লোককে কি ঘৃণা করতে বলেছেন, লোককে কি অসম্মান করতে শিখিয়েছেন, তাদের কি অমর্য্যাদা করতে বলেছেন, শাস্ত্রে কি এমন কথা লেখা আছে কোথাও?—কোথাও নাই, বরং সকলে মিলেমিশে চলব আমরা—এই নীতি-আদর্শ-উপদেশ-নির্দ্দেশই শাস্ত্রের সব জায়গায় লেখা আছে। সেখানে Provincialism—প্রাদেশিকতার কোন কথা নাই। দুটো কুকুর ঝগড়া করে Provincial হয়ে, ক্ষুদ্র স্বার্থে—তার অঞ্চলে অন্য কাউকে প্রবেশ করতে দেয় না সে। এই প্রাদেশিকতা বা আঞ্চলিকতাবাদ Narrow-minded ব্যক্তিগণেরই উপজীব্য; তারা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ-চিন্তা না করে নিজস্ব অঞ্চলের উন্নতির চিন্তায় ব্যস্ত। ভগবান্ তার অনেক উর্দ্ধে, ঋষিগণও তার অনেক উর্দ্ধে। তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা, ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য্য নাই, কারণ তাঁরা নির্ম্মৎসর। তাঁরা অপ্রাকৃত স্নেহযুক্ত ও প্রেমময়। সেখানে ওসব কোন কথা নাই, যেখানে জীবাত্মার স্বরূপের বিচার করা হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এ জগতে এসেছেন, তিনি জীবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে কি বল লেন?—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্ব্বা।

কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ ॥

আমি ব্রাহ্মণ নহি, আমি রাজা নহি, বৈশ্য বা শূদ্র নহি, আমি ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বাণপ্রস্থ নহি, সন্ন্যাসীও নহি। তাহলে তুমি কে? জীবের স্বরূপের পরিচয় দিচ্ছেন স্বয়ং সেই নিখিল বিশ্বের অখিল লোকশিক্ষক—World-Teacher। তিনি বলছেন,—"কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধের্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ ॥"—আমি নিত্য স্বতঃ-প্রকাশমান নিখিল পরমানন্দপূর্ণ-অমৃতসমুদ্রস্বরূপ ভগবানের পদকমলের দাস-দাসানুদাস। আমি যদি ভগবানের দাস বলি, তাহলে কিছুটা অহঙ্কার এসে যায়; কিন্তু যদি ভগবানের দাসানুদাস, তার দাস—এই কথা বলি, তাহলে অহঙ্কার নাই। সেইজন্য দেখা যায়, ভক্তের যে প্রার্থনা সেখানে সম্রাট্ কুলশেখর বলছেন,—

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে, মৎপ্রার্থনীয়-মদনুগ্রহ এষ এব।
তদ্‌ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ॥

হে লোকনাথ ভগবান্! তুমি আমাকে তোমার ভৃত্যের ভৃত্যের ভৃত্য বলে মনে কর। তাহলে আমি জানব—আমার প্রতি তোমার স্নেহ, মমতা, দয়া আছে। সুন্দর বিচার দেখিয়েছেন। সেখানে কোনরূপ হিংসা, মাৎসর্য্যের স্থান নাই। ঋষিগণ পরম কৃপালু, দয়ালু, জগতের কল্যাণ-চিন্তা করেছেন তাঁরা—জগজ্জীব কি করে সেই ভগবানের দিকে অগ্রসর হবে, বিভেদ ভুলে যাবে। যেখানে আমাদের বহু উপাস্য, সেখানেই গণ্ডগোল বেশী। ৩৩ কোটী দেব-দেবী যেখানে উপাস্য, সেখানে ৩৩ কোটী রকমের চিন্তাধারা। যদি উপাস্য নির্ণয় করতে হয়, তাহলে শাস্ত্র যেভাবে উপাস্য নির্ণয় করেছেন, সেভাবে আমাদের উপাস্য নির্ণয় করতে হবে। সেখানে বলছেন, আমাদের একায়নশাখী হতে হবে। ঋষিগণের নীতি হল একায়ন, বহ্বয়ন নহে। রাস্তাটা এক, The only Road, The only well-Mecadamised Road। সনাতন ধর্ম্মপথ এক, সিঁড়ি—Step অনেক হতে পারে। সেখানে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা ইত্যাদি step—সিঁড়ি, সোপান। আমি এটা গীতা থেকে প্রমাণ করতে পারি। আপনারা গীতা আলোচনা করেছেন, সেখানে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন,—ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কাকে বলে? আমি ব্যবসা করতে বসেছি। ব্যবসা করা মানে—আমি লাভ করব। তবে আমাকে আগে থেকে জেনে নিতে হবে, চিন্তা করে নিতে হবে—ব্যবসার Merits, Demerits। ব্যবসা করতে গেলে আমার লোকসান হতে পারে, সেটা আগেই আমাকে চিন্তা করে রাখতে হবে। তা না হলে যদি আমার লাখ টাকা লোকসান হয়ে যায়, তাহলে হয়ত' হার্ট ফেল করে মারা যেতে পারি। সেইজন্য আগে থেকে Demerits গুলো জেনে নিয়ে ধৈর্য্যধারণ করতে হবে। কিন্তু ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কি?—আমি লাভ করব। এখানে গীতায় ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কাকে বলছেন?—নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, ভগবানকে পাওয়ার যে নিশ্চিত বুদ্ধি। সে পথ ত' এক। আজ বহু পথের কল্পনা যারা করছেন, তারা অব্যবসায়ী; তারা ব্যবসা বোঝেন না, কি করে ব্যবসা করতে হয় তা তারা জানেন না—নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অভাবে।

বকরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির মহারাজকে চারটী প্রশ্ন করেছেন, মহাভারতে আছে,—কা চ বার্ত্তা, কিমাশ্চর্য্যম্, কঃ পন্থাঃ, কশ্চ মোদতে।

বদ মে চতুরঃ প্রশ্নান্ মৃতা জীবন্তু বান্ধবাঃ॥

আমার এই চারটী প্রশ্নের উত্তর দাও, তাহলে তোমার এই আত্মীয়স্বজন যারা মরে গেছে, অজ্ঞান হয়ে গেছে এখানে, তারা সব বেঁচে উঠবে। 'কা চ বার্ত্তা'—জগতের খবর কি? দুনিয়ার সংবাদ কি? আমাদের জিজ্ঞাসা করলে আমরা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির খবর সব বলে দেব। আমরা খেতে পারছি না, পরতে পারছি না—এই সমস্ত আর্জ্জি পেশ করব নেতাদের কাছে। কিন্তু এখানে জগতের বার্ত্তা বলেছেন কি?—

মাসর্ত্তু দর্ব্বী পরিঘট্টনেন, সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রি-দিবেন্ধনেন।
অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে, ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা॥

একটু রূপক করে জিনিসটা বললেন। মাস এবং ঋতু দর্ব্বীর (হাতা) কাজ করছে। রান্না করতে গেলে একটা খুন্তী, চামচ ত' লাগবে নাড়বার জন্য। সেইটাকে বলছেন দর্ব্বী। 'পরিঘট্টনেন'—হাতা-খুন্তী দিয়ে ঘাঁটা হচ্ছে। সূর্য্য, অগ্নি, রাত্র, দিবা এরা ইন্ধনের—Fuel এর কাজ করছে। 'অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে'—রান্না করবার জন্য একটা পাত্র দরকার। সে পাত্রটা হল জীবের মায়া-মোহময় কটাহ। 'ভূতানি কালঃ পচতি'—দুরন্ত কাল ভূতগণকে—প্রাণীগণকে পাক করছে এই মায়ামোহময় কটাহে। এটা বুঝিয়ে দিলেন রূপক করে। এইটা হল দুনিয়ার সংবাদ।

দ্বিতীয় প্রশ্ন,—'কিমাশ্চর্য্যম্' এর উত্তর দিয়েছেন,—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥

প্রতিমুহূর্ত্তে আমার চোখের সামনে আমারই কত আত্মীয়-স্বজন চলে যাচ্ছেন—মারা যাচ্ছেন। কিন্তু তাতেও আমার কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। মনে করছি, আমরা নিশ্চয়ই বেঁচে থাকব। আমার চোখের সামনে যে ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত, তাতে আমার প্রত্যয় নাই। আমি মনে করছি,—আমি অজর, অমর। নীতিশাস্ত্রে আছে,—"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।" যখন আমি অর্থ রোজগার করব, তখন আমি ভাবব—আমি অজর, অমর। তা না হলে অর্থ রোজগার হবে না, বিদ্যালাভ হবে না। "গৃহীত এব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥"—আর ধর্ম্মাচরণ যখন করতে হবে, তখন মৃত্যু আমার কেশাকর্ষণ করছে—এটা চিন্তা না করলে ধর্ম্মাচরণ করা যায় না। যদি আমি Adamant—বেপরোয়া হয়ে যাই, তাহলে ধর্ম্মচিন্তা—নীতি-আদর্শ সংরক্ষণ করা যায় না। সেইজন্য 'গৃহীত এব কেশেষু' বিচারটা পাশাপাশি রাখতে হবে, যদিও ওটা ভয়ের কথা নয়, নির্ভীকতারই উদাহরণ। যাঁরা ধার্ম্মিক, তাঁরা ভীরু, কাপুরুষ নন; যারা অধার্ম্মিক তারাই ভীরু। ধার্ম্মিক ভীরু নন যেহেতু তিনি নীতিবাদী, জীবনে চলার পথে নীতি-আদর্শকে তিনি সর্ব্বতোভাবে বজায় রাখতে চান। সেইটাই তাঁর জীবনের Summum bonum।

প্রতি মুহূর্ত্তে যে ঘটনা ঘটছে, তার কোন প্রত্যয় নাই আমার—এর থেকে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে! এখানে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্য বা আজকাল যে সব Atom and Hydrogen Energy, Electronics যন্ত্রপাতি আবিষ্কার, Computer বা রোবট্ ইত্যাদির কথা বলা হয় নাই। এখানে আশ্চর্য্য বলছেন কি?—চোখের সামনে যেটা ঘটছে তাতে বিশ্বাস নাই, এটাই সব থেকে আশ্চর্য্য ব্যাপার!

তারপরে প্রশ্ন হয়েছে,—'কঃ পন্থাঃ'—ভগবানকে পাওয়ার প্রকৃষ্ট পথ কোন্‌টা? উত্তরে বলছেন,—

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ, নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং, মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ॥

'বেদা বিভিন্নাঃ'—বেদের মধ্যে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগীর পক্ষে বহু কথা বলা হয়েছে। তার থেকে সার-সঙ্কলন করা বড় কষ্টকর। তার থেকে চুনাও

করে যে আমি আমার আত্মকল্যাণ বিষয়টা লাভ করব, সেটা প্রায় অসম্ভব। 'স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ'—স্মৃতিশাস্ত্রে বহুপ্রকার বিচার, বহু নির্দ্দেশ, বহু রকমের ব্যবস্থা দিয়েছেন। তার থেকেও আমার সার-সঙ্কলন করা মুস্কিল। 'নাসা-বৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্'—এমন কোন ঋষি নাই, যিনি ভিন্ন মত প্রকাশ না করেছেন। প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ মত ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু তার মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। অধিকারিভেদে মত বিভিন্ন বলতে পারেন, কিন্তু তার সামঞ্জস্যকারীও আছেন। সামঞ্জস্য কে করছেন? বিভিন্ন রকমের কথা আসছে, আমি তার মীমাংসা করতে পারি না কোনদিন। তাহলে ধর্ম্মপথটা আছে কোথায়? আমি রাস্তাটার অনুসন্ধান পাচ্ছি কোথায়? "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্"—ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত আছে। 'গুহা' বলতে কি পাহাড়ের গুহার মধ্যে নিহিত আছে?—না তা নয়, মহাজনের হৃদয়-গুহায়। সে মহাজন কে? ধান-চালের ব্যবসা করা মহাজন?—না, মহাজন মানে—যাঁরা ভগবানের সঙ্গে কারবার করেন, লেনদেন করেন, ভগবানের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ রাখেন, তাঁর সঙ্গে আত্মকল্যাণজনক আলোচনা ও আদান-প্রদান করেন, তাঁরা মহাজন। তাঁদের হৃদয় গুহাতে ধর্ম্মতত্ত্ব নিহিত আছে। "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ"॥—সেই মহাজনগণ যে পথে গিয়েছেন, সাধন-ভজন করেছেন, সেই পথটা হল প্রকৃত বাস্তব পথ। 'সঃ পন্থাঃ' একবচন। দ্বিবচন বা বহুবচন নয়। Singular number, Plural number নয়। তাহা The only way, The only Mecadamised Royal Road। ভগবানকে পাওয়ার যে রাস্তা সেটা এক, বহু নয়। যদি কেউ বলেন—রাস্তা বহু, তাহলে বুঝতে হবে ভুল করে বলছেন। সেই পথ একটা। তথায় বহু step বা সোপান অতিক্রম করতে হয়। Step গুলোকে কেউ রাস্তা বললেও তাহা রাস্তা নয়। যদিও step গুলোকে নিয়েই রাস্তা, তথাপি রাস্তার একটা পৃথক্ সংজ্ঞা আছে। Road টাকে নিশ্চয়ই step বা সিঁড়ি বলা হয় না, কিন্তু সোপানগুলোকে নিয়েই সড়ক বা রাস্তা হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ-মহিমা

গৌরাঙ্গের পূর্ব্বে কে ছিল জগতে
জীবের কল্যাণ করিবারে দান!
গৌরাঙ্গের পূর্ব্বে কে ছিল জগতে
এমন অকুণ্ঠ মহাবদান্য, হন পূর্ণ-ভগবান্!
গৌরাঙ্গের পূর্ব্বে কে ছিল জগতে
কলিযুগ-ধর্ম্ম নাম-মহামন্ত্র শিখাইতে!

গৌরাঙ্গের পূর্ব্বে কে ছিল জগতে
সাধিতে সাধ্য-প্রেম, ভক্তি—সাধন !
গৌরাঙ্গের পূর্ব্বে কে ছিল জগতে
জানাতে বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সন্দেশ !
গৌরাঙ্গের পূর্ব্বে কে ছিল জগতে
নামাতে ধরায় ব্রজের প্রেম !
গৌরাঙ্গের পূর্ব্বে কে ছিল জগতে
'পরং বিজয়তে কৃষ্ণনাম', নিভাতে ত্রিতাপ !
গৌরাঙ্গের পূর্ব্বে কে ছিল জগতে
অহৈতুকী ভক্তি শ্রীরাধাকান্তে !
গৌরাঙ্গের পূর্ব্বে কে ছিল জগতে
আচরি' আত্মধর্ম্ম প্রচার করিতে !
গৌরাঙ্গের পূর্ব্বে কে ছিল জগতে
শিখাতে "জীবের স্বরূপ—নিত্যকৃষ্ণদাস" !
গৌরাঙ্গের পূর্ব্বে কে ছিল জগতে
বৈষ্ণব-আনুগত্যে হয় শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দ জয় !
গৌরাঙ্গের পূর্ব্বে কে ছিল জগতে
'জীব' বলিতে 'আত্মা' জানিহ শুদ্ধা নিত্যা !
গৌরাঙ্গের পূর্ব্বে কে ছিল জগতে
জানাতে যেই "কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা" সেই গুরু হয় !
গৌরাঙ্গের পূর্ব্বে কে ছিল জগতে
জীবে-ঈশ্বরে ভেদাভেদ তত্ত্ব-প্রকাশিতে !
গৌরাঙ্গের পূর্ব্বে কে ছিল জগতে
সন্ন্যাসী হয়ে নেচে গেয়ে প্রেম দিয়েছে জনে জনে !
মুকুন্দ-চরণ করিবারে বরণ
সদ্‌গুরুচরণে করি আত্মনিবেদন ।

—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী
(ডাঃ পরিতোষ রাহা)

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব

সর্ব্ব জীবাত্মার অধীশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পূত-পবিত্র জন্ম-জয়ন্তী শুধু ভারতবর্ষের নয়, সারাবিশ্বের এক সার্ব্বিক (আন্তর্জ্জাতিক) উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে জনজীবনে নেমে আসে এক অভূতপূর্ব্ব উন্মাদনা, সর্ব্বত্র বয়ে যায় আনন্দের জোয়ার। সেই জোয়ারে অবগাহন করার জন্য অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও বিভিন্ন মঠ হতে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ এবং দূর-দূরান্তর হতে অগণিত ভক্তবৃন্দ জগদ্‌গুরু শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শাখাকেন্দ্র শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে উপনীত হন। দিক্ দিগন্ত বিস্তৃত গগনস্পর্শী গারো পাহাড়ের কোলে অবস্থিত সুন্দরী তুরা সহরের অন্তর্গত 'শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ'।

পূর্ব্বেকার ন্যায় বর্ত্তমান বৎসরেও শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণের শুভাবির্ভাব-তিথি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে বিপুল সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে গত ২৭শে শ্রাবণ (ইং ১৩।৮।৯০) সোমবার শ্রীমঠের প্রবেশদ্বারে বিরাট্ তোরণ নির্ম্মাণ করা হয়। শ্রীমন্দিরসহ সমগ্র উৎসব প্রাঙ্গণ বিচিত্র রঙ্গীণ বস্ত্রাদি, আম্রপল্লব ও পূর্ণকুম্ভসহ কদলীবৃক্ষদ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। সন্ধ্যা ৬টায় সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-রাধাবিনোদবিহারীজীউ এবং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশ-কারী শ্রীনৃসিংহদেবের জয়দানপূর্ব্বক এই মহোৎসবের সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়।

২৮শে শ্রাবণ (ইং ১৪।৮।৯০), মঙ্গলবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি ও তুলসী পরিক্রমার পরেই সুসজ্জিত ট্যাক্সিতে শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা —শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ও সমিতির বর্ত্তমান আচার্য্য-সভাপতি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ এবং পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আলেখ্য স্থাপনপূর্ব্বক এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাসহকারে মহামন্ত্র কীর্ত্তনমুখে শহরের মুখ্য মুখ্য পথগুলি পরিক্রমা করা হয়। পরিক্রমান্তে উক্ত দিবস সমস্তদিন মঠে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী পারায়ণ হয় এবং সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হতে ব্রহ্মচারিগণ সুললিত কণ্ঠে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজের সভাপতিত্বে এক

মহতী ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল,—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবিগ্রহতত্ত্ব।" উক্ত সভায় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমৎ যতি মহারাজ, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, বিশেষ অতিথি Principal R. Bhattacharjee (Tura Govt. College) ও শ্রীসুধাংশু-মোহন ঘোষ (Manager of Apex Bank, Bagmara) প্রমুখ বক্তৃগণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে সভার সভাপতি শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ বিশেষ বক্তব্য রাখেন। সর্ব্বশেষে শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ দাসাধিকারী রামায়ণ গান পরিবেশন করেন।

পরদিবস ২৯শে শ্রাবণ (ইং ১৫।৮।৯০), বুধবার শ্রীনন্দোৎসব দিবসে দুপুর ১২টা হতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে আহূত, অনাহূত ও রবাহূত প্রায় চারি সহস্রাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনান্তে ধর্ম্মসভার কাজ আরম্ভ হয়। পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল—"শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও বৈদিক সাম্যবাদ।" অদ্যকার সভায় পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমৎ যতি মহারাজ, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীদাম ব্রহ্মচারী, Prof. K. P. Chowdhury (Tura Govt. College) ও শ্রীরামনরেশ পাণ্ডে (প্রধান শিক্ষক, তুরা হিন্দী হাইস্কুল) প্রমুখ বক্তৃবৃন্দ ভাষণ প্রদান করেন। পরিশেষে সভাপতি মহারাজের ভাষণান্তে রামায়ণ গান পরিবেশিত হয়।

৩০শে শ্রাবণ (ইং ১৬।৮।৯০), বৃহস্পতিবার শ্রীসমিতি-পরিচালিত "শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বিদ্যাপীঠের" (English Medium School) ছাত্রছাত্রীগণ বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ কৃতী ছাত্রছাত্রীগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে Mr. Biren Hajong (Ex. D. I. of Schools) প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন। সর্ব্বশেষে শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ দাসাধিকারী রামায়ণ গান করেন।

এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য স্থানীয় সুধী ভক্তবৃন্দের ও P. W. D., P. H. E. ও B. S. F. প্রভৃতি সরকারী বিভাগের সহযোগিতা বিশেষ প্রশংসনীয় ও উল্লেখযোগ্য। মঠের Decoration ও বিশাল তোরণদ্বার নির্ম্মাণে শ্রীপাদ নরনারায়ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীখগেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুপদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিধান শর্ম্মা প্রমুখের

সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। জন্মাষ্টমীর এক বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় ছিল শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরাম অবতারের লীলামূর্ত্তি প্রদর্শনী। প্রতিদিনই অগণিত দর্শনার্থী প্রকৃতি ও স্থানের বিপদ সঙ্কুলতা ও প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে দুর্দ্দমনীয় গতিতে উৎসবের মহানন্দ আস্বাদনে ছুটে আসতেন। বিশাল জনসমাগম দেখে মনে হত এই উৎসব শুধু তুরা বা গারো পাহাড়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব নয়, সমগ্র মেঘালয়ের গৌরবের বিষয়।

বলাবাহুল্য শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব সমিতির প্রধানকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও তদধীন শাখামঠসমূহে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীচৈতন্যে মর্ত্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭৮ পৃষ্ঠার পর]

লেখক ৩০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন,—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী-কথিত চৈতন্য 'স্বয়ং নারায়ণ' কথাটি যদি সর্ব্বান্ত সত্য হইত, তাহা হইলে সে কথা শুধুমাত্র চৈতন্য ভাগবতে থাকিত না—সেক্ষেত্রে কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃতেও বর্ণিত হইত অবশ্যম্ভাবীরূপে। কিন্তু কার্য্যত তাহা হয় নাই।

ইহার উত্তর খুবই স্পষ্ট যে, "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের" নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী শিশু-চৈতন্যের ভবিষ্যদ্বাণী প্রসঙ্গে 'নারায়ণ'-শব্দটির উল্লেখ করিয়াছেন ;—

"চিহ্ন দেখি' চক্রবর্ত্তী বলেন হাসিয়া।
লগ্ন গণি' পূর্ব্বে আমি রাখিয়াছি লিখিয়া॥
বত্রিশ লক্ষণ—মহাপুরুষ-ভূষণ।
এই শিশু-অঙ্গে দেখি সে-সব লক্ষণ॥
তথাহি সামুদ্রিকে তৃতীয়-শ্লোক ঃ—
পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্ব-পৃথু-গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্॥
নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত-চরণ।
এই শিশু সর্ব্বলোকে করিবে তারণ॥
এই ত' করিবে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার।
ইহা হৈতে হ'বে দুই কুলের নিস্তার॥"

(চৈঃ চঃ আদি ১৪।১৩-১৭)

শ্রীচৈতন্যদেব বারাণসীতে অবস্থানকালে কাশীবাসী একদণ্ডী শাঙ্কর সন্ন্যাসিগণের গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে উদ্ধার-মানসে জনৈক বিপ্র-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকারপূর্ব্বক সন্ন্যাসীদের সভায় গিয়া প্রথমে স্বীয় স্বরূপের কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। পরে তাঁহাদের নিকট বেদান্তসূত্রের মর্ম্ম বিবৃত করিয়া মায়াবাদ-সিদ্ধান্ত খণ্ডন করেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের বহু শাস্ত্রযুক্তি-শ্রবণে সন্ন্যাসিগণসহ তাঁহাদের গুরু শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী নির্ব্বিশেষবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতী মায়াবাদের অসারতা উপলব্ধি করেন ও সকল সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে 'সাক্ষাৎ নারায়ণ' বলিয়া স্তব করেন। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' বর্ণিত আছে,—

"এইমত সর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া॥
বেদময়-মূর্ত্তি তুমি,—সাক্ষাৎ **নারায়ণ**।
ক্ষম অপরাধ,—পূর্ব্বে যে কৈলু নিন্দন॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৭।১৪৭-১৪৮)

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দেখিয়া লব্ধসুকৃতি লোকের নারায়ণ-বুদ্ধি হয়।—

লোকে কহে—'সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম-নারায়ণ॥'

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১০৯)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্যত্র দৃষ্ট হয়;—প্রকাশানন্দ সরস্বতীর জনৈক শিষ্য সভাস্থলে সমালোচনা-মুখে মহাপ্রভুকে 'নারায়ণ' জ্ঞান করেন।

"প্রকাশানন্দের শিষ্য এক তাঁহার সমান।
সভামধ্যে কহে প্রভুর করিয়া সম্মান॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় 'সাক্ষাৎ **নারায়ণ**'।
'ব্যাসসূত্রের' অর্থ করেন অতি-মনোরম॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।২৩-২৪)

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে" মধ্যলীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রকাশানন্দ-সমীপে এক বিপ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যে ভাগবত-কথিত ঈশ্বর-লক্ষণসমূহের বিদ্যমানতা জ্ঞাপন করেন,—

এক বিপ্র দেখি' আইলা প্রভুর ব্যবহার।
প্রকাশানন্দ-আগে কহে চরিত্র তাঁহার॥
"এক সন্ন্যাসী-আইলা জগন্নাথ হৈতে।
তাঁহার মহিমা-প্রতাপ না পারি বর্ণিতে॥

সকল দেখিয়ে তাঁতে অদ্ভুত-কথন।
প্রকাণ্ড-শরীর, শুদ্ধ কাঞ্চন-বরণ॥
আজানুলম্বিত ভুজ, কমল-নয়ন।
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব্ব সল্লক্ষণ॥
তাহা দেখি' জ্ঞান হয়—'এই নারায়ণ'।
যেই তাঁরে দেখে, করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন॥
'মহাভাগবত'-লক্ষণ শুনি ভাগবতে।
সে-সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে॥
'নিরন্তর কৃষ্ণনাম' জিহ্বা তাঁর গায়।
দুই-নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা-প্রায়॥
ক্ষণে নাচে, হাসে, গায়, করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে,—সিংহের গর্জ্জন॥
জগৎমঙ্গল তাঁর 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নাম।
নাম, রূপ, গুণ তাঁর, সব—অনুপম॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১০৫-১১৩)

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, শ্রীচৈতন্যভাগবতের 'সাক্ষাৎ নারায়ণ'-কথাটি চৈতন্যচরিতামৃতেও বহুবার স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত—দুইটী গ্রন্থেই অভিন্ন কথার উল্লেখ থাকায় লেখক মহাশয় তাঁহার পুস্তকের ৩০ পৃষ্ঠার বক্তব্য অনুযায়ী চৈতন্য 'স্বয়ং নারায়ণ' কথাটি সর্ব্বান্তসত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন ত' ?

লেখক আরও লিখিয়াছেন—'সেই চির শাশ্বত সূর্য হলো 'মানুষ চৈতন্য'। 'ভগবান চৈতন্য সেই সূর্যকে প্রচ্ছন্ন রাখার কৃত্রিম মেঘ-স্বরূপ আভরণ মাত্র।' এই কথাটির প্রমাণের জন্য লেখক যে একটী প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা উপরোক্ত অবস্থায় অযৌক্তিক ও অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কাজেই ঐ উদাহরণের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত বক্তব্যটির অসারতা প্রতিপন্ন হইল।

লেখক বলিতে চাহেন—'মানুষ চৈতন্য' হইতেছেন চির শাশ্বত সূর্য। এস্থলে লেখক শ্রীচৈতন্যকে জন্ম-মরণশীল মানুষ জ্ঞান করিতেছেন। মানবাত্মা শাশ্বত হইতে পারে, কারণ গীতাতে জীবাত্মাকে "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং" বলা হইয়াছে, কিন্তু দেহকে আত্মা মনে করা বিবর্ত্ত বা ভ্রান্তি। তাই মনুষ্য-দেহ শাশ্বত হইতে পারে না।

'ভগবান চৈতন্য' সেই 'মানুষ চৈতন্য' রূপ শাশ্বত সূর্যকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার কৃত্রিম মেঘ স্বরূপ আভরণ মাত্র—বলিয়া লেখক যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা বিচার করিলে ভগবান্ চৈতন্য কৃত্রিম মেঘস্বরূপ হইয়া যান। সূর্য্যকে কি মেঘ ঢাকিয়া রাখিতে পারে? মানুষের চক্ষুই মেঘের দ্বারা আবৃত হয়। স্বপ্রকাশ সূর্য্য নিরন্তরই নির্ম্মল। সূর্য্যকে প্রচ্ছন্ন ঢাকিয়া রাখার মত কৃত্রিম মেঘ থাকে না। ভগবান্ চৈতন্য কৃত্রিম মেঘস্বরূপ আভরণমাত্র বলিলে সর্ব্বকারণকারণ ভগবান্ চৈতন্যের কৃত্রিমতা প্রকাশ পায়। 'ভগবান্' শব্দের অর্থে 'ভগ' আছে যাঁহার, তাঁহাকে ভগবান্ বলা হয়। 'ভগ' বলিতে বুঝায়—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"

অর্থাৎ,—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বশক্তিমত্তা, যশঃপূর্ণতা, সৌন্দর্য্যপূর্ণতা, সমগ্র জ্ঞানজনিত চিৎস্বরূপ বস্তু এবং বৈরাগ্য-সমন্বিত স্বতন্ত্রতা ও নির্লিপ্ততা—এই ছয় চমৎকারিতা শ্রীভগবানে সর্ব্বদা বিদ্যমান। কৃত্রিম মেঘ আসল মেঘেরই মত এবং তাহা বৈজ্ঞানিকগণ সৃষ্টি করিতে পারেন; কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানের উপর আর কে আছেন, যিনি কৃত্রিম ভগবান্ সৃষ্টি করিবেন? দুশ্চর-তপস্যালভ্য ভগবান্ স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত চৈতন্যরূপে মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া মানুষের রূপ ধারণ করিয়া অনর্পিতচর ব্রজপ্রেম-সুধারস জগৎকে বিলাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব মানবের ন্যায় দেহ-সন্নিবিষ্ট ও মানবোচিত বহু কার্য্য করিলেও পাঞ্চভৌতিক শরীরধারী নহেন। যাঁহাদের বিদ্বৎ-প্রতীতি উদিত হইয়াছে, তাঁহারাই চৈতন্যদেব-স্বরূপকে 'নিত্য সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব' বলিয়া বুঝিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যাবতার সাক্ষাৎ নারায়ণ; জগদুদ্ধারার্থ তাঁহার নরলীলা।

"মনুষ্য নহেন তিঁহো—নর-নারায়ণ।
নররূপে লীলা তাঁর জগৎ-কারণ॥" (চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।১২৩)

এমতাবস্থায় লেখকের পুস্তকে চিরশাশ্বত সূর্য মানুষ চৈতন্য, আর ভগবান চৈতন্য সেই সূর্যকে প্রচ্ছন্ন রাখার কৃত্রিম মেঘ স্বরূপ আভরণ মাত্র—কথাটির অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

আবার ৩০ পৃষ্ঠায় শেষাংশের বক্তব্যে দেখা যায়—'যদিও চরিতামৃতে চৈতন্যকে একাধিকবার ভগবান বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু তা ভক্তের তুলিতে আঁকা নিছক ভগবানের ছবি।'

প্রসঙ্গতঃ প্রশ্ন আসে যে, চৈতন্যদেব ভগবান্ হিসাবে কি কেবল ভক্তের

তুলিতেই শোভা পাইয়াছেন? গৌড়াধ্যক্ষ যবন রাজা—হুসেন শাহ বাদশাহ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন।

"রাজা কহে, শুন, মোর মনে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহঁ নাহিক সংশয়॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১।১৮০)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত দেখা যায়,—মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য্যোল্লেখপূর্ব্বক বাদশাহের প্রভুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া প্রতীতি,—

"হিন্দু যাঁরে বলে 'কৃষ্ণ', 'খোদায়' যবনে।
সে-ই তিঁহো, নিশ্চয় জানিহ সর্ব্বজনে॥
* * *
তাঁহারে সকল দেশে কায়-বাক্য-মনে।
ঈশ্বর নহিলে বিনা-অর্থে ভজে কেনে?"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪।৫৫, ৫৮)

এস্থলে বাদশাহ হুসেন শাহের বক্তব্য কি ভক্তের তুলিতে আঁকা নিছক ভগবানের ছবি হইতে পারে? হুসেন শাহ কি কখনও মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ভক্ত হইয়াছিলেন?

আবার চৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্ট হয়,—মহাপ্রভুর প্রতি বৌদ্ধাচার্য্যের ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হইলে ও পাষণ্ডী বৌদ্ধদের শাস্তি হইলে গুরুর দশা-দর্শনে বৌদ্ধ-শিষ্যগণের মহাপ্রভুর চরণে শরণাগতি,—

"হাহাকার করি' কান্দে সব শিষ্যগণ।
সবে আসি' প্রভু-পদে লইল শরণ॥
তুমি ত' ঈশ্বর সাক্ষাৎ, ক্ষম অপরাধ।
জীয়াও আমার গুরু, করহ প্রসাদ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৯।৫৭-৫৮)

এইভাবে পাষণ্ড আচরণকারী বৌদ্ধগণ মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞান করার পর বৌদ্ধগণকে মহাপ্রভু কৃষ্ণনাম-দীক্ষা দান করেন। সুতরাং বৌদ্ধগণ মহাপ্রভুর ভক্ত হইবার পূর্ব্বেই যে তাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞান করিলেন, তাহাও কি ভক্তের তুলিতে আঁকা ভগবানের ছবি?

(৫) লেখক ৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"আমরা জানি, চৈতন্য প্রথম জীবনে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। বরং বৈষ্ণব বিদ্বেষীই ছিলেন। কিন্তু সুপণ্ডিত, প্রাজ্ঞ, অদ্বৈত পণ্ডিত তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি ও ধী শক্তির জোরে চৈতন্যকে টেনে এনেছিলেন বৈষ্ণব শিবিরে।"

আবার ২০০ পৃষ্ঠায় লেখক লিখিয়াছেন,—"১৬।১৭ বছর বয়েসে নিমাই অদ্বৈত আচার্য্যের কাছে বেদ ও ভাগবত পাঠ নিয়েছিলেন।"

লেখকের উক্ত বক্তব্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বুঝা যায় যে, চৈতন্যের ১৬।১৭ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে লেখকের মতে চৈতন্য বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন। কিন্তু লেখকের ঐরূপ ধারণার ভিত্তি কোথায়? লেখক 'নিবেদনে' লিখিয়াছেন,—'ধর্ম-সংস্থাপনার্থ'র উদ্দেশ্যে···অবিসম্বাদী চৈতন্যের আবির্ভাব। লেখকের নিবেদনের বক্তব্য সত্য হইলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে—চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হইলে তিনি কি প্রথম জীবনে বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হইতে পারেন? লেখক মহাশয় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে বৈষ্ণব-বিদ্বেষী বলিলেই ত' হইবে না, তাহার প্রমাণ কোথায়?

লেখক "চৈতন্যচরিতামৃত" ও "চৈতন্যভাগবত"—এই দুইটী প্রামাণিক গ্রন্থ পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন যে, শিশুকালে নিমাইকে একমাত্র হরিনাম ব্যতীত সান্ত্বনা দিবার আর কোন উপায় ছিল না।—

"ক্রন্দনের ছলে বলাইল হরিনাম।
নারী সব 'হরি' বলে,—হাসে গৌরধাম॥" (চৈঃ চঃ আদি ১৪।২২)

জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য পণ্ডিত নামে দুইজন ব্রাহ্মণ গোদ্রুমদ্বীপে বাস করিতেন। প্রভুর গৃহ হইতে হিরণ্য-জগদীশ পণ্ডিতদ্বয়ের গৃহ একটু দূরে, প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। তাঁহারা একাদশী দিবসে প্রচুর পরিমাণে ভগবন্নৈবেদ্যের আয়োজন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব অর্থাৎ শিশু নিমাই সেই নৈবেদ্য খাইবার আশায় তাঁহার পিতাকে হিরণ্য-জগদীশের বাড়ীতে পাঠান। হিরণ্য-জগদীশ শিশু নিমাইয়ের প্রার্থনা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভাবিলেন, শিশু নিমাইয়ের মধ্যে অবশ্যই কোন ঐশী শক্তি আছে!

"দুই বিপ্র বোলে,—মহা অদ্ভুত কাহিনী!
শিশুর এমত বুদ্ধি কভু নাহি শুনি॥
কেমতে জানিল আজি শ্রীহরিবাসর।
কেমতে বা জানিল নৈবেদ্য বহুতর॥" (চৈঃ ভাঃ ৫।২৮-২৯)
"এ শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ।
হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন॥
মনে ভাবি' দুই বিপ্র সর্ব্ব-উপহার।
আনিয়া দিলেন করি' হরিষ অপার॥" (চৈঃ ভাঃ ৫।৩১-৩২)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুচারুরূপে পালে সেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪২শ বর্ষ | ১৫ কেশব, ক্ষীরোদশায়ী, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ
৩০শে কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৯৭, ইং ১৭।১১।৯০ | ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীচতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মকৃতা শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তুতিঃ

[শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বৃন্দাবনখণ্ডে শ্রীনারদ-বহুলাশ্ব-সংবাদে ব্রহ্মস্তুতৌ নবমেঽধ্যায়ে]

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

১। কৃষ্ণায় মেঘবপুষে চপলাম্বরায়
পীযূষমিষ্ট-বচনায় পরাৎপরায়।
বংশীধরায় শিখিচন্দ্রকয়ান্বিতায়
দেবায় ভ্রাতৃসহিতায় নমোঽস্তু তস্মৈ॥ ১॥

[গোলোকপতি সাক্ষাৎ হরিকে গুপ্ত গোপালবেশে দর্শন করিয়া ব্রহ্মা পূর্ব্বকর্ম্ম স্মরণ করত ভীত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করিবার জন্য স্বীয় বাহন

হইতে অবতরণপূর্ব্বক লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। তিনি ঈশকে বারবার প্রণামপূর্ব্বক অর্ঘ্য প্রদান করিয়া দণ্ডের ন্যায় ভূপতিত হইলেন। তিনি ভক্তিযুক্তচিত্তে করজোড়ে প্রণাম করিলেন এবং ভূতলে দণ্ডবৎ লুণ্ঠিত হইয়া গদ্‌গদ-বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন,—]

ব্রহ্মা বলিলেন,—মেঘকান্তি, চপলাম্বর, অমৃততুল্য-মিষ্টিভাষী, পরাৎপর, বংশীধর, বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছচূড় শ্রীকৃষ্ণদেবকে ভ্রাতা বলরামসহ নমস্কার করি ॥১॥

২। কৃষ্ণস্তু সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমঃ স্বয়ং
পূর্ণঃ পরেশঃ প্রকৃতেঃ পরো হরিঃ।
যস্যাবতারাংশকলা বয়ং সুরাঃ
সৃজাম বিশ্বং ক্রমতোঽস্য শক্তিভিঃ ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম, পূর্ণ, পরেশ, প্রকৃতির অতীত এবং পরব্রহ্ম হরি। আমরা দেবগণ যাঁহার অংশ ও কলাবতার; তাঁহার শক্তিতেই আমরা ক্রমশঃ বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥ ২ ॥

৩। স ত্বং সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্রাবতারো
নন্দস্যাপি পুত্রতামাগতঃ কৌ।
বৃন্দারণ্যে গোপবেশেন বৎসান্
গোপৈর্মুখ্যৈশ্চারয়ন্ ভ্রাজসে বৈ ॥ ৩ ॥

সেই তুমি সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছ এবং পৃথিবীতে নন্দের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছ। তুমি প্রধান প্রধান গোপগণের সহিত গোপবেশে বৃন্দাবনে গোচারণ করিয়া বিরাজ কর ॥ ৩ ॥

৪। হরিং কোটিকন্দর্প-লীলাভিরামং
স্ফুরৎকৌস্তুভং শ্যামলং পীতবস্ত্রম্।
ব্রজেশন্তু বংশীধরং রাধিকেশং
পরং সুন্দরং তং নিকুঞ্জে নমামি ॥ ৪ ॥

কোটি কন্দর্পের লীলায় অভিরাম, স্ফুরৎপ্রভ-কৌস্তুভ-ভূষণ, শ্যামবর্ণ, পীতবসন, বংশীধর, ব্রজেশ, রাধিকেশ, পরমসুন্দর হরিকে নিকুঞ্জমধ্যে প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

৫। তং কৃষ্ণং ভজ হরিমাদিদেবমস্মিন্
ক্ষেত্রজ্ঞং খমিব বিলিপ্ত-মেঘমেব।

স্বচ্ছাঙ্গং পরমধিযজ্ঞ-চৈত্যরূপং
ভক্ত্যাদ্যৈর্ব্বিশদ-বিরাগভাব-সভ্যৈঃ ॥ ৫ ॥

যিনি আকাশে বিলিপ্ত মেঘের ন্যায় এই দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ, যিনি অধিযজ্ঞের চৈত্যস্বরূপ, স্বচ্ছাঙ্গ পরব্রহ্ম এবং যিনি নির্ম্মল ভক্তি আদি বিশদ বিরাগভাবলভ্য, সেই আদিদেব হরি কৃষ্ণকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥

৬। যাবন্মনশ্চ রজসা প্রবলেন বিদ্বন্
সঙ্কল্প এব তু বিকল্পক এব তাবৎ।
তাভ্যাং ভবেনমনসিজস্থভিমানযোগ-
স্তেনাপি বুদ্ধিবিকৃতিং ক্রমতঃ প্রযান্তি ॥ ৬ ॥

হে সর্ব্বজ্ঞ! যখনই মনে রজোভাবের উদয় হয়, তখনই মন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক হইয়া থাকে; সেই সঙ্কল্প-বিকল্পবশে মন হইতেই অভিমান জন্মে; আর তাহাতেই ক্রমে বুদ্ধিকে বিকৃত করিয়া দেয় ॥ ৬ ॥

৭। বিদ্যুদ্দ্যুতিস্তুতুগুণো জলমধ্যরেখা
ভূতোল্মুকঃ কপটপান্থয়তির্যথা চ।
ইত্থং তথাস্য জগতস্তু সুখং মৃষেতি
দুঃখাবৃতং বিষয়ঘূর্ণমলাত-চক্রম্ ॥ ৭ ॥

ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের চমক, ঋতুর গুণ, জলমধ্যগত রেখা, পিশাচের আগুন এবং কপট পথিকের রতির মত জগতের সুখ মিথ্যা, উহা অলাতচক্রবৎ ॥ ৭ ॥

৮। বৃক্ষা জলেন চলতাপি চলা ইবাত্র
নেত্রেণ ভূরিচলিতেন চলেব ভূশ্চ।
এবং গুণৈঃ প্রকৃতিজৈর্ভ্রমতো জনস্থং
সত্যং বদেদ্‌গুণসুখং ইদমেব কৃষ্ণ ॥ ৮ ॥

দুঃখাবৃত বিষয়মোহে ঘূর্ণ্যমান নেত্র অত্যন্ত ঘূর্ণিত হইলে যেমন অচলা ভূ চলিতবৎ প্রতিভাত হয়, তরুগণ না চলিলেও জল চলিত হওয়ায় চলার মত দেখায়। হে কৃষ্ণ! এইরূপ প্রকৃতি-প্রসূত গুণবশতঃ ভ্রান্ত জগৎ তাদৃশ সুখকে সত্য বলিয়া ধারণা করে ॥ ৮ ॥

৯। দুঃখং সুখঞ্চ মনসা প্রভবঞ্চ সুপ্তে
মিথ্যা ভবেৎ পুনরহো ভুবি জাগরেঽস্য।

ইত্থং বিবেক-ঘটিতস্য জনস্য সর্ব্বং
স্বপ্ন-ভ্রমাদৃত-জগৎ সততং ভবেদ্ধি ॥ ৯ ॥

সুখ ও দুঃখ মনের দ্বারাই উদ্ভূত হয়, সুপ্তাবস্থায় তাহা লুপ্ত হইয়া থাকে; আর জাগরণকালে তাহা পুনরায় অনুভূত হয়; যাহার এই বিবেক আছে, তাহার নিকট এ জগৎ সতত স্বপ্নভ্রম বলিয়াই অনুমিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

১০। জ্ঞানী বিসৃজ্য মমতামভিমান-যোগং
বৈরাগ্যভাব-রসিকঃ সততং নিরীহঃ।
দীপেন দীপকশতঞ্চ যথা প্রজাতং
পশ্যেত্তথাত্মবিভবং ভুবি চৈকতত্ত্বম্ ॥ ১০ ॥

জ্ঞানী মমতা ও অভিমান ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা বৈরাগ্যভাব-রসিক ও নিরীহ হইবেন এবং একটী দীপ হইতে যেমন শত শত দীপের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ এক পরমাত্মা হইতে সমস্ত উৎপন্ন—এই একমাত্র তত্ত্ব দর্শন করিবেন ॥ ১০ ॥

১১। ভক্তো ভজেদজপতিং হৃদি বাসুদেবং
নির্ধূমবহ্নিরিব মুক্তগুণঃ স্বভাবঃ।
পশ্যন্ ঘটেষু সজলেষু যথেন্দুমেক-
মেতাদৃশঃ পরমহংসবরঃ কৃতার্থঃ ॥ ১১ ॥

ভক্ত নির্ধূম বহ্নিশিখার ন্যায় গুণযুক্ত ও আত্মনিষ্ঠ হইয়া হৃদয়ে ব্রহ্মেশ বাসুদেবের ভজনা করিবেন; আর একই চন্দ্রবিম্ব যেমন ঘটমধ্যস্থ জলেও দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ আত্মার একত্ব দর্শনে শ্রেষ্ঠ পরমহংসও কৃতার্থ হইবেন ॥ ১১ ॥

১২। স্তুবন্তি বেদাঃ সততঞ্চ যং সদা
হরের্মহিম্ন কিল ষোড়শীং কলাম্
কদাপি জানন্তি ন তে ত্রিলোকে
বক্তুং গুণাংস্তস্য জনোঽস্তি কঃ পরঃ ॥ ১২ ॥

বেদসমূহ সতত যাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া, কখনও তাহার ষোড়শাংশের একাংশও প্রকাশ করিতে সমর্থ হন না, ত্রিলোকে সেই হরির গুণবর্ণনে অপর কে সমর্থ হইবেন? ১২ ॥

নামাশ্রয়ের ফল

পূর্ণতম ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা দেদীপ্যমান আছে। মধুর রসাশ্রিত শুদ্ধ ভক্তবৃন্দ অপ্রাকৃত দেহে তাহা অনুভব করিয়া থাকেন। সেই অষ্টকাল লীলার মধ্যে সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভরূপে দ্বিবিধ রস। শ্রীমতী রাধিকা ও তৎপরিচারিকাগণ তাহা আস্বাদন করেন। বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের স্ফূর্ত্তি হয় না, এজন্য অষ্টকালীয় লীলা মধ্যে সময়ে সময়ে পূর্ব্বরাগ, বিরহ ইত্যাদি ভাব হইয়া থাকে। সে মাধুর্য্য নব নবভাবে প্রকটিত হন, এককালে সমস্ত ভাবোদয় হয় না।

শুদ্ধনাম-পরায়ণ ভক্ত-পুরুষ নামাস্বাদকালে যখন ভক্তিস্রোতে ভাসিতে থাকেন, তখন তাঁহার অপ্রাকৃত দেহে সমস্ত তত্ত্ব আসিয়া উদ্দীপিত হয়। ব্রজধামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যখন সে লীলা প্রকটিত করেন, শুদ্ধভক্ত নামের বলে অনায়াসে তাহা দেখিতে পান। ইহা শাস্ত্রযুক্তিগত সিদ্ধান্তদ্বারা কিছুই অবগত হওয়া যায় না। একমাত্র সদ্‌গুরু আশ্রয় করিয়া নিরপরাধে নামাশ্রয় করিলে স্বল্পদিন মধ্যেই অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া শ্রীনামে নিষ্ঠা হইলে সমস্ত সিদ্ধিই হয়। নামাপরাধ থাকিলে নামের ফল হয় না। তেমনি হৃদয়-দৌর্ব্বল্য, অসত্তৃষ্ণা নিবৃত্তি না হইলে ভক্তিনিষ্ঠা হয় না। যাঁহারা শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব পাইবার প্রয়াসী তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে অনর্থগুলী যাহাতে বিনষ্ট হয়, তাহারই উপায় করিবেন।

অনর্থ একদিনে যায় না, নিরপরাধে নাম করিবার যত্ন পাইলে ক্রমে ক্রমে নষ্ট হয়। এই অনর্থই ভজনের প্রতিকূল। অনর্থ থাকিলে কোনক্রমেই ভজনোন্নতি হইবে না। অনর্থ-চতুষ্টয় এককালে নিবৃত্তি হইলে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা ক্রমোন্নতি অনুসারে প্রাপ্ত হওয়া যায়; শুদ্ধ নামোদয় হইলে সেই কৃষ্ণনাম রূপ হইয়া দর্শন দেন, সে রূপটী শ্যামবর্ণ। ক্রমে গুণোদয় হইলে শ্রীগোপীবল্লভের অসাধারণ গুণ উদ্দীপিত হয়। সিদ্ধি হইলে লীলা দর্শন-ফলে ব্রজগোপীদিগের পরিচারিকা মধ্যে পরিগণিত হওয়া যায় এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকাল সেবা-সুখ সম্ভোগ করেন। নিষ্কপটে সদ্‌গুরুর নিকট হইতে শ্রীনাম পাইয়া একান্তভাবে নামাশ্রয় করিলে অতি অল্পকাল মধ্যেই সকল বস্তু সিদ্ধি হয়, আর পরজন্মের অপেক্ষা থাকে না। চিন্ময় নামানন্দে চিত্তের বিচিত্র ভাব উদয় হয়। সে বিমল আনন্দের নিকট কর্ম্মযোগ-ধ্যান কিছুই

নয়। নাম অপেক্ষা আর কোন বস্তু শ্রেষ্ঠ নয়। সর্ব্ব তত্ত্বাপেক্ষা শ্রীহরিনাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শুদ্ধ ভক্তের জীবন-স্বরূপ। শ্রীচরিতামৃতে ;—

কলিযুগে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।
তীর্থ লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥

গুণাবতারের নিগূঢ় ভাব অন্তর্ব্বহিঃ ভেদে দ্বিবিধ। অন্তরে ব্রজভাব, পারকীয় রস, নব নটবর, গোপবেশ, বনমালা গলদেশে, পীতাম্বর পরিধান, মুরলীবাদন ইত্যাদি ; বাহ্যে রাধা-ভাব-কান্তি, প্রেমভক্তি আস্বাদন করত জীবগণকে শিক্ষা দেওয়া এবং জগদাচার্য্যরূপে শ্রীনাম প্রচার। সেই নাম হইতে অন্তর্ভাব প্রকাশ করিয়া মধুর নামে মধুর রস বিলাইয়াছেন। তাহা শুদ্ধ ভক্ত মহাজনগণ প্রেম-চক্ষে দর্শন করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ব্রজরস সমুদ্র-বিশেষ। তাহা একবিন্দু পাইলে জীব আপনাকে ভুলিয়া যান। তিনি সংসারে থাকিয়াও ব্রজমাধুর্য্য আস্বাদন করত চিদ্দেহদ্বারা সমস্ত সুখানুভব করিয়া ছন্নাবতারের নিগূঢ় ভাব সমুদয় অবগত হন। শ্রীধামমাহাত্ম্যে :—

দাস্য পরিপক্কে যবে জীবের হৃদয়ে।
শ্রীমধুর রস উদে মূর্ত্তিমান হয়ে॥
সে-সময় ভজনীয় তত্ত্ব গৌরহরি।
রাধাকৃষ্ণরূপ হয়ে ব্রজে অবতরি॥
নিত্যলীলা-রসে সেই ভক্তকে ডুবায়।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা, ব্রজধাম পায়॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষানুসারে যাঁহারা নামাশ্রয় করেন তাঁহারা অচিরে দেখিতে পান যে, কৃষ্ণনামই চরমে প্রেমরূপে প্রকাশিত হন। অন্যপ্রকার রসাপেক্ষা পারকীয় মধুর রস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই রসে অধিক মাধুর্য্য থাকায় মধুর-রস নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য শ্রীবিগ্রহ-দর্শন নহে। আমি বিগ্রহ দর্শন করিয়া সুখী হওয়া অপেক্ষা শ্রীবিগ্রহ আমাকে দেখিয়া সুখী হইলে পরম মঙ্গল হয়। ভগবান্ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন।

—শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

তৃতীয় জন্ম

অনেকের নিকট 'তৃতীয় জন্ম' নূতন কথা হইলেও শাস্ত্রে ইহার প্রচুর প্রয়োগ আছে। ভার্গবীয় মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধীতিগণ অধ্যয়ন করিয়াছেন—"মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে। তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥" উপনীত দ্বিজ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞদীক্ষায় বেদশ্রবণ (সম্বন্ধজ্ঞান) হইতে তৃতীয় জন্ম লাভ করেন। প্রথমে মাতাপিতা হইতে উৎপত্তি লাভপূর্ব্বক যথাবিধি সাবিত্র্য সংস্কার হইলে, আচার্য্য পিতা ও গায়ত্রী মাতা হইতে জাত হওয়ায় দ্বিতীয় জন্ম। আর দ্বিজ দীক্ষিত অবস্থায় ভগবৎসেবায় অধিকার পাইলে, গুরু পিতা ও মন্ত্রদীক্ষা মাতা হইতে তৃতীয় জন্ম। এইরূপে অধিরোহ-মার্গে প্রথমে শরীর জন্ম, দ্বিতীয় মানস ও তৃতীয় আনুষ্ঠানিক জন্ম—এই ত্রিবিধ জন্ম পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে এই ত্রিবিধ জন্মকে যথাক্রমে শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য জন্ম বলিয়াছেন—"কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্রসাবিত্র্যযাজ্ঞিকৈঃ।"

"ধিগ্ জন্মনস্ত্রিবৃদ্ যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্" (ভাঃ ১০।৩১)—শ্রীধর স্বামিপাদ টীকায় লিখিয়াছেন,—"ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্র্যং দৈক্ষ্যমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম। শুক্রসম্বন্ধি জন্ম বিশুদ্ধমাতাপিতৃভ্যামুৎপত্তিঃ। সাবিত্র্যমুপনয়নেন যাজ্ঞিকং দীক্ষয়া।" বিশুদ্ধ মাতাপিতাজাত বলিতে "ব্রাহ্মণাদ্ব্রাহ্মণ্যাং জাতঃ" ইহাই বুঝায়। ব্রহ্মা হইতে যিনি স্বীয় বংশপ্রণালী অবিচ্ছেদে দশসংস্কারকৃৎ পিতৃপুরুষগণের নির্দ্দেশ করিতে পারেন, আর বংশে কুত্রাপি অসবর্ণ বিবাহ হয় নাই বা প্রত্যেক গর্ভাধানকালে তদুপযোগী সংস্কার অব্যাহত হইয়া আসিতেছে, ইহাও নির্দ্দেশ করিতে পারেন, তিনিই শৌক্র ব্রাহ্মণ। "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত" এই শ্রুতিবচন বা "গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনয়নম্" এই স্মৃতিবচন-নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণ বলিতে এইরূপ শৌক্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেবল যাঁহারা কয়েকপুরুষ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন তাঁহাদিগের সন্তানবর্গকে লক্ষ্য করে না, অথবা যাঁহাদের কুলে অসবর্ণ বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল, অথবা যাঁহাদের বংশে একটী মাত্র গর্ভাধান বা অন্য সংস্কার অসিদ্ধ বা অসম্যক্ সিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদিগকেও লক্ষ্য করে না। "কয়েক পুরুষ ব্রাহ্মণ" অর্থে যাহারা অন্যবর্ণোদ্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ও বেদানুগ শাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে বৃত্ত ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

যেমন ক্ষত্রিয় গর্গের পুত্র শিনি হইতে গার্গ্য ব্রাহ্মণগণ, মুদ্গল রাজ হইতে মৌদ্গল্য ব্রাহ্মণগণ, উর্ব্বশী-গর্ভজাত মিত্র-তনয় মহর্ষি বশিষ্ঠ হইতে বাশিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, এরূপ অসংখ্য বংশ বিদ্যমান—তাঁহারা বিশুদ্ধ শৌক্র ব্রাহ্মণ না হইলেও তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বের মূল ভিত্তি বৃত্ত ব্রাহ্মণতা যতদিন অটুট থাকিবে, ততদিন তাঁহাদের ব্রাহ্মণোচিত সম্মান অব্যাহত থাকিবে। যদি কোন শৌক্রব্রাহ্মণ বা বৃত্ত-ব্রাহ্মণের অধস্তনগণ ব্রাহ্মণের লক্ষণোপেত না হন, তবে তাঁহারা উভয়েই সমভাবে পতিত। মহাভারত বনপর্ব্ব ২১৫ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে "ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু। দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রাজ্ঞঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ॥" এ সকল শাস্ত্র-নির্দ্দেশানুসারে কলিকালে নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ শৌক্র ব্রাহ্মণ কাহারা ও কাহারা নহে, ইহার নির্ণয় নাই। সুতরাং অধিরোহবাদ-বিচারে যথার্থ দ্বিজ ও ত্রিজের পরিচয় একান্ত দুর্ল্লভ। কিন্তু যাহারা বেদানুগ আগমাশ্রয় করিয়া অবরোহ বা অবতার মার্গে গুরুপরম্পরাগত প্রণালীতে অধোক্ষজ-সেবা জ্ঞান প্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহারা আগমোক্ত উপায়ে সংস্কারলাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেছেন। কলিকালে তদ্ভিন্ন শুদ্ধত্বের আর কোন উপায় নাই।

"অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্নঃ শ্রৌতবর্ত্মনা॥"

সুতরাং সকল ব্রাহ্মণেরই এখন সাত্বত আগম, তন্ত্র বা পঞ্চরাত্র-বিধি অনুসারেই ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, অন্যথা নহে; যেহেতু শাস্ত্রে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতেছেন যে কলিজাত ব্রাহ্মণ অশুদ্ধ—শৌক্র-পারম্পর্য্যের বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয় না, অতএব তাঁহার অশুদ্ধ অবস্থায় শ্রৌতবিধি অনুসারে সাবিত্র্য সংস্কার হইতেই পারে না, তিনি দ্বিজই হইতে পারেন না, ত্রিজ ত' দূরের কথা। বেদানুগ সাত্বত আগম-পন্থায় অশুদ্ধ অবস্থাতেই দীক্ষাদ্বারা শুদ্ধির ব্যবস্থা আছে, অন্য উপায়ে শুদ্ধির ব্যবস্থা হইতেই পারে না। যিনি যে কুলেই জাত হইয়া থাকুন না কেন, তথা-কথিত ব্রাহ্মণবংশোৎপন্ন বা অবরকুলোৎপন্ন ব্যক্তিকে শুদ্ধ হইতে হইলে কলিতে প্রথমে বৈদিক পঞ্চরাত্রোক্ত বিধি-অনুসারে দীক্ষিত হইয়া দ্বিজত্বের অধিকার সংগ্রহপূর্ব্বক সাবিত্র্য সংস্কারের চিহ্ন ধারণ করিতে হইবে। শাস্ত্র বলিতেছেন, "যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং।" নরমাত্রেরই যথার্থ বৈদিক পঞ্চরাত্রোক্ত বিধিমতে বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ হইলে দ্বিজত্ব সাধিত হয় ও তখনই তদুচিত উপনয়ন-সংস্কার আবশ্যক হইয়া পড়ে। অবশ্য নিত্যসিদ্ধ নিত্যশুদ্ধ

পরমহংসগণ বর্ণাশ্রমাতীততত্ত্ব—তাঁহাদিগকে আর নূতন করিয়া শুদ্ধ হইতে হয় না ; সুতরাং তাঁহারা উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ নাও করিতে পারেন। তাই বলিয়া তাঁহাদের ত্রিজত্বের অভাব নাই। তাঁহারা ব্রাহ্মণের গুরু—ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের দাস। তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন, ব্রাহ্মণাবর—এরূপ বলিলে বৈষ্ণবাচার্য্য বিপ্রবরকে শূদ্রবুদ্ধিকারীর ন্যায় অনন্ত নিরয়বাসই প্রাপ্যফল হইয়া দাঁড়ায়।

পূর্ব্বে হংস বলিয়া একবর্ণ ছিল, পরে গুণবৃত্তিবিচারে চতুর্ব্বর্ণবিধান চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে,—প্রথমে চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্ট হয় নাই। অবশ্য চাতুর্ব্বর্ণ্য ও চতুর্ব্বর্ণে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সুধীগণ একথা ভাল করিয়া বিচার করিবেন। ঐভাবে চাতুর্ব্বর্ণ্য-প্রবর্ত্তনের পর বিশুদ্ধভাবে পিতা হইতে পুত্রে বর্ণ সঞ্চারিত হইবারও প্রণালী স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। ইহারই নাম শৌক্রবর্ণ। কিন্তু শৌক্র প্রণালীই বর্ণনির্ণয়ের একমাত্র পন্থা নহে—ইহা শাস্ত্রাধীতী প্রত্যেকেই জানেন। তিনি অবশ্যই জানেন যে, ঋষভদেবের একশত পুত্রের মধ্যে একাশী জন ব্রাহ্মণ, নয়জন ক্ষত্রিয় এবং নয়জন বৈষ্ণব হইয়াছিলেন, গৃৎসমদের শৌনকাদি ব্রাহ্মণপুত্র ব্যতীত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রপুত্র ছিল, ক্ষত্রিয় দুরিতক্ষয়ের পুত্র ত্রয্যারুণি, কবি, পুষ্করারুণী ব্রাহ্মণ হন, অজমীররাজের বংশে প্রিয়মেধা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ জাত হন, আরও কতশত উদাহরণ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। শ্রীশ্রীরামানুজ-আচার্য্যপ্রভুর গুরু শঠকোপ দাস শূদ্রকুলজাত হইয়াও ব্রাহ্মণ ছিলেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর বংশে, শ্রীল রঘুনন্দন-বংশে, শ্রীহরিহোড়বংশ প্রভৃতিতে আজও দ্বিজসংস্কার অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে। এই দীক্ষাবিধান-সিদ্ধ পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা অভিজ্ঞ ব্যক্তি চিরদিন স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। ইহা দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

"আমি অধিক বুঝি, আর অন্য গুরু আসিয়া আমায় কি উপদেশ দিবেন"—এইরূপ অহঙ্কারকারিজনের অপরাধ-বশতঃ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না, সুতরাং শত শত ব্যসন আসিয়া গুরুভক্তিরহিত জীবকে ভক্ত-সজ্জায় কেবল সংসারেই বাস করায়।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ

নিঃসর্ত্তে নির্গুণ-দানস্থলেই মঠ-মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ
কংসটীলা, মথুরা (উঃ প্রঃ)
ইং ৫।২।৬২

স্নেহাষ্পদেষু—

* * *! আমরা দান বলিতে নিঃস্বর্ত্তে দান করাকেই বুঝি। তাহাই সাত্ত্বিকদান। সাত্ত্বিকদান না হইলে ভগবৎসেবায় লাগে না। ভগবদ্ভক্তের হাতে ঐ প্রকার দান বিশুদ্ধসত্ত্বে অর্থাৎ নির্গুণরূপে পরিণত হয়। তাহা আমতল্যায় সম্ভবপর হওয়া কঠিন।

ভুবনবাবু তাঁহার নামে কিভাবে মঠ করিবেন, বুঝিলাম না। 'ভুবন' বলিলে পৃথিবী বা মাটি বুঝায়। শ্রীবেদান্ত সমিতির মঠ প্রাকৃত জগৎ, পৃথিবী বা মাটিয়া দেশের বাহিরে থাকে। সুতরাং 'ভুবন' নামে কোন মঠ হইতে পারে না; তবে তাঁহার নামে একটী প্রস্তর ফলক সংযুক্ত করা যাইতে পারে।

তাঁহার জমির মূল্য ৫/৭ হাজার টাকা, কিন্তু আমাদের ২০/২৫ হাজার টাকা খরচ করিয়া মঠ-মন্দিরাদি করিতে হইবে। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে উহা দান নহে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

সম্বন্ধ-তত্ত্ব

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥
হে কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধো! দীনবন্ধো! জগৎপতে।
গোপেশ! গোপিকাকান্ত! রাধাকান্ত! নমোঽস্তুতে॥

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দ-মতের্গতি।
মৎসর্ব্বস্ব-পদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥

"সকল বেদের হয় ভগবান্ সে সম্বন্ধ।" সমস্ত জগতের সৃষ্টির মূল যিনি, যাঁহাতে সমস্ত জগতের স্থিতি ও প্রলয়, যাঁহাতেই সমস্ত জগতের অবস্থান, তিনিই সকল শাস্ত্রের মূল বিষয়। যাঁহাকে সম্বন্ধ করিয়া সমস্ত শাস্ত্রের উৎপত্তি, তিনিই 'ভগবান্', তিনিই 'সম্বন্ধ তত্ত্ব।' কে ভগবান্? "কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্।" "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥"

এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও লয় যে তত্ত্ব হইতে হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় হয়, অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা বিচার করিলে যিনি সমস্ত অর্থ বা ব্যাপারে একমাত্র পরম 'জ্ঞ তত্ত্ব' অর্থাৎ 'স্বরূপ-তত্ত্ব' বলিয়া স্থির হন; যিনি দৃশ্যমান জগতে একমাত্র স্বরাট্ অর্থাৎ স্বতন্ত্র রাজা; যিনি আদিকবি ব্রহ্মাকে অন্তর্যামিরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন; যাঁহাতে সমস্ত বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতের মুহুর্মুহু মোহ জন্মিয়া থাকে; যাঁহাতে তেজোবারি, মৃত্তিকা প্রভৃতি ভূতনিচয়ের বিনিময় অর্থাৎ পৃথগ্রূপ সত্তা; যাঁহাতে তিন প্রকার সৃষ্টি অর্থাৎ চিদুদয়রূপ সৃষ্টি, জীব-প্রাকট্যরূপ সৃষ্টি ও মায়িক ব্রহ্মাণ্ডরূপ সৃষ্টি—সত্যরূপে বর্ত্তমান; সেই আত্মশক্তিদ্বারা নিত্যকুহকশূন্য পরমসত্য-তত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ধ্যান করি।"

"কৃষ্ণ কে?" চতুঃশ্লোকী ভাগবতে বলিয়াছেন,—

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥

পরম নিত্য আমি এক অদ্বয় তত্ত্ব। প্রথমে আমিই ছিলাম। সৎ ও অসৎ এই দুই হইতে শ্রেষ্ঠ—আমি মাত্র ছিলাম। আর কিছুই ছিল না। অসৎ অর্থাৎ আগমপায়ী অবস্থা এবং সৎ অর্থাৎ সৃষ্টিতে আমার অদ্বয় সম্বন্ধ এই দুই ক্রিয়া, যাহা সৃষ্টিতে উদয় হইয়াছে, তাহা আমি। অগ্নির যেমন বিস্ফুলিঙ্গ, সূর্য্যের যেমন কিরণ, সর্ব্বভূত আমার সেইরূপ শক্তি-পরিণাম। আমি পরিণত হই না। কিন্তু আমার অক্ষয় শক্তি চিন্তামণির স্বর্ণ প্রসবের ন্যায় স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াও এই চরাচর জগতকে প্রসব করে। সৃষ্টি হওয়াতে

আমার অদ্বয়তত্ত্ব যায় নাই। সৃষ্টিতত্ত্বের পৃথকতা হইলেও আমি সর্ব্বস্বরূপ একই তত্ত্ব। ইহাই আমার অচিন্ত্যশক্তির ভেদাভেদ পরিচয়। আবার প্রলয়ে আমি অবশিষ্ট একই থাকি। কেবলাদ্বৈতবাদ, কেবল দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদ—এই সকল নামের বিবাদ মাত্র। সমস্তবাদের বাদত্ব দূর হইলে যে পরমসত্য থাকে, তাহা আমার অচিন্ত্যশক্তি পরিণামরূপ নিত্য ভেদাভেদ জ্ঞান। ইহাই সর্ব্ববেদবাক্য ও মহাবাক্য-সম্মত।"

আবার বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥"

অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানই পরমতত্ত্ব। ভগবান্ কহিলেন,—"আমার জ্ঞান অদ্বয় ও পরমগুহ্য। তাহা অদ্বয় হইয়াও নিত্যই চারিটী ভেদযুক্ত—জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গ। তাহা জীব-বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিবে না। আমার অনুগ্রহে তাহার উপলব্ধি কর। জ্ঞান আমার স্বরূপ, বিজ্ঞান শক্তি-সম্বন্ধ, জীব আমার রহস্য, প্রধান আমার জ্ঞানাঙ্গী। এই চারিটী তত্ত্বের নিত্য অদ্বয়তা ও নিত্য রহস্যগত ভেদ আমার অচিন্ত্যশক্তির পরিণাম।"

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হইয়াছে,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

কৃষ্ণের স্বরূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দময়বিগ্রহ। তিনিই আদিপুরুষ ও সর্ব্বকারণের কারণ।

বেদে বহুবার "অসমোর্দ্ধ" কথাটির প্রয়োগের দ্বারা বুঝান হইয়াছে, তাঁহার ঊর্দ্ধ ত' দূরের কথা, তাঁহার সমানও কেহই নাই।

"পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন॥"

স্বয়ং ব্রহ্মাও কৃষ্ণের বৈভব-বর্ণনে অসমর্থ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—

"জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥

অর্থাৎ যাঁহারা বলেন,—'আমরা কৃষ্ণতত্ত্ব জানি,' তাঁহারা জানুক, কিন্তু আমি অনেক উক্তি করিতে ইচ্ছা করি না। প্রভো! আমি এইমাত্র বলি যে, তোমার বৈভবসকল—আমার মন, শরীর ও বাক্যের অগোচর॥"

মায়িক ব্রহ্মাণ্ড বা দেবীধাম, বৈকুণ্ঠধাম বা পরব্যোম এবং গোলোকধাম—এই তিনধামের স্বরাট্ অধীশ্বর কৃষ্ণ। তিনিই সর্ব্ব অবতারের অবতারী।

"ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর,—এই সৃষ্ট্যাদি-ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ—অধীশ্বর॥"

কৃষ্ণই সকল প্রকার সৃষ্টির আদি কারণ।—

"এক কৃষ্ণ-দেহ হইতে সবার প্রকাশে।
ক্ষণেকে সবাই সেই শরীরে প্রবেশে॥"

"কৃষ্ণাবতারে ব্রহ্মা কৃষ্ণের মহিমা পরীক্ষা করিবার জন্য গোবৎস ও গোপসকল চুরি করিলে কৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তু সমস্তই প্রকট করিয়াছিলেন।"

"চিন্ময় জগৎ—একটী পদ্মস্বরূপ; সেই পদ্মের উচ্চ (মধ্য) ভাগ 'কর্ণিকার'-রূপী কৃষ্ণলোকের চতুর্দ্দিকে দলশ্রেণীরূপে অনন্ত বৈকুণ্ঠ পরব্যোমে বিরাজমান।"

"তিন আবাস-স্থান কৃষ্ণের, শাস্ত্রে খ্যাতি যার॥
অন্তঃপুর—গোলোক-শ্রীবৃন্দাবন।
যাহাঁ নিত্যস্থিতি মাতাপিতা-বন্ধুগণ॥
মধুর ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য কৃপাদি-ভাণ্ডার।
যোগমায়া দাসী যাহাঁ রাসাদি লীলাসার॥"

গোলোক শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর। এই ধামে তিনি যোগমায়ার দ্বারা স্বেচ্ছায় আবরিত হইয়া সর্ব্বজ্ঞতা সত্ত্বেও অজ্ঞলীলা আস্বাদন করিতে মাধুর্য্যের ভাণ্ডার উন্মোচিত করিয়া রাখিয়াছেন। পিতামাতা, সখা, গোপীগণসহ নিরন্তর নিত্যলীলা করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার ভগবৎ ঐশ্বর্য্য রূপের এখানে প্রকাশ নাই। এই ধামে তাঁহার মাধুর্য্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে। ব্রহ্মা যখন সখা, গো ও বৎসসকল হরণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি অজ্ঞ শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছেন। যোগমায়া আবরণ উন্মোচিত করিলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার প্রকাশ পাইল এবং ব্রহ্মা হরণ করিয়াছেন জানিয়া তখন আবার সকলকিছু প্রকটিত করিলেন। যশোদার নিকটে শিশু; সখাদের স্কন্ধে উঠান, উঠেন; গোপীদের মান-অভিমানের দাসত্ব স্বীকার; সকলই তাঁহার মাধুর্য্যলীলার প্রকাশ। এই গোলোকধামই তাঁহার অন্তঃপুর।

এই গোলোকধামের নিম্নে অনন্ত পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠধাম। ইহা তাঁহার মধ্যমাবাস। ইহা তাঁহার ঐশ্বর্য্যের লীলাভূমি, গৃহলক্ষ্মীগণের দ্বারা সেবিত হইয়া ভগবৎ ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ করিয়া এখানে তিনি লীলা করিতেছেন।

"তার তলে পরব্যোমে 'বিষ্ণুলোক'-নাম।
নারায়ণ-আদি অনন্ত স্বরূপের ধাম॥
মধ্যম-আবাস কৃষ্ণের—ষড়ৈশ্বর্য্য-ভাণ্ডার।
অনন্ত-স্বরূপে যাহাঁ করেন বিহার॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাহাঁ—ভাণ্ডার-কোঠরি।
পারিষদগণে ষড়ৈশ্বর্য্যে আছে ভরি'॥"

"তার তলে বাহ্যাবাস বিরজার পার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহাঁ কোঠরি অপার॥
'দেবীধাম'-নাম তার, জীব যার বাসী।
জগল্লক্ষ্মী রাখে, যাহাঁ রহে মায়া-দাসী॥
এই তিন ধামের হয় কৃষ্ণ অধীশ্বর।
গোলোক-পরব্যোম—প্রকৃতির পর॥"

সমষ্টিরূপে ব্রহ্মাণ্ডে ও ব্যষ্টিজীবের অন্তরে তিনি স্বয়ং অবস্থান করিতেছেন। দেবীধামকে কৃষ্ণের একপাদ বিভূতি আখ্যা দেওয়া হয়। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার সম্মুখে কৃষ্ণের আজ্ঞায় দ্বারকাতে যখন দশ, শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, কোটি, অর্ব্বুদ মুখযুক্ত ব্রহ্মা ও রুদ্রগণ আসিয়া হাজির হইলেন, তখন চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা কৃষ্ণের বিভূতি দর্শনে অবাক্ হইয়া গেলেন। কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার অনুসারে ব্রহ্মা ও রুদ্রগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

"পূর্ব্ব-উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত দিক্‌পাল।
অনন্ত বৈকুণ্ঠাবরণ, চিরলোকপাল॥
তাঁ-সবার মুকুট কৃষ্ণপাদপীঠ-আগে।
দণ্ডবৎকালে তার মণি পীঠে লাগে॥
মণি পীঠে ঠেকাঠেকি, উঠে ঝন্‌ঝনি।
পীঠের স্তুতি করে মুকুট হেন জানি॥"

আর এই সমুদয় রাজ্যের রাজ্যলক্ষ্মীগণ সকলেই কৃষ্ণসেবিকা।

"সেই স্বরাজ্যলক্ষ্মী করে নিত্য পূর্ণকাম।
অতএব বেদে কহে—স্বয়ং ভগবান্॥"

সুতরাং কৃষ্ণের সঙ্গেই সকল সৃষ্টির সকল ধামের নিত্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান। কারণ সকল কিছুই কৃষ্ণ হইতেই উৎপত্তি। আবার 'কৃষ্ণ' অর্থাৎ তিনি সকল কিছুর মধ্যে নিজে অবস্থান করিয়া নিজের প্রতি আকর্ষণ করেন। তাঁহার

বিভূতি, তাঁহার ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বোপরি তাঁহার মাধুর্য্যময় রূপ, গুণ, লীলার দ্বারা সকলকে তিনি হরণ করিতেছেন।

স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিতে গিয়া কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইল।—

ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হৈল।
মাধুর্য্যে মজিল মন, এক শ্লোক পড়িল॥
"যন্মর্ত্ত্যলীলোপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহিতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥

সেই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি স্বীয় চিচ্ছক্তির বল প্রদর্শন করাইবার মানসে মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী আপনারও বিস্ময়জনক এবং সমস্ত সৌভাগ্য-ঋদ্ধির পরমপদ (পরাকাষ্ঠা) ও সমস্ত ভূষণকে ভূষিত করিতে সমর্থ।

"কৃষ্ণের যতেক লীলা,　　সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণুকর,　　নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ॥"

অনন্ত লীলাময় কৃষ্ণ অনন্তভাবে লীলা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার বিভিন্ন পুরুষাবতার-লীলা, নৈমিত্তিক অবতার-লীলা, গুণাবতার-লীলা, আবেশাবতার-লীলা, সবিশেষ পরমাত্মাদি-লীলা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাদি-লীলা ইত্যাদি অন্যান্য সকল লীলার মধ্যে তাঁহার নরলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

কৃষ্ণের মাধুর্য্যময় রূপ অতীব মধুর। যাহার এক কণামাত্র সমগ্র ত্রিভুবনকে মোহিত করিতে ও আকর্ষণ করিতে সমর্থ। শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাঁহার মাধুর্য্যের বর্ণনা করিতে অক্ষম হইয়া কেবল 'মধুর' 'মধুর'-শব্দে ভূষিত করিয়াছেন। এহেন কৃষ্ণের রূপের বর্ণনার ভাষা কিছুই নাই। তিনি তাঁহার নিজরূপে নিজেই চমৎকৃত।

"রূপ দেখি আপনার,　　কৃষ্ণের হৈল চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম॥"

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশ, সমগ্র সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য—এই ষড়ৈশ্বর্য্য শ্রীভগবানে বর্ত্তমান। তন্মধ্যে সমগ্র শ্রীর নাম মাধুর্য্য। এই মাধুর্য্যই হইল ভগবত্তার সার নির্য্যাস। শ্রীকৃষ্ণ—মাধুর্য্যময়, নারায়ণ—ঐশ্বর্য্যময়। শ্রীভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে 'নির্ম্মৎসর' কথাটির প্রয়োগ করিয়াছেন অর্থাৎ 'পরশ্রীকাতরতাহীন'। 'পর' অর্থাৎ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ,

তাঁহার 'শ্রী' বা মাধুর্য্য অর্থাৎ ব্রজেশ্বরী ও ব্রজগোপীস্থ কৃষ্ণের যে মাধুর্য্যময় বিগ্রহ, সেই রূপে যে ভক্তগণ আকৃষ্ট হন, তাঁহারাই 'নির্ম্মৎসর' আখ্যায় ভূষিত। এইরূপ ভক্তগণের সেবায় শ্রীভগবান্ পরম সন্তুষ্ট।

সেই মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ এমনই অপরূপ, তাহা যেন অলঙ্কারেরও অলঙ্কার। এইরূপ অপরূপ শ্রীঅঙ্গে মিলিয়াছে ললিত ত্রিভঙ্গঠাম, আর নেত্রের ভ্রূধনু অপাঙ্গদৃষ্টিবাণদ্বারা শ্রীরাধাসহ ব্রজগোপীগণকে বিদ্ধ করিতেছেন। এহেন মনোহররূপ প্রাকৃত-অপ্রাকৃত সকল জগৎকে মোহিত করিয়া তাহাদের সকল কিছু হরণ করিয়া ফিরিতেছে। 'পতিব্রতা শিরোমণি' লক্ষ্মীগণ ও কৃষ্ণরূপে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পাদপদ্ম আকাঙ্ক্ষা করেন।

তিনি বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীনমদন। রূপ-রস-গন্ধ শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চশরে ত্রিভুবনকে বিদ্ধ করিয়া জর্জ্জরিত করিতেছেন। কৃষ্ণরূপে আকৃষ্ট গোপীগণ কাম-জর্জ্জরিত হইয়া, মাত্র দুইটী আঁখি-প্রদাতা ও নিমেষ সৃষ্টিকারী বিধির নিন্দা করিয়াছেন। তাহাদের ক্ষোভ লক্ষকোটী আঁখি কেন বিধি দিলেন না?

এহেন রূপের সহিত আবার শ্রীকৃষ্ণের বেণু মাধুরী যে কর্ণে প্রবেশ করে, সে কর্ণে অন্য কোন শব্দকেই প্রবেশ করিতে দেয় না।

ঐরূপ ঐ বেণুধ্বনি সর্ব্বোপরি তাঁহার গুণাবলী যাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার মধ্যে সকলকিছু পরিত্যাগ করিয়া ঐ চরণে দাসী হইবার অভিলাষই প্রবল হইতে প্রবলতর ও প্রবলতম পর্য্যায়ে উঠিবে।

সুতরাং সর্ব্ব অখিল চিত্তহারী মাধুর্য্যঘনবিগ্রহ কন্দর্পকান্তি শ্রীকৃষ্ণই সকল সম্বন্ধের মূল, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সম্বন্ধ-তত্ত্ব। লীলাবিস্তারে চিদচিৎ উভয় সৃষ্টির সহিত তাঁহার নিত্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান। একারণেই তিনিই একমাত্র সম্বন্ধ-তত্ত্ব।

—শ্রীমতী মায়া সরকার

কৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন

আদিবৃক্ষ-স্বরূপ এই সমষ্টি-ব্যষ্টি-দেহাত্মক প্রপঞ্চে প্রকৃতি-কবলিত জীবগণ লাভ-লোকসানের খতিয়ান-অনুসারে নিজেদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সকলে বেণের ন্যায় লাভের ঝুড়িটাকে পরিপূর্ণরূপে ভরাইয়া রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট; জাগতিক লোকসানের অঙ্কের চিন্তা মনে উদয় হইলেই তাঁহারা আতঙ্কগ্রস্ত হন। লাভ-লোকসানের তুলাদণ্ডে লাভের পাল্লা ভারী হইলেই তাঁহাদের খুশীর জোয়ারে ভাসিতে দেখা যায়, লোকসানের পাল্লা ভারীতে মন বিষাদগ্রস্ত হইয়া যায়।

জড়লাভাকাঙ্ক্ষী অর্থাৎ স্বার্থসিদ্ধি-পরায়ণ ব্যক্তিরা "যেখানে ধন, সেখানে মন" নীতির সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থের জন্য অত্যন্ত জঘন্য কার্য্য করিতেও তাঁহারা পিছপা হন না। "দুষ্টের হাজারো ছল।" দুষ্ট ব্যক্তিরা "ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোণোর" জন্য ছলপূর্ব্বক লোকের নিকট উপস্থিত হন। মুখে কৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও সরলতার ভাব প্রকাশ করিয়া "পিছন দিয়ে ছুরি মেরে" লোকের সমস্তকিছু আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। "হাড় খাব, মাস খাব, চাম দিয়ে ডুগ্‌ডুগি বাজাব"-নীতি হইতে স্বার্থান্ধেরা কিছুতেই সরিয়া আসিতে চাহেন না। অপরকে ঠকাইয়া "আপন কোলে ঝোল না টানিলে" তাঁহাদের সুখনিদ্রা কিরূপে হইবে?

কাহারও নিকট জড়ভোগের পরিপূরক কোন সুযোগ-সুবিধা লাভ করিলেই কেহ কেহ "কৃতজ্ঞতার নামাবলী" গায়ে চাপাইয়া কৃতজ্ঞতায় গদ্‌গদভাব প্রকাশ করেন। অনেক সময় তাঁহাদের কৃতজ্ঞতার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেও অনেক কষ্ট করিতে হয়। তাঁহাদের এই কৃতজ্ঞতায় কপটতার অর্থাৎ কৃতঘ্নতার পূর্ণপ্রকাশ বিদ্যমান। স্বার্থে আঘাত লাগিলেই কৃতজ্ঞতার মুখোশ খুলিয়া গিয়া কৃতঘ্নতার স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে। আত্মসুখ অর্থাৎ জড়ভোগের পথে বাধা পড়িলেই পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন সকলেই পর অর্থাৎ ঘোরতম শত্রু হইয়া যান। সবকিছু তাঁহার নিকট বিষতুল্য মনে হয়।

কেবলমাত্র কৃষ্ণভক্তগণই প্রকৃত লাভের তথ্য বিশেষভাবে অবগত আছেন। "কৃষ্ণভজনই অর্থাৎ পরমার্থ-ধন সঞ্চয়ই যে জীবের পক্ষে প্রকৃত লাভ" এই প্রকৃত সত্য তাঁহারা জগতের নিকট প্রকাশ করিয়া নিজেদের মহানুভবতার পরিচয় প্রদর্শন করেন। কিন্তু কৃষ্ণবিমুখ ব্যক্তিরা 'আকাশে মুষ্ট্যাঘাতের'

ন্যায় ভক্তের বাক্যকে অবমাননা করিতে গিয়া নিজেদের হাস্যাস্পদ করিয়া তুলেন।

শ্রীভগবান্ জীবের দুঃখে কাতর হইয়া সেই দুঃখের বিমোচন-কল্পে কতই না দয়া করিয়া থাকেন। জীবনধারণের সমস্ত কিছু উপাদান তিনি সকলের জন্য পৃথিবীতে রাখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার অফুরন্ত দান গ্রহণ করিয়াই জীবগণ অতিযত্নে লালিত-পালিত হইতেছে। তথাপি জীব অকৃতজ্ঞতাবশে তাঁহার ভজন করে না। প্রত্যুপকার বুদ্ধিতেও যদি দুঃখীজনগণ তাঁহাকে তাঁহাদের দুঃখের আসানকারী জানিয়া ভজন করেন, তাহা হইলেও ভগবদ্-বৈমুখ্য হইতে পরিত্রাণ পায়; ভগবানের সেবা করাই ভগবদ্ দাসের একান্ত কর্ত্তব্য। এই পৃথিবীর ক্রীতদাস-প্রথার ন্যায় চেতনময় জগতের অশুল্ক-দাসত্বও (অশুল্ক দাসত্ব অর্থে কোনরূপ বেতন বা পারিতোষিক গ্রহণ না করিয়া যে সেবা) কিছু স্বার্থপরতা, ক্লেশ ও অভাব-অভিযোগময় ব্যাপার নহে। জড় জগতের অভাব ও অসম্পূর্ণতা চেতন-জগতে নাই।

তামসিক গুণসম্পন্ন তথা মাৎসর্য্যপরায়ণ কামুক ও নির্ব্বিশেষবাদিগণ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান, কুযুক্তি, কুতর্ক, প্রভৃতি দ্বারা ভক্তের ও ভগবানের চরিত্র সমালোচনা করেন এবং প্রকৃত সাধুকে 'লোভী' বলিয়া নিজেদের অসৎ চরিত্রকে গোপন রাখিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা দৌরাত্ম্য, দুর্ব্বৃত্ততা বা পৈশুন্য আচরণ করিয়া লোকের মঙ্গল ত' দূরের কথা, মঙ্গলময় বস্তুকে ধ্বংস করিয়া তজ্জন্য পারিতোষিক দাবী করেন। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের ব্যাপার।

সাধুগণই সমাজের রক্ষক ও সমাজের প্রকৃত নিঃস্বার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী। অথচ সেই সাধু মহাত্মাগণকেই চোরের ন্যায় "ঐ চোর" বলিয়া লোকচক্ষে হেয় ও ঘৃণ্যরূপে প্রতিপাদন করিবার জন্য হরিবিমুখ ব্যক্তিগণের চেষ্টার বিরাম নাই। বেদ, গীতা, ভাগবতাদি শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, এই বিশ্ব ভগবানের সম্পত্তি অর্থাৎ ভগবানই সমস্ত বস্তুর মালিক। তাঁহার বস্তু বা দ্রব্য তাঁহার সেবায় নিযুক্ত না করিয়া যাঁহারা আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে "চোর" ও "অকৃতজ্ঞ"। যাঁহারা ভগবানের কথা প্রচার করেন, জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া তাহাদিগকে মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত করেন, তাঁহাদিগকেই অকর্ম্মণ্য, অলস ও সমাজের বিত্তাপহারক বলিয়া দেখাইয়া দিয়া কৃতঘ্নেরা নিজেদের অসৎপ্রবৃত্তিকে বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

কর্ম্মী—কৃতজ্ঞতার মুখোশে অকৃতজ্ঞ

ফলভোগাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মকাণ্ডীর দল "শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গা"র ন্যায় যাহা কিছু করেন, তাহারই বিনিময়ে কিছু চান। ইহারা কখনই ভগবানের সেবা বা জগতের প্রকৃত উপকার করেন না। বহির্দৃষ্টিতে ইহাদিগকে ধর্ম্মে কর্ম্মে বা ভগবানের সেবাতে নিযুক্ত দেখিয়া মূর্খ ও বোকা লোকেরা ইহাদিগকে পরম ভক্ত বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ ইহারা "ফেল কড়ি, মাখ তেল"-নীতির উপাসক। "প্রভু আমাকে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখিবেন"—এ জন্য প্রভুর তোষামোদ কখনও 'প্রভুভক্তি' নহে, ইহা প্রভুর প্রতি বিরোধ ও প্রভুকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা।

কর্ম্মী সুখের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত সুখ অর্থাৎ প্রভুর প্রীতিটুকুই পান নাই; কারণ তিনি "আমার দাঁড়ে ছোলা"-নীতির পক্ষপাতী। প্রকৃতিকৃত কার্য্য স্বকৃত মনে করিয়া অহঙ্কারবশতঃ কর্ম্মিগণ 'আমি কর্ত্তা'—এইরূপ অভিমান করেন। এইরূপ অহঙ্কারী ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা আপনাদের জগতের ভোগের মালিক কল্পনা করিয়া পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চাহেন। কিন্তু প্রকৃতিদেবীই স্বয়ং ইহাদের অহঙ্কারের বিপুল সৌধ ভূমিসাৎ করিয়া ভগবানের প্রতি অকৃতজ্ঞতার চরম সাজা দিয়া থাকেন।

ব্রহ্মৈকজ্ঞানী—কৃতঘ্নতার চরম শিখরে আরূঢ়

জড়সুখভোগ ত্যাগ করিয়া নিজে 'প্রভু' হইবার যে প্রচেষ্টা, তাহা অত্যন্ত ভয়ানক ও জগতের পক্ষে ক্ষতিকারক। মায়াবাদিগণ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদীরা যদিও বাহিরের দিকে বিলাসী বা ভোগী নহেন, তথাপি তাঁহারা এমনি নিমক-হারাম বা কৃতঘ্ন যে মণিবের আসন দখল করিতে চান। বস্তুতঃ ইহারা "যার শিল তার নোড়া, তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া"-নীতির সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। ইহারা বাহিরে বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা দেখায় বটে, কিন্তু অন্তরে "মণিব হইব" এই কালকূটবুদ্ধি পোষণ করেন। এই কালকূট আকণ্ঠ পান করিয়া তাহারা প্রথমে স্মৃতি-বিভ্রম, বুদ্ধিনাশ ও সর্ব্বশেষে আত্মবিনাশ লাভ করেন। জীবের 'ঈশ্বর'-অভিমান অত্যন্ত ঘৃণার্হ ও আত্মঘাতক। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।
সেই ত' 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৮/১১৫)

জীব কখনই পরংব্রহ্ম হইতে পারেন না, রাবণ কখনও ভগবান্ রামচন্দ্র হইতে পারেন না।

ভক্ত—কৃতজ্ঞতার মূর্ত্ত-বিগ্রহ

নিত্যপ্রভু নিত্য-ভৃত্যের সেবাগ্রহণ করিয়া যে তৃপ্তি লাভ করেন, তাহাতেই ভৃত্যের সুখ—ইহাই সেবানন্দ। ভগবদ্‌ভক্তই নিজের যথাসর্ব্বস্ব নিঃশেষে নিত্যারাধ্য-প্রভু ভগবান্ শ্রীহরির ও তাঁহার নিজ-জনগণের পাদপদ্মে নিবেদন করিয়া নিরন্তর অনবদ্য সেবানন্দ-সুখের স্রোতে ভাসিয়া থাকেন। শুদ্ধভক্ত পরিচয় প্রদান করেন,—আমি নিত্যকালই ভগবানের চাকর ও ইহাই আমার স্বরূপের পরিচয়। সুতরাং প্রভু ও তাঁহার নিজজনের সেবা করিয়া যেন কালাতিপাত করিতে পারি, তাহার বিনিময়ে যেন আমি কোন কাণাকড়ি চাহি না। আমার মনিব ও তাঁহার প্রিয়জনেরা বড়ই উদার ও দয়ালু। তাঁহারা যেন এই দীনের সামান্য অযোগ্য সেবাটুকু প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন এবং কখনও যেন আমাকে সেবা হইতে বঞ্চিত না করেন। তাঁহারা সেবা গ্রহণ করিলেই আমি কৃতার্থ হইব—আমার জীবন সার্থক হইবে। যে-কোনস্থানে বা যে-কোন জন্ম লাভ হউক না কেন, আমি যেন কোন জন্মে তাঁহাদের সেবাসুখ হতে বঞ্চিত না হই।

পশু-পক্ষী হয়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে।
তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ-হৃদয়ে॥ (শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

সেই মহান্ প্রভুই আমার রক্ষক, মারিলেও তিনি মারিতে পারেন। ইহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার। "মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা। নিত্যদাস প্রতি তুঁয়া অধিকারা॥" আমি যেন মনিবের আসন দখল করিতে গিয়া কৃতঘ্নতার পরিচয় না দিই।"

যাঁহার হৃদয়ে প্রকৃত হরিভক্তির উদয় হইয়াছে, তিনি কখনও আপনাকে এই প্রকৃতির বা বিশ্বের ভোক্তা, কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর প্রভৃতি কল্পনা করেন না, তিনি আপনাকে গুরু-বৈষ্ণবের নিত্য-পদধূলিরূপেই উপলব্ধি করেন; তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই অকপট দৈন্য বিরাজিত থাকে। ভগবানই ভক্তের মহিমা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। কৃতঘ্ন ব্যক্তিরাই ভগবানকে ভজন করেন না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

ঈশ্বর সে জানে—ভক্ত-মহিমা বাড়া'তে।
হেন প্রভু না ভজে কৃতঘ্ন কোনমতে॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।২৫৯)

ভগবান্ ভক্তপ্রিয়, সত্যবাক্, সুহৃৎ ও কৃতজ্ঞ। কোনকালে কোন ভক্ত তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ ভজন করিলেও তিনি তদ্বিনিময়ে ভক্তকে যাবতীয় বিষয় প্রদান করেন; কেবল তাহাতেই তিনি নিবৃত্ত হন না, অপচয় ও উপচয়বিহীন নিজেকে পর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন। অতএব কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এ হেন দয়ালু ভগবানের ভজন হইতে বিরত থাকিতে পারেন?

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের

২৩শ তম বিরহ-মহোৎসবে

নিবেদন-কুসুমাঞ্জলি

কোথা আছ প্রভুবর !
আর কি মোদেরে দেখা নাহি দিয়া কাঁদাবে জীবন'ভর !
একদা শ্যামের শারদীয় রাসে
মোদের ত্যজিয়া গেছ দূরদেশে.
কানুর বেণুর ধ্বনি শুনি' আর রহিলে না ধরা'পর।
ব্রজে রসরাজ সাথে রাসমঞ্চেতে খেলিছ নিরন্তর !!
মনে কি পড়ে না আমাদের কথা ? আমরা যে তব দাস !
তোমারে হারায়ে মোদের হৃদয়ে জাগে শুধু হাহুতাশ !
শত জনমের সুকৃতির ধন,
তব পদে মোরা সঁপেছি জীবন,
তব নাম-রূপ-গুণ-লীলা স্মরি যতদিন র'বে শ্বাস !
কবে হে দয়াল তব কৃপা-বলে টুটিবে এ মায়া-পাশ ॥
এসেছিলে তুমি এ মর-জগতে জীবের উদ্ধার তরে।
শত শত লোক তব শ্রীচরণে লুটা'লো ভকতি ভরে !
পাতকীর চিত্ত করিয়া শোধন
সাধুসঙ্গে রাখি' শিখালে ভজন,
ভগবজ্ জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিলে ভকতের অন্তরে।
দেশে দেশে ভ্রমি' শুদ্ধ হরিকথা বিলাইলে অকাতরে ॥
শঙ্কর-মায়াবাদ খণ্ডি' গাহিলে বৈষ্ণবের জয়গান।
বেদান্ত শাস্ত্রের নাম পর ভাষ্য তব নব অবদান ॥
সিদ্ধান্তার্ণব করিয়া মন্থন
আনিলে জগতে ভকতি-প্লাবন,
তোমার মহিমা বুঝিতে আমারে শকতি কর গো দান।
তোমার বিরহে কেঁদে কেঁদে আজ আকুলিত মোর প্রাণ ॥

তব প্রেষ্ঠজন 'শ্রীভক্তি বামন' প্রস্ফুটিত শ্রেয়োবনে।
তাঁহার সৌরভে তব সুবিচার পরকাশে ক্ষণে ক্ষণে।
আচার্য্য-আসনে নেহারি' তাঁহারে,
তোমার করুণা পেতেছি অন্তরে ;
'অনুগতিরেব সিদ্ধিঃ'—বাণী স্মরি' নমি তাঁরে সযতনে।
মোর অশ্রু-পুষ্পে অঞ্জলি প্রদানি' নমি তব শ্রীচরণে॥

তাং ২৯শে পদ্মনাভ, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ
শ্রীগুরু-বিরহ বাসর

ভবদীয় শ্রীপাদপদ্ম কৃপারেণু প্রার্থী
—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী
বড় বহরকুলি (বর্দ্ধমান)

জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দের আদলে

শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা—যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন—তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়,—এই তিনটী বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভ সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করেন। কথাটি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সাথে গীতগোবিন্দের আলোচনার সুযোগ পেয়ে শ্রীস্বরূপদামোদর তাঁর কড়চায় লিখেছিলেন শ্লোকাকারে। রায় রামানন্দ, শিখি মাহেতি ও তাঁর ভগ্নী মাধবী দেবী প্রভৃতি ভক্তজনের সাথে গীতগোবিন্দের আলোচনার স্থান ছিল শ্রীক্ষেত্র পুরী। আজ থেকে পাঁচশ বছর পূর্ব্বে। গীতগোবিন্দের অনেক শ্লোকের মর্ম্মার্থ বুঝতে সাহায্য করেছিল 'ব্রহ্মসংহিতা' ও বিল্বমঙ্গলের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'-নামক গ্রন্থদ্বয়।

পুরীতে গীতগোবিন্দ-গবেষণার গোড়াপত্তন অত সহজেই অবশ্য হয়নি। দূরে ও নিকটেই ছিল দুটী বিরাট্ অন্তরায়। একটী—কাশীবাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতীর ষাট হাজার শিষ্যের অদ্বৈতবাদের সংগঠন, দ্বিতীয়টী—পুরীর প্রধান পাণ্ডা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের আনুগত্যে শঙ্করপন্থীর আলোচনা-চক্র। প্রথমেই এ দুটীকে বহু ধৈর্য্য ও ক্লেশ স্বীকার করে অদ্বৈতবাদের কবল হতে উদ্ধার

করতে হয়েছিল শ্রীচৈতন্যদেবকে। 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো' শ্লোকের ব্যাখ্যায় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বেদান্তের নিপুণ ব্যাখ্যাকারী অভিমানের পরাজয়ে নিজেকে বিল্বমঙ্গলের উক্তি দিয়ে তুলনা করে মহাপ্রভুর কৃপার জন্য স্তব করেছেন।—

'অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ, স্বানন্দসিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন, দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥'

যার অর্থ,—অদ্বৈতমার্গের পথিকগণদ্বারা উপাস্য, আত্মানন্দ সিংহাসন হতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েও আমি কোন গোপবধূ-লম্পট শঠ-কর্ত্তৃক হঠক্রমে দাসীরূপে পরিণত হয়েছি।

মাননীয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ইঙ্গিতেই রাজা প্রতাপরুদ্রের আদরের মন্ত্রী মহাশয় রায় রামানন্দের সাথে মিলিত হবার জন্য মহাপ্রভু আকুল হয়ে ছুটে যান দক্ষিণ ভারতের গোদাবরী-তটে। তথায় সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের প্রশ্নোত্তরে গীতগোবিন্দ আলোচনার যোগ্যপাত্র নির্ব্বাচিত হন—রামানন্দ রায়। মহাপ্রভুর দর্শন ও কথোপকথনে দক্ষিণ ভারতের অনেক শৈব-শাক্ত 'বৈষ্ণব' হয়েছেন। এমনকি, বেঙ্কট ভট্টাচার্য্যের মত শ্রী-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব লক্ষ্মীনারায়ণেরও সেবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রাধাকৃষ্ণের যুগলভজনের স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেই হতে পুরী ও দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলিতে গীতগোবিন্দ সমাদৃত হয়েছে। বিশেষ করে দৈনন্দিনের স্তবস্তুতিতে 'দশাবতারস্তোত্রম্' প্রার্থনাটি। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর সংস্পর্শে এসে দ্বৈতবাদের চরম শত্রুভাবাপন্ন অদ্বৈতবাদী ধুরন্ধর পণ্ডিতগণই হয়েছিলেন দ্বৈতবাদের প্রচারে প্রভুর পরম বান্ধব। পূর্ব্বভারত, উত্তরভারত, দক্ষিণভারতের মাঝামাঝি পুরীতেই স্থায়িত্ব লাভ করে গীত-গোবিন্দের রসাস্বাদন-কেন্দ্র। এ ছাড়া এখানে গীতগোবিন্দ আলোচনার মহাপ্রভুর ব্যক্তিগতভাবে অন্তর্নিহিত আর একটী কারণ আছে। সেটা তাঁর হরি-স্মরণ। জগন্নাথসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই দ্বাপরে ছিলেন নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।

মথুরা হতে কংস অক্রূরকে পাঠিয়ে স্নেহাস্পদ ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে বলরামসহ রঙ্গমঞ্চ দেখাবার ছলে এনে নিজের মৃত্যুকে নিজেই বরণ করেছেন। বন্দী উগ্রসেনকে মথুরার রাজসিংহাসনে বসিয়ে কৃষ্ণ পিতামাতা বসুদেব-দেবকীকে কংসের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেছিলেন। গুরু সান্দীপনির নিকট গুরুসেবার আদর্শে কৃষ্ণ পেয়েছেন প্রাণভরা কৃপাশীর্ব্বাদ। গুরুদেবের মৃত পুত্রকে যমালয় হতে এনে দিয়েছিলেন অভিলষিত গুরু-দক্ষিণা। তারপর ফিরে এসেছেন মথুরায়। কংস হত হলে তাঁর দুই স্ত্রী পিতা জরাসন্ধের নিকট

কেঁদে কেঁদে জানিয়েছেন তাদের অকাল বৈধব্যের কথা। জরাসন্ধ জামাতা কংস হত্যার একমাত্র কারণ জেনে কৃষ্ণকে ভেবেছেন চরম শত্রু। সেজন্য জরাসন্ধ-কর্ত্তৃক মথুরা আক্রান্ত হয়েছে অনেকবার। কৃষ্ণপ্রীতির যোগসূত্রে পাছে ব্রজবাসিগণ জরাসন্ধের শত্রুতার দৃষ্টিভঙ্গিতে পড়েন, সেজন্য ব্রজবাসীর প্রতি কৃষ্ণের আন্তরিক আকুলতা-ব্যাকুলতাতেও তিনি ছিলেন বাহ্যতঃ ব্রজবিমুখ। ব্রজবাসিগণ বুঝেন কৃষ্ণের মর্ম্মবেদনা। ব্রজবাসীর প্রতি জরাসন্ধের ভাবী কোপদৃষ্টি ও মথুরার পুরবাসিগণকে জরাসন্ধের আক্রমণ হতে রক্ষার জন্য কৃষ্ণ স্থানান্তরিত হন দ্বারকায়।

অপাত্রে কন্যাদান ও তার ভাবী নির্য্যাতনের কথা স্মরণ করেই সুদূরদর্শিনী রুক্মিণী নিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণের শরণ। শরণাগতপালক শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করেন রুক্মিণীকে। সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে গৃহবধূ ভোগের সামগ্রীই নন, পরন্তু গৃহলক্ষ্মী-স্বরূপিণী। ঘর-বাড়ীগুলিই 'গৃহ' নয়, 'গৃহিণী'ই গৃহ-পদবাচ্যা। শাস্ত্রে গৃহের দু'টী পরিচয় দিয়েছেন। একটী শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হিরণ্যকশিপুর প্রতি প্রহ্লাদের উক্তিতে হরিবিমুখ 'গৃহান্ধকূপ' যা আত্মকল্যাণকামীর পরিত্যাগ-যোগ্য। অপরটী দশম স্কন্ধের ৮০-৮১ অধ্যায়ে সুদামা সখার হরিভজনপরায়ণ 'গৃহস্থাশ্রম' যা আত্মকল্যাণকামীর সাদরে গ্রহীতব্য। গৃহকর্ত্তা স্বয়ং ধর্ম্মজীবনযাপন করলে 'গৃহস্থাশ্রমী' তিনি। গৃহস্থাশ্রমী পতিকে সধর্ম্মাচরণে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য-সহানুভূতি প্রদর্শনকারিণীই 'সহধর্ম্মিণী' আখ্যার যোগ্যা। সহধর্ম্মিণীকে অবলম্বন করে পুরুষ গৃহেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গ পুরুষার্থ লাভ করতে পারেন। এমনকি, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি-রূপা পরমসুখ পঞ্চম পুরুষার্থও লাভ করতে পারেন গৃহিণীকে আশ্রয় করেই। সেই গৃহিণী ভোগ্যপণ্য বা লাঞ্ছিতা হলে পুরুষ সুখ-সম্পদ লাভ করতে পারেন না।

অন্যত্র 'অর্থই অনর্থের মূল' তা বুঝাতে স্যমন্তক মণির রহস্য উদ্ঘাটনে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহিত হয়েছেন জাম্ববতী ও সত্যভামার সাথে। নরকাসুর-কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা রাজকন্যাগণ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতা হলে তাঁদের অস্বীকার করে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণকে হতে হয়েছে গার্হস্থ্য-লীলা-পরায়ণ। কিন্তু বহু পত্নীদ্বারা পরিসেবিত হয়েও ব্রজবাসী পিতামাতা, গো, গোবর্দ্ধন, সখা-সখীগণের প্রতি আকুল-হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ। পুরী দ্বারকা-স্বরূপ। এখানকার সমুদ্র, শ্রীবলদেব, সুভদ্রা ও জগন্নাথের স্নেহবিগ্রহ সেই ব্রজবিহারীর বিরহকাতরতারই উদ্দীপনা জাগায়।

মথুরা হতে কৃষ্ণ উদ্ধবকে একবার ব্রজে পাঠিয়েছিলেন বিরহকাতর

ব্রজবাসীদের সান্ত্বনা দিতে। ব্রজলীলা ও স্বজনবর্গের বিস্মরণজন্য উদ্ধবের নিকট ব্রজের গোপগোপীগণ কৃষ্ণকে অনুযোগ করেছেন—"বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, যমুনা-পুলিন, বন, সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা। সেই ব্রজের ব্রজজন, মাতা-পিতা-বন্ধুগণ, বড় চিত্র কেমনে পাসরিলা॥" উদ্ধব কৃষ্ণপ্রেরিত জেনে ব্রজবাসী গোপগোপীগণের যে ভাবের উদয় হয়েছিল, সেই ভাবে বিভাবিত হতেন নীলাচলে মহাপ্রভু। তখন স্বরূপের গান, রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটক ও গীতগোবিন্দের কথোপকথনে সুখী হতেন তিনি।

অদ্যাবধি যাঁরা সমাজে রাধার চরিত্র চিত্রিত করেছেন, তাঁদের রাধা ভিন্ন ভিন্ন পাত্রী নন। পরন্তু একই রাধাকে যে যেমন সে ঠিক তেমন ভাবেই দেখেছেন ও তদনুসারে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাপাত্র শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে যুক্তি-সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে তাত্ত্বিক দিক্ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন, তা অন্যত্র নাই। কোন বর্ণনায় গীতগোবিন্দের পৌরাণিক উপাদানের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বিলাসকলার বাহ্যিক দিক্ এত বেশী বর্ণিত হয়েছে যে, তাতে রাধা, লক্ষ্মী, সীতা, সাবিত্রীর চেয়েও সমাজে অধিক আদরণীয়া না হয়ে সাধারণের নিকট কলঙ্কিনী রাধায় পরিণতা হয়েছেন। এঁদের রাধা অপরের, অর্থাৎ কবি জয়দেবের। অপরের রাধাকে সুযোগ বুঝে লোকে ভাল-মন্দ বলেন। কিন্তু জয়দেবের রাধা তাঁর নিজস্ব। যেখানে মমত্ববোধ, সেখানে প্রাণের টান, যথার্থ আবেগের সঞ্চার। কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ মহাকবি জয়দেবের অনুস্মরণে, 'গহণকুসুম কুঞ্জমাঝে'লিখে ক্ষান্ত হয়ে তিনি সমাজকে বুঝাতে চেয়েছেন, ভক্ত জয়দেবের মত রাধা নিজস্ব, আদরণীয়া ও পূজনীয়া বুদ্ধি না হলে কোন ব্যক্তি প্রাকৃত বিদ্যা-বুদ্ধির দ্বারা তাঁকে যথার্থ-রূপে জানতে পারে না। যে-বিষয়ে যাঁর যথার্থ জ্ঞান নেই, সমাজে সে-বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যায় তাঁকে আত্মবঞ্চিত ও জগৎবঞ্চনারূপ দোষে দুষ্ট হতে হয়।

কবি জয়দেব তাঁর রাধাকে তিনি কোথায় পেয়েছেন, আজকের দিনের রাধা সম্বন্ধে বিতর্কিত সমাজে গীতগোবিন্দে জয়দেবেরই পৌরাণিক, বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক ব্যাখ্যার দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন।

জয়দেবের রাধা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী নন, ইনি পরকীয়া নায়িকা। এখানেই সমাজের ভুল বুঝাবুঝির সূত্রপাত। সমাজে রাধাকৃষ্ণের বিবাহ ও তাঁর পরকীয়া সম্বন্ধে সামঞ্জস্য বোধ না হলে তাঁকে কলঙ্কিনী ভাবা অস্বাভাবিক নয়। বিশেষতঃ রাধা কৃষ্ণাপেক্ষাও দুর্জ্ঞেয়া।

বৃষভানু-রাজনন্দিনী রাধা বিবাহের যোগ্যা হয়েছেন। মহারাজা বৃষভানু কন্যার জন্য উপযুক্ত বরান্বেষণে ভারতের বিভিন্ন স্থানে দূত প্রেরণ করেন। বহু অনুসন্ধানের পর অবশেষে 'মাল্যক' নামক গোপরাজের কনিষ্ঠ পুত্র আয়ানের সাথে রাধার বিবাহ স্থির হয়। মাল্যকের পত্নীর নাম জটিলা; মদন, দুর্ম্মদ, দম ও আয়ান—চারজন রূপবান্ পুত্র এবং যশোদা, কুটিলা ও প্রভাকরী—অসামান্য রূপসী তিন কন্যা। তন্মধ্যে কন্যা যশোদার সাথে গোপরাজ নন্দের শুভ পরিণয় হয়।

এদিকে আয়ানের সাথে রাধার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হওয়ায় শ্রীরাধা বিশেষ-ভাবে চিন্তিত হয়ে তার পূর্ব্ব অভিশাপ 'প্রাকৃত মানুষের পাণিগ্রহণ' বিষয় স্মরণ করে নিত্যপতি প্রিয়তম অধোক্ষজ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সখীগণ-পরিবৃত হয়ে কাত্যায়নী ব্রতের ছলে কালিন্দীতীরে আগমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ আরাধনায় তৎপরা হন। বহুকাল অতীত হলে শ্রীকৃষ্ণ একদিন দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিতে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে আশ্বাস প্রদান করত বললেন,—'হে প্রিয়ে! তুমি এ কঠোর তপস্যা হতে বিরত হও, তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।' শ্রীরাধা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক হাতজোড় করে বললেন,—'হে ভগবন্! তুমি সকলের ভয়চ্ছেত্তা, আমি তোমার দাসী, আমাকে ভয় হতে পরিত্রাণ কর। পিতা আমাকে আয়ানের নিকট প্রদান করতে মনস্থ করেছেন। হে মধুসূদন! আমি ভগবৎপরায়ণা, তোমা ভিন্ন অন্য ক্ষুদ্র মানব আমাকে কি-প্রকারে গ্রহণ করতে পারে? তুমি আমায় অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ না করলে আমার প্রাণধারণ বৃথা।' (ক্রমশঃ)

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

বাল্যক-কালে পরমেশ্বরের সাধন হইতে পারে না,—এরূপ মনে করা অনুচিত। আমরা ইতিহাসে দেখিতেছি যে, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ অত্যন্ত শৈশব অবস্থায় পরমেশ্বরের প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। যদি কোন মানব কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবে মানবমাত্রেই যত্ন করিলে সেই কার্য্য সাধন করিতে পারিবেন, ইহাতে সন্দেহ কি? বিশেষতঃ যাহা প্রথম বয়স হইতে অভ্যাস করা যায়, তাহা ক্রমশঃ স্বভাবস্বরূপ হইয়া পড়ে।

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ, তুরা (মেঘালয়), তাং ২৪।৮।১৯৮১

[দ্বিতীয় অধিবেশন]

সর্ব্বাগ্রে অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে অসংখ্য দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করি। পরিশেষে প্রধান-অতিথি মহোদয়, ত্রিদণ্ডিপাদগণ, বৈষ্ণববর্গ, সুধী সজ্জনমণ্ডলী ও মাতৃমণ্ডলী-চরণে অসংখ্য প্রণতি। আজ আমরা যে ধর্ম্মসভায় সমবেত হয়েছি, এটী দ্বিতীয় অধিবেশন। আলোচ্য বিষয় আজ 'অবতারবাদ এবং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব'। কার্য্যসূচীতে যেহেতু 'অবতারবাদ' নিয়ে প্রথমে লেখা আছে, সেইজন্য 'অবতারবাদ' নিয়েই আমার আলোচনা শুরু করব। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয়গণ তাঁদের সাধ্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। তাতে আপনারা বহু বিষয় অবগত হয়েছেন।

বর্ত্তমানে অবতারতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে আমাকে ব্যাখ্যা করতে হয় অবতার কি বা কাকে অবতার বলা যায়? অবতার কার হয় ইত্যাদি বিষয়। আমরা ভাগবতে এই তত্ত্বদর্শন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একটা শ্লোক দেখতে পাই,—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

ভগবানের—তত্ত্ববস্তুর তিনটে Aspect—ধারণা। প্রথম হল ব্রহ্ম, দ্বিতীয় হল পরমাত্মা এবং তৃতীয় হল ভগবান্। কাকে ব্রহ্ম বলছেন?—তত্ত্ববস্তুর আভা, প্রভাকেই বলছেন ব্রহ্ম। তত্ত্ববস্তুর অংশকে বলছেন পরমাত্মা, আর স্বয়ংরূপ তত্ত্ববস্তুকে বলা হল ভগবান্। ভগবান্ যাঁকে বলছেন, তিনি হলেন Superlative degree। এই তিনটী জিনিসকে শাস্ত্রে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—প্রথমে ব্রহ্মতত্ত্বকে Positive degree ধরা যায়, পরমাত্মতত্ত্ব Comperative degree এবং ভগবত্তত্ত্ব Superlative degree। সেই তত্ত্ববস্তুকে ভগবান্ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হয়েছে। ভগবান্ শব্দের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শাস্ত্র বলছেন,— ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র শক্তিসামর্থ্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য ইত্যাদির পূর্ণমূর্ত্তি যিনি, তিনি হলেন ভগবান্। সেই ভগবত্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলছেন, তাঁর সমান কেউ হতে পারেন না, তাঁর অধিকও কেউ নহেন। তিনি হলেন সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব। সৎ-চিৎ-আনন্দময় বস্তু অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তু নন। সুতরাং যখনই আমরা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনা করতে যাই, যখনই আমরা অবতারবাদ নিয়ে আলোচনা করতে যাই তখনই দেখি, তার ভিতরে প্রাকৃত কোন চিন্তা নাই। দার্শনিক বিচারে আমরা দেখতে পাই,—যখনই ভগবানকে সাধারণ মনুষ্যদৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা হয়, তখনই ভুল হয়ে গেল। ঠিক এই উল্টো ভাবটা আবার আসে, যখন আমরা মানুষকেই ভগবান্ বলতে চাই। কিন্তু দুটো Theoryই ভুল—দার্শনিক বিচারে বলছেন। একটাকে বলা হয়েছে Anthropomorphism—অপ্রাকৃতে প্রাকৃতবুদ্ধি, আর একটাকে বলা হয়েছে Apotheosis—জড়বস্তুতে দেবত্বারোপ। চেতনকে যখন জড় বলতে যাই, তখন একরকম ভুল হয়, আবার যখন জড়কে চেতন বলতে যাই, তখন অন্য প্রকার ভুল হয়। সুতরাং ভগবত্তত্ত্ব শাস্ত্রে যেভাবে নির্দ্দেশ করেছেন, বেদে, বেদান্তে, উপনিষদে, গীতা, ভাগবতে, রামায়ণে, মহাভারতে যেভাবে বর্ণনা করেছেন, সেটী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শাস্ত্র অন্বয়জ্ঞানতত্ত্বকে বলেছেন অক্ষয় অব্যয়স্বরূপ। ভগবান্ যেমন অক্ষয় অব্যয়স্বরূপ সনাতন তত্ত্ব, ধর্ম্মও তদ্রূপ সনাতন, শাস্ত্রও তদ্রূপ সনাতন। সুতরাং সনাতন শব্দের ব্যাখ্যায় আমরা পাচ্ছি—যেটা পূর্ব্বে ছিল, বর্ত্তমানেও সেই অবস্থায় আছে এবং ভবিষ্যতেও সেই অবস্থায় থাকবে, অর্থাৎ যার বিকৃতি নাই, যার কোন পরিবর্ত্তন—Alteration, পরিবর্দ্ধন—Addition নাই, তাকে বলে সনাতন। শাস্ত্র সনাতন। সেই সনাতন শাস্ত্রের মর্ম্ম আমাদিগকে উপলব্ধি করতে হবে।

শাস্ত্রের ভিতরে কিছু Insertion প্রবেশ করেছে বা তার ভিতরে কিছু Concoction, Fabrication আছে—এটা যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে আর আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব সংরক্ষণ করতে পারছি না। শাস্ত্র মানে Axiomatic Truth, Fundamental Truth, তাকেই বলা হয়েছে শাস্ত্র। শাস্ত্র মানে সংবিধান। ভারতবর্ষে, ভারতরাষ্ট্রে বাস করছি আমরা, ভারতীয় সংবিধান আমাদের মেনে নিতে হয়। কেন?—যদি আমি ভারতীয় সংবিধান না মানি, তাহলে আমার নিজেরই অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। যে-সব আইন-কানুনগুলো আছে সে-সব আইন-কানুনগুলোর কোন সুযোগ-সুবিধা—Facility পাই না আমি।

সুতরাং আমারই সুবিধার্থে, আমারই কল্যাণার্থে ভারতবাসী আমাকে ভারতীয় সংবিধান মেনে নিতে হয়। তদ্রূপ শাস্ত্র হল Spiritual Constitution—পারমার্থিক সংবিধান। একেও ঐভাবে মানবার জন্য আমাদের সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে। সে সংবিধানে কোন Addition, Alteration চলে না, হয় না। এখানকার সংবিধানে Addition, Alteration চলে, চলছে, কিন্তু Spiritual Constitution এ ওটা চলে না, চলবে না। হাজার হাজার বৎসর ধরে যে শাস্ত্রগ্রন্থ চলে আসছে, যার টীকা-ভাষ্য—Commentary ইত্যাদি প্রমাণ করছে মূলবস্তুকে, তার ভিতরে Insertion আমরা স্বীকার করি না। মৌলিক যে-সব গ্রন্থগুলি আছে—যাকে শাস্ত্র বলে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—

ঋগ্‌যজু সামাথর্ব্বাঞ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥

এর ভিতরে কোন Concoction, Fabrication ইত্যাদি হয় নাই। পরবর্ত্তিকালে বহু ব্যাপার এর মধ্যে হয়েছে, সেটা স্বীকার করতে হবে, কিন্তু সুধীসমাজ—যাঁরা সাধন-ভজনবলে বলীয়ান্, তাঁরা অপ্রয়োজনীয় প্রক্ষিপ্ত অংশ বাদ দিয়ে সার সঙ্কলন করতে অনায়াসে পারেন। সার সঙ্কলন করাটাই হয়েছে মুস্কিল আমাদের পক্ষে। শাস্ত্র বলছেন,—Time is short art is long. 'অনন্তপারমখিলশব্দশাস্ত্রম্ স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্না, সারং ততো গ্রাহ্যম্।' —একথা যদি সত্যই প্রমাণিত হয় তাহলে আমাদের সার সঙ্কলন অবশ্যই করতে হবে। সার সঙ্কলন ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর নাই। তাই বলছেন,—'সারং ততো গ্রাহ্যম্ অপাস্য ফল্গুঃ'—অসারকে পরিত্যাগ করে সার সঙ্কলন করা শিখতে হবে আমাদের। ঠিক সেইভাবেই আমাদের সবকিছু আলোচনা প্রয়োজন। 'হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ'। কিভাবে সার সঙ্কলন করব? কার অধিকার সেটা?—রাজহংসকে দুধে জলে মিশিয়ে দিলে সে যেমন দুধটাকে গ্রহণ করে, জলটা পড়ে থাকে, তদ্রূপ সার সঙ্কলন। শাস্ত্র আমাদিগকে জানিয়ে দিচ্ছেন তত্ত্ববস্তু সম্বন্ধে। বেদান্ত-দর্শন তাই বলছেন,—যদি ভগবত্তত্ত্ব জানতে হয়, যদি অবতারবাদ জানতে হয়, যদি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব জানতে হয়, যদি মায়াতত্ত্ব জানতে হয়, যদি জগত্তত্ত্ব জানতে হয়, তাহলে শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। সেইজন্য বেদান্ত-দর্শনের ১ম পাদ, তৃতীয় সূত্রে বলছেন,—'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ'—শাস্ত্রই আমাদের উপযুক্ত মাধ্যম সেই পরাৎপরতত্ত্ব ভগবানের সম্বন্ধে কিছু Concrete idea নেওয়ার জন্য। তা না

হলে আমাদের কিছুই থাকছে না। Footings কিছুই থাকে না আমাদের যদি শাস্ত্রকে অস্বীকার করে দিলাম আমরা। সেইজন্য তত্ত্ববস্তুর অভিজ্ঞান সম্বন্ধে শাস্ত্রই হল আদি প্রমাণ। কেন?—শাস্ত্রকে বলছেন অপৌরুষেয়। বেদকে বলছেন অপৌরুষেয়—ভগবানের নিঃশেষিত বাণী। সাক্ষাৎ ভগবানের বাণী—তাকে বলে শাস্ত্র। গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্র সেইরূপ। সেখানে কোন সন্দেহের সম্ভাবনা নাই, তর্কের কোন স্থান নাই। Undisputed সেটা। সে-সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করার অধিকার দেওয়া হয় নাই। তার্কিকগণ ত' ইহজগতের সর্ব্বত্র রয়েছেন। তারা সব জিনিসের উপর সন্দেহ পোষণ করতে পারেন—ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিবিধ সন্দেহ—বিভিন্ন ধারণা পোষণ করতে পারেন। কিন্তু আমরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি Idea নেব? ধর্ম্ম কাকে বলা হয়েছে?

ঋষিগণ যে ধর্ম্মের কথা বললেন, সেটা সনাতন ধর্ম্ম এবং সে সনাতন ধর্ম্ম আলোচনা করতে গিয়ে পাশাপাশি অসনাতন ধর্ম্ম—অনিত্য ধর্ম্ম যেটা, সেটা নিয়েও আলোচনা করেছেন। তাই ঋষিগণকে বলতে হয়েছে—চতুঃশ্লোকী শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝাতে হয়েছে যে, যখনই আমরা তত্ত্বদর্শন নিয়ে আলোচনা করব, তখনই Positive ও Negetive দুটো নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে। তাই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে বললেন,—অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে আমাদের শাস্ত্র আলোচনা করতে হবে। তা না হলে শাস্ত্র আলোচনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে না। সেখানে Comperative studyর অভাব থেকে যাবে। তাই বলছেন,—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥

অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে শাস্ত্র আলোচনা করতে হবে। Merits-demerits—ভালমন্দ দুটো নিয়েই আলোচনার প্রয়োজন আছে। সেই পরাৎপর তত্ত্ব যে ভগবান্—যার থেকে নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, নিখিল বিশ্ব Generated হয়েছে, অনন্ত শক্তিমান্ সেই ভগবান্। তাঁর থেকে এই অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টি, তাঁর থেকেই সংরক্ষণ ও তাঁর থেকেই লয়। সবকিছুর মূলাধার তিনি। যদি ভগবানকে আমরা বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বনিয়ন্তা বলে মেনে নেই, তাহলেও আবার দেখা যায় স্রষ্টা আর একজন আছেন। যাঁর নাম লোকপিতামহ ব্রহ্মা। আবার একজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে যিনি প্রলয় ঘটিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর নাম শিবঠাকুর। আবার একজনকে পাওয়া যাচ্ছে যিনি বিষ্ণু, জগৎপালন করছেন। কি বিচার আছে এর মধ্যে? মুখ্য মালিকানা ভগবানের, যাকে

ভগবান্-শব্দে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তিনি হলেন মূল মালিক। তাঁরই অনন্ত কর্ম্মচারী। সেই কর্ম্মচারী দিয়ে তিনি সবকিছু করাচ্ছেন। সুতরাং গৌণসৃষ্টির মালিক হলেন ব্রহ্মা, গৌণ প্রলয়ের মালিক হলেন শিব। এইরকম অনন্তকোটী Officer নিয়ে তিনি তাঁর অনন্ত সংসার, অনন্ত বিশ্ব পরিচালনা করছেন। সেই কথাই বেদে, বেদান্তে, উপনিষদের মধ্যে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে।

সেই যে ভগবান্, তিনি নিখিল শক্তির মূলাধার। যখন তাঁকে বলি আমরা শক্তিহীন, যখন তাঁকে বলি আমরা নিঃশক্তিক, নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ, তখন সবটাই ভুল হয়। সেখানে One sided view—একদেশিক বিচার করা হয়। শাস্ত্র বলছেন,—Positiveকে আগে মেনে নাও, তারপরে Negetivity। তত্ত্বদর্শনটাও তাই। ভগবানের শক্তি আছে, তিনি শক্তিমান্, তারপরে তর্কের খাতিরে, যুক্তির ক্ষেত্রে বলা হল—তিনি নিঃশক্তিক। ঠিক সেইভাবেই শাস্ত্রের সব জিনিসটা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। নিরাকার-সাকার দুটী শব্দ আছে শাস্ত্রে। নিরাকারত্বের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন—তাঁর কোন প্রাকৃত আকার নাই। সেই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ অপ্রাকৃত আকারবিশিষ্ট। তাঁর যে শক্তি অপ্রাকৃত শক্তি, তাঁর যে গুণ অপ্রাকৃত গুণ, সেইভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেখানে নিরাকার, নির্গুণ, নিঃশক্তিক, নির্ব্বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার অর্থ এইভাবে করেছেন। সুতরাং আমাদের ভুল বুঝবার কোন কারণ নাই। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, সেই ভগবান্ Non-entity নন, তিনি সাংখ্যের নিষ্ক্রিয় পুরুষ নন। প্রকৃতিবাদী বলছেন,—প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করেছেন। গীতায় ঐ যুক্তি খণ্ডন করে দিয়েছেন। গীতার শ্লোকের মধ্যে রয়েছে,— ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥

প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করছেন—একথা ঠিক, কিন্তু কার দ্বারা, কার সহায়তায়? ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বলেছেন,—Under the guidance—তাঁর সহায়তায় প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করছেন। তা না হলে সম্ভব নয়। সুতরাং শক্তিমান্ তত্ত্বকে বাদ দিয়ে শক্তির কোন পরিচয় নাই। শক্তি যখনই বলি তখনই শক্তি একটী Attribute, কোন বস্তুর বা কোন ব্যক্তির শক্তি। শক্তির পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। শক্তিমানেরই শক্তি। সেই তত্ত্বই দর্শনশাস্ত্রে পরিস্কার বুঝিয়েছেন। শক্তিকে Abastract Noun—গুণবাচক বিশেষ্য বলা হচ্ছে। প্রকৃতির একাকী নিজের কোন কিছু করবার ক্ষমতা বা সম্ভাবনা নাই, সেইকথা গীতায় পরিস্কারভাবে জানিয়েছেন।

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবতি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥

সুতরাং প্রকৃতিবাদী নিরস্ত হউন। প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করছে না পুরুষের সাহায্য ব্যতীত। পুরুষের সাহায্য নিয়ে প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করতে পারে, তা না হলে প্রকৃতি সক্রিয়া নয়। সেইকথাই বেদ, বেদান্তে, উপনিষদে প্রচারিত ও প্রমাণিত।

অবতারবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করবার কথা আছে আজ। অবতার কাকে বলব? মানুষকে কি অবতার বলা চলবে? মানুষ কি ভগবান্? নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন ভগবান্; তার উদাহরণ রয়েছে আমাদের সনাতন হিন্দু শাস্ত্রে, Christianityতে রয়েছে, মুসলিম ধর্ম্মেতেও সে-সব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমাদের সনাতন শাস্ত্রে যে সৃষ্টি রহস্যের কথা বলা হচ্ছে তা ভাগবতের ভিতরে বেশ সুন্দরভাবে বলা হয়েছে, তার প্রকরণটা ব্যাখ্যা করেছেন। তারপরে কিভাবে আসছে সেই সৃষ্টি।

সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপ-পশূন্ খগ-দন্দশূকান্।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়
ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ ॥

সৃষ্টি রহস্যের কথা বলছেন। ভগবান্ প্রথমে জল সৃষ্টি করলেন, তারপর স্থল, তারপর তিনি জলজ প্রাণী – Aquatic animal সৃষ্টি করলেন। তারপরে তিনি বৃক্ষ, তৃণ, গুল্মলতা সৃষ্টি করেছেন। তারপর পাখী, পশু সৃষ্টি করেছেন, Reptiles –সরীসৃপ সৃষ্টি করেছেন। এতসব সৃষ্টি করবার পরও সেই প্রেমময় ভগবান্ সন্তুষ্ট হতে পারেন নাই, সুখী হতে পারেন নাই। তারপরে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করলেন। তখন তিনি সন্তুষ্ট হলেন। কেন?—আগে যাদের সৃষ্টি করেছি, এদের সাথে আমার মনের—ভাবের আদান-প্রদান সম্ভবপর নয়। কিন্তু মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনি, তার সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান তাঁর সম্ভব। মানুষকে জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, বৈরাগ্য, বিচক্ষণতা প্রভৃতি সবকিছু দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সেইজন্য এই মানুষই হল ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি —Best creation, শাস্ত্রে বলছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ-তিথিতে

উদ্দীপন

পরম করুণ, গুরুদেব হন,
জীব উদ্ধার হেতু মর্ত্ত্যে বিজয়।
গৌরহরি-জন, পতিততারণ,
যাঁহার আশ্রয়ে মায়া দূর হয়॥
গুণানুশ্রবণ, করিলে কীর্ত্তন,
শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্নে ভক্তির উদয়।
(যাঁর) গায়ত্রীর ধ্যান, হৃদয়ে জপন,
সর্ব্ববিঘ্ন হরি' চিদানন্দ হয়॥
নিত্য ভাব মন! হেন মহাজন,
সেবানন্দ-ভাবের হইবে উদয়।
স্বরূপ-দর্শন, বিবর্ত্ত-বিভ্রম,
অজ্ঞান-তিমির সব যায় ক্ষয়॥
বেদান্ত-স্ফুরণ, হৃদয়ে তখন,
অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্বে অবস্থান হয়।
শ্রৌতবাণী জন, অনর্থ বর্জ্জন,
ত্যজিতে পারেন যাঁহার আশ্রয়॥
পরমার্থ-ধন, নিষ্ঠা-রুচি হন,
আসক্তি-ভাবাদি প্রেমভক্তি পায়।
অধিকারীজন, সেবাকুঞ্জে মন,
সতত নিযুক্ত থাকয়ে নিশ্চয়॥
নাম-মন্ত্রদান, তারিলা ভুবন,
সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন পায়।
আদেশ পালন, করেন যে-জন,
সর্ব্বতত্ত্ববিৎ সিদ্ধান্তেতে রয়॥

ভুক্তি-মুক্তিহীন, দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন,
সৎসঙ্গে রহি সতত ভজয়।
সম্বন্ধ-বিহীন, মায়ামুক্ত নন,
বিরূপেতে রহি সর্ব্বজন্ম যায়॥
জ্ঞান-চক্ষু দান, করেন যে জন,
হেন গুরুদেব করহে আশ্রয়।
পরশ রতন, পাইল যে জন,
বিরহে প্রকট উদিছে হৃদয়॥
রূপানুগ জন, প্রেম বিতরণ,
করিলে সবায় সর্ব্বজন গায়।
সরস্বতী-জন, রাধাদাস্যে মন,
কৃতিরত্ন হয় বিদ্বৎসভায়॥
এই দীনজন, চিন্তি অনুক্ষণ,
তব জন সঙ্গে কৃপা ভিক্ষা চায়।
দাস 'হরিজন', সেবনে মগন,
মর্ত্ত্যে কুঞ্জে রহি উদ্দীপন গায়॥

শ্রীগুরু-গৌর-দাসানুদাস—
—শ্রীহরিজন
(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ)

শ্রীচৈতন্যে মর্ত্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩২০ পৃষ্ঠার পর]

শরীরে পীড়া হইয়াছে এবং বিষ্ণু-নৈবেদ্য খাইলে সেই পীড়া আরোগ্য হইবে—এই ছল করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নৈবেদ্য আনাইয়া খাইয়াছিলেন।—

"ব্যাধি-ছলে জগদীশ-হিরণ্য-সদনে।
বিষ্ণু-নৈবেদ্য খাইল একাদশী-দিনে॥" (চৈঃ চঃ আদি ১৪।৩৯)

একদিন প্রভু আবর্জ্জনাপূর্ণস্থানে বিষ্ণুনৈবেদ্য রান্না করা বর্জ্য হাঁড়ির উপরে বসিয়া নিজ জননীকে উপদেশ দান করেন,—

"এ-সব হাঁড়িতে মূলে নাহিক দূষণ।
তুমি যাতে বিষ্ণু লাগি' করিলা রন্ধন॥
বিষ্ণুর রন্ধন-স্থালী কভু দুষ্ট নয়।
সে হাঁড়ী-পরশে আর-স্থান শুদ্ধ হয়॥
এতেক আমার বাস নহে মন্দ-স্থানে।
সবার শুদ্ধতা মোর পরশ-কারণে॥" (চৈঃ ভাঃ আদি ৭।১৭৭-১৭৯)

মহাপ্রভুর শিশুকালের এবম্বিধ লীলা ও আরও বহু লীলা-কাহিনী আছে, যাহাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি শিশুকালেও নাস্তিক বা ভগবদ্ বিদ্বেষী ছিলেন না এবং নিজে লীলা-ছলে আচরণদ্বারা জগদ্বাসীকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

(৬) লেখক ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"চৈতন্য মৃগী রোগী ছিলেন। ···কখনো হাসেন, কখনো কাঁদেন। কখনো স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া, মা শচীদেবীকে মারধোর করতে যান (চৈঃ ভাঃ ২।২।৮৭)।"

লেখক ৭৫ পৃষ্ঠায়ও লিখিয়াছেন,—"চৈতন্যচরিত পাঠক মাত্রেই জানেন, শিশুকাল থেকেই চৈতন্য কি রকম এক অসুস্থ প্রকৃতির ছিলেন। হঠাৎ হঠাৎ মূর্চ্ছা যেতেন।"

লেখক ৫৩ পৃষ্ঠায় চৈতন্যভাগবতের যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন, তাহা হইল ;—

"ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়।
লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায়॥" (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২।৮৭)

উহার পরবর্ত্তী শ্লোকে অবশ্যই দৃষ্ট হয়,—

"এইমত হৈলা প্রভু বৈষ্ণব-আবেশ।
শচী না বুঝয়ে কোন্ ব্যাধি বা বিশেষ॥" (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২।৮৮)

এস্থলে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আপনাকে পাষণ্ডি-সংহারক বিষ্ণু বলিয়া হুঙ্কার করত লীলাবিরোধী পাষণ্ডগণের শিক্ষার নিমিত্ত দুষ্টনাশিনী মূর্ত্তিতে লীলা-ভিনয় করিয়াছেন। মূঢ় লোকগুলি প্রভুর ঐ কৃষ্ণপ্রেম-চেষ্টাকে বায়ুরোগ-বিকার জ্ঞান করিয়াছেন। ভক্ত শ্রীবাসঠাকুর কিন্তু মহাপ্রভুর ঐ প্রেমবিকার দর্শনে উহাকে মহাভাব জ্ঞান করিয়াছেন।

"অদ্ভুত দেখিয়া শ্রীনিবাস মনে গণে'।
মহাভক্তিযোগ, বায়ু বলে কোন্ জনে?" (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২।১১০)

লেখক পুনঃ ১৭১ পৃষ্ঠায় নিজেই লিখিয়াছেন,—"অতঃপর চিন্তান্বিতা শচীদেবীর উদ্দেশ্যে শ্রীবাস বললেন,—

"চিত্তের যতেক দুঃখ করহ খণ্ডন ॥
'বায়ু নহে,—কৃষ্ণভক্তি' বলিল তোমারে।
ইহা কভু অন্য জন বুঝিবারে নারে ॥"

শ্রীবাসপণ্ডিতের আশ্বাসন বাণী শুনে মা শচীদেবীর দুশ্চিন্তা কিছুটা প্রশমিত হলো সত্যি কিন্তু শ্রীবাসের ঐ 'বায়ু নহে—কৃষ্ণভক্তি' কথাটা তাঁর মাতৃ-হৃদয়কে দ্বিগুণ উদ্বেলিত করে তুললো। ভয় হলো, অপত্য স্নেহের অন্তর্দ্বন্দ্বে উৎপীড়িত শচীদেবীর মনে, সন্তানপালিনী, চিরকল্যাণময়ী মাতৃহৃদয় জুড়ে তখন একমাত্র চিন্তা, ভক্তিবাদের তুমুল জোয়ারে বিশ্বরূপ ভেসে গেছে। সেই সংসার-বিমুখী সর্ব্বনাশা জোয়ার এসেছে বিশ্বম্ভরের মনেও।" লেখকের ভাষাতেই শচীদেবী যখন বিশ্বম্ভরের বায়ুরোগ নহে,—কৃষ্ণভক্তি—ইহা বুঝিয়াছেন, তখন লেখক কি তাহা বুঝেন নাই?

চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত আছে, বায়ুরোগচ্ছলে প্রভুর অন্তর্দ্দশায় প্রেমবিকার প্রকাশ হইত।—

"একদিন বায়ু-দেহমান্দ্য করি' ছল।
প্রকাশেন প্রেমভক্তি-বিকার সকল ॥" (চৈঃ ভাঃ আদি ১২।৬৭)

কিন্তু প্রভুর ইচ্ছায় সকলের তদীয় ঈশ্বরত্ব উপলব্ধি হইত না।

"আপনা' প্রকাশ প্রভু করে বায়ু-ছলে।
তথাপি না বুঝে কেহ তা'ন মায়া-বলে ॥" (চৈঃ ভাঃ আদি ১২।৭৮)

সুতরাং প্রেমবিকার প্রকাশ করিতে প্রভুর ভাবোন্মাদ মৃগীরোগ নহে ও হইতে পারে না। অতএব যাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মৃগীরোগগ্রস্ত মনে করেন, তাহারা বা তিনি নিশ্চয়ই কোনরূপ বিকারগ্রস্ত হইয়াছেন, মনে হয়।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নিজ জননীর প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু মারিতে ধাবিত হন নাই। তাহার প্রমাণ,—

"ধর্ম্মসংস্থাপক প্রভু ধর্ম্ম-সনাতন।
জননীরে হস্ত নাহি তোলেন কখন ॥" (চৈঃ ভাঃ আদি ৮।১৪৩)

লেখক তাঁহার পুস্তকে ৬০।৬১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"তবে শেষ দিকে চৈতন্য ওড়িশায় কাশী মিশ্রের বাড়ীতে (গম্ভীরার) দেওয়ালে যেভাবে মুখ ঘষতেন ও তাঁর কপালে ঠোঁট কেটে যেভাবে রক্ত বেরোতো—এসব লক্ষণ দেখে ধারণা করার যথেষ্ট কারণ থাকে যে চৈতন্য মৃগী অর্থাৎ এপিলেপসি (Epilepsy) রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগ উঠিলা।
গম্ভীরার ভিত্যে মুখ ঘষিতে লাগিলা॥
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার।
ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার॥
সর্ব্বরাত্রি করে ভাবে মুখ সঙ্ঘর্ষণ।
গো গো শব্দ করে স্বরূপ শুনিল তখন॥"

[চৈতন্যচরিতামৃত / অন্ত্যলীলা / উনবিংশ পরিচ্ছেদ]

আশ্চর্য্য এই যে, লেখক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্ত পয়ারটি পাঠ করিয়াও তাহাতে মহাপ্রভুর মৃগী রোগের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন! উক্ত পয়ারে বর্ণিত মহাপ্রভুর মুখ সঙ্ঘর্ষণরূপ দিব্যোন্মাদ (উদ্‌ঘূর্ণা) কি মৃগীরোগ হইতে পারে? বিপ্রলম্ভে দিব্যোন্মাদের চরম অবস্থা এইরূপ;—

"উদ্‌ঘূর্ণা, বিবশ-চেষ্টা—দিব্যোন্মাদ-নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, আপনাকে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।৬১)

উক্ত শ্লোকে মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত-কৃষ্ণ-সেবাময়ী পরম চমৎকারিণী সর্ব্বোত্তমাবস্থা দৃষ্ট হয়। শ্রীল রঘুনাথদাস তাঁহার রচিত "গৌরাঙ্গ-স্তব কল্পবৃক্ষ"-গ্রন্থে মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহে প্রলাপোন্মাদময় দশা বর্ণনা করিয়াছেন,—

"স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদ সদৃশ-গোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপান্মুন্মাদাৎ সতত মতি কুর্ব্বন্ বিকলধীঃ।
দধদ্‌ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষাতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি।"

উক্ত শ্লোকের 'অমৃতপ্রবাহভাষ্যে' শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"নিজের অসংখ্য প্রাণসদৃশ ব্রজের বিরহক্রমে প্রলাপোন্মাদ জন্মিলে সর্ব্বদা সেই চেষ্টা অধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বিকলবুদ্ধি গৌরচন্দ্র অনুদিন স্বীয় চন্দ্রবদন ভিত্তিতে ঘর্ষণপূর্ব্বক ক্ষতোত্থ রুধির ধারণ করিতেন। এবম্বিধ গৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মাদিত করিতেছেন।"

শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তাঁহার রচিত "শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্"-গ্রন্থে ১৩৪ শ্লোকে মহাভাবোন্মত্ত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"ক্ষণং হসতি রোদিতি ক্ষণমথ ক্ষণং মূর্চ্ছতি
ক্ষণং লুঠতি ধাবতি ক্ষণমথ ক্ষণং নৃত্যতি।

ক্ষণং শ্বসিতি মুঞ্চতি ক্ষণমুদার হা হা রুতিং
মহাপ্রণয়সীধুনা বিহরতীহ গৌরো হরিঃ ॥"

"শ্রীগৌরহরি মহাভাবামৃত-রসে মগ্ন হইয়া কখনও হাস্য করিতেছেন, কখনও রোদন করিতেছেন, কখনও মূর্চ্ছিত হইতেছেন, কখনও ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন, কখনও দ্রুত গমন করিতেছেন, আবার কখনও নৃত্য করিতেছেন, কখনও দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, কখনও বা 'হা' 'হা' এইরূপ মহৎ শব্দ করিতেছেন, (ঈদৃশ নানাভাবে) প্রপঞ্চে বিহার করিতেছেন।"

লেখক অজ্ঞতাবশতঃ মহাপ্রভুর মহাভাবোন্মাদ-দশাকে বুঝিতে অসমর্থ হইয়া মৃগীরোগ বা বায়ুরোগ বলিয়া তাঁহার পুস্তকে বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন, —ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। 'চৈতন্যচরিতামৃত' পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিলে লেখক তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিবেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

মর্ম্মভেদী কান্না

"নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় কোটীচন্দ্রাননদ্বিষে।
প্রেমানন্দাব্ধিচন্দ্রায় চারুচন্দ্রাংশুহাসিনে ॥"
"বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং মনোহরাম্।
লৌকিকীমপি তামীশচেষ্টয়া বলিতান্তরাম্ ॥"

পাগল ছেলে! সকাল থেকেই কেঁদে চলেছে, মা আর সামলাতে পারছেন না। কি করে পারবেন? কিসের জন্য ছেলেটি যে কাঁদছে তাইত' তিনি জানেন না, কোন কিছুরইত' অভাব রাখেননি তাঁরা। তবে?

পাড়া-প্রতিবেশী সবাই ছুটে এসেছেন। সকলের প্রিয় ঐ ছোট্ট ছেলেটাকে দেখলেই যে চুম্বন করতে ইচ্ছে করে! ও ত' সকলের আদর সোহাগ মাখানো স্নেহ-চুম্বনের অধিকারী। আজ তাকে আঘাত করল কে?

"সর্ব্ব অঙ্গ-সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ-প্রতিমা-ভান,
সর্ব্বঅঙ্গ—সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্যজ্যোতি, দেখি' পাইল বহু প্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয়॥" (চৈঃ চঃ আঃ ১৩।১১৬)

কান্নার মধ্যে কতখানি কারুণ্য! কতখানি আর্ত্তি! প্রতিটি মুহূর্ত্তে ঐ মর্ম্মভেদী কান্না যেন প্রতিবেশীদের অবিচলিতভাবে কৌতূহল-পরবশ করে

তুলছে। জনৈকা প্রতিবেশীনির হঠাৎ 'হরি' 'হরি' ধ্বনি উচ্চারণ করা মাত্রই আশ্চর্য্যভাবে সকলের অবাকের পরিমাণকে উচ্চ শীর্ষে পৌঁছে দিয়ে পাগল ছেলের মর্ম্মভেদী কপট কান্না এক মুহূর্ত্তেই বন্ধ হয়ে যায়। সকলেই স্তম্ভিত!

তবে কি হরিনাম-কীর্ত্তনই শিশুকান্না বন্ধ করবার একমাত্র ঔষধ? হ্যাঁ, ঠিক তাই, যখনই কাঁদতো ছেলেটি, সবাই মিলে হরিনাম গ্রহণ করতেন, তাতেই কান্না বন্ধ হতো।

নদীয়ার সেই পাগল ছেলে শ্রীজগন্নাথসুত বিশ্বম্ভরের কথাই বলছি। ছোটবেলায় সবাই বলতো পাগল বিশ্বম্ভর। কিন্তু সত্যিকারের পাগল নয়, কপট পাগলামি। সে পাগলামির কথা শুনলে আমরা সবাই হাসব হয়ত'। কেননা, মানুষ অপরের রূপে পাগল হয়, কিন্তু বিশ্বম্ভর নিজের রূপে নিজেই পাগল হয়েছিলেন। নিজের অঙ্গ-সৌরভ আঘ্রাণ ও নিজের রূপ-সৌন্দর্য্যকে আস্বাদন করবার লোভে চতুর শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত বিশ্বম্ভররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

সেই রাধায়িত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণায়িত রাধা শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য পাগল হয়েছিলেন। সে কী কান্না! কতখানি মর্ম্মভেদী! শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে বিরহী উন্মাদ শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে প্রকাশ হয়েছিল অষ্টসাত্ত্বিক বিকার—অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্চ্ছা, স্বেদ, স্তম্ভ, পুলক ও হুঙ্কার। কি হৃদয় আকুল করা বেদনা! ভাষায় বর্ণনা করা আমার মত নরাধমের ক্ষমতা না থাকলেও শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ তাঁদের অহৈতুক ভক্তিপূর্ণ পবিত্র হৃদয় দিয়ে একটুখানি উপলব্ধি করতে পারেন নিশ্চয়ই। "হুঙ্কার, গর্জ্জন, কম্প, পুলক, ক্রন্দন।
নিরন্তর আছাড় পড়য়ে ঘন ঘন॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৪।১০)

সমস্ত স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে অন্তরালে রেখে কপট চাতুর্য্যের আশ্রয় নিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ। দেখিয়েছিলেন—কতখানি ভগবানের জন্য কাঁদতে পারলে ভক্তিদেবী তাঁর মায়াবরণ খুলে দেন। মা যখন শিশুকে মারে, আর শিশু নিজকে অসহায় একা মনে করে—যেভাবে যতখানি কারুণ্য-আর্ত্তি নিয়ে কাঁদে, ঠিক তেমনি করে ভগবানের জন্য ভগবদ্বিশ্বাস নিয়ে কাঁদতে হবে। মর্ম্মভেদী কান্না! হৃদয়-বিদারী ভক্তি-সূঁচের মত। ঠিক ভালবাসার জন্য কাঁদা, এমন ভালবাসা যে একমুহূর্ত্ত তাঁকে ছাড়া থাকাই যায় না। তাইত' ভক্ত কেঁদে বলে,—

এ সখি! হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর,　　মাহ ভাদর,
শুন মন্দির মোর॥

কী করুণার্ত্তি! ভক্তমনে এক অসাধারণ উন্মাদনার সঞ্চার করে। এক বিশেষ মুহূর্ত্ত ও পরিবেশে এক বিশেষ ভক্তের চিত্তচাঞ্চল্য, সুরে ও ছন্দে, ভাবে ও ভাবনায় এমনভাবে উদ্ঘাটিত যে একটা প্রাণ-নিঙড়ানো, বুক-নিঙড়ানো যন্ত্রণা, গুমরে গুমরে উঠে দেহের সমস্ত অস্থি-সন্ধিগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। আত্ম-স্বীকৃতির জন্য মিলনের মদির মুহূর্ত্ত থেকে বিরহের এই মদনার্ত্ত প্রহরের প্রয়োজন বেশী যেন অনেকগুণে।

রাধায়িত কৃষ্ণ যেন কৃষ্ণকেই পাওয়ার জন্য এপার থেকে ওপারে ছুটে চলেছেন। ভক্তের গলা জড়িয়ে সে কী আকুল মর্ম্মভেদী কান্না!

"সই, কত না রাখিয়া হিয়া।
আমার বঁধুয়া আনবাড়ি যায়, আমার আঙিনা দিয়া॥"

শেষে সব কান্না থেমে যায়। হতাশ হয়ে পড়েন শ্রীগৌরাঙ্গ, কৃষ্ণ-বিরহের প্রগাঢ় বেদনা এক তীব্র নৈরাশ্য সৃষ্টি করে। বলে ওঠেন—

"সুখের লাগিয়া, এঘর বাঁধিনু,
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল॥"

সেই যে মর্ম্মভেদী কান্না—ছোটবেলায় সমস্ত পাড়াপ্রতিবেশীকে আকুল করে তুলত'—বেদনায় ভুগতে থাকতেন শচীমাতা সেই কান্নায়। শ্রীকৃষ্ণ বিরহের সেই যন্ত্রণায় সারাটা জীবন ছট্‌ফট্ করতে করতে একদিন শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে অন্তর্দ্ধান করেন। ভক্তবৃন্দ কেঁদে বলে ওঠেন,—

"পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর কাছে একান্ত প্রার্থনা, ভগবানের জন্য যেন সেই মর্ম্মভেদী কান্না কাঁদতে পারি। জড় সংসারের কুটিল মায়াজালে বদ্ধ না হয়ে যেন ভগবানের ভালবাসার জালে বদ্ধ হতে পারি। যেন বলতে পারি,—

"আমি—কৃষ্ণপদদাসী; তিঁহো—রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেয় দরশন, না জানে মোর প্রাণ-মন,
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতধৃত শিক্ষাষ্টক ৮)

—শ্রীমতী কুহু বেরা, অমর্ষি (মেদিনীপুর)

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুচারুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪২শ বর্ষ | ১৪ নারায়ণ, বাসুদেব, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ | ২৯ অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৯৭, ইং ১৬।১২।৯০ | ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীচতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মকৃতা শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তুতিঃ

শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বৃন্দাবনখণ্ডে শ্রীনারদ-বহুলাশ্ব-সংবাদে
ব্রহ্মস্তুতৌ নবমেঽধ্যায়ে]

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

১৩-১৪। বক্ত্রৈশ্চতুর্ভিস্ত্বহমেব দেবঃ
শ্রীপঞ্চবক্ত্রঃ কিল পঞ্চবক্ত্রৈঃ
সহস্রশীর্ষাস্তু সহস্রবক্ত্রৈ-
র্যস্তৌতি সেবাং কুরুতে চ তস্য ॥ ১৩ ॥
বিষ্ণুশ্চ বৈকুণ্ঠনিবাসকৃচ্চ
ক্ষীরোদবাসী হরিরেব সাক্ষাৎ।

নারায়ণো ধর্ম্মসুতস্তথাপি
গোলোকনাথং ভজতে ভবন্তম্ ॥ ১৪ ॥

আমি চারি মুখে, দেব পঞ্চানন পঞ্চবদনে, সহস্রবদন অনন্ত সহস্রমুখে যাঁহার স্তব করিয়া সেবা করেন; বৈকুণ্ঠবাসী বিষ্ণু ক্ষীরোদশায়ী সাক্ষাৎ হরি এবং ধর্ম্মসুত নারায়ণ সেই গোলোকপতি আপনার সেবা করিয়া থাকেন ॥ ১৩-১৪ ॥

১৫। অহোতিধন্যো মহিমা মুরারে-
র্জানন্তি ভূমৌ মুনয়ো ন মানবাঃ।
সুরাসুরা বা মনবোঽবুধাঃ পুনঃ
স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি ন তৎপদদ্বয়ম্ ॥ ১৫ ॥

অহো মুরারির মহিমা ধন্য; ভূতলে সে মহিমা মুনিগণই জানেন, মানবে নহে। অজ্ঞ মনুষ্যগণ, সুর, অসুর,—ইহারা স্বপ্নেও তদীয় পাদপদ্ম দর্শনে অসমর্থ ॥ ১৫ ॥

১৬। বরং হরিং গুণাকরং সুমুক্তিদং পরাৎপরম্।
রমেশ্বরং গুণেশ্বরং ব্রজেশ্বরং নমাম্যহম্ ॥ ১৬ ॥

গুণাকর, মুক্তিদ, পরাৎপর, রমেশ, গুণেশ, ব্রজেশ্বর, পরমাত্মা শ্রীহরিকে নমস্কার করি ॥ ১৬ ॥

১৭। তাম্বুল-সুন্দরমুখং মধুরং ব্রুবন্তং
বিম্বাধরং স্মিতযুতং সিতকুন্দ-দন্তম্।
লীলালকাবৃত-কপোল-মনোহরাভং
বন্দে চলৎ-কনককুণ্ডল-মণ্ডলাহম্ ॥ ১৭ ॥

তাম্বুলরাগে সুন্দরবদন, মধুরভাষী, বিম্বাধর ঈষৎ হাস্যযুক্ত কুন্দকুসুমবৎ সুন্দরদন্ত, লীলালকাবৃত-কপোল, মনোহর কান্তি, দোদুল্যমান কুণ্ডলে মণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥ ১৭ ॥

১৮। সুন্দরন্তু তব রূপমেব হি
মন্মথস্য মনসো হরং পরম্।
আবিরস্তু মম নেত্রয়োঃ সদা
শ্যামলং মকর-কুণ্ডলাবৃতম্ ॥ ১৮ ॥

হে কৃষ্ণ! তোমার পরম সুন্দররূপ মন্মথেরও রূপ হরণ করে; আমার নেত্রে সর্ব্বদা মকর-কুণ্ডলাবৃত শ্যাম-কলেবর কৃষ্ণ আবির্ভূত হউন ॥ ১৮ ॥

১৯। বৈকুণ্ঠ-লীলা-প্রবরং মনোহরং
নমস্কৃতং দেবগণৈঃ পরং বরম্।
গোপাল-লীলাভিযুতং ভজাম্যহং।
গোলোকনাথং শিরসা নমাম্যহম্॥ ১৯॥

দেবগণ সর্ব্বোত্তম বৈকুণ্ঠ-লীলাপ্রবর মনোহর রূপের নমস্কার করেন। আমি গোপাল-লীলাযুক্ত গোলোকনাথকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া ভজনা করি॥ ১৯॥

২০। যুক্তং বসন্ত-কলকণ্ঠ-বিহঙ্গমৈশ্চ
সৌগন্ধিকঃ তরুণপল্লব-শাখিসঙ্গম্।
বৃন্দাবনং সুধিত-ধীর-সমীরলীলং
গচ্ছন্ হরির্জয়তি পাতু সদৈব ভক্তান্॥ ২০॥

বসন্তকালের কোকিলাদি কলকণ্ঠ বিহগযুক্ত, সুগন্ধময়, তরুণ-পল্লবযুক্ত বৃক্ষাবৃত, সুধোপম ধীরসমীর সম্পর্কিত বৃন্দাবনে বিচরণ করিয়া কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন এবং সর্ব্বদা ভক্তগণকে রক্ষা করুন॥ ২০॥

২১। হরতি কমলমানং লোলমুক্তাভিমানং
বরনিরসিক-দানং কামদেবস্য বাণম্।
শ্রবণ-বিদিতযানং নেত্রযুগ্ম-প্রয়াণং
ভজয়তুত-সমক্ষং দানদক্ষং কটাক্ষম্॥ ২১॥

তোমার কর্ণান্ত-বিশ্রান্ত নেত্রদ্বয় কমলের মান হরণ করে, দোলায়মান মুক্তার অভিমান দূর করে; তোমার রসিকতা ধরণীর যাবতীয় রসিকের পরাভব করে; আর তোমার কটাক্ষ কাম-বাণকে তিরস্কৃত করে। আমি সেই সকল ভজনা করিব॥ ২১॥

২২। শরচ্চন্দ্রাকারং নখমণিসমূহং সুখকরং
সুরক্তং হৃৎপূর্ণং প্রকটিততমঃ-খণ্ডনকরম্।
ভজেঽহং ব্রহ্মাণ্ডে সকলনর-পাপাভিদলনং
হরের্বিষ্ণোর্দৈবৈর্দিবি ভারতখণ্ডে স্তুতমলম্॥ ২২॥

যাঁহার নখমণিসমূহ শরচ্চন্দ্রাকার সুখকর সুরক্ত হৃদয়গ্রাহী, গাঢ়ান্ধকার-হারী, জগতের সর্ব্ববিধ পাপহারী, ভারতখণ্ডে ও স্বর্গে দেবতাগণ বিষ্ণু শ্রীহরিরূপের স্তব করেন, আমি তাঁহাকে ভজনা করি॥ ২২॥

২৩। মহাপদ্মে কিংবা পরিধিরিব চাভাতি সততং
কদাদিত্যস্ফূর্জ্জদ্রথ-চরণ ইত্থং ধ্বনিধরম্।
যথান্যস্তং চক্রং শতকিরণযুক্তং তু হরিণা
স্ফুরচ্ছীমঞ্জীরং হরিচরণপদ্মে ত্বধিগতম্॥ ২৩॥

তোমার পাদপদ্মের সর্ব্বদা শব্দায়মান কিরণযুক্ত হরি-চক্রাকার নূপুর হইতে যে পরিধির ন্যায় ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহা কি শতকিরণযুক্ত সূর্য্য-রথ-চক্রের পরিধি? অথবা তোমার পাদপদ্মের পরিধি? ২৩॥

২৪। কট্যাং পীতাম্বরং দিব্যং ক্ষুদ্রঘণ্টিকয়ান্বিতম্।
ভজাম্যহং চিত্তহরং কৃষ্ণস্যাক্লিষ্ট-কর্ম্মণঃ॥ ২৪॥

যাঁহার কটিতে ক্ষুদ্র ঘণ্টাযুক্ত দিব্য পীতাম্বর, আমি অক্লিষ্টকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের সেই মনোহর রূপের ভজনা করি॥ ২৪॥

ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব

ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্বের সোপান

অনেকে মনে করেন যে ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম। সেই বিশ্বাস হইতে মূঢ়লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণবত্বের পক্ষপাতী হইয়া ব্রাহ্মণত্বের নিন্দা করেন। কেহ কেহ বা ব্রাহ্মণত্বের পক্ষপাতী হইয়া বৈষ্ণবত্বের নিন্দা করেন। শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষেরা তাহা করেন না। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণত্বই বৈষ্ণবত্বের অধিকার বা সোপান এবং বৈষ্ণবত্বই ব্রাহ্মণের ফল। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"সহজ নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসতি এই যোগ্যস্থান হয়॥
মাৎসর্য্য চণ্ডালে কেন ইহা বসাইলে।
পরমপবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে॥"

জীবের নির্ম্মল হৃদয়ের নাম ব্রাহ্মণত্ব। কৃষ্ণভক্তি নির্ম্মল হৃদয়েই বসতি করেন।

মাৎসর্য্য প্রেমের বিরুদ্ধ এবং মাৎসর্য্যপর ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নহেন

সেই হৃদয়ে যদি মাৎসর্য্য চণ্ডাল স্থান-লাভ করে, তাহা হইলে কৃষ্ণভক্তি তিরোহিত হন। তখন আর সেই ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ব থাকে না। পরসুখে দুঃখী ও পরদুঃখে সুখী হওয়ার নাম মাৎসর্য্য। মাৎসর্য্য ও প্রেম পরস্পর বিরুদ্ধ। যেখানে মাৎসর্য্য, সেখানে প্রেম নাই। যেখানে প্রেম, সেখানে মাৎসর্য্য নাই। মাৎসর্য্যশূন্য হৃদয় ব্রাহ্মণত্বের একমাত্র পরিচয়। তাহা প্রেমের অবশ্য বসতি-ভূমি।

ব্রাহ্মণের লক্ষণ

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রাহ্মণত্বের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন,—

"শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্॥"

যিনি ব্রাহ্মণ, তাঁহার এই একাদশটী লক্ষণ অবশ্য আছে। শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, অচ্যুত-ভক্তি ও সত্য যে-ব্যক্তিতে নাই, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। এই প্রকার ব্রাহ্মণের হৃদয়ে কৃষ্ণতত্ত্ব দেদীপ্যমান হইয়া সর্ব্বদা বিরাজ করেন। যাঁহার কৃষ্ণভক্তি হইল না, তাঁহার সুতরাং ব্রাহ্মণত্ব হয় নাই।

গুণের দ্বারাই ব্রাহ্মণের পরিচয়, জাতির দ্বারা নহে,

নারদ বলিয়াছেন,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

এই শ্লোকটীর টীকায় শ্রীধরস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতি-মাত্রাদিত্যাহ যস্যেতি। যদ্যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেৎ তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতি-নিমিত্তেনেত্যর্থঃ॥"

এই সমস্ত পারমার্থিক শাস্ত্রবচন এবং মন্বাদি সংসারনির্ব্বাহী স্মৃতিবচন অনুশীলন করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ দুইপ্রকার, অর্থাৎ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। ব্যবহারিক ব্রাহ্মণত্ব কেবল জাতিনিবন্ধন এবং পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব গুণ-নিবন্ধন।

পারমার্থিক ব্রাহ্মণ না হইলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না

বৃহদারণ্যকে পারমার্থিক ব্রাহ্মণের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন ;—

এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।
অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥

নিষেকাদি শ্মশানান্ত দশবিধ ব্যবহার ক্রিয়া। সেই সকল ক্রিয়াতে ব্যবহারিক ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা স্মৃতি-শাস্ত্রে লিখিয়াছেন। দীক্ষা, উপাসনা, সন্ন্যাস ও ভজনাঙ্গ ব্রতাদি সম্বন্ধে পারমার্থিক ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা। **পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে না পারিলে বৈষ্ণবত্ব লাভ করা যায় না।** তৎসম্বন্ধে বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন,—

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।

চিদচিদীশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ প্রজ্ঞা অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলন করিবেন।

এই সমস্ত শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত বিচার করিয়া আমরা নিশ্চয় জানিতে পারিতেছি যে, উন্নতিগর্ভ, ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্বে ভেদ নাই। **ব্রাহ্মণত্ব লাভ করত উদিতশ্রদ্ধ হইলেই জীব কৃত-কৃত্য হইয়া ভক্তি লাভ করেন।**

ভগবানকে লাভ করিতে হইলে জাতি-ব্রাহ্মণ হইবার আবশ্যক নাই

অনেকের মনে জড়ভরতাদির উদাহরণ দৃষ্টি করিয়া একটী সংশয় হয়। যে, নীচবর্ণের ভক্তি হইলেও পরাগতি লাভের জন্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মের প্রয়োজন হয়। এতৎসম্বন্ধে শ্রীভগবদ্গীতার সিদ্ধান্তবাক্যই সর্ব্বদা আলোচনীয়। তদ্‌যথা ;—

মাং হি পার্থ! ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় জন্মে যদি তীব্র ভক্তির উদয় হয়, তাহা হইলে যে জীব উদ্ধার হইবে ইহাতে আর সন্দেহ কি? কেননা স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ পাপযোনিপ্রাপ্ত চণ্ডালাদি সকলেই আমার শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করিয়া পরাগতি লাভ করে।

ভজন-প্রভাবে দুর্জ্জাতিত্ব নষ্ট হইয়া পারমার্থিক ব্রাহ্মণ হয়

যে দুইটী বচন উদ্ধৃত করা হইল তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বস্থিত দুইটী বচনের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে আর কোন প্রকার সন্দেহ থাকিবে না।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

এই দুই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই, সাধারণতঃ জীবগণ ব্রাহ্মণত্ব-সম্পন্ন হইয়া ভক্ত বা বৈষ্ণব হইয়া থাকেন। যদি কোন ব্যক্তি সাধুসঙ্গ-বলে ব্রাহ্মণত্ব সম্পত্তির পূর্ব্বেই অনন্যভক্তি লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাকেও সাধু বলিয়া স্থির করিতে হইবে। কেননা, মৎকৃপায় অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি ধর্ম্মাত্মা অর্থাৎ **ভক্ত্যধিকার-যোগ্য ব্রাহ্মণত্ব ভক্তির আনুসঙ্গিক ফল ক্রমেই** লাভ করিবেন। হে কৌন্তেয়! তাঁহার পুনর্জ্জন্মাদি-রূপ পতন কখনই হইবে না, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা। এই জন্মেই আমি তাঁহাকে বিনা প্রায়শ্চিত্তে বিশুদ্ধ পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব দিয়া প্রেম প্রদান করিব।

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ

হে পাঠকবর্গ! ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্বের ভেদ করিবেন না। ব্রাহ্মণ স্বভাবতঃ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অধিকারী। এতন্নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শুদ্ধ-ভক্ত্যধিকারী ব্রাহ্মণদিগকে এতদূর সম্মান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণসকলের একান্ত কৃপা লাভ করিলে আমরা শুদ্ধ হইতে পারি। ব্রাহ্মণত্বের অবজ্ঞা করিয়া কেহ বৈষ্ণব হইতে পারে না এবং বৈষ্ণবত্বের অবজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্মণ কখনই চরিতার্থ হইতে পারেন না। অতএব ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের যেরূপ স্বভাব-সিদ্ধ ভ্রাতৃত্ব, তাহাই জগতে প্রোদীপ্ত হউক। স্বার্থপরতা ও মূর্খতা প্রবেশ করত যেন তাঁহাদের মধ্যে বৈর-ভাব উৎপন্ন না করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রাহ্মণ-সম্মান জগতে বিস্তৃত করিবার জন্য ব্রাহ্মণ-চরণামৃত পানদ্বারা স্বীয় জর-লীলার অন্ত্য করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ আমাদিগকে কৃপা করুন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ধান্য ও শ্যামা

ধান্য ও শ্যামা এই দুই প্রকার গাছের অনেকটা সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু ধানগাছ হইতে ফলকালে ধান পাওয়া যায় এবং শ্যামাগাছ হইতে ফল-কালে শ্যামাগাছের বীজ পাওয়া যায়। ধান হইতে চাউল উৎপন্ন হয়। চাউল বিষ্ণুনৈবেদ্যে লাগে। নৈবেদ্য-প্রসাদ বৈষ্ণবের শরীরকে পুষ্ট করিয়া হরিভজনের উপযোগী করায়। শ্যামাঘাস ধানগাছের সহিত একত্র উৎপত্তি লাভ করিলেও ধানগাছের উপকারের জন্য সেইগুলিকে প্রথমমুখে অপসারিত করিতে হয়। শ্যামাগাছের উচ্ছেদ সাধন না করিলে ধান্যক্ষেত্রের সমৃদ্ধি হয় না। যদি ধান্য-ক্ষেত্রে শ্যামা প্রবল হইয়া যায় এবং উপযুক্ত সময়ে নিড়াইয়া না দেওয়া হয়, তাহা হইলে ধান্যরোপণকারীর অভীষ্টসিদ্ধি-লাভে ব্যাঘাত ঘটে। শ্যামাগাছ বড় হইয়া ধানগাছের ক্ষতি করে, আবার শ্যামার বীজ প্রপক্ক হইয়া ভবিষ্যতে ধান্যক্ষেত্রের ভূমিকে পুনরায় বিপদ্‌সঙ্কুল করে। শ্যামার প্রপক্ক বীজ ভূমিতে পড়িয়া থাকায় পরবর্ষে ধান্যের আবাদকালে শ্যামার অনেকগুলি গাছ হয়। যে কৃষক ধান্যলাভের আশা করেন, তিনি ধান্যরোপণ করিবার অব্যবহিত পরেই শ্যামাগুলিকে উৎপাটিত করিবেন, না করিলে শ্যামার বীজ ভূমিতে পড়িয়া শ্যামাগাছের উৎপত্তি করাইবে। কৃষকের পরিশ্রম ও খরচ বাড়িয়া যাইবে। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কার্য্যারম্ভ, ও কার্য্যে প্রবৃত্তির পূর্ব্বে সাবধান হওয়াই আবশ্যক। যিনি সতর্কতায় অমনোযোগ করেন, তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির বড়ই ব্যাঘাত হয়। শ্যামাঘাসের বীজ ভগবন্নৈবেদ্যে লাগে না এবং তাদৃশ দ্রব্য বৈষ্ণবগণের ভজনের অনুকূল নহে। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের জন্য যাবতীয় সৃষ্টি। সুতরাং ধান্যের উৎকর্ষ-সাধন আবশ্যক ও শ্যামাগাছের উৎসাদন সর্ব্বতোভাবে ভজনের অনুকূল।

শ্রীগৌরসুন্দর ভোগাসক্ত জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশ্যে হরিকীর্ত্তনের উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর বদ্ধজীবের চরম কল্যাণ লাভের জন্য হরিভজনের উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের নির্ম্মল সেবার স্বরূপ আবৃত করিবার জন্য বিমুখ জীবের বিমোহিনী শক্তি অবিদ্যা শ্রীগৌর-সুন্দর হইতে প্রকট লাভ করিয়া বদ্ধজীবকে গৌরসেবার নামে শ্রীগৌরাঙ্গকে পার্থিব ভোগের বস্তু মনে করাইয়া সেবার পরিবর্ত্তে শ্রীগৌরাঙ্গের উপর প্রভুত্ব করে। কৃষক যেরূপ অনভিজ্ঞ হইলে শ্যামাঘাসকে ধানগাছ মনে করে, কৃষক

যেরূপ ক্ষীণদৃষ্টি হইলে শ্যামার পরিবর্ত্তে ধান গাছের উৎপাটন করে, সেইরূপ জীব অবিদ্যাগ্রস্ত হইলে বিবর্ত্ত বা ভ্রমে পতিত হন। তিনি তখন সত্যবস্তু বুঝিতে না পারিয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া ধারণা করেন। সত্যবস্তুকে অসত্য বলিয়া ভ্রম হইলে অভীষ্টলাভ ঘটে না, কার্য্য পণ্ড হইয়া যায়। যাঁহারা অভিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ হইয়া কার্য্যনিপুণ, তাঁহাদিগের আনুগত্যই একমাত্র সিদ্ধির কারণ। অন্যথা অনভিজ্ঞতা ও অক্ষমতা আমাদিগের কোন সুবিধা করিতে দেয় না। অধিরোহবাদ অবলম্বন করিয়া জীব কৃষ্ণবিমুখ হন। অবতারবাদ-আশ্রয়েই জীব কৃষ্ণোন্মুখ হন। কৃষ্ণোন্মুখ জীবগণই আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া জানেন। মন্দভাগ্য বদ্ধজীব অধিরোহবাদীকে গুরু বলিয়া স্থাপন করেন। তাহাতে তাঁহার মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, কণ্টকাকীর্ণ পথেই চলিতে হয়। অধিরোহ-বাদী গুরুর শিষ্য অধিরোহ-প্রথা অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুভক্তি হইতে অচিরেই বিচ্যুত হন। অধিরোহ-বাদের ক্রমিক্রমে প্রথম-মুখেই শ্রীগুরুদেব ভ্রান্ত। 'আমাকেই গুরুদেবকে দুরস্ত করিতে হইবে'—এই বিচার প্রবল হয়। অধিরোহ-বাদের গুরু তখন বিষম সঙ্কটে পড়েন। ভগবদ্ভক্তিতে অধিরোহ-বাদের কোন আশঙ্কাই নাই। সেখানে বিষ্ণু বা অবতারবাদ প্রবল।

নিরন্তকুহক সত্যবস্তু পরমেশ্বরের সেবায় শ্রীবৈষ্ণব গুরু অধিষ্ঠিত। অধিরোহ-বাদের কুহক বা মায়া সেখানে যাইতে পারে না। তবে বৈষ্ণবের গুরুগিরি করিবার প্রার্থী অধিরোহবাদ অবলম্বন করিয়া আপনাকে অবতারবাদী বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া যে ন্যায়রহিত উক্তি করেন, এবং যে শিষ্য অন্যায়-পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করেন, তাহারা উভয়েই অচ্যুত গোত্র হইতে চ্যুত হইয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে হরিবিমুখ হইয়া যান—বংশপরম্পরাগত শ্যামাঘাসের বীজধারা সংরক্ষণ করেন মাত্র। শ্যামাঘাসের উত্তরোত্তর উন্নতিক্রমে ধান্যক্ষেত্র আর ধান উৎপন্ন করিতে পারে না। ভক্তির পথ কলিহত বুদ্ধিতে অধিরোহবাদের অধীন হইয়া পড়ে, তাদৃশ ভক্তিকে 'মিছাভক্তি' শব্দে মহাজনগণ বলিয়া থাকেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত 'সব্যলীক ভগবদাশ্রয়', গীতা 'সকামোপাসনা', বেদান্ত 'কর্ম্মবাদ' প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রদান করেন।

অধিরোহবাদে গুরু করিবার প্রথা থাকিলেও তাহা অবিদ্যাজনিত অর্থাৎ তাহা সত্য নহে—পরিবর্ত্তন যোগ্য। অধিরোহবাদ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনময়। অধিরোহপ্রথায় যিনি গুরু হন তিনি পূর্ব্বগুরুদিগের কথিত সত্যবস্তুকে বিকৃত করেন, কেননা পরিবর্ত্তনই তাহার স্বভাব। অধিরোহবাদে গুরু অনিত্য,

শিষ্যও অনিত্য এবং তাঁহাদের উপদেশও অনিত্য। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ঐ সম্বন্ধ অনিত্য অর্থাৎ কালপ্রভাবে সেই সম্বন্ধ নিশ্চয়ই বিচ্যুত হইবে ইহা তাঁহারাও জানেন। নিত্যসত্য ঐরূপ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যে অবিদ্যা-মুক্ত নিরন্তকুহক সত্য ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিত করিয়াছেন, যাহা ব্রহ্মা দেবর্ষিকে অবিমিশ্রভাবে নিত্যকাল প্রদান করিতেছেন, যাহা নারদ শ্রীব্যাসকে দিয়াছেন, শ্রীব্যাস যাহা নিত্যকাল শ্রীমধ্বমুনিকে দিতেছেন, শ্রীমধ্বমুনি যাহা শ্রীঈশ্বরপুরী এবং শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতপ্রমুখ ঈশ্বরবস্তুতে প্রদান-লীলার অভিনয় করিতেছেন—শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রকৃত গুরুদেব যে নিত্যসত্যের সর্ব্বদা অবস্থিত, তাহার মধ্যে কোন বিবর্ত্ত বা ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা নাই—ইহাই অবতার-বিচার, ইহা অধিরোহের প্রতিকূল। অবতারবাদী বৈষ্ণবগণ নিত্যসত্যের আশ্রিত। অধিরোহবাদী প্রাকৃত বীরগণ নিজ নিজ পূর্ব্বগুরুদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন মাত্র। তাঁহারা নিত্যসত্য গ্রহণে পরাঙ্মুখ।

বর্ত্তমান সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের আজ্ঞার ছলনায় যাঁহারা অধিরোহবাদ অবলম্বন করিয়া হরিকীর্ত্তনের নামে জড়ভোগবাদ প্রচার করেন, তাঁহারা 'বৈষ্ণব' শব্দবাচ্য নহে—প্রকৃতপ্রস্তাবে কপটী বা মিছাভক্ত। তাঁহারা যাহা কিছু প্রচার করেন, তাহা 'ভক্তি' শব্দবাচ্য নহে বা ভক্তিপ্রচার নহে। অনভিজ্ঞ সমাজকে ভ্রমপথে লইয়া যাইতে সকল অবৈষ্ণবেরই অধিকার আছে। শুদ্ধ বিষ্ণুভক্ত তাদৃশ দৌরাত্ম্যের প্রশ্রয় দেন না। তাঁহারা পূর্ব্ব মহাজনের সকল কথাই নিজের আচরণ বলিয়া জানেন। যেখানে পূর্ব্ব মহাজনের আচরণ উল্লঙ্ঘিত হইয়া ভোগপিপাসা প্রবল হইয়াছে, তথায় হরিবিমুখতামাত্র অবস্থান করে। শ্যামাঘাসকে যদি আমরা ধানগাছ মনে করি এবং ধানগাছকে যদি আমরা শ্যামাঘাস মনে করি, তাহা হইলে আমাদের হরিসেবার পরিবর্ত্তে হরিদ্বারা অবিদ্যার সেবা করাইয়া লওয়া হয়।

প্রচার-উদ্দেশে অবতারবাদের প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহা কিছু প্রচারিত হয় তাহা কলিজনোচিত। আমরা তাদৃশ প্রচারের পক্ষপাতী নহি। অসংখ্য অধিরোহবাদী জগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আবাহন করিবেন। তাহাকে আমরা শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান বলিব না। তাহা বিষয়কথা বা গ্রাম্যকথা নামে দৃঢ়রূপে জানিব। শাস্ত্র-গুরু ও বাক্যই আমাদের অবলম্বন হউক। আমরা শাস্ত্র ও গুরুর নিকটই মাধুকরী করিব। ভোগপর কর্ম্মীর নিকট মাধুকরী করিব না।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

আশ্রমীয় অনুশাসন মানিয়া লওয়াই শিষ্টাচার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ
ইং ১।৬।১৯৬৩

স্নেহাস্পদেষু—

* * * মহারাজ! * * * * মহারাজ "নগ্নমাতৃক" ন্যায়ানুসারে সন্ন্যাসী হইয়াও গৃহস্থাশ্রমের নাম ব্যবহার করায় একপ্রকার অপরাধী। তাঁহার পুস্তকে ঐরূপ নাম ব্যবহার করায় আমরা ইতঃস্তত চিন্তার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি।

দুই নৌকায় পা দেওয়া বৈষ্ণবশাস্ত্রের বিরুদ্ধ। সুতরাং এইসব বিষয় আমার ব্যক্তিগতভাবে মীমাংসা হইয়া গেলে পরে পত্রের উত্তর দিব। তাহা ছাড়া বইখানা পড়িবার সময় এখনও পাই নাই। শীঘ্রই তাহা দেখিতে চেষ্টা করিব। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দের আদলে

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪৬ পৃষ্ঠার পর]

অশ্রুমুখী শ্রীরাধার এরূপ বিনয়োক্তি শ্রবণ করে শ্রীকৃষ্ণ স্নেহে স্বয়ী পীতাম্বরের অঞ্চলদ্বারা তাঁর চোখের জল মুছায়ে সুমধুর বাক্যে বললেন,—'হে সুমুখি! তুমি কেন এত ভীতা হয়েছ? তুমি যাঁর জন্য ভয় করছ, সে আয়ান আমারই অংশ, ক্ষুদ্র মানুষ নয়।' রাধা তথাপি তাতে অসম্মত হলে ভগবান্ তাঁকে পুনরায় বললেন,—'হে রাধে! এ বিষয়ে আমি এক উপায় বলছি, তা শুন। মামা আয়ানের বিবাহোৎসব দর্শনের জন্য আমি মায়ের সাথে গমন করে বিবাহের সময় মামা আয়ানের কোলে বসব। এরূপে বিবাহ

অনুষ্ঠানে আমি থেকে তোমার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হব। লোকে জানবে —রাধার সাথে আয়ানের বিবাহ হল; কিন্তু তোমার আমার পরম গোপনীয় তত্ত্ব কেহই জানতে পারবে না।

শ্রীকৃষ্ণ আরও বললেন,—হে প্রিয়তমে! শ্রীরাধে, তোমার প্রতি প্রীতিযুক্ত হয়ে আরও এক বর প্রদান করছি। আজ হতে আমার ভক্তবৃন্দ তোমার 'রাধা' নাম পূর্ব্বে সংযুক্ত করে আমার 'কৃষ্ণ' নাম স্মরণ করবেন। যে-সকল জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অগ্রে 'রাধা' শব্দ প্রয়োগ পরে 'কৃষ্ণ' শব্দ উচ্চারণ করবেন, তাঁরা নিশ্চিত আমার পরম-ধামে গমনে সমর্থ হবেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃ, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে 'রাধা-কৃষ্ণ' যুগলনাম জপ করেন, তাঁর নিখিল পাপরাশি বিনাশ হয়। কেহ মোহগ্রস্ত হয়ে বা ব্যঙ্গোক্তিদ্বারা পরিহাসচ্ছলে আমার নাম অগ্রে উচ্চারণের পর, তোমার নাম স্মরণ করলে তাকে মহাপাতকগ্রস্ত হতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ হতে বর লাভ করে রাধা আনন্দচিত্তে পিতৃগৃহে সমাগতা হলেন। বৃষভানুরাজাও অমাত্য-পুরবাসী-রাজন্যবর্গ, পুরোহিতগণকে স্বভবনে এনে রাধার বিবাহোৎসব সম্পাদন করলেন। বৃষভানু-রাজা আয়ানকে কন্যা সম্প্রদানকালে শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্রিয়া শ্রীরাধিকার মনোভিলষিত প্রার্থনা পূরণার্থ আয়ানকে পশ্চাতে রেখে স্বীয় দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করে কন্যারত্নের পাণিগ্রহণপূর্ব্বক 'বাঢ়ং' এই প্রতিগ্রহসূচক বাক্য বলেন। বৃষভানুরাজা কন্যাদানের দক্ষিণাস্বরূপ কতকগুলি রত্ন শ্রীকৃষ্ণহস্তে প্রদান করিলে তিনি তাও 'স্বস্তি' বলে গ্রহণ করেন। কিন্তু এতাদৃশ বৃত্তান্ত রাজা বৃষভানু কিঞ্চিৎ মাত্রও উপলব্ধি করতে পারলেন না। বাহ্যতঃ সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে আয়ানের সাথে রাধার বিবাহ হল বলে মনে হলেও আসলে রাধা কৃষ্ণকেই বিবাহ করেছেন। ইতঃপূর্ব্বে শিবাদি দেবতার উপস্থিতিতে ও প্রজাপতি ব্রহ্মার পৌরহিত্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ হয়েছিল। রাধা চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। 'বৃষভানু-রাজা পরমাসুন্দরী এক কন্যা লাভ করেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কন্যাটি জন্মান্ধ।' লোকমুখে একথা শুনে মা-যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে কোলে করে রাধাকে দেখতে যান। শ্রীকৃষ্ণ মায়ের কোল হতে নেমে শয্যায় শায়িতা রাধাকে ধরেন। শ্রীকৃষ্ণ স্পর্শানুভবে রাধা তাঁর শুভাগমন বুঝতে পেরে চোখ খুলে নিত্যপতি শ্রীকৃষ্ণকেই দর্শন করেন। রাধা কৃষ্ণময়ী। বৃঃৎ গৌতমীয়ে—'দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥' ব্রহ্মা-শিবাদিরও

বন্দিতা পরদেবতা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী কৃষ্ণময়ী রাধা, যিনি সর্ব্বচিত্তাকর্ষী শ্রীকৃষ্ণকেও মোহিত করবার সামর্থ্য রাখেন। ঋক্-পরিশিষ্টে—'রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা' অর্থাৎ 'রাধাকে নিয়েই মাধব দেবতা, মাধবেরই রাধা' এ হেন নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত রাধা আয়ানের সাথে বিবাহ সম্বন্ধে কেন কলঙ্কিনী হয়েছেন, তারই অনুসন্ধান করতে হবে।

আয়ান পূর্ব্বজন্মে ছিলেন এক তপস্বী ব্রাহ্মণ। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন,—নারায়ণ যে চরাচর জগৎ পালন করেন, তা তাঁর শক্তি ঐ লক্ষ্মীর দৌলতেই। ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ ভক্তের জন্য কি না করেন, তাহা বুঝতে সেই লক্ষ্মীকে একবার আমার ঘরে বিজয়া রূপে ঘরণী করে বরণ করতে হবে। এই সঙ্কল্প করে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হয়েছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁর তপস্যায় ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতারও ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। নারায়ণ তাঁর নিকট আবির্ভূত হয়ে বর দিতে চাইলে, তপস্বী ব্রাহ্মণ লক্ষ্মীকে গৃহিণীরূপে প্রার্থনা করলেন। বিষ্ণু তাঁকে অন্য বর প্রার্থনা করতে বললেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ লক্ষ্মী ছাড়া অন্য কোন বরই নিতে চাইলেন না। অবশেষে বিষ্ণু বললেন,—'হে ব্রাহ্মণ! লক্ষ্মীকে তুমি এ জন্মে গৃহিণীরূপে পাবে না। এর পরে তুমি গোপবংশে আয়ানরূপে জন্মগ্রহণ করবে। লক্ষ্মী বৃষভানু-রাজার কন্যারূপে জগতে প্রকটিতা হবেন। তখন তুমি তাঁকে গৃহিণীরূপে পাবে।' লক্ষ্মীপতি নারায়ণকে লক্ষ্মীছাড়া করে লক্ষ্মীবান্ হবার ব্যতিক্রম প্রার্থনার জন্য ব্রাহ্মণ আয়ানরূপে মাল্যকের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। রাধারাণীর বিবাহকালে শ্রীভগবদিচ্ছায় তিনি নপুংসকত্বে পরিণত হন। আয়ানের পূর্ব্বজন্মে তপস্বী ব্রাহ্মণরূপে বর প্রার্থনা ও রাধার আবেদনকে সামঞ্জস্য করে শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপ বিবাহে লক্ষ্মীস্বরূপিণীর পতিব্রতা ধর্ম্মকে রক্ষা করেছেন।

বিবাহযোগ্যা বৃষভানু-রাজনন্দিনী বুদ্ধিমতী শ্রীরাধা কালিন্দীতীরে কাত্যায়নী-ব্রতের ছলে শ্রীকৃষ্ণের সাথে যে পরামর্শ করেছেন তা পিতা নন্দ, মাতা যশোদা প্রভৃতি বাৎসল্য-স্নেহপরায়ণ অভিভাবকদের জানাবার জন্যে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্যা অষ্টসখীকে সহচরী করেছেন। রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটাবার এই সখীরাই প্রধান নায়িকা। পক্ষান্তরে ভাগবতের বস্ত্রহরণ লীলায় শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাবার ব্রজকুমারীদের প্রার্থনা তাঁদের পিতামাতা হিতৈষী গুরুজনদের কাণে তোলার জন্য ঐ কুমারীদেরই পল্লীবাসী গোপবালকদের শ্রীকৃষ্ণ অনুগত সখারূপে সাথে করে কালিন্দী-তীরে গিয়েছিলেন। কিন্তু উহা নিতান্ত বালক-বালিকার ঘর-সংসার-খেলার কালে প্রেম-ভালবাসার

কথোপকথন বাল-চপলতা বলেই গুরুজনদের নিকট ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হয়নি। শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্ত ব্রজের পিতামাতা গুরুজনদের নিকট রাধাকৃষ্ণের কিছুই গোপন নেই। তাঁদের সরল স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তায় সখীদের মাধ্যমে মা-যশোদা ও যশোদা-কর্ত্তৃক নন্দমহারাজ সবই জানেন। নন্দ-যশোদার দৃষ্টিতে পতিব্রতা সতীসাধ্বী লক্ষ্মীস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধা ভক্তবৎসল নারায়ণের বাৎসল্যকে রক্ষার জন্যে তাঁরই আদেশে সাধারণ লোকচক্ষুর দৃষ্টিতে আয়ানের বিবাহিতা নামে আয়ান-ঘরণী বলে কলঙ্কিনী হয়েছেন। কিন্তু রাধা নন্দ-যশোদারই স্নেহের কাঙালিনী, তাঁদেরই গৃহবধূ।

আয়ান তাঁর পূর্ব্বজন্মের তপস্যার দৌলতে নিশ্চিতরূপে জানেন গৃহলক্ষ্মী স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধা সতী-সাধ্বী-পতিব্রতা-শিরোমণি। জটিলা-কুটিলার মত শ্বাশুড়ী-ননদের ঘরে রাধাকে গৃহবধূরূপে বরণ করে, আয়ান যে কি ভুল করেছেন, তা মর্ম্মে মর্ম্মে তাঁর অনুভব হয়েছে। জগৎপতি, প্রজাপতি, সভাপতি, গৃহপতি প্রভৃতি পতি-পদবাচ্যের শব্দার্থ—সুনিয়ন্ত্রণকারী, রক্ষক, পালক, পোষক। সে দিক দিয়ে জটিলা, কুটিলা ও তদনুগামীর অপবাদ থেকে রাধাকে উদ্ধার করার বিরাট্ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের অধীন আয়ান। তাই জটিলা প্রভৃতির অপবাদের প্রসঙ্গকে তিনি এড়াতে পারেন না। অবশেষে জটিলা-কুটিলা ও আয়ান উভয়পক্ষই একদা উহা প্রমাণের জন্য চেষ্টিত হলেন। তাঁরা রাধাকৃষ্ণের মিলন-স্থলীতে উপস্থিত হবার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ হৈমবতী কালিকার রূপ ধারণ করেন এবং রাধা তাঁর আরাধনায় তন্ময়া হন। জটিলা, কুটিলা ও আয়ান রাধার এ রূপ দেখে মা-বোনের সাথে আয়ান কাত্তায়নীকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করলেন। তাঁরা রাধিকাকে পরমা তপস্বী জেনে নিজদিগকে ধন্যবোধে বার্ষভানবীকে স্নেহালিঙ্গন ও আনন্দাশ্রুতে অভিষিক্ত করলেন।

শ্রীল ব্যাসদেবের ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ অনুষ্ঠানের পর, পরবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে রাধা গোপীগণের মধ্যে অবগুণ্ঠিতা নব গৃহবধূ। তাই রাধা সর্ব্বসাধারণের লোকচক্ষুর পর্দার অন্তরালে। কিন্তু সখীদের মাধ্যমে রাধা-কৃষ্ণের মিলন ঘটাবার শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলারূপ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অন্যান্য গোপীগণের সজ্জন-পরিবার-পরিজন ও নন্দ-যশোদা প্রভৃতি গুরুজনদের নিষেধ ত' নেইই, পরন্তু তাঁরা পরামর্শ-প্রদানকারী ও ব্যবস্থাপক।—এখান হতেই মহাকবি জয়দেব তাঁর শ্রীগীত-গোবিন্দের প্রথম স্তবকের সূচনা করেছেন।

কবি জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দের অধ্যায়গুলির নামকরণ করেছেন 'সর্গ' বলে। 'সর্গ' মানে—স্বাভাবিক সৃষ্টি। 'নিসর্গ' মানে স্বাভাবিকতার বিকৃতরূপ। প্রথমসর্গের নামকরণ করেছেন, 'সামোদদামোদর' নামে। মা-যশোদা যাঁকে ভক্তিডোরে বেঁধেছেন, মায়ের বাঁধনে থেকে যিনি পিতামাতা, গুরুজন, সখা-সখীগণকে আনন্দবিধান করছেন ও তাঁদের দ্বারা আনন্দিত হচ্ছেন এরূপ ভাব।

প্রথম শ্লোকে 'মেদৈর্মেদুরম্বরম্' মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সমাজকে আকাশের সাথে তুলনা করেছেন, যথা—"যতিধর্ম্মে পরিধানে অরুণ বসন। মুক্ত কৈল 'মেঘাবৃত গৌড়ীয়-গগন'॥" 'মেঘ' জলের নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বা স্বভাবের নিসর্গ। জল একটী তরল পদার্থ বা বস্তু। পদার্থের স্বভাবকে ধর্ম্ম বলে। তরলতা, বদ্ধাবস্থায় সমোচ্চশীলতা, নিম্নগামিতা, পাত্রানুসারে আকার ধারণের সামর্থ্য ও যে কোন রংকে আত্মসাৎ করার বৃত্তি জলের ধর্ম্ম। সেই জল যদি তার স্বাভাবিক তাপমাত্রা হইতে অধিক উষ্ণ হয়, তবে উহা বাষ্পে পরিণত হয়। আবার অধিক শীতলতায় হয় বরফ। এ দুই জলের নৈমিত্তিক ধর্ম্মের পরিচয়। প্রথম শ্লোকে পিতা নন্দমহারাজ 'নক্তং' অর্থাৎ পূর্ব্বের শারদীয়া রাসের রাত্রে রাধার মান করে রাসস্থলী ত্যাগ ও কৃষ্ণেরও রাধাকে ত্যাগের কথা 'পুনরাবৃত্তির ভাবনায়' ভীত কৃষ্ণ। সমাজেও 'আয়ান ঘরণী রাধা' প্রভৃতি মেঘের সাজ ও তর্জ্জন-গর্জ্জন। বসন্ত ঋতুতে তিনি একা রাত্রিতে যেতে ভীত, অতএব রাধাই তাকে গৃহে লয়ে যাক এরূপ আদেশ। রাধা-কৃষ্ণের নিত্যসহচরী তাকে যে নৈমিত্তিক কারণে সাথে নিতে ভয় করে নন্দমহারাজ সে কৃষ্ণের নামোচ্চারণও করতে চান না। তাই 'ভীরুরয়ং' ও 'তদিমম্' শব্দদ্বয় প্রয়োগ। এক হাতে কখনও তালি বাজে না। তাই নন্দ মহারাজ রাধারাণীকেও এই ভয়ের কারণের মধ্যে গণ্য করেছেন, 'ত্বমেব' শব্দদ্বারা। পিতা নন্দ মহারাজের উপদেশে রাধাই এর বিহিত ব্যবস্থা করতে পারেন এমন ইঙ্গিত।

দ্বিতীয় শ্লোকে পদ্মাবতী-চরণচারণ কবি জয়দেব। স্বনামধন্য মহাকবি জয়দেব তিনি তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতীর নামে পরিচিত নন। পদ্মাবতী রাধারই অপর নাম। 'পদ্মং বিদ্যতে করে যস্যাঃ সা পদ্মাবতী'—রাধা। পদ্মাবতী-(রাধা) চরণ পূজা করেন যিনি—সেই জয়দেব বলে তিনি তাঁর আত্মপরিচয় দিয়েছেন। সরস্বতীপতি হরির চরিত্র কেহ বাগ্দেবীর কৃপায় বর্ণনা করতে পারেন, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের চরিত্র রাধারাণীর কৃপা ব্যতীত নয়। রাধার পাদপদ্মের কৃপায় তিনি "গীতগোবিন্দ"-নামক প্রবন্ধগ্রন্থের বর্ণনা করতে পারবেন, এরূপ ভরসাশীল জয়দেব। এ ক্ষেত্রে তিনি রাধার নাম পদ্মাবতী বলেছেন কেন?—যেখানে তাঁর আরাধ্য 'ব্যাসদেব' আখ্যায় অভিহিত, সেখানে তিনি তাঁর শক্তিকে 'রাধা' আখ্যা দিতে পারেন না।

—শ্রীসদাশিব দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগুরুদেবের ব্যাসপূজা-তিথিবাসরে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

গুরুদেব ! নমি তোমা,
কোটী জনমের অপরাধ মোর
কৃপা করি' কর ক্ষমা।
মায়াদেবী যবে গলে ফাঁস দিয়া
ভবকূপে মোরে দিলেক ডারিয়া,
সেদিন হইতে যাতনা পেতেছি
পরিয়া পথিক-জামা ॥
চৌরাশী লক্ষ জনম ধরিয়া
ভবের মাঝারে মরিছি ঘুরিয়া,
কেমন করিয়া পরপারে যা'ব
শেষ করি' উঠা-নামা ?
লোভ ও লালসা, ভোগের পিপাসা
হৃদয় জুড়িয়া রহিয়াছে ঠাসা,
পরাণ-পাখী যে উড়িয়া যাইবে
আসিলে মরণ-মামা ॥
ঠগ আর যত প্রতারকগণে
আদরে সেবিনু আত্মীয়তাজ্ঞানে,
তব কৃপা বিনা কেমনে হইবে
ভব-পথ চলা থামা ?
কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ শ্রেষ্ঠ যে ভাবিয়া
কতদিন তাহে রহিনু মজিয়া,
কৃপা করি যবে ভাঙ্গাইলে ভুল
শেষ হ'ল ভয়ে ঘামা ॥
করুণা-সাগর তুমি ওহে গুরু !
কৃষ্ণভক্তি বিনা চিত্ত মোর মরু,
কৃপা কর যাতে কাম-তরঙ্গের
উত্তেজনা হয় কমা।

আজিকে তোমার আবির্ভাব-দিনে,
কিবা অর্ঘ্য দিবে এ অধম দীনে !
শ্রদ্ধাঞ্জলি তব পদে দিনু যাতে
ভক্তিধন হয় জমা ॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবাকাঙ্ক্ষী—
—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

অভিধেয় তত্ত্ব

শ্রীরাধিকামাধবয়োরপার-মাধুর্য্য-লীলা-গুণ-রূপ-নাম্নাম্ ।
প্রতিক্ষণাস্বাদনলোলুপস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

দীব্যদ্ বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥

তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি !
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে ॥
বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ ।
কৃষ্ণভক্তি-প্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ"—নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই আমাদের আরাধ্যতম বস্তু বা কৃষ্ণই যে 'সম্বন্ধ তত্ত্ব'—এই উপলব্ধি হইবার পরেই প্রশ্ন আসিয়া যায়,—কি উপায়ে সেই আরাধ্যতম বস্তুর সেবা লাভ ঘটিবে ?

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—'জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।' দাসের ধর্ম্মই হইল সেবা। সেই সেবালাভ কি উপায়ে সংঘটিত হইবে ? অভীষ্ট বস্তু পাওয়ার নিমিত্ত যে উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন হয়, তাহাকে শাস্ত্রে "অভিধেয়" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের অভীষ্ট বস্তু এ জগতে বহু। অভীষ্টলাভের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে সুখলাভ, কিন্তু জীব-হৃদয়ে যে চিরন্তনী সুখের বাসনা রহিয়াছে, এই জগতের কোন বস্তুর দ্বারাই সেই সুখের

বাসনার পরিতৃপ্তি ঘটা কখনই সম্ভব নহে। সে সুখ হইল—সুখস্বরূপ, রসস্বরূপ, নিত্যবস্তু পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার সহিতই জীবের নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান। তিনিই 'সম্বন্ধ তত্ত্ব'। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান। অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব সম্বন্ধ-জ্ঞানরহিত হইয়া আছে। সম্বন্ধ-জ্ঞান ভুলিয়া মায়ার দাসত্ব করিয়া বর্ত্তমানে জীব জন্ম মৃত্যুচক্রে আবর্ত্তিত হইতেছে ও ত্রিতাপ-জ্বালার ভয়ে সর্ব্বদা ভীত হইয়া আছে। ইহা হইতে নিষ্কৃতির একমাত্র পথ সম্বন্ধ-জ্ঞানে জাগ্রত হওয়া। সেই কৃষ্ণ-স্মৃতিকে জাগ্রত করাই জীবের মুখ্য কর্ত্তব্য। এই জাগ্রত করিবার উপায়কেই "অভিধেয়" বলা হইয়াছে।

অভিধেয়ের জন্য প্রয়োজন সাধনা। সাধনার পথ অনেক প্রকার আছে—কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কোন্ পথটি বিধেয় বা চরম মঙ্গল লাভের সহায়ক, তাহা জানিতে হইবে। কর্ম্ম স্বর্গাদি সুখ দিতে পারে, কিন্তু সংসার-বন্ধন মুক্ত করিতে পারে না। একারণে কর্ম্মের অভিধেয়ত্বই নাই।

যোগী পরমাত্মার সহিত ও জ্ঞানী ব্রহ্মের সহিত মিলন চাহেন। যোগ স্বীয় ফল প্রদান করিতে ভক্তির অপেক্ষা রাখে। আর ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল জ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা করেন, তাহাদের ভাগ্যে কেবল ক্লেশই অবশিষ্ট থাকে।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ভক্তের সেবায় লাগিবার জন্য সময় প্রতীক্ষা করে, আর মুক্তি মুক্তাঞ্জলি হইয়া ভক্তের নিকটে দণ্ডায়মান থাকে। সুতরাং ভক্তির দ্বারা চারি পুরুষার্থ সহজেই আসিয়া থাকে। কিন্তু ভক্ত তাহা চাহেন না। পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমই ভক্তের কাম্য। ভক্তি ভিন্ন কৃষ্ণপ্রেম লাভ কোনপ্রকারেই সম্ভব নহে।

সুতরাং সর্ব্বশাস্ত্রে ভক্তিই একমাত্র মূল "অভিধেয়" বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই ভক্তির দ্বারাই জীবের চরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইবে।

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—"হে অর্জ্জুন! আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার যাজন কর, আমায় নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়; আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, এইরূপ করিলেই আমাকে পাইবে।"

ভগবান্ স্বীয় মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মহিমা হইল তাঁহার স্বরূপ-শক্তিরই বিলাসবিশেষ। স্বরূপশক্তির বিলাসেই ভগবান্ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন,—"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ॥" বিশুদ্ধসত্ত্বকে 'বসুদেব' বলে। বিশুদ্ধসত্ত্বে অপাবৃত পুরুষ

প্রকাশিত হন। স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষকে বলে বিশুদ্ধসত্ত্ব বা শুদ্ধসত্ত্ব। ভগবান্ চিদ্‌বস্তু; চিদ্‌বস্তু ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে তাঁহার প্রকাশ সম্ভব নহে। স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী বৃত্তির সারই হইল ভক্তি। এই ভক্তি যখন স্বরূপশক্তির কৃপায় ভক্ত-হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, তখন সেই ভক্ত-হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বে পরিণত হয় এবং সেই হৃদয়ে স্বরাট্ কৃষ্ণের অধিষ্ঠান হয়।

সুতরাং ভক্তিই "অভিধেয়" তত্ত্ব। কিন্তু কি উপায়ে ভক্তিলাভ সম্ভব? ভক্তি অর্জ্জন জীবের স্ব-চেষ্টায় বা অন্য কোন প্রকারে সম্ভব নহে। এমনকি, স্বয়ং কৃষ্ণও জীবকে ভক্তি দান করিতে পারেন না। ভক্তি হইল স্বরূপশক্তির হ্লাদিনীবৃত্তির অংশ। তাহার মালিক কৃষ্ণ নহেন। স্বয়ং রাধারাণীই তাহার অধিশ্বরী। "ভক্তের নিকটে কর ভক্তি উপার্জ্জন"—একমাত্র ভক্তের নিকটে ভক্তের কৃপাতেই ভক্তিলাভ সম্ভব।

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে কৃষ্ণেতর অনর্থনাশিনী কথা শ্রবণ হয়। অনর্থনাশিনী হরিকথা শ্রবণ হইতে নিষ্ঠার উৎপত্তিক্রমে ভগবন্মাহাত্ম্যের পরিজ্ঞান হয়, আর রুচির উৎপত্তিহেতু হরিকথায় হৃদয় ও কর্ণের রসায়ণ হয়। সাধুসঙ্গে অর্থাৎ প্রকৃষ্ট সঙ্গের পূর্ব্বে শ্রবণ ক্রিয়া। শ্রদ্ধা হইতে সঙ্গ। হৃৎকর্ণরসায়নী কথা প্রীতির সহিত আস্বাদন করিতে করিতে আসক্তি, রতি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি ক্রমপন্থায় উদিত হয়।" (ভক্তিসন্দর্ভ)

কিন্তু ভক্তিলাভের ফল কি?

"প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥"

"হে উদ্ধব! আমার কথিত ভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক যে মুনি নিত্যকাল আমার ভজন করিতে থাকেন, আমি তাঁহার হৃদয়মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় তাঁহার হৃদয়স্থিত সমস্ত কাম বিনষ্ট হইয়া যায়।" (ভক্তিসন্দর্ভ)

একারণে সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধন-ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব গীত হইয়াছে,—

"অতএব 'ভক্তি' কৃষ্ণপ্রাপ্যের উপায়।
'অভিধেয়' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥"
"তৈছে ভক্তি-ফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায়॥"

চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণকারী মায়াবদ্ধ জীবের ভাগ্যে কখন এই ভক্তিলাভ ঘটিবে?

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥"

ভক্তি সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান অর্জ্জনের প্রয়োজন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমদ্রূপগোস্বামী শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন,— "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

এই শ্লোকেই ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থালক্ষণ বর্ত্তমান। উত্তমা ভক্তিই 'শুদ্ধভক্তি'। 'কর্ম্মবিদ্ধা' ভক্তিতে ভক্তিফল উদ্দেশ্য থাকায়, এবং 'জ্ঞানবিদ্ধা' ভক্তিতে মুক্তিফল উদ্দেশ্য থাকায় ইহাদের শুদ্ধাভক্তি বলা যায় না। ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহাশূন্য যে ভক্তি, তাহাই উত্তমা বা শুদ্ধা ভক্তি। ইহার দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম-ফল লাভ করা যায়। এই শুদ্ধা ভক্তির দুটী লক্ষণ,—

(১) আনুকূল্য-ভাবের সহিত কৃষ্ণানুশীলন—ভক্তির 'স্বরূপ লক্ষণ'।

(২) অন্যাভিলাষিতা-শূন্যতা অর্থাৎ কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত অন্য কোন ইতর বিষয়ে অভিলাষ না করা এবং জ্ঞান-কর্ম্মাদি অনাবৃতত্ব—এই দুইটী ভক্তির তটস্থা-লক্ষণ।

এই শুদ্ধভক্তির ছয়টী বৈশিষ্ট্যের কথা শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীপাদ বর্ণনা করিয়াছেন,—

(১) "ক্লেশঘ্নী—ক্লেশ তিনপ্রকার—পাপ, পাপবীজ, অবিদ্যা। পাতক, মহাপাতক, অতিপাতক ক্রিয়াসকল পাপ, পাপ করিবার বাসনাসকল পাপবীজ, জীবের স্বরূপ-ভ্রমের নাম—অবিদ্যা। শুদ্ধভক্তির উদয়ে 'আমি কৃষ্ণদাস' এই বুদ্ধি সহজে উদিত হয়; অতএব স্বরূপ-ভ্রমরূপ অবিদ্যা থাকে না। ভক্তি-দেবীর আলোক হৃদয়ে প্রবেশ করিবামাত্রই পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যারূপ অন্ধকার, সুতরাং বিনষ্ট হয়; ভক্তির আগমনে ক্লেশের অদর্শন। সুতরাং ক্লেশঘ্নত্বই ভক্তির একটী বিশেষ ধর্ম্ম।"

(২) ভক্তি শুভদা—যিনি শুদ্ধ ভক্তিলাভ করিয়াছেন, তিনি চারিগুণে (দৈন্য, দয়া, মানশূন্যতা, অন্যে মান প্রদান) গুণী হইয়াছেন। বিষয়-সুখ, ব্রহ্ম-সুখ, সর্ব্বপ্রকার সুখ প্রদানের ক্ষমতা ভক্তির থাকিলেও শুদ্ধভক্তকে চতুর্ব্বর্গের ফল দান না করিয়া নিত্য পরমানন্দ কৃষ্ণপ্রেমই দান করেন।

(৩) ভক্তি মোক্ষলঘুতাকারিণী—শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে ভগবৎরতিসুখ উদয় করাইয়া ভক্তিদেবী মোক্ষকেও তুচ্ছ জ্ঞান করান।

(৪) ভক্তি সুদুর্ল্লভা—বিশেষ অধিকারী না হইলে ভক্তিলাভ ভাগ্যে

ঘটে না। ভুক্তি-মুক্তির দ্বারাই অধিকাংশ জীব ভুলিয়া থাকে। ভক্তি স্বীয় প্রচেষ্টার দ্বারা জীব লাভ করিতে পারে না। একমাত্র ভক্তের ও ভগবানের কৃপাতেই ভক্তিলাভ ভাগ্যে ঘটে। স্বীয় প্রচেষ্টায় অন্য কোনপ্রকার সাধনের দ্বারা শুদ্ধভক্তিলাভ জীবের ভাগ্যে ঘটে না। একারণে ভক্তি সুদুর্ল্লভা।

(৫) ভক্তি সান্দ্রানন্দ বিশেষস্বরূপা—"ভক্তি চিৎসুখ, অতএব আনন্দ-সমুদ্র। জড়জগতের বা তাহার বিপরীত চিন্তাময় জগতের যে ব্রহ্মানন্দ আছে তাহা পরার্দ্ধ গুণীকৃত হইলেও ভক্তিসুখ-সমুদ্রের একবিন্দুর সহিত তুলনার স্থল হয় না। জড়সুখ তুচ্ছ, জড়-বিপরীত সুখ নিতান্ত শুষ্ক—সেই দুইপ্রকার সুখই চিৎসুখ হইতে বিজাতীয় ও বিলক্ষণ। বিজাতীয় বস্তুর পরস্পরে তুলনা নাই; এতন্নিবন্ধন যাঁহারা ভক্তিসুখ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ একটী গাঢ় আনন্দের স্বরূপ ভোগ করিতে পান যে, ব্রহ্মাদিসুখ তাঁহাদের নিকট গোষ্পদ বলিয়া বোধ হয়, সে-সুখ যে অনুভব করিতেছে, সে-ই জানে, অপরে বলিতে পারে না।"

(৬) ভক্তি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী—"যাঁহার হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাঁহার নিকটে সমস্ত প্রিয়বর্গ-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ প্রেমদ্বারা বশীভূত হইয়া আকৃষ্ট হন, অন্য কোন উপায়ে তাঁহাকে বশীভূত করা যায় না।"

ভক্তি এরূপ উপাদেয় হওয়া সত্ত্বেও সকল শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ভক্তিলাভে যত্নবান্ হন না। ইহার কারণ, মানব স্বীয় জড়ীয় বিচার-বুদ্ধিদ্বারা অপ্রাকৃত ভক্তি ও কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিতে পারেন না। পূর্ব্বসুকৃতি-বলে যে-সকল সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির বিন্দুমাত্র রুচির উদয় হয়, তাঁহারাই একমাত্র ভক্তিতত্ত্ব বুঝিবার শক্তিলাভ করেন। চিৎসুখ বিষয়ে এই জড়ীয় যুক্তি-তর্কের অধিকার নাই। (ক্রমশঃ)

—শ্রীমতী মায়া সরকার

আমাদের আদর্শ চরিত্রে অন্য লোক যাহাতে অন্যপ্রকার দর্শন না করে, তজ্জন্য আমরা যেন সর্ব্বদা সতর্ক হই। কোমলশ্রদ্ধগণের প্রতিপদেই বিপদ। তাঁহারা অন্তর্দর্শী নহেন, কেবল বাহ্যাকৃতি দেখিয়াই বিচার করেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৫২ পৃষ্ঠার পর]

কিন্তু সেই মানুষের চেহারাটাকেই মানুষ বলা হয় নাই। 'সবার উপরে মানুষ' সত্য তাহার উপরে নাই'—কবির একথা বলার উদ্দেশ্য কি? লর্ড মেকলে যা বলেছেন,—'More than a man you can not be'—এ কথারই বা তাৎপর্য্য কি? এখন আমি বলতে চাই, মানুষ কাকে বলা হবে? মানুষের চেহারাটাকে নিয়ে যদি আমরা বসে থাকি, তাকে কি মানুষ বলে স্বীকার করা হয়েছে? Rationality ও Animality—দুটো জিনিস আছে। মানুষ যদি Rational being হয়, তবে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে সে Rational being। নীতি-আদর্শপরায়ণ মনুষ্যকেই ঠিক ঠিকভাবে মানুষ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। চেহারাটা মানুষের মত, কিন্তু কাজটা অমানুষের মত—পশুর মত, তাকে বলা হল Animal। Animality-সর্ব্বস্ব যে মনুষ্য শরীরধারী ব্যক্তি, তাকে মানুষ বলে আখ্যা দেওয়া হয় নাই।

প্রশ্ন: একে কি মানুষ বলা হবে?—নীতি-আদর্শ-বিবর্জ্জিত মানুষকে মানুষ বলা হবে না, সে মনুষ্যত্ব থেকে খারিজ। দ্বিতীয় প্রশ্ন: যদি কেউ নীতি-আদর্শ মানেন, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকে, তাহলে তাকেও হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই। অতএব প্রথম বাদ হচ্ছে—নিরীশ্বর নির্নৈতিকতা, শেষের দিকে বাদ গেল—নিরীশ্বর-নৈতিকতা। যিনি ঈশ্বরকে মানেন না, কিন্তু নীতি মানেন, তার নীতি কাকে আশ্রয় করে? নীতি ত' ভগবানকে আশ্রয় করে, ভগবানকে বাদ দিয়ে কোন নীতি-আদর্শের কথা স্বীকৃত হয় নাই। যখন আমরা নীতি-আদর্শের কথা বলব, তখন ভগবান্ তার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। নীতি—Principle বলে যে জিনিস শাস্ত্রে রয়েছে সেটাকে বলেছেন Axiomatic Truth। সেটা সবাইকে আমাদের সব সময়ের জন্য মেনে নিতে হচ্ছে। সেটা যদি মনুষ্যেতর প্রাণী পাখী-পশুর মধ্যেও দেখা যায়, তাকেও মেনে নিতে হচ্ছে। সেই নীতি-আদর্শ মানুষের মধ্যে যখন পূর্ণভাবে দেখা যাচ্ছে, তখন তার সেইভাবে পরিচিতি আসছে। শাস্ত্রে সেইজন্য মানুষকে কতভাগে ভাগ করেছেন।—

প্রথম মানুষকে বললেন—নিরীশ্বর নির্নৈতিক, দ্বিতীয় মানুষকে বললেন—নিরীশ্বর নৈতিক। এই দুই শ্রেণীকে মনুষ্যত্ব থেকে বাদ দিলেন। তৃতীয়

Categoryতে এল সেশ্বর নৈতিক। তাকে বলা হল,—হ্যাঁ তুমি মানুষ, তোমাকে মানুষ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হল, মনুষ্যের Categoryর মধ্যে তুমি পড়লে। Fourth Categoryতে এল সেই মনুষ্য যখন নীতি-আদর্শ-পরায়ণ, যখন তাঁর ধর্ম্মে বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস এসেছে, তখন তাঁর সাধনার ক্রম শুরু হয়েছে। তখন তাঁর দরকার হচ্ছে গুরু—Spiritual Preceptor। কেন? —তিনি না হলে সাধন-পথে চালিত করতে পারবেন না কেউ। নানামতে বিভ্রান্ত হয়ে এদিক ওদিক Diverted হবেন তিনি। তিনি সঠিক রাস্তা খুঁজে পাবেন না। 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ' সেই পন্থা দেখাবেন সদ্‌গুরু। এইজন্যই গুরুর প্রয়োজন হচ্ছে। গুরুর আনুগত্য নিয়ে শিষ্য বা ছাত্র যখন সাধনে অগ্রসর হচ্ছেন তখন তার Fourth stage। আগেকার মানুষকে বলা হল—মুকুলিত চেতন। যখন সাধন-ভজন শুরু করছেন তিনি, Proper trackএ চলতে শুরু করেছেন, তখন তাকে বলা হল বিকচিত চেতন মনুষ্য। সাধন-ভজন করতে করতে যখন ক্রমশঃ তাঁর বাস্তব অনুভূতি —Realisation আসছে, যখন তিনি পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, তখন তাঁকে বলা হল পূর্ণ-বিকচিত-চেতন মনুষ্য, সিদ্ধ মহাত্মা। সুতরাং এইভাবে মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশ অনুসারে—Gradual development অনুযায়ী শাস্ত্রে মানুষকে কয়ভাগে ভাগ করেছেন। এটা আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে। কেবলমাত্র মনুষ্য-শরীরধারী ব্যক্তিকেই যদি মানুষ আখ্যা দিতেন, তাহলে ভুল করতেন আর্য্য-ঋষিগণ। কিন্তু তাঁরা তা করেন নাই। সেইজন্য বৈষ্ণব-কবি বলেছেন, —"মানুষ আকার হইলে কি হয়, করহ ভূতের কাম।" তোমার কাজটা দেখছি উল্টো। চেহারাটা তোমার মানুষের মত বটে, কিন্তু Animality ভর্ত্তি তোমার মধ্যে। তুমি তোমার বিরূপ আচরণ দিয়ে Animality প্রমাণ করছ, তুমি তোমাকে Rational being বলে প্রমাণ করতে পারলে না। ঋষিগণের বিচারের মধ্যে এসব কথাগুলো আছে।

মানুষের যে চরম বিকাশ,—'Manliness in next to godliness'। মানুষ সাধনার দ্বারা—সাধনার ক্রমানুসারে শুদ্ধিতা বা দেবত্ব লাভ করতে পারে। ভগবান্ তাঁর সব Officer নিয়ে অনন্ত বিশ্বসংসার চালাচ্ছেন। কখনও কখনও Officer Group-এ জনসংখ্যা কমে গেলে এই মনুষ্য-সমাজ থেকে 'চুনাও' করে কিছু কিছু officerদের বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা দেবত্ব লাভ করছেন। যেমন এই দুনিয়াতে আমরা অনেক Postএ Honourary Service আছে দেখতে পাচ্ছি, তেমন ভগবানের রাজ্যেও ঐ রকম আছে।

বিশেষ শক্তিশালী মনুষ্যকে দেবত্ব-পদ দিচ্ছেন ভগবান্। এর বহু প্রমাণ রয়েছে শাস্ত্রে।

তাহলে ব্রহ্মা কাকে বলি? শিবাদি দেবতা কাকে বলি?—বলছেন, যত officer আছেন, সব officerএর মধ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এঁরা দুজন—ব্রহ্মা এবং শিব। তার ভিতরে আবার শিবের মহিমা অধিক। তাঁদের যে-সব দায়-দায়িত্ব, যে-সব Duty, সেগুলি শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করেছেন। শিবঠাকুরকে, ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করা হল,—আপনারা এ সমস্ত কাজগুলো কোথা থেকে পেয়েছেন? আপনারা যে এই সকল Dutyগুলি করে যাচ্ছেন, এগুলো কে দিলেন আপনাদের? কাঁর আজ্ঞা পালন করছেন আপনারা? 'সৃষ্টামি তন্নিযুক্তোঽহম্ হরো হরতি তদ্বশঃ'। ব্রহ্মাজী বলছেন,—সেই ভগবৎ-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়েই আমি ব্রহ্মা জগতে গৌণ সৃষ্টি চালিয়ে যাচ্ছি। 'হরো হরতি তদ্বশঃ'—শিবঠাকুরও এই গৌণ প্রলয় ঘটিয়ে যাচ্ছেন। আবার কখনও শিবঠাকুর নিজেই বলছেন ঐ একই কথা। যখন শিবানী প্রশ্ন করছেন, তুমি ও আমি কোথা থেকে এলাম? আমাদের Origin কে? তখন শিবঠাকুর বলছেন,—

"তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরি।
কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ॥"

সেই যে পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, সেই যে সর্ব্বহেতুভূত বস্তু, তাঁর থেকে তুমি, আমি এসেছি। কথাটা চিন্তা করবেন। ব্রহ্মা বলছেন,—তাঁরই আজ্ঞায় আমি গৌণ সৃষ্টি করে থাকি।

অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুণাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কো নাম লোকে ভগবৎ-পদার্থঃ॥

ব্রহ্মা অর্ঘ্য নিবেদন করছেন। সেই অর্ঘ্য গঙ্গারূপে এ জগতে আসছে। শিবঠাকুর গঙ্গাদেবীকে জটায় ধারণ করেছেন। জগৎকে পবিত্র করছেন সেই গঙ্গাদেবী। ব্রহ্মা তাঁরই আজ্ঞাবাহী ভৃত্য। "সেশং পুণাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কো নাম লোকে ভগবৎ-পদার্থঃ॥" সুতরাং সেই ভগবান্ ছাড়া Supreme Command, Supreme Lord, Almighty Lord আর কে আছেন? শ্রীভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তা দেখাচ্ছেন; তিনি নিখিল দেব-দেবী সকলের উপরওয়ালা, সেটাই প্রমাণ করছেন এখানে।

অবতারবাদ নিয়ে আজ আলোচনার কথা। শাস্ত্র অবতারবাদ নিয়ে বলছেন প্রথমেই,—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাঽবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥

অবতারের কথা বলছেন। কাকে বলে অবতার? কাকে বলে অবতারী? এখানে ব্যাখ্যা করছেন,—সত্ত্বনিধি ভগবান্ শ্রীহরি, তাঁর থেকে বহুতর অবতার generated হচ্ছেন। কিরকম?—অক্ষয় সরোবর থেকে যেমন বহু নদ-নদী প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ সেই অনন্ত শক্তিমান্ সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণ থেকেই অসংখ্য অবতার আসছেন বেরিয়ে। এখন বিচার হচ্ছে এই যে কৃষ্ণ সর্ব্বাবতারী, Main Fountain Source যে কৃষ্ণ, তাঁর থেকে নিঃসৃত এই যে অবতারগণ, এঁদের কার কতটুকু ক্ষমতা এবং কতটুকু রসগত বৈশিষ্ট্য আছে, তা নিয়েও শাস্ত্র বিচার করেছেন। আমরা যখন দার্শনিক বিচারে প্রবেশ করি, তখন দেখি—নারায়ণ বা বিষ্ণু স্বরূপে দুই এক। শ্রীরামচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে যত সব অবতার এসেছেন, নারায়ণ-স্বরূপে সব এক। নারায়ণ কাকে বলা হবে?—যাঁর ভিতরে ৬০টী গুণের সমাবেশ বা ৬০টী গুণ-সমন্বিত তত্ত্বকে বলে নারায়ণ বা বিষ্ণু। এখান থেকে পূর্ণত্বের বিচার আরম্ভ হয়েছে। ৫৫টী গুণবিশিষ্ট তত্ত্বকে বলা হয়েছে শিব বা ব্রহ্মা। ৫৫টী গুণ আংশিক-ভাবে, পূর্ণ নহে। কিন্তু পূর্ণ ৬০টী গুণের অধীশ্বর যিনি, তাঁকে বলা হল নারায়ণ বা বিষ্ণু। এই Categoryর মধ্যে আসছেন সমস্ত অবতার, যদিও ভক্ত ও ভগবানের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য নিত্যবর্ত্তমান। নারায়ণ-স্বরূপে কোন পার্থক্য বিচার করা হয় নাই। সেখানে একই তত্ত্ব, কিন্তু কোথায় বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করছেন? যেমন ধরুন রামস্বরূপ, যিনি মর্য্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র, তাঁকেও পূর্ণব্রহ্ম বলা হচ্ছে। কিন্তু রসগত বৈচিত্র্য-বৈশিষ্ট্য সেখানে রয়েছে, যেটা নারায়ণ-স্বরূপে নাই। নারায়ণ-স্বরূপে ৬০টী গুণ আছে, কিন্তু রামচন্দ্রের ভিতরে ২½ গুণ ও রস বেশী আছে। শান্ত, দাস্য এবং সখ্যের অর্দ্ধেক। কৃষ্ণ-স্বরূপে পূর্ণ ৬৪টী গুণ আছে। তাঁর চারটী গুণ অধিক আছে—লীলামাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য, রূপ-মাধুর্য্য ও প্রেমমাধুর্য্য। সুতরাং ৬০টী গুণের পূর্ণতম যে Entity, তাঁকে বলা হল শ্রীকৃষ্ণ—অবতারী। পূর্ণত্বের বিচারে কৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্রাদি অবতারকে ছোট-বড় করা হয় নাই। সেখানে এক বিচার। কেন?—অখণ্ড তত্ত্ব বলে। নারায়ণ তত্ত্ব, বিষ্ণুতত্ত্ব অখণ্ড তত্ত্ব। ভগবান্ বিষ্ণু ও তাঁর ভক্ত অখণ্ড। অখণ্ড কাকে বলা হবে?—গুরুতত্ত্বকেও বললেন অখণ্ড। প্রণাম মন্ত্রের মধ্যে রয়েছে,—

ওঁ অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরুতত্ত্বকেও বললেন অখণ্ড তত্ত্ব। ভক্ত, ভগবান্ ও ভক্তি—তিনই অখণ্ড তত্ত্ব। একে খণ্ডিত করা হয় নাই, খণ্ডিত করা যায় না। পূর্ণতমতত্ত্ব সর্ব্বাবতারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর থেকে সমস্ত অবতার generated হয়েছেন। অসংখ্য নদ-নদী যেমন অক্ষয় হ্রদ থেকে বেরিয়ে আসে, তদ্রূপ সেই সত্ত্বগুণনিধি যে ভগবান্ কৃষ্ণ, তাঁর থেকে অসংখ্য অবতার বেরিয়ে আসছেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই কি সমগুণসম্পন্ন?—বিষ্ণু বা নারায়ণ তত্ত্ব-হিসাবে সমান, কিন্তু যেখানে 'শক্ত্যাবেশাবতার' বলা হল, সেখানে বিভিন্নাংশ জীবতত্ত্ব। সেখানে ভগবান্ ও জীবের পরিমাণগত পার্থক্য স্বীকৃত হয়েছে। তত্ত্বদর্শন হল জীব এবং ভগবান্। সব জীব যদি শিব হয়ে যান, তাহলে Theory ভুল হয় না কি? জীব তাকেই বলা হবে, যার মধ্যে ৫০টী গুণ আংশিক মাত্রায় আছে। ৫৫টী গুণ যাঁর মধ্যে আংশিক মাত্রায় আছে, তাঁকে বলে শিবতত্ত্ব বা ব্রহ্ম তত্ত্ব তাহলে জীব কি করে শিব হন, যুক্তি দিয়ে বিচার করা হউক। যে কথাটা বাজারে চলছে—'জীব শিব হন', শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে—বিচারক্ষেত্রে—দার্শনিক বিচারে আমরা ওটা পাই না। সব জীব শিব হতে পারেন না। শিবের যে শিবত্ব, তাঁর যে প্রাধান্য সর্ব্বজনস্বীকৃত সত্য, Axiomatic Truth। সুতরাং যখন সব জীব শিব হতে পারেন না, তখন জীব ভগবান্ কি করে হচ্ছেন বা হবেন? এটা কি সম্ভব? বহু ব্যক্তির ধারণা আজ,—জীব ভগবান্ হতে পারে। কিন্তু কোনক্ষেত্রে হতে পারেন না, আজ পর্য্যন্ত হতে পারেন নাই, এটা কখনও সম্ভব নয়—It is quite impossible। যদি ভগবানকে জীব বলি, তাহলে ভগবানকে কমা করা হয়। ভগবানকে যদি জীবসাম্যে স্থাপন করা হয়, তাহলে ভুল করা হল। সেই সাধারণ ভুলই সংশোধন করেছেন স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গীতার মধ্যে।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

হে অর্জ্জুন! আমি মানুষের মত চেহারা নিয়ে এসেছি বলে যারা আমাকে সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধি করে, ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব দোষদুষ্ট যে মনুষ্য—অজ্ঞান যে মনুষ্য, যার পদে পদে ভুল-ভ্রান্তি হয়, সেই মনুষ্য আমাকে যদি মানুষ বলে অবজ্ঞা করে, তাহলে চরম ভুল করবে তারা। অর্জ্জুন, তুমি আমাকে ঐরূপ প্রাকৃত মানুষ মনে করো না, যদিও আমি নরাকার হয়েই এসেছি। নরাকার-পরব্রহ্মই আমার স্বরূপ বা Original (আদি) আকার। শ্রীভগবান্ সাবধান করে দিচ্ছেন অর্জ্জুনকে দিয়ে।

অর্জ্জুনকে সাবধান করার কি প্রয়োজন? অর্জ্জুন ত' তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁর কোন মোহ হয় নাই, ছিলও না। মোহ হয়েছে আমাদের মত বোকা হতভাগা জীবের। সেই মোহ অপনোদনের জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে সমগ্র জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়েছেন। অর্জ্জুন বলতে হয় বলেছেন,—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

এটা বলেছেন অর্জ্জুন আমাদের হয়ে আমাদের জন্য, বাস্তবক্ষেত্রে অর্জ্জুনের কোন মোহ ছিল না। তাঁর মোহ কাটাবার জন্য কোন ব্যবস্থাও নিতে হয় নাই। ভগবান্ জগৎকে এইভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। সে শিক্ষাগুলি আমাদের গ্রহণ করতে হবে। তাই বললেন, ভগবানের সম্বন্ধে ভুল বিচার করলে হবে না।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥

হে অর্জ্জুন! আমার জন্ম-কর্ম্ম অলৌকিক, দিব্য, অপ্রাকৃত; সাধারণ মানুষের মত, কর্ম্মফলবাধ্য জীববিশেষের মত আমি আসি না। আমি এ জগতে আসি, যাই আমার নিজ ক্ষমতাবলে। আমার গমনাগমন সম্পূর্ণ আমার এক্তিয়ারভুক্ত, আমার নিজের ইচ্ছাধীন। আমার জন্ম-কর্ম্ম দিব্য, অপ্রাকৃত—এই তত্ত্ব যারা বুঝতে পেরেছেন, তাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। যদি আমরা আমাদের এই Birth and Rebirth-এর Chain থেকে উদ্ধার লাভ করতে চাই, তাহলে এইরূপ বিচার অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, এতে বিশ্বাসী হতে হবে। ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলছেন,—অর্জ্জুন! তুমি আমার কাছে, আমার ধামে যাবে? তোমার ধাম কোথায়? ভগবদ্ধাম—সেইটাই আমাদের সকলের প্রাচীন বাস্তভিটা। সেইটাই আমাদের পূর্ব্ব পৈত্রিক ভূমি। শাস্ত্র বলছেন,—"Back to God and back to Home—our eternal Home". "Baikuntha is our heritage, earth's but a players stage". সুতরাং ভগবদ্ধামই হল আমাদের নিজস্ব পৈত্রিক ভিটা, পৈত্রিক ভূমি। তাই আমি অনেক সময় বলি,—যাঁরা পূর্ব্ববঙ্গ থেকে এদেশে এসেছেন Evaquees—শরণার্থী হয়ে, তাঁরাই শুধু Displaced person নন। এই অনন্ত বিশ্বে মায়াদেবীর কারাগারে—দুর্গাদেবীর কারাগারে যারা এসে পড়েছি, সবই Fettered souls—বদ্ধ জীব। সবাই নিজেদের আদি আশ্রয় ভুলে এখানে এসেছি। সেইজন্য সনাতন শাস্ত্রের নির্দ্দেশ—"Back to God

and back to Home—our eternal Home". তত্ত্বদর্শনটাই ত' বুঝতে হবে নিজেদের। আত্মতত্ত্ব কি? পরমাত্মা কি বা কে?—আত্মার আত্মা যিনি, তিনিই ত' পরমাত্মা। তিনি নিশ্চয় আমার কোন অন্তরঙ্গ জন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ত' সম্পর্ক রাখতে পারি না। কে ভগবান্? তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? এই সম্পর্কের বা সম্বন্ধের উদ্বোধনের প্রয়োজন আছে। সেইজন্য সদ্‌গুরু প্রয়োজন। সেই সম্পর্ক উদ্বোধনের জন্য ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কটা কি, সেটা যাচাই করে নিতে হবে। সেইকথা বলছেন শাস্ত্রে।

ভগবান্ যাঁকে বলছি, তিনি হলেন—সমস্ত অবতারের অবতারী। 'অবতার' একটী আলাদা Section, যেখানে পূর্ণদর্শনের বিচার করছেন। যখনই জীব-জগতের কথা আলোচনা হয়েছে, তখনই আংশিক বা খণ্ডিত বিচার। সেই জীব দু'রকম—বদ্ধ ও মুক্ত। যাঁরা সাধনের দ্বারা মুক্তিলাভ করছেন, তাঁরা ভগবানের কাছে চলে যাচ্ছেন। আর এক নিত্যমুক্ত জীব। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা-লাভ। এই নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত দুই জাতীয় রয়েছেন। কৃষ্ণ যাঁকে বলি, ভগবান্ যাঁকে বলি,—তিনি কে? তিনি আমাদের সবকিছু। কিরকম?—তাঁর সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক স্থাপন করা যায় যদি ইচ্ছা করি আমরা। আপনারা একটা শ্লোক প্রায়ই বলেন, বহু জায়গায় বলতে শুনি, গান্ধারী একটী শ্লোক উচ্চারণ করেছেন,—

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেবঃ॥

ভগবানের সঙ্গে তিনি সমস্ত সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইছেন। সেটা এই শ্লোকের মধ্যে পরিস্ফুট। যেখানে বলছেন—"Father, Mother, Lover, Son, Lord, Preceptor, Husband।" কি আরও কান! কৃষ্ণকে বলছেন,—হে ভগবান্! তুমিই আমার সব, 'ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেবঃ'। তুমি আমার কি নয়! প্রেমময় ভগবানের সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। (ক্রমশঃ)

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান

বিজ্ঞান মনস্কতার এবং বিজ্ঞানের জয়যাত্রার এই যুগে আধুনিক শিক্ষাভিমানী মানুষ বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে বদ্ধপরিকর। বিশেষ জ্ঞানকে তাঁরা বিজ্ঞান আখ্যায় আখ্যায়িত করেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনুসন্ধান, পর্য্যবেক্ষণ, প্রমাণ প্রভৃতি দ্বারা কোন সত্য প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে বিজ্ঞানের অবদান বলি। ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও যে পারমার্থিক সত্য বা আধ্যাত্মিক সত্য আছে তা' বিজ্ঞান—মানব স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করেন। ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বের উৎস এখানেই। পৃথিবীর তাবৎ বিদ্যার শাখাকে বিজ্ঞান-সমন্বিত বলা যাবে, কেবল ধর্ম্মের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান-শব্দ অপাংক্তেয়। আজ ত' রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞান এবং গৃহ-বিজ্ঞান প্রভৃতি আছে—অথচ পারমার্থিক বিজ্ঞান বললে স্বীকৃতিতে কুণ্ঠা জাগবে কেন?

পৃথিবীর সব সত্যকে বিনা বাক্যব্যয়ে বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করতে যে মন প্রস্তুত, সে মন আধ্যাত্মিক সত্যকে বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করতে চায় না। অথচ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন,—"Religion is Realisation—উপলব্ধিই ধর্ম্ম।" সত্যদ্রষ্টা আর্য্যঋষিদের উপলব্ধ সত্যকে অবৈজ্ঞানিক বলার স্পর্দ্ধা আর যারই থাক, বিজ্ঞানীদের থাকা সমীচীন নয়। একথা সত্য—বিজ্ঞান বহির্জগতের অনেক তথ্য, অনেক তত্ত্ব, অনেক সংবাদ আমাদের দিয়েছে, অনেক রহস্যের উদ্ভেদও সে করেছে। কিন্তু অন্তর জগতের কয়টী খবর তাঁরা দিতে পেরেছেন? একথা অনস্বীকার্য্য বিজ্ঞান মানুষের মৌল প্রয়োজন—খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়সহ জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য রোগমুক্তি, আরাম, বিলাস, ব্যসন, শ্রমকুণ্ঠতা এনে দিয়েছে। বহু অভাবের অভাব ঘটিয়েছে ঠিকই, কিন্তু আরও অভাবের সিংহদুয়ার উন্মোচিত করে দিয়েছে। মানুষের অনন্ত পিপাসার নিবৃত্তি ঘটাতে বিজ্ঞান সমর্থ হয়েছে কি? ক্ষুটির সমাধান হয়ত' কিছুটা হয়েছে, কিন্তু Psychological needs মিটেছে কি? ব্যবহারিক স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়াও তার আছে মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য, আছে আত্মিক স্বাচ্ছন্দ্য। বিজ্ঞান সে-বিষয়ে অনগ্রসর, অগ্রসর সেখানে বেদান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র। তাই মানুষের মননের জন্য, মনের স্বাস্থ্যের জন্য ধর্ম্মাশ্রয় প্রয়োজন, প্রয়োজন ধর্ম্মবিজ্ঞানের—পারমার্থিক জগতের কুঞ্চিকা যেখানে নিহিত। আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু "স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা

প্রবাহ" প্রবন্ধে মনের মননশীলতার শক্তির কথা বলেছেন। বাইরের উত্তেজক পদার্থের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও ভেতরে উত্তেজনা আসতে পারে, স্নায়ুগুলি সক্রিয় হতে পারে। তা' যদি সম্ভব হয় এবং তা' বিজ্ঞানসম্মত হয়, তবে ঈশ্বরের অবস্থিতি মানুষের মনে চাঞ্চল্য, অস্থিরতা, আলোড়ন সৃষ্টি করলে তা' বিজ্ঞান-সম্মত হবে না কেন ?

বিজ্ঞানের সর্ব্বার্থসাধকতায় যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁরা কি বলতে পারবেন জীবনের সব সমস্যার সমাধান তাঁরা করে ফেলেছেন ? প্রমাণ ছাড়া তাঁরা কিছু গ্রহণ করেন না যখন বলেন, তখন তাঁরা বিজ্ঞানের গুটিকয় বস্তু বা সূত্রকে অনুমানভিত্তিক জেনেও তা' গ্রহণ করেছেন কিসের ভিত্তিতে ? ধর্ম্মের ক্ষেত্রে ধর্ম্মবিশ্বাস আছে, একথা ত' বহুজন কেন সর্ব্বজনবিদিত, কিন্তু বিজ্ঞানের জগতেও বিশ্বাসের স্থান আছে, তা' কি তাঁরা অস্বীকার করতে পারবেন ? বিজ্ঞানের উচ্চ পর্য্যায়ের শিক্ষার্থীর নিকট থার্মোডায়নামিকসের Closed systemএ black bodyতে, ideal gasএ, Avogardo's number-এ বিশ্বাস অপরিহার্য্য। বিশ্বাস ত' মানুষ তখনই করে, যখন নিজে তা' প্রমাণ করে গ্রহণ করতে পারে না। অন্যের প্রমাণিত বা উদ্ভাবিত বা উপলব্ধ সত্যকে বিনা প্রমাণে গ্রহণ করার মধ্যে ত' বিশ্বাস নিহিত। নাস্তিকতায় বিশ্বাস সেও বিশ্বাস, মার্কসবাদে বিশ্বাস সেও বিশ্বাস। এতদুভয়ের ক্ষেত্রে সমস্ত সত্যকে নিজ জীবনে কেউ প্রমাণ করে ত' বিশ্বাস করেনি। অথচ আজকের মানুষের তাতে আস্থা বা বিশ্বাসের কমতি ত' হয়নি। ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও তেমনি আর্য্য-ঋষি প্রজ্ঞাবান্ দ্রষ্টার উপলব্ধ সত্য, সে গুলিই ত' আমাদের নিকট ধর্ম্মবিশ্বাস বলে প্রতিভাত।

আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, শাশ্বত বা সত্য বলে যা' আজকের মানুষ গ্রহণ করছেন, আগামীকাল তার পরিবর্ত্তন হচ্ছে এবং তা' গৃহীতও হচ্ছে। কাজেই স্থির সত্য কি, সে বিষয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। ধর্ম্ম স্থির সত্যকেই নির্দ্দেশ করেছে। ইতিহাস পারেনি, ভূগোল পারেনি, রাষ্ট্রনীতি পারেনি তার এককালের প্রতিষ্ঠিত সত্যকে সর্ব্বকালের প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে প্রতিপন্ন করতে। কালের বিবর্ত্তনে নতুন চিন্তা-ভাবনার মূল্যায়নে এককালের প্রতিষ্ঠিত সত্য তার আপাতঃ অনড় আসন থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানের সত্যও বারবার পরিবর্ত্তিত হয়েছে। কাজেই অনুসন্ধিৎসু তার অনুসন্ধান অব্যাহত রাখলে অনেক নূতন সূত্রের উদ্ভাবনদ্বারা নতুন কোন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। আর বিশ্বাস ? বিশ্বাস মাত্রই ত' অন্ধ। কারণ

অন্যের প্রমাণিত বা প্রতিষ্ঠিত সত্যকে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়াতেই বিশ্বাসের প্রশ্ন। আমরা কেউই ত' চের্নোবিলের দুর্ঘটনার ব্যাপ্তি, বিস্তৃতি এবং ভয়াবহতা চোখে দেখিনি; চোখে দেখিনি নিজের দেশের ভূপালের গ্যাস দুর্ঘটনার মর্ম্মান্তিক পরিণতি। অথচ খবরের কাগজ পড়ে অপরের দেখা এবং লেখা বিবৃতিকে ত' সত্য বলে মেনে নিচ্ছি। মেনে নিচ্ছি নিকট অতীতের ঘটনা বলে। দূর অতীতের ঘটনাও ত' দূর অতীতের মানব-প্রজ্ঞারই প্রদত্ত প্রতিবেদন। তবে সেখানে অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠবে কেন? বিজ্ঞান যুক্তি-নির্ভর শাস্ত্র, কখনই তা একদেশদর্শী নয়। তাই নিজের ক্ষেত্রের সব কিছুই সত্য, আর অন্যের ক্ষেত্রের সব কিছুই অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার—এ অভিমত কি একদেশদর্শী নয়?

আমরা বেদনা বোধ করি যখন একজন পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকস্থানীয় ব্যক্তি জ্যোতির্বিজ্ঞান বা জ্যোতিষবিজ্ঞানকেও অস্বীকার করবার স্পর্দ্ধা প্রদর্শন করেন। আমাদের মনে হয়, গোলমাল যত নীচের থাকে। উচ্চকোটিতে গোঁজামিল বা গোলমালের কোন সম্ভাবনা নেই। জ্যোতিষশাস্ত্রকে অবাস্তব কল্পকাহিনী বললে সন্তান হয়ে মাকেই বন্ধ্যা বলার সামিল হয়ে যায়। গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান, রাশিগুলির বিবর্ত্তন ওতঃপ্রোতভাবে সম্বন্ধ। আর সমগ্র নিসর্গ জগতের সঙ্গে মানবদেহের যোগ নিবিড় ও অচ্ছেদ্য। তা' যদি না হত তবে পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় শারীরিক অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুভূত হয় কেন? দু'একজনের ক্ষেত্রে হলে তা' শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য বা অপটুতা বা ভাইরাস-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হবার কথা না হয় স্বীকার করা গেল, কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে অমাবস্যা-পূর্ণিমার প্রভাব পড়ছে কিভাবে? এর বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা কি? তাই যে বিদ্যা আমার অধিগত নয়, তার সত্যাসত্য সম্বন্ধে আমার অভিমত ব্যক্ত করা বাতুলতা নয় কি?

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের একটা স্থির ধর্ম্মবিশ্বাস—বৃহস্পতি গ্রহের প্রভাব পৃথিবীর পক্ষে শুভ এবং শনি পৃথিবীর পক্ষে বিপজ্জনক এবং অশুভ। বৃহস্পতি যেমন ফসলের উন্নতি এবং ফসলের সুযোগ ঘটায়, তেমনি শনি স্বাস্থ্যহানি, মৃত্যু ও দুর্ভিক্ষের সহায়ক। অথচ যে বিজ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কিছু মানতে রাজী নয়, সেই বিজ্ঞানও আজ দীর্ঘকালের প্রচলিত ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে মেনে নিয়েছে। অবশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর। কিন্তু পরীক্ষান্তে প্রমাণিত হল ত' সেই ধর্ম্মবিশ্বাসই। তাই ধর্ম্মবিশ্বাসকে অবৈজ্ঞানিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। সম্প্রতি রাশিয়ার ইঞ্জিনীয়ারদের ফেডারেশন

"এনিয়ন" এ ধর্ম্মবিশ্বাসকে প্রমাণ করতে পেরেছে। "১৯৭৯-৮১ সালের মহাকাশযান ভয়েজার—১ ও ভয়েজার—২ বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের পাশ দিয়ে উড়ে যাবার সময় প্রাচীন বিশ্বাসের সত্যতা অপ্রত্যাশিতভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। সে দেশের জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী এ প্রসঙ্গে গবেষণা করে জানিয়েছেন যে, বৃহস্পতি ও তার উপগ্রহরা সম্মিলিতভাবে এক জেনারেটার বা শক্তি উৎপাদক হিসাবে কাজ করে এবং সে গ্রহের বিদ্যুৎ চুম্বকক্ষেত্র পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পক্ষে মঙ্গলজনক। অন্যদিকে বলয়সমূহ সমেত শনিগ্রহ প্রায় বিশাল এক প্রোটন-সিংক্রোটনের কাজ করে। নানা গ্যাসের প্রায় মহা জাগতিক গতিবেগের আয়ন ছিটকে পারিপার্শ্বিক মহাকাশে বর্ষিত হতে থাকে। সে গ্রহের আবহমণ্ডল ছাড়িয়ে ঐ সব আয়ন মহাকাশের দীর্ঘপথ পরিক্রমা করে পৃথিবীসহ অন্যান্য দূরের গ্রহতেও পৌঁছায়। এ আয়নের বড়-বাড়ন্ত পৃথিবীর বহু ক্ষতি করে।"

আগেই বলেছি; যত গোলমাল নীচের পর্য্যায়ে। তেমন গোলমাল ত' সর্ব্বক্ষেত্রেই সম্ভব। ধর্ম্মের উচ্চকোটির চিন্তার সঙ্গে ঝাড়-ফুক, দোওয়া-তাবিজ, কবজ-মাদুলীর চিন্তা-ভাবনা যোগসূত্র রচনা করে ধর্ম্মের পরিবাদ কীর্ত্তন কি যুক্তিবিরুদ্ধ নয়? একথা সত্য, ধর্ম্মজগতে Exploitation এর অনুপ্রবেশ তাকে কলুষিত করেছে। বিচক্ষণ ব্যক্তির নিকট অশ্রদ্ধেয় করে তুলেছে। কিন্তু কিছু দুষ্কৃতকারীর অপকর্ম্মের জন্য গোটা ধর্ম্ম জগৎকে দায়ী করলে বিচারবুদ্ধির উপর আস্থা রাখা দায় হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানের জগতের বিধ্বংসী মারণাস্ত্র নির্ম্মাণকারী কিছু বিজ্ঞানীর জন্য সুস্থ সুন্দর পরিচ্ছন্ন মানবকল্যাণমুখী বিজ্ঞানচিন্তার উপর কটাক্ষপাত করা যেমন যায় না, বিজ্ঞান জগৎকে যেমন নিন্দা করা যায় না, ঠিক তেমনি ধর্ম্মজগতের গ্লানির দু'একটী দিককে বড় করে দেখলে ধর্ম্মজগৎকে খাটো করে দেখা হবে। বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের সংঘাতের কোন প্রশ্নই নেই।

বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন বলেছেন,—Science without religion is lame and religion without Science is blind." এখানে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানকে হাত ধরাধরি করে চলবার কথাই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী নির্দ্দেশ করেছেন। দুটী বিষয় বিপরীত ধর্ম্মী হলে তাদের সহাবস্থানের কথা একজন বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী কি করে বললেন? একটীর মধ্যে প্রমাণিত সত্য, অন্যটীর মধ্যে অন্ধবিশ্বাস থাকলে এই সহাবস্থান কেমন করে সম্ভব? একটীর মধ্যে পরীক্ষিত তত্ত্ব, অন্যটীর মধ্যে কল্পকথার ফুলঝুরি থাকলে দুইয়ের মিল কি করে

সম্ভব? এই অনন্ত বিজ্ঞান প্রতিভার সুনির্দ্দিষ্ট নির্দ্দেশ বিজ্ঞানের কল্যাণ-মুখীনতাকে বাস্তবায়িত করতে ধর্ম্মের সর্ব্বতোমুখী কল্যাণ প্রয়াসের সংযুক্তি ঘটাতে হবে। ধর্ম্মের মধ্যে অবাঞ্ছিত বস্তুর অনুপ্রবেশ যুক্তি ও বিচারমনস্কতা দিয়ে চোলাই করে নিতে হবে। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর পরস্পরের প্রতিপক্ষ নয়, পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক।

বিজ্ঞান-মনস্কতা আমাদের ততখানি গ্রহণ করতে হবে যতখানি নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের ধর্ম্মীয় অনুশাসন অনুমোদিত। দুঃসাহস বিবেচিত না হলে বলব—বিজ্ঞান মানব-জীবনে মূল্যবোধহীনতা এনে দিয়েছে। বিজ্ঞান-মনস্কতা মানুষকে আত্ম-সচেতন করে তুলেছে, স্বাবলম্বী করেছে, শক্তিমান্ করেছে, আবার প্রচলিত বিশ্বাসগুলিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করতেও প্ররোচিত করেছে। এখানেই প্রয়োজন ধর্ম্মের। ধর্ম্মের বাতাবরণে মূল্যবোধহীনতার স্থান নেই। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ দাস
আটুরিয়া (২৪ পরগণা উঃ)

গণসহ শ্রীরাধাবির্ভাব

গৌরীপিতা হিমাচলের 'কন্যা-সৌভাগ্য'।
দেখিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বত দুঃখিত হইল ॥
অনুরূপ কন্যা-সৌভাগ্য লাভের আশায়।
তপস্যা করিয়া বিন্ধ্য ব্রহ্মার বর পায়।
চতুরানন তারে প্রসাদ করিয়া।
"দু'টী কন্যা লভ"—বর দিলেন হাসিয়া ॥
"আমার কটাক্ষে উত্তম ভর্ত্তা লভিবে।
নিশ্চয়ই সে ধূর্জ্জটি-বিজয়ী হইবে ॥
অশেষ কল্যাণগুণগণ-ভূষিত।
বিশ্বের বিস্ময়, আর প্রেমময় চিত ॥"
—শুনিয়া বিন্ধ্যশৈল আনন্দিত হইল।
অশেষে বিশেষে ব্রহ্মার স্তুতি করিল ॥

এবে বৃষভানুপুরে শ্রীরাধাবির্ভাব ।
শ্রবণে মঙ্গল লভে শ্রীরাধাপ্রসাদ ॥
গোকুলের মহিমা কে বর্ণিতে পারে ?
মো-সম পাতকী তরে যে-নাম-শ্রবণে ॥
বৃষভানু, চন্দ্রভানু গোপদ্বয়ের গৃহে ।
দোঁহাকার পত্নীগর্ভে দু'কন্যা প্রবেশে ॥
বিধিনির্ব্বন্ধে গর্ভ আকর্ষণ করি ।
বিন্ধ্যজায়া-গর্ভে তাহা সংস্থাপেন হরি ॥
পৃশ্নী-সুতপা দোঁহে তপশ্চর্য্যা করি' ।
দ্বাপরে লভিল পুত্র কংসারি হরি ॥
নিত্যপুত্র যশোদার যশোদানন্দন ।
ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণহেতু দেবকীনন্দন ॥
তেমতি বিন্ধ্যশৈলে অনুগ্রহ করি' ।
তাঁহার কন্যা হইলেন সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী ॥
কংসানুচরী দানবী পূতনা রাক্ষসী ।
'শিশুঘাতিনী' জানি চিন্তিত গিরি ॥
বিন্ধ্যাচলের পুরোহিত যজ্ঞ আরম্ভিল ।
সন্ত্রস্তা হইয়া বালঘ্নী ভয়েতে ছুটিল ॥
বিদর্ভদেশ-গামিনী নদীর স্রোতে ।
নিপতিতা জ্যেষ্ঠ কন্যা ভীষ্মক লভে ॥
ভীষ্মক-দুহিতা ব্রজে চন্দ্রভানু-কন্যা ।
'চন্দ্রাবলী' নাম ধরে রূপে-গুণে ধন্যা ॥
'পৌর্ণমাসীদেবী' — যিনি ব্রজে সুবন্দিতা ।
পূতনা হইতে লভে ললিতাদি কন্যা ॥
মনোজ্ঞা, পদ্মা, ভদ্রা, শৈব্যা ও শ্যামা ।
এ সকলে রক্ষা করেন যতনে পূর্ণিমা ॥
বিশাখা যমুনা-প্রবাহে ভাসিবার কালে ।
জটিলা তুলিয়া রাখে আপনার গৃহে ॥

বিন্ধ্যের দ্বিতীয় কন্যা ত্রিজগতের সার।
অপরূপ রূপমহিমা 'তারা' (রাধা) নাম তাঁর ॥
প্রসূতা হইলে কন্যা অপহরণ করি'।
পূতনা আনিল তাঁকে শ্রীগোকুল-পুরী ॥
মহামতি বৃষভানু দুখিত-অন্তর।
দৃষ্টিহীনা কন্যার কৈছে হবে বর ॥
কন্যা লভি' কীর্ত্তিদা পরম হরিষে।
পালেন হৃদয়ে রাখি' অশেষ-বিশেষে ॥
একদা যশোদা আইলা বৃষভানুপুরে।
বালক কানাইসহ রাধা দেখিবারে ॥
দৈবে কানুর হস্ত কন্যার বদন-কমলে।
স্পর্শিতেই দৃষ্টি লভে কৃষ্ণ লক্ষিবারে ॥
বৃষভানু-পুরে কন্যা দিনে দিনে বাড়ে।
ভানুকুল-চন্দ্রিমা গোকুলে প্রকাশে ॥
এইরূপে শ্রীরাধার প্রিয়সখীগণ।
তাঁহার ইচ্ছায় ব্রজে আবির্ভূতা হন ॥
যে 'রাধা' নাম-শ্রবণে, স্মরণ-কীর্ত্তনে।
গর্ভবাস, পাপ, রোগ—ভয় যায় দূরে ॥
গণসহ সে রাধাগোবিন্দ-চরণ।
ভজ মন অনুক্ষণ লইয়া শরণ ॥
"রেফো হি কোটিজন্মাঘং কর্ম্মভোগং শুভাশুভম্।
আ-কারো গর্ভবাসঞ্চ মৃত্যুঞ্চ রোগমুৎসৃজেৎ ॥
ধ-কারমায়ুষো হানিমাকারো ভববন্ধনম্।
শ্রবণ-স্মরণোক্তিভ্যঃ প্রণশ্যতি ন সংশয়ঃ ॥"

—শ্রীরঘুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যে মর্ত্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৫৮ পৃষ্ঠার পর]

(৭) লেখক তাঁহার পুস্তকের ২২।২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"অতঃপর দেখা যাক্, মানুষ চৈতন্যকে তাঁর চরিত্রকাররা কতোখানি অতিমানুষ বানিয়েছেন। চৈতন্যভাগবতে কমপক্ষে অন্ততঃ ১৩ জায়গায় চৈতন্যের নানারূপের অলৌকিকত্ব বর্ণনা রয়েছে। নানারূপ বলতে বর্ত্তমান কালের সত্যান্বেষী গোয়েন্দাদের মতো কখনো সাধু, কখনো ফকির বা পাগল—ঠিক তা নয়। একেবারে আধিভৌতিক ব্যাপার। দেখা যাচ্ছে, দুহাত ধারী মানুষ চৈতন্য ছ'হাত ধারী এক ভয়াবহ অতিমানুষে পরিণত হয়েছেন। কখনো বা ভয়ঙ্কর রূপধারী দৈত্যে। কখনো বা তীক্ষ্ণ দাঁতঅলা শূকর রূপে। আবার কখনো বা মা কালী বা জটাজুটধারী দিগম্বর শিব রূপে। সেইসব রোমহর্ষক স্থানগুলির বিবরণ নিম্নে তুলে ধরলাম। যথা—(এক) মা শচীদেবীর কাছে চৈতন্যের কৃষ্ণরূপ প্রকটন [চৈতন্যভাগবত ২।৮।৬৩-৬৬]। (দুই) মুরারি গুপ্তের কাছে বরাহ রূপ প্রকটন (ঐ ২।৩।১৮-২৪)। (তিন) মাধায়ের কাছে চতুর্ভুজ-রূপ প্রকটন (ঐ ২।১০। ১৯৩-১৯৫)। (চার) চন্দ্রশেখর আচার্যের ঘরে রুক্মিনী-আদ্যাশক্তি রূপ প্রকটন (ঐ ২।১৯ অধ্যায়)। (পাঁচ) অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের কাছে বিশ্বরূপ প্রকটন (ঐ ২।২৩।৪৭-৬০)। (ছয়) সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাছে ষড়্ভুজ রূপ প্রকটন (ঐ ৩।৩।১০১-২)। (সাত) শ্রীধর পণ্ডিতের কাছে কৃষ্ণ বলরাম রূপ প্রকটন (ঐ ২।৯।১৯০-৯৫)। (আট) শ্রীবাস পণ্ডিতের কাছে নৃসিংহরূপ প্রকটন (ঐ ২।২।২৫-৫৯)। (নয়) অদ্বৈতাচার্যের কাছে অপূর্ব্ব কৃষ্ণ রূপ প্রকটন (ঐ ২।৫।৭৪-৮৫)। (দশ) শিবের গায়েনের কাছে শিব-রূপ প্রকটন (ঐ ২।৮। ৯৫-১০১)। (এগারো) মুরারি গুপ্তের কাছে রাম-লক্ষণ-সীতা রূপ প্রকটন (ঐ ২।১০।৬-১০)। (বারো) নিত্যানন্দের কাছে ষড়্ভুজ রূপ প্রকটন ঐ ২।৫।৮৮-৯০) এবং তৈর্থিক নামক বিপ্রের কাছে কৃষ্ণ-রূপ প্রকটন (ঐ ১।৩।২৬৩-৭০) প্রভৃতি।

এ রকম প্রায় সকল চৈতন্য জীবনীকারদের গ্রন্থে মানুষ চৈতন্যকে অল্প বিস্তর অতি-ভৌতিক, আবার কোথাও বা অতি-শাক্তিক (almighty) পরিণত করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনিই সর্ব্ব ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনিই 'যয়া-ত্বয়া জগৎ স্রষ্টা জগৎ পাতাত্তি যো জগৎ।' বেশি দিনের কথা নয়, মাত্র পাঁচশো বছর আগে এক সাধারণ পরিবারের অতি সাধারণ সাংসারিক মানুষকে নিয়ে কেন এমন আধিদৈবিক গল্প করা হয়েছিল ভাবলে সততই বিস্ময় জাগে।"

লেখকের উপরোক্ত বক্তব্যে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, লেখক শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর অলৌকিকত্বে সন্দেহ পোষণ করিয়া তাহা অতি-ভৌতিক ব্যাপার বলিয়াছেন। লেখক উক্ত পুস্তকের ৩০ পৃষ্ঠায় অতি-ভৌতিক শব্দের অর্থে অতীব কাল্পনিক বলিয়াছেন। লেখক ২৩১ পৃষ্ঠায় চৈতন্যভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃতি দিয়া লিখিয়াছেন,—"সার্ব্বভৌমের সমীপবর্তী ষড়ভুজ মূর্তিমানে রূপান্তরিত হলেন চৈতন্য।

অপূর্ব্ব ষড়ভুজ মূর্ত্তি কোটিসূর্য্যময়।
দেখি মূর্চ্ছা গেলা সার্ব্বভৌম মহাশয়॥"

এক্ষণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে কোটি সূর্য্যময় প্রখর ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়া পরমপণ্ডিত সার্ব্বভৌম মূর্চ্ছিত হইলেন, সেই ষড়্ভুজ মূর্ত্তি সম্বন্ধে লেখক তৎপরবর্ত্তী ২৩২ পৃষ্ঠায় মতামত জানাইয়াছেন—"কোন প্রতীকী (Symbol) অর্থে এই ষড়ভুজ বা চতুর্ভুজ মূর্তি ব্যবহারিত হয়েছে বলে মনে হয়।"

ইহাতে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, কোটি সূর্য্যময় প্রখর দীপ্তিযুক্ত কোন প্রতীকী ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব কি? আরও লেখক 'মনে হয়' শব্দ ব্যবহার করায় 'প্রতীকী' শব্দটি লেখকের মনগড়া মাত্র বুঝাইতেছে। লেখক প্রতীকী মনে করিলে তাহাই কি বিজ্ঞজন সঠিক বলিয়া ধরিয়া লইবেন? শ্রীমন্মহাপ্রভু যে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে শুদ্ধভক্তদের দর্শন দিয়াছেন এবং শুদ্ধভক্তগণ তাহাতে মুগ্ধ, হতচকিত বা মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, তাহা কি সর্ব্বৈব মিথ্যা হইতে পারে? লেখক চৈতন্যদেবকে সাধারণ মানুষ মনে করিয়াছেন। কিন্তু চৈতন্যদেব যে-সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহা মানুষের দ্বারা সম্ভব নহে।

লেখক ২২।২৩ পৃষ্ঠায় চৈতন্যদেবের বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হওয়ার কাহিনী যাহা 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থ হইতে বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে চৈতন্যদেবের ভগবত্তাই প্রমাণিত হয়। অবতার-পুরুষ বা ভগবানের দৈহিক আকার ও চিহ্ন তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ এবং তাঁহার কার্য্যকলাপ তটস্থ-লক্ষণ যাহা অন্য জীবের পক্ষে আদৌ সম্ভব নহে।

"অবতার নাহি কহে আমি অবতার।
মুনি সব জানি' করে লক্ষণ বিচার॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩৫৪)
'স্বরূপ'-লক্ষণ, আর 'তটস্থ-লক্ষণ'।
এই দুই লক্ষণে 'বস্তু' জানে মুনিগণ॥
আকৃতি, প্রকৃতি, স্বরূপ,—স্বরূপ-লক্ষণ।
কার্য্যদ্বারা জ্ঞান,—এই তটস্থ-লক্ষণ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩৫৬-৩৫৭)

"অবতার এমত কি আছে অদ্ভুত।
যাহা প্রকাশিলেন হইয়া শচীসুত॥" (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।১৫৫)

সুতরাং ভগবানের আকৃতি—আকার, প্রকৃতি—স্বভাব, স্বরূপ—মূর্ত্তি,—এই তিনটীই স্বরূপ বা মুখ্য লক্ষণ। আর কার্য্যদ্বারা জ্ঞানই তটস্থ বা গৌণ-লক্ষণ। কলিকালে যুগাবতারের স্বরূপ-লক্ষণ—পীতবর্ণ আকার, আর তটস্থ-লক্ষণ—প্রেমদান ও সংকীর্ত্তন-কার্য্য।

"সনাতন কহে—যাতে ঈশ্বর-লক্ষণ।
পীতবর্ণ, কার্য্য—প্রেমদান-সঙ্কীর্ত্তন॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩৬৪)

'চৈতন্যচরিতামৃতে' উল্লিখিত ৩২টী মহাপুরুষের লক্ষণও ভগবানের শ্রীঅঙ্গে পরিলক্ষিত হয় এবং এমতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীঅঙ্গে এইসকল চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। লেখক তাঁহার পুস্তকের ২৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"অদ্যাবধি সর্ব ভারতীয় সন্ন্যাসীদের মধ্যে বোধ করি চৈতন্যই ছিলেন সর্বাপেক্ষা রূপবান পুরুষ। চৈতন্য শুধুমাত্র গুণাবলীর জন্য নয়, ঐশ্বরিকরূপের বিভূষণেও মানুষকে সম্মোহিত করেছিলেন।"

লেখকের বক্তব্যগুলি পরস্পর আলোচনা করিলে দেখা যায়,—শ্রীচৈতন্যদেব ষড়্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ, বিশ্বরূপ দর্শন দান, বরাহ-মূর্ত্তি ধারণ প্রভৃতি যে-সমস্ত লীলা করিয়াছেন; তাহা লেখক কখনও বা অতি-ভৌতিক বা অতি-কাল্পনিক বলিয়া, কখনও প্রতীকী (Symbol) বলিয়া, আবার কখনও বা ঐশ্বরিক রূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে লেখক যে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। 'চৈতন্য ঐশ্বরিক রূপের বিভূষণেও মানুষকে সম্মোহিত করেছিলেন'—ইহা ত' লেখকেরই উক্তি। চৈতন্য মানুষ হইলে তিনি কি ঐশ্বরিক রূপ দেখাইতে পারিতেন? লেখকও ত' একজন মানুষ, তিনি কি ঐশ্বরিকরূপ দেখাইতে পারেন? লেখক তাঁহার পুস্তকের ২৩ পৃষ্ঠায় শ্রীচৈতন্যদেবকে এক সাধারণ পরিবারের অতি সাধারণ সাংসারিক মানুষ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং চৈতন্যদেবের বিশ্বরূপ-প্রকটন, নৃসিংহরূপ-প্রদর্শন প্রভৃতি ঐশ্বরিক রূপগুলিকে আধিদৈবিক গল্প বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লেখকের উক্ত মন্তব্যের সহিত ২৭৩ পৃষ্ঠার মন্তব্যের সামঞ্জস্য হইতেছে কি? ঈশ্বর ব্যতীত ঐশ্বরিক রূপ কেহই দেখাইতে সমর্থ নহেন। লেখকের ২৩ পৃষ্ঠার বক্তব্য অনুযায়ী চৈতন্যদেবের ঐশ্বরিক রূপগুলি যদি আধিদৈবিক গল্প মাত্র হয়, তাহা হইলে ২৭৩ পৃষ্ঠার লেখকেরই বক্তব্য

অনুসারে প্রশ্ন জাগে,—চৈতন্যদেবের ঐশ্বরিকরূপ দেখিয়া মানুষ সত্যই কেন সম্মোহিত হইয়াছিলেন? লেখক নিবেদনে 'ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ' শব্দটি যখন গীতা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন গীতা নিশ্চয়ই লেখক পাঠ করিয়া থাকিবেন। গীতার একাদশ অধ্যায়ে ৮ম শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"... পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্" অর্থাৎ "তুমি আমার ঐশ্বরিক শক্তি দর্শন কর।" তৎপরেই অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান্ বিশ্বরূপ দেখাইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মনোঽভিলাষ পূরণার্থ বিশ্বরূপ দেখাইলেন এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু অন্তর্যামিরূপে ইহা জানিতে পারিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন,—তাহা যে ঐশ্বরিকরূপ গীতার বাণীতেই প্রমাণিত হয়।

"বিশ্বরূপ দেখিয়া অদ্বৈত-নিত্যানন্দ।
কাহারো নাহিক বাহ্য—পরম আনন্দ॥" (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৪।৭৬)

শ্রীচৈতন্য ঈশ্বর বলিয়াই ত' ঐশ্বরিক রূপ দেখাইয়াছেন। ঈশ্বর চৈতন্য, ঈশ্বরই আছেন। চৈতন্য মানুষ নহেন এবং তাঁহাকে কেহই অতি-মানুষ বানায় নাই। এমতাবস্থায় লেখকের চৈতন্যদেবকে ঈশ্বর বলিতে আপত্তি থাকা উচিত কি?

ভগবান্ যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার আবির্ভাবের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত থাকিবেই। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব সর্ব্বাবতারিত্ব-সমীক্ষায় মাত্র কয়েকটি শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ করিতেছি;—

"সপ্তমে গৌরবর্ণো বিষ্ণুরিত্যনেন স্বশক্ত্যা চৈক্যমেত্য প্রান্তে
প্রাতরবতীর্য্য সহ স্বৈঃ স্বমন্ত্রং শিক্ষয়তি।"

(অথর্ব্ববেদ-পুরুষ বোধিনী সূক্তে)

অর্থাৎ—"সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তরে কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু গৌরবর্ণ শ্রীভগবান্ সপার্ষদ অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় হ্লাদিনী-শক্তিদ্বারা জনগণকে 'হরেকৃষ্ণ' মন্ত্রাদি উপদেশ দান করিতেছেন।"

"তথাঽহং কৃতসন্ন্যাসো ভূগীর্বাণোঽবতরিষ্যে তীরেঽলক-
নন্দায়াঃ পুনঃ পুনরীশ্বর প্রার্থিতঃ সপরিবারো
নিরালম্বো নির্ধূত-কলি-কল্মষ-কবলিত-জনাবলম্বনায়।"

(সামবেদান্তর্গত-ব্রহ্মভাগে)

অর্থাৎ—"শিবাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত হওয়ায় কলিপাপহত জনগণের একমাত্র অবলম্বন-হেতু নিরালম্বভাবে সপরিবার ব্রাহ্মণকুলে (আমি) অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিব।" (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৭ ; ইং ১৬।১২।৯০

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

ব্যাসকুল-শ্রবণসজ্যারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৯শে মাঘ, ১৩৯৭ (ইং ২।২।৯১) শনিবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব মাঘী-কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথি** হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্গুরু নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর** মাঘী-কৃষ্ণা পঞ্চমী ৫ই গোবিন্দ, ২১শে মাঘ (ইং ৪।২।৯১) সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরু-পঞ্চক, তত্ত্বপঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—১৯শে মাঘ, শনিবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীগুরুমহিমাসূচক বন্দনাদি, মহাজন-গীতি-কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলিপ্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা কীর্ত্তন এবং শ্রীগুরুমহিমাসূচক ভক্ত্যঞ্জলিরূপ-প্রবন্ধাদি পাঠ ও বক্তৃতা।

২০শে মাঘ, রবিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবদান সম্পর্কে ভাষণ।

২১শে মাঘ, সোমবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।



নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম দুষ্টরূপে পালে সেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪২শ বর্ষ | ১৪ মাধব, সঙ্কর্ষণ, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ
২৯ পৌষ, সোমবার, ১৩৯৭, ইং ১৪।১।৯১ | ১১শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীচতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মকৃতা শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তুতিঃ

শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বৃন্দাবনখণ্ডে শ্রীনারদ-বহুলাশ্ব-সংবাদে ব্রহ্মস্তুতৌ নবমেঽধ্যায়ে]

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

২৫-২৭। ভজে কৃষ্ণক্রোড়ে ভৃগুমুনি-পদং শ্রীগৃহমলং
তথা শ্রীবৎসাঙ্কং নিকষরুচিযুক্তং দ্যুতিপরম্।
গলে হীরা-হারান্ কণকমণিযুক্তাবলিধরান্
স্ফুরত্তারাকারান্ ভ্রমরবলিভারান্ ধ্বনিকরান্॥ ২৫॥
বংশী-বিভূষিতমলং দ্বিজ-দানশীলং
সিন্দুরবর্ণমতিকীচ-করাবলীলম্।

হেমাঙ্গুলীয়-নিকরং নখচন্দ্রযুক্তং
হস্তদ্বয়ং স্মর-কদম্ব-সুগন্ধপৃক্তম্ ॥ ২৬ ॥
শনৈশ্চলন্মানস-রাজহংস-
গ্রীবাকৃতৌ কন্ধর উচ্চদেশে।
কাদম্বিনী-মানহরৌ বরৌ চ
ভজামি নিত্যং হরি-কাকপক্ষৌ ॥ ২৭ ॥

যাঁহার বক্ষ শ্রীবৎস-ভূষিত, যাঁহার নিকষ-পাষাণ-কান্তি অত্যুজ্জ্বল ভৃগুপদ লাঞ্ছিত বক্ষে লক্ষ্মী বিলাস করেন, যাঁহার গলে স্বর্ণরত্ন ও মুক্তাবলী রাজিত এবং তারকাকারে প্রস্ফুরিত মধুকরসমূহের ন্যায় ধ্বনিকারী হীরাহার বিদ্যমান; যিনি বংশী-বিভূষিত, দ্বিজগণে অত্যন্ত দানশীল, সিন্দুরবর্ণ সুন্দর অঙ্গুলীদ্বারা বংশীবাদনে তৎপর; যাঁহার অঙ্গুলীতে স্বর্ণাঙ্গুরীয়, হস্তদ্বয় চন্দ্রতুল্য নখযুক্ত; যিনি কদম্ব-কুসুমের সুগন্ধপৃক্ত ও কামদেব-সদৃশ; সুগতিসম্পন্ন মানস-রাজ-হংসের ন্যায় যাঁহার উচ্চ কন্ধর গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত উন্নত, যাঁহার মনোজ্ঞ কাকপক্ষ মেঘের মানহরণ করিয়াছে, সেই শ্রীহরিকে নিত্য ভজনা করি ॥ ২৫-২৭ ॥

২৮-২৯। কল-দর্পণবদ্বিশদং সুখদং
নব-যৌবন-রূপধরং নৃপতিম্।
মণি-কুণ্ডল-কুন্তলশালি-রতিং
ভজ গণ্ডযুগং রবি-চন্দ্ররুচিঃ ॥ ২৮ ॥
খচিত-কনক-মুক্তা রক্তবৈদূর্য্য-বাসং
মদন-বদন-লীলা-সর্ব্বসৌন্দর্য্যরাসম্।
অরুণ-বিধু-সকাশং কোটি-সূরপ্রকাশং
ঘটিত-শিখি-সুবীটং নৌমি বিষ্ণোঃ কিরীটম্ ॥ ২৯ ॥

স্বচ্ছ-দর্পণবৎ নির্ম্মল, সুখদ, নবযৌবন-কান্তিযুক্ত নরগণের রক্ষক, মণি-কুণ্ডল ও কুন্তলশালী, যাঁহার গণ্ডযুগল মার্ত্তণ্ড ও চন্দ্রের ন্যায় দ্যুতিযুক্ত, যিনি স্বর্ণমুক্তা ও রক্ত বৈদূর্য্যখচিত বসন পরিধান করিয়াছেন, যিনি মদনের ন্যায় বদনশালী, সর্ব্বসৌন্দর্য্যের সারভূত রাস-লীলাকারী, অরুণ-চন্দ্রকান্তি ও কোটিসূর্য্যতুল্য-প্রভ এবং যাঁহার চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ বিদ্যমান, সেই বিষ্ণু-কিরীটকে নমস্কার করি ॥ ২৮-২৯ ॥

৩০। যদ্দ্বারিদেশেন গতিশ্চ হেন্দ্র-
গণেশ-তারেশ-দিবাকরাণাম্।

আজ্ঞাং বিনা যান্তি ন কুঞ্জমণ্ডলং
তং কৃষ্ণচন্দ্রং জগদীশ্বরং ভজে ॥ ৩০ ॥

যাঁহার দ্বারদেশে কার্ত্তিক, গণেশ, ইন্দ্র, চন্দ্র ও দিবাকরের গতি নাই, আদেশ ব্যতীত যাঁহার নিকুঞ্জমধ্যে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না, সেই জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ভজনা করি ॥ ৩০ ॥

৩১। ইতি কৃত্বা স্তুতিং ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ।
পুনঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা স্ববিজ্ঞপ্তিং চকার হ ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মা এইরূপে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া পুনরায় করজোড়ে স্বীয় বক্তব্য জ্ঞাপন করিলেন ॥ ৩১ ॥

৩২। অপরাধন্তু পুত্রস্য মাতৃবত্ত্বং ক্ষমস্ব চ।
অহং তন্নাভিকমলাৎ সম্ভবোঽহং জগৎপতে ॥ ৩২ ॥

হে জগৎপতে! আমি আপনার নাভিকমলজাত; অতএব মাতা যেমন পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করেন, তদ্রূপ আপনিও আমার অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ৩২ ॥

৩৩। ক্বাহং লোকপতিঃ ক্ব ত্বং কোটিব্রহ্মাণ্ড-নায়কঃ।
তস্মাৎ ব্রজপতে দেব রক্ষ মাং মধুসূদন ॥ ৩৩ ॥

হে ব্রজপতে! কোথায় আমি একটী লোকের অধিপতি; আর আপনি কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক, অতএব হে মধুসূদন! আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৩৩ ॥

৩৪। মায়য়া যস্য মুহ্যন্তি দেব-দৈত্য-নরাদয়ঃ।
স্ব-মায়য়া তন্মোহায় মূর্খেঽহং হ্যুদ্যতোঽভবম্ ॥ ৩৪ ॥

যাঁহার মায়ায় সুর, অসুর ও নরাদি মোহিত হয়, আমি মূর্খের মত তাঁহাকে আমার মায়ায় মোহিত করিতে উদ্যত হইয়াছি ॥ ৩৪ ॥

৩৫-৩৭। নারায়ণস্ত্বং গোবিন্দ নাহং নারায়ণো হরে।
ব্রহ্মাণ্ডং ত্বং বিনির্ম্মায় শেষে নারায়ণঃ পুরা ॥ ৩৫ ॥
যস্য শ্রীব্রহ্মণি ধাম্নি প্রাণং ত্যক্ত্বা তু যোগিনঃ।
যথা যান্তি তস্মিংস্তু সকুলা পূতনা গতা ॥ ৩৬ ॥
বৎসানাং বৎসপানাঞ্চ কৃত্বা রূপাণি মাধব।
বিচচার বনে ত্বন্তু হ্যপরাধান্ মম প্রভো ॥ ৩৭ ॥

হে গোবিন্দ! আপনি নারায়ণ, আমি নারায়ণ নহি। হে হরে! আপনি ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া শেষ-শয্যায় জলশায়ী হন। যোগিগণ প্রাণত্যাগ করিয়া পূতনার ন্যায় আপনার ব্রহ্মতেজে মিলিত হন। হে মাধব! আমারই অপরাধে আপনি বৎস ও বৎসপালগণের রূপ ধারণ করিয়া বনে বনে বিচরণ করিয়াছেন। (অতএব প্রভো! আমাকে ক্ষমা করুন।) ॥ ৩৫-৩৭ ॥

সাধু-সঙ্গের প্রণালী-বিচার

সঙ্গই স্বভাবের মূল

সঙ্গ হইতে স্বভাব। যে ব্যক্তি যাহার সঙ্গ করে, তাহার তদ্রূপ স্বভাব হইয়া উঠে। পূর্ব্বজন্মের সঙ্গরূপ কর্ম্মদ্বারা জীবের যে স্বভাব গঠিত হয়, তাহা আধুনিক জন্মের সঙ্গদ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং সঙ্গই মানব-স্বভাবের মূল। অতএব কথিত হইয়াছে যে,—

"যস্য যৎ সঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ সঃ তদ্‌গুণঃ।"

স্ফটিক মণি যে-কোন বর্ণের নিকট থাকে তাহাতেও সেই বর্ণ প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ যে পুরুষ যে পুরুষের সঙ্গ করে, তাহাতে তদ্বৎ গুণগুণ প্রতিভাত হয়।

সাধু-সঙ্গই নিঃসঙ্গত্ব

ভাগবতে বলিয়াছেন,—

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে ॥ (ভাঃ ৩।২৩।৫৫)

অসৎ জনের সঙ্গ করিলে ঘোর সংসাররূপ ফলপ্রাপ্তি হয়। কে অসৎ, কেবা সৎ—এ-বিষয় বিচার না করিয়াও সঙ্গ-ফল অবশ্য লাভ হয়। **সাধু-লোকের সঙ্গ করিলে নিঃসঙ্গত্ব-রূপ ফলোদয় হয়।**

অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ কর্ত্তব্য

অসৎসঙ্গ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন,—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্‌যাতি সংক্ষয়ম্ ॥

তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥

(ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪)

সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, হ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ভগ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য—এ-সমস্তই যে অসৎসঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই অসাধু, অশান্ত, মূঢ় ও যোষিৎক্রীড়ামৃগদিগের সহিত সঙ্গ নিতান্ত শোচনীয় জানিয়া একেবারেই পরিত্যাগ করিবে।

সাধুর লক্ষণ ; সাধু-সঙ্গই কর্ত্তব্য

কেবল অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। যত্নপূর্ব্বক সৎসঙ্গ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। যে-সকল সাধুজনের সঙ্গ করিতে হইবে, সেই সাধুগণের লক্ষণ বলিতেছেন,—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্ মদ্গতচেতসঃ॥
ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে॥

(ভাঃ ৩।২৫।২১, ২৩-২৪)

কপিলদেব কহিলেন, হে মাতঃ! তিতিক্ষাযুক্ত, কারুণিক, সর্ব্বদেহীর সুহৃৎ, অজাত-শত্রু, শান্ত সাধুগণ সাধু ভূষণ। শুদ্ধ ভক্তদিগেরই এইপ্রকার স্বভাব। ভক্তগণ মদ্গতচিত্ত, সুতরাং কর্ম্ম, জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ-যোগগত বহুবিধ কষ্টাভ্যাস করেন না। সহজে মদাশ্রয়া-কথাদ্বারা মার্জ্জিত অন্তঃকরণে পরস্পর হরিকথা বলেন ও শ্রবণ করেন। হে সাধ্বি! সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত সেই সাধুগণ সঙ্গদোষ নাশ করেন। তুমি তাঁহাদের সঙ্গ প্রার্থনা কর।

বেশের দ্বারা সাধু নির্ণীত হয় না—সাধু অতি দুর্ল্লভ

আমরা যে-কোন বেশ দেখিয়া কোন ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া স্থির করিব না। পরচর্চ্চা, পরনিন্দা—এ-সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও আমরা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ না দেখিলে কাহাকেও সাধু বলিয়া গ্রহণ করিব না। কলিকালে সাধুর বিচার একেবারে উঠিয়া যাইতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে, যাহাকে তাহাকে বাহ্যিক বেশ দেখিয়া সাধু বলিয়া সঙ্গ করত আমরা ক্রমশঃ সকলেই

কপট হইয়া পড়িতেছি। আমাদের এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। সাধু অনেক পাওয়া যায় না। সাধু-সংখ্যা আজকাল এত অল্প হইয়াছে যে, বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াও বহুদিন অনুসন্ধান করিয়া একটী প্রকৃত সাধু পাওয়া দুর্ল্লভ হইয়াছে।

মাধুর্য্য-রসাশ্রিত কৃষ্ণভক্তি অতীব দুর্ল্লভ

মহাদেব দেবীকে কহিলেন, হে ভগবতি! সহস্র সহস্র মুমুক্ষুদিগের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মুক্ত-লক্ষণ লাভ করেন। আবার সহস্র সহস্র মুক্ত-জনের মধ্যে কেহ কদাচিৎ সিদ্ধি লাভ করেন। আবার কোটী কোটী সিদ্ধ ও মুক্তজনের মধ্যে কদাচিৎ কেহ সৎসঙ্গ-সুকৃতিবলে নারায়ণ-পরায়ণ হন। দেখ, নারায়ণ-ভক্ত প্রশান্তাত্মা, অতএব সুদুর্ল্লভ। এখন দেখুন, দাস্য-রসাশ্রিত শুদ্ধ নারায়ণ-ভক্ত যখন এত দুর্ল্লভ, তখন মাধুর্য্য-রসাশ্রিত কৃষ্ণভক্ত যে কত দুর্ল্লভ, তাহা কি বলিব।

কৃষ্ণভক্তই পরম সাধু এবং তাঁহার সঙ্গের পরম ফল

উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তই আমাদের পক্ষে পরম সাধু। কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গই আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন। কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ পাইলে আমাদের যে লাভ হয়, তাহা ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—

তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রি-নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥

(ভাঃ ১০।১৪।৩৬)

স্বভাবতঃ বিষয়াবিষ্ট রাগ-দ্বেষ আমাদের সমস্ত সত্ত্ব অপহরণ করিতেছে। আমাদের গৃহ, কারাগৃহ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা মোহরূপ অঙ্ঘ্রি-নিগড়ে সর্ব্বদা আবদ্ধ আছি। আমাদের কি দুর্দ্দশা! হে কৃষ্ণ! যেদিন তোমার শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে আমাদের তোমাতে মমতা জন্মে, সেইদিন হইতে আমরা তোমার জন-মধ্যে বসিতে পারি। সেইদিন হইতে আমাদের রাগাদি প্রবৃত্তি আর চৌরের ন্যায় আচরণ করে না; পরম বন্ধুবৎ আচরণ করিয়া তোমার ভক্তির চরণে লীন হয়। সেইদিন হইতে আমাদের গৃহ অপ্রাকৃত হইয়া নিত্যানন্দ দান করে। সেইদিন হইতে আমাদের মোহ কেবল ভক্তি-সেবক হইয়া আমাদের আত্মোন্নতি বিধান করে। অতএব ব্রহ্মা আবার প্রার্থনা করিলেন,—

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো, ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং, ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥

(ভাঃ ১৪।১৪।৩০)

হে কৃষ্ণ! আমি এই ব্রহ্ম-জন্মেই থাকি বা অন্য জন্ম লাভ করি বা পশু-পক্ষী হই, আমার প্রার্থনা এই যে—আমার সেই ভাগ্যলাভ হউক যদ্দ্বারা আমি আপনার ভক্তজনের মধ্যে কেহ হইয়া আপনার পাদপল্লব সেবা করি। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের সঙ্গফলেই জীবের এবম্ভূত অসীম অবস্থা লাভ হয়।

সাধুসঙ্গ-সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

সাধুসঙ্গ কি কার্য্য করিলে হইতে পারে, ইহার বিচার অতীব প্রয়োজনীয়। অনেকে মনে করেন যে, যাঁহাকে সাধু বলিয়া স্থির করা যায় তাঁহার পদসেবা, তাঁহাকে প্রণতি, তাঁহার চরণামৃত সেবন, তাঁহার প্রসাদ সেবা এবং তাঁহাকে কিছু অর্থ দান করিলেই সাধুসঙ্গ হয়। সেই সমস্ত কার্য্যের দ্বারা সাধু সম্মাননা হয় বটে এবং তাহাতে কোন-না কোনপ্রকার লাভ আছে। কিন্তু তাহাই যে সাধুসঙ্গ, তাহা নয়।

সাধুসঙ্গ-লাভের ক্রমোপায়

সাধুসঙ্গ যেরূপে করিতে হয়, তাহা বলিতেছেন,—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রী-শূদ্র-হূণ-শবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রম-পরায়ণ-শীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥ (ভাঃ ২।৭।৪৬)

'অদ্ভুতক্রম' শব্দে 'শ্রীকৃষ্ণ'। শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্তগণ অদ্ভুত-ক্রমপরায়ণ। সেই ভক্তগণের 'শীল' অর্থাৎ 'স্বভাব' ও 'সচ্চরিত্র' যিনি বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা করেন, তিনিই নিশ্চয় ভগবানের মায়া-শক্তিকে জানিতে পারেন, আর কেহ জানিতে পারে না। তিনিই কেবল মায়া-সাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইতে সক্ষম হন। যে-কোন স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর, অন্য পাপ-জীব ও পশু-পক্ষী কৃষ্ণভক্তের স্বভাব শিক্ষা করিতে পারেন, তিনিই অনায়াসে ভব-সাগর পার হইবেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভক্তচরিত্র অনুসরণ করিয়া যে অনায়াসে সংসার-সাগর পার হইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? তাৎপর্য্য এই যে, বহু শাস্ত্র-জ্ঞান লাভ করিলেও মায়াবল অতিক্রম করিতে পারে না। উত্তম জাতিলাভ করিলেও কোন চরম লাভ হয় না। শাস্ত্র-বিচারদ্বারা শুষ্ক বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেও সংসার পার হওয়া যায় না। ধন ও সৌন্দর্য্যের দ্বারাও সে লাভ হয় না। কেবল শুদ্ধ ভক্ত-সাধুগণের স্বভাব ও সচ্চরিত্র বহু যত্নে অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহা নিষ্কপটে অনুকরণ করিতে পারিলে বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।

বিষয়ীর দৈন্য ও কৃপা-প্রার্থনা—কপটতা মাত্র

বিষয়িগণ সাধুর নিকট প্রণতিপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন যে,—"হে দয়াময়! আমাকে কৃপা করুন—আমি অতিশয় দীন-হীন, আমার সংসার-বুদ্ধি কিরূপে দূর হইবে?" বিষয়ীর এই বাক্যগুলি কপট বাক্য মাত্র। তিনি মনে জানেন যে, কেবল অর্থলাভই লাভ ও বিষয়-সংগ্রহই জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁহার হৃদয়ে শ্রী-মদ অহরহঃ জাগ্রত আছে। কেবল প্রতিষ্ঠা-লাভের বাসনা ও সাধুগণের শাপের দ্বারা আমার বিষয় ক্ষয় না হয়—এই ভয় হইতে তাঁহার নিকট কপট দৈন্য ও কপট ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি ঐ সাধু তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন যে,—"ওহে তোমার বিষয়-বাসনা দূর হউক এবং ধন-জন তোমার ক্ষয় হউক।" তখনই ঐ বিষয়ী বলিবেন,—"হে সাধু মহারাজ! আপনি আমাকে এরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন না। এরূপ আশীর্ব্বাদ কেবল শাপমাত্র সর্ব্বদা অহিতজনক বাক্য।" এখন দেখুন, সাধুগণের প্রতি এরূপ ব্যবহার নিতান্ত কপট।

কপটতাহেতু সাধুসঙ্গের ফল-লাভে বঞ্চিত

জীবনে অনেক সাধুজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু আমাদের কপট ব্যবহারে আমরা সাধুসঙ্গের কোন ফল লাভ করি না। অতএব সরল শ্রদ্ধার সহিত আমরা সংপ্রাপ্ত সাধু-মহাত্মার সচ্চরিত্র নিরন্তর যত্নপূর্ব্বক অনুসরণ করিতে পারিলে সাধুসঙ্গদ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করি। এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া প্রকৃত সাধুর সন্নিকটস্থ হইয়া তাঁহার স্বভাব-চরিত্র অবগত হইব এবং যাহাতে আমাদের স্বভাব-চরিত্র তদ্রূপ গঠন করিতে পারি, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিব। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের শিক্ষা।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

"যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণ-পথ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ব্যবহার

ব্যবহার হইতে পরমার্থ পৃথক্। বদ্ধজীবের নশ্বর প্রয়োজনকে ব্যবহার বলে। তাহার অপর নাম অনর্থ। অনর্থের ব্যতিরেক ভাবই পরমার্থ। পরমার্থ নিত্য, ব্যবহার তাৎকালিক মাত্র। ব্যবহার ভোগময় ও ত্যাগপর। পরমার্থ ভগবৎসেবোন্মুখ ও বদ্ধানুভূতির ভোগ্য নহে।

লোকে অনেক সময়ে ব্যবহারকেই পরমার্থ মনে করে এবং পরমার্থকে ব্যবহারের অন্তর্গত করিতে প্রয়াস করে। অনেকে ধর্ম্ম বা অলৌকিক ধারণাকে লৌকিক ভোগের অন্তর্ভুক্ত করে, তাহার ফলে তাহারা পরমার্থ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয়। যাহাদের নিত্যানিত্য বিবেক নাই, চিদচিদ্-বৈশিষ্ট্যের ধারণা করিতে যাহারা অসমর্থ, ব্রহ্ম ও মায়াবদ্ধ জীবকে যাহারা এক মনে করে, তাহারা যে ব্যবহারকেই পরমার্থ বলিয়া ভ্রম করিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি?

কর্ম্মকাণ্ডের বিচারসমূহ অনেক সময় ব্যবহারনিপুণ সমাজের নিয়ন্তা হয়। কর্ম্মিগণের চেষ্টা নশ্বর ভোগপর হওয়ায় বৈরাগ্যের শুদ্ধ আদর্শকে তাহারা সর্ব্বদা কলঙ্কিত করে এবং পরমার্থকে ব্যবহার জীবনের অন্যতম কৃত্য বলিয়া মনে করে। সেইরূপ অবিবেচনার ফলে তাহারা পারমার্থিকের অপ্রাকৃত চরণে অবলীলাক্রমে অপরাধ করিয়া বসে।

সম্প্রতি পরমার্থের আলোচনা করিতে গিয়া অনর্থের প্রবল অত্যাচারে আমরা প্রাকৃত সহজিয়াগণের হাবভাব দেখিয়া বিস্মৃত হই। ব্যবহারিক সহজিয়াগণ আপনাদিগকে বুঝদার মনে করিয়া জড়ের ভোগবাসনাকে পরমার্থ বলিয়া ভ্রান্তিময়ী ধারণা পোষণ করে, তাহাতে তাহাদের মঙ্গল হয় না। শ্রীব্যাসদেব পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন,—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

অনেকে প্রত্যক্ষজ্ঞানে প্রতারিত হইয়া শ্রীগুরুদেবকে মনুষ্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহাকে নীচের সন্তান বলিয়া জ্ঞান করেন এবং শিষ্য স্বয়ং উচ্চবংশজাত

মনে করেন। ব্রহ্মজ্ঞের গুরু পরমাত্ম যোগনিরত শুদ্ধজীবাত্মা এবং যোগেশ্বরের গুরু হরিসেবাপর বৈষ্ণব; একথা ভুলিয়া প্রাকৃত সহজিয়া শ্রীগুরুদেবকে ও বৈষ্ণবকে নীচের সন্তান বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। প্রাকৃত সহজিয়া শ্রীমহাপ্রসাদ বিশ্বাস করেন না। তিনি দেশবিদেশে নিজ নিজ ব্যবহারিক সমাজের স্মার্ত্তকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করিতে গিয়া নিত্যকাল পরমার্থ হারাইয়া ফেলেন। পারমার্থিকগণকে নিজের বর্ণ জ্ঞান করিয়া প্রকৃত সত্য হইতে ভ্রষ্ট হন। সময়ে সময়ে আপনাকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করিয়া বসেন। ফলে হয় এই যে পরমার্থচ্যুত হইয়া নরক লাভই তিনি শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন। বিষ্ণুকে অন্য দেবের সহ সমান বুদ্ধি করা নারকীর লক্ষণ। বিষ্ণুর নাম ও বিষ্ণুমন্ত্রকে অপর আভিধানিক শব্দের অন্যতম জ্ঞানই অজ্ঞানের পরিচায়ক। বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের পদজলকে অপর জলের সহিত সমান জ্ঞানই নারকীর অক্ষজ জ্ঞান।

মায়াদ্বারা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তকে নিজজ্ঞানে মাপিয়া লওয়া যায় না। যিনি মাপিয়া লইতে প্রমত্ত হন তাঁহার অচিরেই বিনাশ লাভ ঘটে ও বৈষ্ণবাপরাধে অমঙ্গল ঘটিয়া যায়। জড়ীয় আভিজাত্য, ভোগপিপাসা, অর্থৈষণা, পুত্রৈষণা প্রভৃতি প্রবল হইয়া নরকের পথের পথিক করাইয়া দেয়। জীবের স্বাভাবিক বিনয় ঔদ্ধত্যে পরিণত হয়। পাণ্ডিত্য নীচতা ও হিংসায় পর্য্যবসিত হয়।

যাহারা গ্রাম্য ব্যবহার-রসে প্রমত্ত তাহারা কখনও হরিলীলা ও শ্রীমদ্ভাগবত বুঝিতে পারে না। তাহারা বৈষ্ণবের অনুকরণে কতকগুলি কাপট্য প্রচার করিয়া হাস্যাস্পদ হয় মাত্র। চক্ষের জল সাত্ত্বিকভাবসমূহের অনুকরণ, দশা পাওয়া প্রভৃতি বাহ্যিক কপটতা আশ্রয় করিয়া বৈধভক্তিকে বিপন্ন করে মাত্র। তাহাদের বোধশক্তি কপটতা করিতে করিতে এতদূর আচ্ছন্ন হয় যে তাহারা দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া গুরুবৈষ্ণবকে তাহাদেরই ন্যায় নীচের সন্তান, কপট প্রভৃতি দুর্ব্বাক্যে ভূষিত করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। হরিদাস ঠাকুরের প্রেম দর্শন করিয়া একটী মূর্খ ব্রাহ্মণ পরিচয়াকাঙ্ক্ষী সন্তান কৃত্রিম ভক্তিভাব দেখাইতে গিয়া যে-প্রকারে ডঙ্ককর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়াছিল, যাঁহারা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই কপটীর বৈষ্ণব-চেষ্টানুকরণের ফলে দণ্ডের কথা সবিশেষ অবগত আছেন। অধুনা কতিপয় অর্থলোভী প্রতিষ্ঠাশাপরায়ণ মায়াবাদী কুকর্ম্মরত জীব ভগবদ্ভক্ত পরিচয়ে পরিচিত হইবার লোভে নিজের ব্যবহারিক আভিজাত্য লইয়া ভক্তগণকে ও কোমলশ্রদ্ধ সমাজকে ঠকাইবার উদ্দেশে বৈষ্ণবের সজ্জা না লইয়াই হাম্ বড়া বৈষ্ণব খ্যাতি লাভ করিতে গিয়া ব্যবহারিক অবৈষ্ণবতাকে বহুমানন করিয়া কলিজনোচিত কার্য্য-বিস্তারে

শুদ্ধ ভক্তিশাস্ত্রের অমর্য্যাদা আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন। তাহারা নির্ব্বোধ লোকদিগের নিকট প্রকাশ করিতেছে যে, বৈষ্ণবগণ সমাজের অগ্রণী নহেন। অপ্রাকৃত ধর্ম্ম প্রাকৃত সমাজের অধীন। ধর্ম্মাধীন সমাজের পুনঃ সংস্থাপনের আবশ্যকতা নাই। সমাজের ব্যবহারিক অবৈধ নিয়মগুলিতে চিরদিনই পরমার্থ-পথ রুদ্ধ থাকুক্। আর অর্ব্বাচীনতার সুবিধা লইয়া তাহারা যার পর নাই তাণ্ডব নৃত্য করিবার অবসর পাউক্। বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রম-বিধি পুনঃ সংস্থাপিত না হইয়া অবিচারিত স্বার্থপর নীতিগুলি সদ্ধর্ম্মপ্রচারকগণ স্বীকার করুন, তাহা হইলেই ধর্ম্মের নামে তাহারা নিজ নিজ মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা বিস্তার করিয়া রাবণের ন্যায় উপাস্যবস্তু সীতাহরণকেও ধর্ম্ম নামে চালাইতে পারেন। সমাজের কুপ্রথাসমূহ যাহাতে অপনোদিত হয় তাদৃশ পরিমার্জ্জনে বাধা দিতে গিয়া শুদ্ধ বর্ণাশ্রমের প্রতি কটাক্ষ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। শাস্ত্রের নামে মূর্খতার অন্তরালে হরি-বিদ্বেষ, সাধু-বিদ্বেষ প্রভৃতি চলিতে পারে না। চুরি করিয়া নিজের চৌর্য্যবৃত্তি আবরণ করিতে গিয়া অপর সাধুকে নিজের ন্যায় অসৎ মনে করিলে সাধারণ লোকেরও আর তাহাদের ধরিয়া ফেলিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। ধর্ম্মই সমাজের রক্ষক। অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলনকারী কুনীতিপরায়ণ সমাজ কখনই শুদ্ধভক্তিধর্ম্মকে অধীন করিতে পারে না। বদ্ধজীব যেরূপ ব্রহ্মকে মাপিয়া লইতে অসমর্থ, নিজের ভ্রম-প্রমাদাদি সঙ্কীর্ণ চেষ্টাদ্বারা ভগবদ্ভক্ত বৈকুণ্ঠবস্তুকে বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার ন্যায় স্বায়ত্তীকৃত করিবার নিষ্ফল চেষ্টা করে, সেইরূপ সত্যকে আবরণ করিয়া কেহই কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশার ভোগরূপ গৃহব্রত-ধর্ম্ম চালাইতে পারেন না। অচিরেই তাঁহাদের কাপটা ধরা পড়িয়া যাইবে।

অভক্ত—ভক্তির ভান করিয়া কতক্ষণ লোক-প্রতারণা করিতে সমর্থ হইবে আমরা তাহা বুঝি না। চাণক্য বলিয়াছেন,—যে কাল পর্য্যন্ত মূর্খ কিছু না বলে, তৎকাল পর্য্যন্তই পণ্ডিত বলিয়া গণিত হয়, কিন্তু বাক্‌জাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেই তাহার স্বরূপ ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। দাঁড়কাক ময়ূরের মত বিভূষিত হইলেই সে ময়ূর হয় না। বাহিরের চিহ্ন অথবা সাধুচিহ্নের নিন্দাপর হইয়া ভিতরের কপটতা লইয়া সাধু হওয়া যায় না। অসাধুতা আপনা হইতেই ফুটিয়া বাহির হয়। প্রাকৃত সহজিয়া কপটীগণ এখনও সাবধান হউন।'

——জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব

ভাষা ভাবের অভিব্যক্তি

'ভাষা' ভাবের অভিব্যক্তি। নানাপ্রকার লেখ-প্রণালীর দ্বারা ইহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। মূক ব্যক্তির নিকট 'বৈখরী' স্বর প্রভৃতির বিকাশ না থাকিলেও অঙ্গভঙ্গিই সে-স্থলে ভাবের যানবাহন। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলে কতকগুলি ভাবের বিকাশ, লেখ-প্রণালী ব্যতীত অন্য প্রকারে প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্রসাম্য লক্ষ্য করা যায়। হাস্যের প্রক্রিয়া, রোদন, উল্লাস, ভীতি প্রভৃতির অভিব্যক্তি সর্ব্বত্রই একইরূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে-কোন প্রক্রিয়ার দ্বারাই ভাবের অভিব্যক্তি হউন না কেন, ব্রাহ্মী ইত্যাদি লেখ-প্রণালীর দ্বারা যে অক্ষরাত্মক অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই 'ভাষা' নামে কথিত হয়।

ভাষার পার্থক্য

দেশ, কাল, পাত্রভেদে ভাষার পার্থক্য প্রচারিত আছে। কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতাদিরও ভাষা আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ, পশুতত্ত্ব আলোচকমণ্ডলী ও বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই ইহাদের ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহাদের স্ব-স্ব চিত্তবৃত্তিকেই কেন্দ্র করিয়া উহা বিচার করিয়াছেন। সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বজীব-তত্ত্বের ভাষার জীবনীশক্তির পর্য্যালোচনা করিতে হইলে কি-প্রকার মানদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে, এস্থলে তাহাই বিচার্য্য বিষয়। কীট-পতঙ্গাদি, আব্রহ্ম দেব, দানব, মনুষ্য, স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেরই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চেতনের বিকাশ-স্বরূপ ভাব-ভাষাদি বর্ত্তমান এবং তাহাদের মধ্যে বাহ্যতঃ যেরূপ পার্থক্য লক্ষিত হয়, তদ্রূপ ভাব ও ভাষার পার্থক্য বর্ত্তমান।

বিভিন্নাংশ অণুচৈতন্যের ভাব ও ভাষা

সমগ্র ভারত বা ভারতের যাবতীয় দেশ-প্রদেশেই চেতনধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক চেতনই এক ধর্ম্মে অবস্থিত হইলেও তাহারা বিভিন্নাংশ। এক অণুচেতন, অন্য অণুচেতনের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিয়া থাকে। এই আদান-প্রদানের প্রণালীই 'ভাষা' বলিয়া কথিত হয়। কীটাণুকীটের অন্তর্নিহিত অণুচেতন, বৃক্ষলতা ও পশু-পক্ষী প্রভৃতির অন্তর্নিহিত অণুচেতন পরস্পরের সহিত ভাব বিনিময় করিয়া থাকে। কিন্তু এক জাতি অন্য জাতির ভাব বিনিময়ের প্রণালীর সহিত ভেদ স্থাপন করিয়াছে। এই

ভেদ প্রত্যেক জীবের অন্তর্নিহিত অণুচেতনের নহে। কারণ ইহা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সর্ব্ববাদিসম্মত যে, চেতনতায় কাহারও কোন পার্থক্য নাই। অর্থাৎ জীবাত্মা স্বরূপতঃ বিভিন্নাংশরূপে একই—ইহাই যাবতীয় আস্তিকগণের বিচার। বিভিন্নাংশ অণুচৈতন্য জীবাত্মা অণুত্বে ও ধর্ম্মে এক হইলে তাহার ভাব ও ভাষা পৃথক্ হইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। আমরা সমাজগত বা দেশগত সসীম সমষ্টির মধ্যে ভাষাগত সাম্য লক্ষ্য করিয়া থাকি। সুতরাং ভাষার পার্থক্য, বিভিন্নাংশ অণুচৈতন্য জীবের স্বভাবগত নহে। ভগবানের মায়াশক্তি-বিরচিত দেশ-কাল-পাত্রাদি আবরণ হইতে উদ্ভূত ভাষারই পার্থক্য বর্ত্তমান।

বিভিন্নাংশ জীবের ভাষা বৈশিষ্ট্য

এক জাতীয় বিভিন্ন আত্মার ভাব-বৈভিন্ন্য অস্বীকৃত নহে; অথচ ভাষার বৈভিন্ন্য না থাকিলেও বৈশিষ্ট্য আছে। একই ভাষার গুরুত্ব-লঘুত্ব, লালিত্য-কাঠিন্য প্রভৃতি ভেদে পার্থক্য লক্ষিত হইলেও ভাষাগত ভেদ নাই। তথাপি তাহাকে 'বৈশিষ্ট্য' বলিতে কোনপ্রকার আপত্তি থাকিতে পারে না। পরন্তু বৈশিষ্ট্যই ভেদের কারণ। অণুচেতনের ভাষার বৈশিষ্ট্য থাকিলেও তদ্দ্বারা ইহা বুঝাইবে না যে, প্রত্যেক জীবাত্মার স্বরূপ গঠনের আত্মগত বৈশিষ্ট্য ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার ভেদ আছে। যাহারা জীবাত্মার বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করিতে চেষ্টা করেন, তাহাদের ভাব ও ভাষা সমস্তই মিথ্যা হইয়া পড়ে। আমরা ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া ঐরূপ 'ব্যবহারিকতা' ও 'মিথ্যার' প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহি।

দিব্য বা দৈব-ভাষা

আত্মা দিব্য বস্তু, প্রকৃতির কোন বস্তু নহেন। সুতরাং আত্মার ভাব ও ভাষা দিব্য বস্তু অর্থাৎ দৈবভাব-সম্পন্ন। তজ্জন্যই আত্মার ভাষা দিব্য ও দৈব। আত্মতত্ত্ব অনুশীলনে যাঁহারা যত উন্নত, তাঁহাদের ভাব ও ভাষাও তত উন্নত। যে দেশ যত নিম্নগতিতে চলিতে থাকে, সেই দেশের ভাব ও ভাষা তত নিম্নগামী হইয়া থাকে। চিন্তাস্রোতের অসম্পূর্ণতাই ভাষার অসম্পূর্ণতা আনয়ন করে। দিব্য বস্তু বা ভাব যাহার দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, তাহাও দিব্য এবং সম্পূর্ণ। তাহা যতই বিস্তৃত হউক বা ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হইতে সংক্ষিপ্ততর বা সংক্ষিপ্ততম হউক না কেন, উহা দিব্য এবং পূর্ণ। আমরা বেদচতুষ্টয়কে অতি বিস্তৃত দেখিলেও উপনিষদাদি তাহা অপেক্ষা অনেক

সংক্ষিপ্ত। উপনিষদ্, পুরাণ, ইতিহাসাদি বিরাট্‌ভাবে দৃষ্ট হইলেও সূত্রাকারে 'ব্রহ্মসূত্রে' আরও সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইহাও মন্ত্রে এবং বীজে আরও সংক্ষিপ্ত আকারে লক্ষিত হয়। 'বীজ' অতি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে সমগ্রতা ও বিরাটের সত্তা লক্ষিত হওয়ায় ইহা সম্পূর্ণ। বটের বীজ অতিশয় ক্ষুদ্র হইলেও তাহাতে বিরাট্ মহীরুহের সত্তা থাকায় উহা পূর্ণ। নৃসিংহতাপনী বলেন,—"বাঙ্মা ওঙ্কারো বাগেবেদং সর্ব্বং ন হ্যশব্দমিবেহাস্তি।" (নৃঃ তাঃ ৮।২)

উক্ত উপনিষদের শঙ্করভাষ্য-রহস্যার্থ-দীপিকায় লিখিত হইয়াছে—"বাঙ্মাত্রত্বাচ্চোঙ্কারস্যোতত্ত্বং সিদ্ধমিত্যাহ বাঙ্মা ইতি। সর্ব্ব-বর্ণন-কবলন-রূপত্বাদ্ বৈখর্য্যাদিরূপত্বাচ্চ বাঙ্মাত্রমবগন্তব্যম্।"

অর্থাৎ ওঙ্কারের বাঙ্মাত্রতাহেতু তাহার ওতত্ত্ব অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপকত্ব সিদ্ধ আছে। ওঙ্কারদ্বারা সকল পদার্থ বর্ণিত হয়। সকল পদার্থই ওঙ্কারের কবলীকৃত বা অন্তর্গত এবং বৈখরী প্রভৃতি স্বরও ওঙ্কারের স্বরূপ মাত্র। এই নিমিত্ত ওঙ্কারকে বাঙ্মাত্র বলিয়া জানিবে।

এস্থলে অপৌরুষেয় বৈদিক বাণী হইতে জানিতে পারি, বীজ-স্বরূপ ওঙ্কারে (ওঁ) যাবতীয় বর্ণ, শব্দ, বাক্য ও ভাষা কবলীকৃত হইয়াছে। বেদ-পুরাণ-ইতিহাসাদি এই ওঙ্কারেরই বিস্তার এবং আরও কথিত হইয়াছে যে, শব্দরূপ ওঙ্কার হইতেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি হইয়া থাকে। সুতরাং 'ওঁ' এই দিব্য শব্দটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও ইহা পূর্ণ এবং ইহাতেই বস্তু ও তত্ত্ব নিহিত আছে —ইহা বৈজ্ঞানিক রূপে সিদ্ধ।

'সংস্কৃত' ভাষার বৈশিষ্ট্য

ইংলণ্ড, গ্রীস, জার্ম্মান, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশের ভাষার সহিত আমাদের ভারতীয় ভাষার তুলনা করিলে ইহার পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বিশেষ-ভাবে অনুভব করিতে পারি। এই পার্থক্যের মূল কারণ প্রকৃতি এবং প্রকৃতি-জাত দেশ, কাল ও পাত্র। ভারতবর্ষ এই প্রকৃতিজাত দেশ, কাল, পাত্র হইতে বহির্ভূত না হইলেও, সে এই প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হইতে অতীত রাজ্যের অনুশীলন করিয়াছে। পার্থিব পরমাণুর সংযোগে যে চেতনতার আভাস লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইতেও ভারতীয় মনীষিগণ আপনাদের বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছেন। অপ্রাকৃত চেতন প্রাকৃত চেতন (?) হইতে প্রচুর পৃথক্। সুতরাং অপ্রাকৃত অণুচেতনের ভাব ও ভাষা প্রাকৃত চেতন হইতে সর্ব্বতোভাবে বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যময় ভাষার নামই 'সংস্কৃত ভাষা'।

ভাষার 'সংস্কৃত' আখ্যা দিবার উদ্দেশ্য

'সংস্কৃত' শব্দের দ্বারা ইহাই বুঝায়, যে ভাষা সর্ব্বপ্রকার সংস্কার লাভ করিয়াছে। দশসংস্কারে মানব যে প্রকার শুদ্ধি লাভ করে, সেইপ্রকার 'সংস্কৃত ভাষা'টীও সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধতা লাভ করিয়াছে। বিষ সদ্‌বৈদ্যের দ্বারা জারিত হইলে উহা প্রাণনাশক না হইয়া প্রাণরক্ষক হইয়া থাকে। সেইপ্রকার ভাষাগত প্রাকৃত মল দেব-ঋষিগণের দ্বারা জারিত হইয়াছে বলিয়া দেবভাষার নাম—'সংস্কৃত ভাষা'। এই ভাষা অক্ষর ব্রহ্ম-বস্তুর নির্দ্দেশকারিণী।

'অক্ষর'-পরিচয়

দেবভাষা কিছু ক্ষর-বস্তু নহে। ইহা অক্ষরাত্মক নিত্য সনাতন বস্তু। এই অক্ষরাত্মক বস্তুর অনুসন্ধান না করিলেই আমরা 'কৃপণ' হইয়া পড়ি। তজ্জন্য বৃহদারণ্যক (৩।৮।১০) বলিয়াছেন,—"এতদ্ 'অক্ষরং' গার্গি অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স এব 'কৃপণঃ'।

ভারত যদি অক্ষর ও ব্রহ্ম-বস্তুর অনুশীলন না করিয়া কৃপণতার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে ভারত অন্যান্য দেশের ন্যায় দুর্ভাগ্য বরণ করিবে। ভারতীয় লেখ-প্রণালী যাহাই হউক না কেন, দিব্য ভাষা বা দৈবভাষাই অনুচৈতন্য জীবমাত্রের ভাবজ্ঞাপক যানবাহন। বাল্যজীবনে পঞ্চম বর্ষীয় শিশুকে অক্ষর পরিচয় করাইয়া দিবার পদ্ধতি আজও রহিয়াছে। তজ্জন্যই তাহাকে শিক্ষাগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আমরা অক্ষর পরিচয়ের পদ্ধতির সারাংশ পরিত্যাগ করিয়া গতানুগতিক ধারা অনুসারে শিক্ষা আরম্ভের সময় যে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া অবলম্বন করি, তাহাতে ক্ষরবস্তু ব্যতীত অক্ষর-বস্তুর পরিচয় হইতেছে না। আমরা আমাদের ত্রিকালজ্ঞ হিতকামী ঋষিবর্গের শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি। অক্ষর-পরিচয়ের নামে ক্ষর-পরিচয় লইয়াই আমরা বর্ত্তমানে ব্যস্ত হইয়াছি। ভারতীয় বিবিধ লেখ-প্রণালী যাহাই হউক না কেন, অক্ষর বস্তুর সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে তাহা সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে অমঙ্গলের পথে চালিত করিবে।

শব্দ বা ধ্বনির উৎপত্তি

লেখ-প্রণালীর সহিত স্বর বা ধ্বনির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ না থাকিলে উহা নিষ্ফল হইয়া পড়ে। ধ্বনি মূলতঃ বায়ু-বিলোড়নে উৎপন্ন হয়। স্ফোটবাদী বৈয়াকরণিকগণ ভাষাগত ধ্বনির উৎপত্তি-স্থান অনেক প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন—প্রধানতঃ কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ

বলা যাইতে পারে, 'স' তিন প্রকারে তিন স্থান হইতে উচ্চারিত হয়। তালু হইতে উচ্চারিত হইলে তালব্য স='শ', মূর্দ্ধা হইতে উচ্চারিত বলিয়া মূর্দ্ধন্য স='ষ' এবং দন্ত হইতে যে স এর উচ্চারণ হয়, তাহা দন্ত্য স='স'। এইপ্রকার উচ্চারণ ভেদে 'ন' ও দুইপ্রকার। যথা দন্ত হইতে উচ্চারিত বলিয়া ন এর নাম—দন্ত্য 'ন' এবং মূর্দ্ধা হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া উহার নাম—মূর্দ্ধন্য 'ণ'। সুতরাং 'বৈয়াকরণিকের শব্দ বা ধ্বনি বায়ু-বিলোড়িত শব্দের ন্যায় প্রাকৃতই বুঝিতে হইবে। ইহাকে আমরা 'অক্ষর' শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তু বলিয়া মনে করিতে পারি না। অথচ অক্ষর-পরিচয় করিতে গিয়া শিশুগণকে ঐপ্রকার বর্ণ-পরিচয়ই করাইয়া দেওয়া হয়।

বর্ণ অক্ষরের সাদৃশ্য

লেখ-প্রণালীর বর্ণমালার সহিত অক্ষর বস্তুর কোনরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে উহার দ্বারা আমাদের পারমার্থিক মঙ্গলের কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং শাস্ত্রকারগণ বলেন,—বর্ণমালাকে সর্ব্বতোভাবে 'সংস্কৃত' করিয়া অর্থাৎ তাহার যাবতীয় মল বিদূরিত করিয়া অথবা সদ্‌বৈদ্যের ন্যায় জারিত করিয়া গ্রহণ করিলে আমরা অপ্রাকৃত অক্ষর বস্তুর সন্ধান পাইব। 'বর্ণ' এবং 'অক্ষর' এক বস্তু নহে, অথচ সাদৃশ্যযুক্ত। সদৃশবস্তুর উপমানের সহিত ভেদ থাকিলেও, উপমান-জ্ঞানে প্রচুর সাহায্য করিয়া থাকে।

অপ্রাকৃত পণ্ডিতকুলবরেণ্য জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার স্বরচিত 'শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে'র প্রথমে লিখিয়াছেন,—"নারায়ণাৎ উদ্ভূতোঽয়ং বর্ণক্রমঃ"—অর্থাৎ নারায়ণ হইতেই বর্ণসমূহের উদ্ভব হইয়াছে। শ্রীনারায়ণই অক্ষর ব্রহ্মবস্তু। যে বর্ণ অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপ নারায়ণ হইতে উদ্ভূত, তাহা প্রাকৃত জিহ্বায় বা কণ্ঠ, তালু প্রভৃতিতে উচ্চারিত হয় না। তথাপি যে বর্ণসমূহ অক্ষরের উদ্দীপক, তাহাই আমাদের একমাত্র গ্রহণীয়। অর্থবোধক বর্ণসমূহের সমষ্টিতে শব্দ এবং এক বা একাধিক শব্দসমূহের অর্থ প্রকাশক সমাবেশে বাক্য এবং বাক্য-সমষ্টিতে ভাষার উৎপত্তি হইয়া থাকে। আমরা নারায়ণ হইতে উদ্ভূত যে বর্ণসমূহ, শব্দ, বাক্য ও ভাষা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকেই 'সংস্কৃত ভাষা' বলিয়া জানি।

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তি

জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান।
আবির্ভাব-তিথি তব এই ধরাধাম ॥ ১ ॥
যোগ্য নহি বর্ণিবারে মহিমা তোমার।
তবু চাহি বর্ণিবারে করুণা তোমার ॥ ২ ॥
বহুভাগ্য-ফলে পাইনু তোমার চরণ।
তোমার কৃপায় (যেন) করি মহিমা বর্ণন ॥ ৩ ॥
ভানু-রশ্মিদ্বারা যেন ভানুর দর্শন।
তোমার কৃপায় চাই তব মহিমা বর্ণন ॥ ৪ ॥
বৈষ্ণবগত প্রাণ তোমার নিজজন ধন।
গোবিন্দের হও তুমি অতি প্রিয়জন ॥ ৫ ॥
সরস্বতীর প্রিয় শিষ্য অতি গুণবান্।
মায়াপুর নাম যাহা গুণের নিধান ॥ ৬ ॥
অদ্যাবধি তোমার সেবা প্রমাণ আছে তাহাতে।
সূর্য্যরশ্মি-সম বিজুলী জ্বলিছে তাহাতে ॥ ৭ ॥
গুরুসেবা-শিক্ষা দিলা নিজ হাতে।
প্রমাণ আছে প্রতি পাতে পাতে ॥ ৮ ॥
তোমার করুণা বিনা ভবসিন্ধু পার।
আশা করি পার হব—চরণ-তরী সার ॥ ৯ ॥
সহিতে পারি না প্রভু সংসারের জ্বালা।
কৃপা করি ছিন্ন কর জন্ম-মৃত্যু মালা ॥ ১০ ॥
অধম হরিদাসী কয়—আর নাই কোন ভয়।
গুরুপদে যদি ভক্তি-বিশ্বাস মোর রয় ॥ ১১ ॥

—শ্রীযুক্তা হরিদাসী দেবী
গোলকগঞ্জ (আসাম)

শ্রীগুরু-পূজারই নামান্তর—শ্রীব্যাসপূজা

বামনকল্পে পরমেশ্বর-বাক্য হইতে পাওয়া যায়,—

প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥

"প্রথমতঃ গুরুপূজা করিয়া অনন্তর আমার পূজা করিলেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন, অন্যথা অর্থাৎ এই নিয়মের ব্যতিক্রমে পূজা নিষ্ফল হইয়া থাকে।" এই প্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে বলিয়াছেন, —"জগতে যত প্রকার পূজ্য বস্তুর পূজা আছে, সকল পূজা অপেক্ষা ভগবানের পূজা সর্ব্বোত্তম, আর সেই সর্ব্বোত্তম পূজ্যের পূজকের পূজা আরও অধিক বড়। সেই পূজককে ভগবান্ পূজা করিয়া থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য—শ্রীভগবান্, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র—প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত; সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁর পূজা করে থাকেন, তাঁর পূজা নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড়।"

গুরুদেবের জয়গান করিবার জন্যই আমাদের এই জীবন-ধারণ। শুধু নিজে জয়গান করিলে চলিবে না, জগতের অন্য সবাইকেও তাহা করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। যাঁহার সহিত শিষ্যের নিত্য সম্পর্ক, যিনি শিষ্যকে নবজন্ম দান করিয়া থাকেন, সেই গুরুদেবের জয়গান শিষ্য যদি করিতে না পারেন, তবে শিষ্যের সাধন-ভজনের প্রয়োজন কি? জগতে বাঁচিয়া থাকিয়াও বা কি লাভ? "শ্রীল প্রভুপাদ-প্রেষ্ঠ শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের অধস্তন আচার্য্যের পৃথক্‌ভাবে জয় দেওয়া যাইবে না"—এই উপদেশকের ন্যায় ঘোরতম শত্রু জগতে এক বই দুই নাই। গুরুতত্ত্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতার জন্যই তিনি শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয় মঠের অধস্তন অন্য কাউকে গুরুদেব বলিয়া স্বীকার করেন না। যদি স্বীকার করিতেন, তবে নিশ্চয়ই গুরুদেবের জয়গানে শিষ্যকে বাধা দিতেন না। অনেকে গুরুদেবের Photo বা আলেখ্য পূজা করিবার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা গুরুদেবের Photo বা আলেখ্যকে জড় সামান্য বস্তুবিশেষ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চাবিগ্রহ যেরূপ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই, তদ্রূপ গুরুদেবের আলেখ্য স্বয়ং গুরুদেবই। যাঁহারা গুরুদেবের আলেখ্যকে 'গুরু' বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহারাই উপদেশকের কার্য্য করিয়া জগতের

মঙ্গল করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ স্বদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-তিথিতে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন,—"এই যে আলেখ্য অর্চ্চা আপনারা দর্শন করছেন, এই বস্তুকে যাঁরা 'গুরু' বলে বিচার করেন, তাঁরা সকলেই আমার গুরুবর্গ, তাঁদের চরণে আমার দণ্ডবৎ-প্রণতি।" শ্রীচৈতন্যমঠ এবং অন্যান্য সকল মঠগুলি সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভজন ও মিলনের স্থান—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্ব-স্ব-দীক্ষাদাতার পরিচয়ে পরিচিত না হইয়া আমরা 'অমুক মঠের শিষ্য' বলিলে কেহই তাহা বিশ্বাস করিবেন না।

দীক্ষাগুরুর দীক্ষাসূত্র ধরিয়াই গৌড়ীয় মঠের সহিত আমাদের পরিচয়। দীক্ষাগুরুর গুরুত্ব স্বীকার না করিয়া "অমুক মঠের সেবক" বলিলে তাহা "পিতাকে মানি না, অথচ আমি অমুক বাড়ীর আদরের সন্তান"-এর ন্যায় হাস্যাস্পদ ব্যাপার হইবে না কি? প্রত্যেকটী গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের লক্ষ্যবস্তু বা লক্ষ্যস্থল যদি একই হয়, তবে আমরা "অমুক গুরুদেবের শিষ্য" পরিচয় প্রদানে কেন বিভেদের সৃষ্টি হইবে? বরং ইহাতে বিভেদ ত' দূরের কথা, প্রত্যেক মঠের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় হইবে। স্ব-স্ব-গুরুদেবের মহিমা প্রচার করিলেই হিংসা বা বিভেদের বীজ সমূলে ধ্বংস হইয়া সকলের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য স্থাপিত হইবে।

একই বৃত্তের মধ্যে যতগুলি ব্যাস অঙ্কন করা হউক না কেন যেমন সবগুলিই সমান, তেমনই শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক—চারি সম্প্রদায়ে যত গুরুদেব থাকুক না কেন সকলের সমান গুরুত্ব। শ্রীব্যাসদেবের মনোহভীষ্ট পূরণ করা সকল গুরুদেবের কার্য্য বলিয়া গুরুপূজা মানেই ব্যাসপূজা। শ্রীব্যাসদেব-রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান এবং ইহাতেই জ্ঞানের পরিসমাপ্তি। শ্রীগুরু-কৃপাবলেই শ্রীমদ্ভাগবত স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় এবং জীবের চরম প্রয়োজনীয় বস্তু কৃষ্ণপ্রেম লভ্য হয়। শ্রীব্যাসদেব ও গুরুদেবের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন পার্থক্য নাই।

কর্ম্মী, জ্ঞানী, পঞ্চোপাসক ও মায়াবাদিগণের মধ্যেও গুরু-পূজা বা ব্যাস-পূজার প্রথা প্রচলিত আছে। তাদৃশ ব্যাসপূজায় অহমিকার বিচারই প্রবল। কর্ম্মী ও জ্ঞানীর প্রয়োজনীয় বস্তু—স্বর্গসুখ-ভোগ ও মোক্ষ, শুদ্ধভক্তি কখনও নহে। শুদ্ধভক্তির অভাব-নিবন্ধন তাহাদের দ্বারা ব্যাসপূজা কখনও সাধিত হইতে পারে না। তাহারা মুখে ব্যাসদেবের অনুগ বলিলেও প্রকৃতপক্ষে ব্যাসদেবের ঘোর বিরোধী। নির্ব্বিশেষবাদিগণ তথা মায়াবাদিগণ গুরু ও শিষ্যের সম্পর্কের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। তাহারা গুরুদেবকে 'ব্রহ্ম'

বলিয়া মনে করেন। নৌকার সাহায্যে নদীর ওপারে পৌঁছিয়া গেলে আরোহীর নৌকার সহিত যেমন কোন সম্বন্ধ থাকে না, তদ্রূপ প্রয়োজন-সিদ্ধি হইলেই তাহাদের গুরুদেবের সহিত সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়া যায়। তাই তাহারা শ্রীব্যাসদেবকে গুরুরূপে বরণ করিতে অসমর্থ। তাহারা বলপূর্ব্বক শ্রীব্যাসদেবকে তাহাদের ধর্ম্মের মূল প্রচারক বলিলেও তাহা কেহই স্বীকার করিয়া লইবেন না।

মায়াবাদী সম্প্রদায়, তথা সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষবাদ-নির্ব্বিশেষে সকলেই জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা দিবসে শ্রীব্যাসপূজার অভিনয় করিয়া থাকেন। কিন্তু গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথির সম্মানের ন্যায় শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিতে তাঁহার পূজা বিধান করিয়া শ্রীব্যাসপূজার বিশেষ বৈশিষ্ট্য স্থাপন করেন। শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথি অত্যন্ত পবিত্র ও জগতের সমস্ত অশুভনাশক। গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ ব্যাসপূজার বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য খণ্ডের ৫ম অধ্যায়ের অনুভাষ্যে বলিয়াছেন,—"শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ বর্ষে বর্ষে মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমী-তিথিতে তাঁহাদের গৌরবের পাত্র-বোধে শ্রীব্যাসপূজার আনুকূল্য বিধান করেন। বার্ষিক অনুষ্ঠানের বিচারে বর্ষকালব্যাপী স্ব-স্ব-গুরুপূজার স্মারক দিবস। শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর 'শ্রীগুরু-পাদপদ্মে পাদ্যার্পণ' বা ইহার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট যে সুষ্ঠু ভগবৎ-সেবন তাহাই উদ্দিষ্ট হয়।" মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমী-তিথি শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি। শ্রীল প্রভুপাদ অনুভাষ্যের মাধ্যমে ভাবিকালের গৌড়ীয় মঠের সেবকগণকে স্ব-স্ব গুরুদেবের আবির্ভাব-দিনে বর্ষে বর্ষে গৌরবের পাত্র-বোধে গুরুপূজা বা শ্রীব্যাসপূজার আনুকূল্য বিধান করিতে উপদেশ করিয়াছেন। অনেকে মুখে প্রভুপাদের অনুগ প্রচার করিলেও, কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহারা প্রভুপাদের নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তবিরোধী কথাগুলি জগতে প্রচার করিয়া জগতের অশেষ ক্ষতিসাধন করেন। তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত অন্য কোন গুরুদেবের পূজার বা ব্যাসপূজার পক্ষপাতী নহেন।

তাঁহারা বলেন,—"শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার জীবদ্দশাতেই যখন আড়ম্বরের সহিত ব্যাসপূজা শিষ্যবর্গদের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুগ আমরা গুরুর আসন অধিকার করিয়া আপন আপন জন্মদিনে স্ব-স্ব-শিষ্যের আয়োজিত ব্যাসপূজার উপঢৌকন বা পূজা কেনই বা গ্রহণ না করিব?" যাঁহারা প্রভুপাদের সত্যিকারের অনুগ, তাঁহারা অবশ্যই স্ব-স্ব-গুরুর আবির্ভাব দিনে বিশেষ আড়ম্বরসহকারে ব্যাসপূজা করিবেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম জড়ীয় লাভ-পূজা-

প্রতিষ্ঠার অনেক উর্দ্ধে অবস্থান করেন। 'শিষ্য আমার পূজাবিধান করুক'—এই আকাঙ্ক্ষা তিনি মনে কখনও পোষণ করেন না; বরং নিজের আবির্ভাব দিনে স্বকীয় পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুবর্গের পূজাবিধান করিয়া থাকেন। কিন্তু শিষ্যগণ গুরুদেবের পূজাবিধান ব্যতীত নিজেদের মঙ্গলের কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া বিশেষ প্রীতিসহকারে গুরুপূজা বা ব্যাসপূজা করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ উৎপাদন করেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবল্লভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

অভিধেয় তত্ত্ব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮১ পৃষ্ঠার পর]

সংসারাকৃষ্ট জীবের প্রথমে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহা সকাম ভক্তি। সকাম ভক্তিও পরে নিষ্কাম হয়, যেমন ধ্রুবের হইয়াছিল।

"কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে।
'কাম' ছাড়ি 'দাস' হৈতে হয় অভিলাষে॥"

শাস্ত্র অবস্থাভেদে ভক্তিকে ত্রিবিধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—(১) সাধন-ভক্তি, (২) ভাবভক্তি, (৩) প্রেমভক্তি।

প্রেমভক্তি—নিত্যসিদ্ধভাব। নিত্যসিদ্ধভাব বস্তুতঃ সাধ্য নয়, যেহেতু জীব স্বরূপ-বিভ্রান্ত, সে-কারণে তাহার হৃদয়ে এই নিত্যসিদ্ধ-প্রেমভাব প্রকটিত নহে। হৃদয়ে এই ভাবকে প্রকট করার নাম 'সাধন'।

"হৃদয়ে এ পর্য্যন্ত উদয় হয় নাই বলিয়া তটস্থভাবে কিয়দ্দিনের জন্য তাহার সাধ্যতা আছে—স্বরূপতঃ তাহা নিত্যসিদ্ধভাব; প্রেমভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি-বিশেষ। তাহা অবশ্যই নিত্যসিদ্ধ; জড়বদ্ধ জীবের হৃদয়ে তাহা প্রকট হয় নাই। কায়মনোবাক্যে তাহাকে হৃদয়ে প্রকট করিবার যে চেষ্টা করা যায়, তাহাই তাহার সাধনা। যে-কাল পর্য্যন্ত তাহা সাধিত হইতেছে, সে-কাল পর্য্যন্ত তাহা সাধ্যভাব প্রাপ্ত; প্রকট হইবামাত্র তাহার নিত্যসিদ্ধতা স্পষ্ট হয়।

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥

সাধ্য ভাবভক্তি যখন কৃতি (ইন্দ্রিয়) সাধ্য হয়, তখন তাহাকে সাধনভক্তি বলে। ভক্তিই জীবের নিত্যসিদ্ধভাব। তাঁহাকে হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনিবার নামই সাধ্যতা। তাৎপর্য্য এই যে, চিৎকণ জীবে স্বভাবতঃ চিৎসূর্য্য কৃষ্ণের যে আনন্দকণ আছে, মায়াবদ্ধ হইয়া তাহা ইহকালে লুপ্তপ্রায়। সেই নিত্যসিদ্ধ-ভাবই হৃদয়ে প্রকটনযোগ্য। এই অবস্থাতেই নিত্যসিদ্ধবস্তু বস্তুর সাধ্য-অবস্থা হইল। সেই সাধ্য-ভাবরূপ ভক্তি যখন বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধিত হইতে থাকে, তখন তাহারই নাম 'সাধন-ভক্তি'।"

প্রেমভক্তির প্রথম অবস্থা ভাবভক্তি নামে প্রকাশিত। যে-কোনপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করানই সাধনভক্তির লক্ষণ। এই সাধনভক্তি আবার দুই প্রকার—বৈধী ও রাগানুগা।

"রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
'বৈধীভক্তি' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥"

"জীবের দুইপ্রকার প্রবৃত্তির উদয় হয়—বিধি অনুসারে যে প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহাকে বৈধী প্রবৃত্তি বলে। শাস্ত্রই বিধি; শাস্ত্রশাসনক্রমে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহা বৈধী প্রবৃত্তি হইতে জাত হওয়ায় বৈধীভক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

শাস্ত্র যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই 'বিধি'; শাস্ত্র যাহাকে অকর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার নাম নিষেধ; বিধি পালন ও নিষেধ পরিহারই জীবের পক্ষে বৈধ ধর্ম্ম।"

বৈধ ধর্ম্মের বিস্তার বহু। শ্রীল রূপগোস্বামী বৈধ ভক্তির সাধনের চতুঃষষ্টি অঙ্গের কথা বলিয়াছেন। সুতরাং বৈধ ধর্ম্মের সর্ব্ব অঙ্গগুলি জানিয়া পালন করা কোন জীবের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। একারণে সংক্ষেপে বিধি-নিষেধ নির্ণয় করিবার শাস্ত্র-সঙ্কেত পদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন,—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥"

'বিষ্ণুকে সর্ব্বদাই স্মরণ করিবে'—ইহাই বিধি; 'কখনও তাঁহাকে ভুলিবে না'—ইহাই নিষেধ। অন্যান্য যাবতীয় বিধি-নিষেধ উক্ত মূলবিধি-নিষেধের অনুগামী কিঙ্কর।

গীতাশাস্ত্রে 'আর্ত্ত', 'জিজ্ঞাসু', 'অর্থার্থী' ও 'জ্ঞানী'—এই চারিবিধ ব্যক্তি ভক্তি করিয়া থাকেন বলা হইয়াছে। কিন্তু সাধুসঙ্গের দ্বারা এই চারিপ্রকার ব্যক্তির অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মে।

'সালোক্য', 'সার্ষ্টি', 'সামীপ্য', 'সারূপ্য' ও 'সাযুজ্য'—এই পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে 'সাযুজ্য' মুক্তি ভক্তিতত্ত্বের নিতান্ত বিরোধী ; একারণে কৃষ্ণভক্তগণ তাহা কখনই স্বীকার করেন না। অন্য চারিবিধ মুক্তি ভক্তির অত্যন্ত বিরোধী না হইলেও কোন অংশে তাহাদের প্রতিকূলতা আছে—কৃষ্ণভক্তগণ নারায়ণ-ধামগত ঐ চারিপ্রকার মুক্তিও কখনও গ্রহণ করেন না। এমনকি, ঐকান্তিক কৃষ্ণাকৃষ্ট ভক্তদিগের শ্রীনারায়ণের প্রসাদও মন হরণ করিতে পারে না। কারণ নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে রসের উৎকর্ষের ভেদ আছে।"

শুদ্ধ-ভক্ত্যধিকারী ব্যক্তি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে অবস্থিত থাকিলেও কেবলমাত্র ভক্ত্যঙ্গ পালন করিতেই বাধ্য, কর্ম্মাঙ্গ পালন ভক্ত্যঙ্গ পালনেই তাঁহাদের হইয়া যায় এবং কোনপ্রকার পাপ তাঁহাদের স্পর্শ করিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সুতরাং অনন্যভক্তিতে যখন অধিকার জন্মে, তখন তিনি জ্ঞানশাস্ত্র ও কর্ম্মশাস্ত্রের বিধির বাধ্য হন না। ভক্তির অনুশীলনমাত্রই তাঁহার সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তিতে আমরা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্"

এই নববিধা ভক্তি যিনি শ্রদ্ধা-সহকারে অনুদিন অনুশীলন করেন, তিনি বিমল কৃষ্ণরতি প্রাপ্ত হন।

শ্রবণ :—শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার অপ্রাকৃত বর্ণনা কর্ণরন্ধ্রপথে প্রবেশ করানই শ্রবণ। শ্রদ্ধার পূর্ব্বে সাধুমুখে শ্রবণের দ্বারা শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধার উদয়ে গাঢ় পিপাসার সহিত শ্রবণে প্রবৃত্তি জন্মে।

কীর্ত্তন :—শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ ও লীলাময় শব্দসমূহের জিহ্বা-স্পর্শের নাম কীর্ত্তন। কলিযুগে কীর্ত্তনই সকল জীবের মঙ্গল সম্পাদনে সমর্থ। একারণে বলা হইয়াছে—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে

যজ্ঞ এবং দ্বাপরে অর্চ্চনদ্বারা যাহা লাভ হয়, কলিতে একমাত্র অপরাধশূন্য নামকীর্ত্তনদ্বারা সেই প্রয়োজন লাভ করা যায়।

স্মরণ :—শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার স্মরণের নাম স্মরণ। স্মরণ পাঁচ প্রকার। সামান্য পরিমাণ অনুসন্ধানের নাম স্মরণ। অন্যান্য বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া কিছুক্ষণ মনোধারণের নাম 'ধারণা'। বিশেষরূপে রূপাদি চিন্তনের নাম ধ্যান; অমৃতধারার ন্যায় অনবচ্ছিন্ন ধ্যানের নাম ধ্রুবানুস্মৃতি এবং ধ্যেয়মাত্র স্ফূর্ত্তির নাম সমাধি। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ ভক্তির প্রধানাঙ্গ। অন্যগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত।

পাদসেবা :—শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের সহিত পাদসেবা বিধেয়। সেব্য বস্তুকে সচ্চিদানন্দ বুদ্ধিতে এবং নিজকে অকিঞ্চন জ্ঞানে পাদসেবা করা কর্ত্তব্য।

অর্চ্চন :—শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের ফলে যদি অর্চ্চনমার্গে শ্রদ্ধা জন্মে, তবে শ্রীগুরুপদাশ্রয়পূর্ব্বক অর্চ্চনে অধিকার আসে।

বন্দন :—পাদসেবা ও কীর্ত্তনাদির মধ্যে বন্দন অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও নমস্কারই বন্দন। নমস্কার দুই প্রকার—পঞ্চাঙ্গ ও অষ্টাঙ্গ নমস্কার।

দাস্য :—'আমি কৃষ্ণদাস'—এই অভিমানই দাস্য।

সখ্য :—কৃষ্ণকে সখা জ্ঞানে সেবা।

আত্মনিবেদন :—নিজের জন্য চেষ্টাশূন্য হইয়া কৃষ্ণের জন্য অখিলচেষ্টাময় হইয়া শ্রীকৃষ্ণে সব কিছু অর্পণের নাম আত্মনিবেদন। সর্ব্বেন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করার চেষ্টাই বৈধভক্তির লক্ষণ। এই চেষ্টার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি সম্ভব।

"অম্বরীষ মহারাজ স্বীয় মন শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে, বাক্য বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে, করদ্বয় হরিমন্দির মার্জ্জনাদিতে, কর্ণ কৃষ্ণকথা-শ্রবণে, চক্ষুদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে, অঙ্গ কৃষ্ণদাসের গাত্রস্পর্শে, নাসা কৃষ্ণের পাদপদ্ম সৌরভ ঘ্রাণে, রসনা কৃষ্ণার্পিত তুলসীর আস্বাদনে, পাদদ্বয় কৃষ্ণক্ষেত্রানুগমনে, মস্তক হৃষীকেশের চরণে প্রণতিকার্য্যে ও কাম কামনারহিত বিষ্ণুদাস্যে এরূপ নিযুক্ত করিয়াছেন যে, তাহাতে কৃষ্ণভক্তগণের আশ্রয়যোগ্য রতির উদয় হয়।"

শ্রীরূপের কৃপায় বৈধভক্তির পরে রাগভক্তি সম্পর্কে জানিতে চেষ্টা করি।

শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন,—"ইষ্টবিষয়ে স্বারসিকী পরমাবিষ্টতাকেই 'রাগ' বলা যায়; কৃষ্ণভক্তি যখন সেই রাগময়ী হন, তখন সেই ভক্তিকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। স্বল্পাক্ষরে বলিতে গেলে, কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী তৃষ্ণাকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলা যায়। ইহা কেবল কৃষ্ণের নিজজন ব্রজবাসিগণের মধ্যে সম্ভব। যে ব্যক্তিতে এরূপ রাগ উদিত হয় নাই, তাহার পক্ষে শাস্ত্র-

বিধিই ভক্তির প্রবর্ত্তক ; সম্ভ্রম, ভয় ও শ্রদ্ধা—ইহারা বৈধী ভক্তিতে ক্রিয়া করে। ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণে যে ভাব, তাহা লক্ষ্য করিয়া যিনি সেই ভাব-প্রাপ্তির জন্য লুব্ধ হন, তিনিই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী।"

রাগানুগা ভক্তি শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা রাখে না। এইপ্রকার ভক্তির অধিকারী বাহ্যে সাধকরূপে ও অন্তরে ব্রজজনের আনুগত্যে সিদ্ধদেহাভিমানে সেবা করেন।

বাহ্য, অভ্যন্তর,—ইহার দুই ত' সাধন।
'বাহ্যে' সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥
'মনে' নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥

এই রাগাত্মিকা-ভক্তি দুইপ্রকার—সম্বন্ধরূপা ও কামরূপা। আমি কৃষ্ণের পিতা, আমি কৃষ্ণের মাতা বা সখা ইত্যাদি অভিমানই সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি।

কাম-শব্দে সম্ভোগ-তৃষ্ণাকে বুঝায়। বদ্ধজীবের কাম সদোষ ও তুচ্ছ। এই কাম ইন্দ্রিয়ভোগ্য, কালদ্বারা ক্ষুব্ধ, কালের গতিতে অল্পক্ষণেই লয়প্রাপ্ত। ব্রজ-গোপীগণের কাম অপ্রাকৃত ও দোষগন্ধ-রহিত। এই কাম কালদ্বারা ক্ষুব্ধ হয় না, নিত্যনবনবায়মান ভাব রসসঞ্চারী, যে ভাব-রসসমুদ্রে কৃষ্ণচন্দ্র পরমসুখে সন্তরণ করেন ও মহাতৃপ্তিলাভ করেন। গোপীদের কাম—প্রীতি-সম্ভোগের দ্বারা কৃষ্ণের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য সমস্ত চেষ্টার উদয় করায় ও নিজসুখের প্রতি দৃষ্টির অপেক্ষা করে না। এই কামরূপা ব্রজগোপীগণ ভিন্ন অন্য কেহই কৃষ্ণচন্দ্রকে সেই পরম সুখ দান করিবার ক্ষমতা ধারণ করেন না। এই গোপীদের মধ্যে মহাভাবময়ী শ্রীরাধাঠাকুরাণীই সাধ্যগণের শিরোমণি ও কৃষ্ণকে সর্ব্বোত্তম সুখবিধানে অনুক্ষণ তৎপর। তাই পণ্ডিতগণ গোপীগণের এতাদৃশ ভাবকে কেবল প্রেম না বলিয়া কাম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কারণ প্রেম বলিতে সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকা ভক্তিও আসিয়া পড়ে। কিন্তু ব্রজগোপীদের একমাত্র কৃষ্ণসুখচেষ্টার জন্য যে কাম, সে একমাত্র ব্রজগোপীদের আনুগত্যে ব্রজেই সম্ভব, অন্য কোথাও দুর্ল্লভ এবং ভগবৎপ্রিয় উদ্ধবাদিও তাহা পাইবার আকাঙ্ক্ষা করেন।

এই কামরূপা ভক্তির অনুগামিনী যে তৃষ্ণা, তাহা কামানুগা। ইহাও দুই প্রকার—সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী। ব্রজগোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে অপ্রাকৃত ক্রীড়া, তাহাই সম্ভোগ শব্দের তাৎপর্য্য। ব্রজযূথেশ্বরীদিগের

কৃষ্ণের প্রতি যে ভাব-মাধুর্য্য, সেইরূপ ভাবমাধুর্য্যের কামনাকে তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা বলা যায়। এই দুটীই ভক্তির চরমতম পর্য্যায়।

শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির মাধুরী দর্শন করিয়া ও কৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করিয়া সেই সেই ভাবের আকাঙ্ক্ষা যাঁহাদের হয়, তাঁহারাই কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা রূপা রাগানুগা ভক্তির সাধনে প্রবৃত্ত হন।

রাগানুগা ভক্তির মাহাত্ম্য হইল—বৈধীনিষ্ঠার সহিত বহুকাল সেবা করিলে যে ফল না হয়, রাগানুগা ভক্তিতে স্বল্পকালেই সেই ফলের উদয় হয়। বৈধমার্গের ভক্তি বিধিসাপেক্ষ হওয়ায় দুর্ব্বলা; কিন্তু রাগানুগাভক্তি প্রবলা।

এতক্ষণ ভক্তিসম্বন্ধে যাহা কিছু আমরা জানিলাম মহাপ্রভুর কৃপায়, নববিধা ভক্তির একমাত্র শ্রীনাম কীর্ত্তনের মাধ্যমেই সকল কিছু, এমনকি, পঞ্চম পুরুষার্থ যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম সবই পাওয়া সম্ভব।

"প্রভু কহে—কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নহি আর॥"
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে॥

—শ্রীমতী মায়া সরকার

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯৩ পৃষ্ঠার পর]

বিজ্ঞানের শক্তিতে শক্তিমান্ রাষ্ট্র কম বিজ্ঞান-শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রকে করুণার চোখে দেখে। শক্তির মদমত্ততায় 'ধরাকে সরা জ্ঞান' করে। উদার মানবতা সময় সময় বিসর্জ্জিত হয়। ধর্ম্ম সেখানে এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনে অপরিহার্য্য। মানুষকে মানুষ বলে ভাবা শক্তিমান্ বিজ্ঞান-শক্তিপুষ্ট রাষ্ট্রের পক্ষে খুবই কঠিন। তা' যদি না হত শুটিকতক ব্যক্তির উপর আক্রোশবশতঃ হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপর আণবিক বোমার বিধ্বংসী পরিণতি আরোপ করা হত না। মুহূর্ত্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। দুটী আধুনিক সুসজ্জিত

শহর ভূমিসাৎ হয়ে গেল। বিজ্ঞানীরা বলেন,—পৃথিবীতে যে আণবিক অস্ত্র মজুত আছে, তার প্রয়োগে এই পৃথিবীর মত দশটী পৃথিবী মিনিট কুড়ির মধ্যে ধ্বংস হতে পারে। বিজ্ঞানের এই মারমুখিতার ক্ষেত্রে প্রয়োজন ধর্ম্মের কল্যাণপেতঃ প্রলেপন।

বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণের জন্য, বিজ্ঞানীর স্বপ্নও তাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিজ্ঞানশক্তির নিয়ন্ত্রক রাষ্ট্র বিশ্বের আপামর সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা অগ্রাধিকার দিতে পারেন না। পারেন না যে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ—মারণাস্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা এবং তার উত্তরোত্তর বিবর্দ্ধন। আরও বিস্ময়ের কথা, এই মহাকালের মহাবিধ্বংসী মহাস্ত্রের নির্ম্মাণকলার প্রযুক্তি অত্যন্ত সংগোপন রাখা হয়ে থাকে। বিজ্ঞানের দোষ কিছু নয়। শক্তিমদমত্ত মানুষ ক্ষমতার লিপ্সায় অধিকারের সীমায়তির প্রসারণে বিজ্ঞানকে মৃত্যুদূত করে তুলছেন। তার অজস্র কল্যাণমুখিতার কথা তাদের প্রাণে কোন উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারে না। একজন মানুষ আর একজন মানুষকে হত্যা করতে উদ্যত হচ্ছেন—এ কোন ধরণের মানব-কল্যাণ, মানব-বুদ্ধির অগম্য। বিজ্ঞানের ছত্রছায়ায় মানব-কল্যাণের এ কোন্ প্রতিচ্ছবি দেখ্‌ছি আমরা? অথচ পাশাপাশি ধর্ম্মের জগতে আমরা মানবপ্রেমের কি অনবদ্য নিদর্শনই না দেখি। মানুষের দুঃখ, কষ্ট, জরা, ব্যাধির হাত হতে নির্ব্বাণের জন্য ঐশ্বর্য্য-বিলাসের ক্রোড়ে লালিত রাজকুমার সন্ন্যাসের পথে পা বাড়ালেন। আর এই সেদিন গুণবতী ভার্য্যা, অফুরন্ত যশঃ, স্নেহময়ী জননী, পাণ্ডিত্যের আকর্ষণ-বলয়, চতুষ্পাঠীর দূর বিস্তার সুখ্যাতির সর্ব্ববিধ আকর্ষণকে উপেক্ষা করে এবং গুণমুগ্ধ অগণিত ভক্ত ও অনুগতের স্নেহের বন্ধনকে ছিন্ন করে আর এক মানববিগ্রহ কৃচ্ছ্রতার রুক্ষরুদ্র পথের অভিযাত্রী হলেন, সেও ত' মানুষের মঙ্গলের জন্য। শুধু মঙ্গল নয়, মানুষকে মানুষ ভেবে আপন করে নেবার সাধনার মহামন্ত্রই তিনি দিয়ে গেলেন। তিনি মহাবদান্য অমেয় প্রেমময় অলোক-সামান্য চৈতন্যবিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু। জাতিভেদ, বর্ণভেদ, বিদ্যা, রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্যের অভিমান ত্যাগ করে সকল মানুষকে কাছে নেবার চিরকালীন পথনির্দ্দেশ রেখে গেছেন তিনি। সর্ব্বধর্ম্মের উচ্চকোটির ভাবনাতে মানুষকে আপন করে নেবার নির্দ্দেশই দেয়। মত-পথ-সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি পরিহার করে বিশ্বমৈত্রী, বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা একমাত্র ধর্ম্মের প্রবক্তারই মুখ্য অবদান। মানব-কল্যাণে বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করতে, মানুষে মানুষে প্রীতির এবং সৌভ্রাতৃত্বের মেলবন্ধন রচনা করতে প্রয়োজন ধর্ম্মের।

বিজ্ঞানপ্রেমী মানুষকে যখন ধর্ম্মজগতের গ্লানির দিকগুলোকেই বড় করে তুলে ধরতে দেখি, তখন বেদনায় অভিভূত হয়ে যাই। বিজ্ঞানই ত' বলে প্রত্যেক জিনিষের Dark side এবং Bright side আছে। সেখানে শুধু মাত্র নেতিবাচক দিকটির প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলে তা' নিশ্চয়ই নিরপেক্ষ মতাদর্শ বলে পরিগণিত হবে না। উদাহরণ-স্বরূপ যিনি বলেন,—নরওয়ের গীর্জ্জাগুলি শিক্ষালয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে, চিকিৎসালয়ে পর্য্যবসিত হচ্ছে। রবিবারে গীর্জ্জায় ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বরের জন্য কেউ আর সেখানে যায় না, কাজেই পৃথিবীর মানুষ ধর্ম্মবিমুখ হয়ে পড়ছেন। তখন তাঁকে সবিনয়ে বলা যায়,—ঠিক তারই পাশাপাশি সাম্যবাদের দেশ রাশিয়া ও চীনে ISKCON-এর কৃষ্ণ ভাবনান্দোলনের ক্রমবিস্তার কি ধর্ম্ম-বিমুখতার পরিচয় বহন করে? আমেরিকার ধনীর দুলালেরা, সরস্বতীর বরপুত্রেরা কিসের আশায় চৈতন্য-আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন? এ কি ধর্ম্ম-বিমুখতা?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বমুখের কথা,—

"পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

কোন্ মহাসত্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে? পৃথিবীর ধর্ম্মান্দোলনের খবর যাঁরা বিন্দুমাত্র রাখেন, তাঁদের পক্ষে আজকের দুনিয়া ধর্ম্ম-বিমুখ একথা বলা শোভা পায় না। জানি এর পরের কথা, আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে সেই মানুষই বলবেন,—ধর্ম্মের নামে ও একটা নেশাগ্রস্ততা, একটা বাতিকের অভিব্যক্তি মাত্র। সত্য বটে নেশা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি নেশা কোথায় নেই? রাজনীতির আবর্ত্তে পড়ে অমানুষিক কৃচ্ছ্রতা যিনি প্রসন্নবদনে বরণ করছেন, সেও ত রাজনীতির মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করবারই এক উদগ্র নেশা। প্রতিভা ত' কথান্তরে নেশাই। প্রতিভাধর মানুষ মাত্রই ত' নেশাগ্রস্তের মত। আচরণে জীবনচর্চ্চায় স্বাভাবিকতা সেখানে পরিলক্ষিত হয় কমই। সত্যসন্ধ গ্যালিলিও, বিজ্ঞানী ব্রুনো, আর্কিমিডিস্, নিউটন সকলেই মানবকল্যাণের দূরতিশায়ী বাসনার নেশায় প্রলুব্ধ হয়ে জীবনপাত করেছেন। কেউ প্রাণ দিয়েছেন রাষ্ট্রশক্তির বিদ্বেষ-বহ্নিতে, কেউ প্রাণ দিয়েছেন শত্রুর উদ্যত খড়্গতলে, কেউ গেছেন নির্ব্বাসনে। নেশাগ্রস্ত না হলে সত্যসন্ধানের তথা মানবকল্যাণের পথ হতে তাঁরা সরে দাঁড়াতেন। মহামতি আলেক-জাণ্ডারের বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা, সেও আর এক নেশা। হিমালয়ের উত্তুঙ্গ-শীর্ষে মানব পদচিহ্ন এঁকে দেওয়ার অভিলাষ—সেও এক দুঃসাহসিক নেশা।

চাঁদে পাড়ি দেওয়া—সেও কি নেশাগ্রস্ত মানুষের কাজ নয় ? সব মহৎ কাজ যদি নেশার ফলশ্রুতি হতে পারে, তবে ধর্ম্মের জগতে মানুষের অনুসন্ধিৎসা, আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়াস কেবলমাত্র নেশা বলে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হবে কেন ?

এই প্রসঙ্গে দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের অভিমত পর্য্যালোচনা করা যেতে পারে। যে কোন ধর্ম্মবোধের সঙ্গে ঈশ্বরচিন্তা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। ধর্ম্মবোধ আছে, অথচ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই, এ হতেই পারে না। "ঈশ্বর মানুষের প্রয়োজনের সৃষ্টি"—একথা বলেছেন ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট বিজ্ঞানী স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ইম্যারিটাস অধ্যাপক ডাঃ অমিয় বিকাশ চৌধুরী। অথচ ভাবতে বিস্ময় লাগে তিনি যখন বলেন,—"শুধু মন্দিরে কেন, আমি গির্জ্জায়ও যাই, যেখানে ঈশ্বরের মূর্ত্তি না থাকলেও ঈশ্বরের কল্পনা আছে। কেন যাই জানেন ? যাই, কারণ ওসব জায়গায় মানুষ ভালো মন নিয়ে যায়, অন্ততঃ মন ভালো করতে যায়। এইটেই আমার ভালো লাগে। মন্দির, মসজিদ, গির্জ্জার পরিবেশে সকলেরই মন পবিত্র হয়। অল্পক্ষণের জন্য হলেও মনে শান্তি আসে, চিত্ত প্রসন্ন হয়। তাই মন্দিরে গিয়ে মূর্ত্তির উদ্দেশে প্রণাম করতেও আমার দ্বিধা হয় না।"

একথা সত্য, আদিম মানুষ প্রকৃতির ভয়াবহতা, দুর্দ্দমতা দেখে তাঁর উদ্দেশ্যে তার হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করেছে। সেই মানুষের উত্তরসূরী তার শিক্ষা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির নিরিখে ঈশ্বরের স্বরূপের সন্ধান পেয়েছে। যা' আদিম মানুষের নিকট অনবজ্ঞাত ছিল, তা' পরবর্ত্তী মানুষের প্রজ্ঞায় এবং প্রত্যয়ে সুস্পষ্ট হয়েছে। তাই "ঈশ্বর মানুষের সৃষ্টি" অর্থ ঈশ্বরোপলব্ধি মানুষেরই অবদান। মনুষ্যেতর কোন প্রাণীর নয়। বিজ্ঞান বলে,—মানুষের অবগতির জন্য কোন মহাসত্য অজানা থাকলে তাকে অস্বীকার করা মূঢ়তার নামান্তর। কলম্বাসের আবিষ্কারের পূর্ব্বে আমেরিকার অস্তিত্ব ছিল না—একথা ইতিহাস বলে না। তাই বিজ্ঞানী মন্দির, মসজিদ, গীর্জ্জায় যাবেন—ঈশ্বরের (মূর্ত্তির) উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করবেন, অথচ তাঁকে মানবেন না—এ উক্তি পরস্পরবিরোধী।

আর এক প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ত' পরিষ্কার বলেছেন, —"মানুষকে একদিন না একদিন ঈশ্বরে বিশ্বাসী হতেই হবে। না হয়ে তার উপায় নেই।" বলাবাহুল্য তিনি নিজে ঈশ্বর-বিশ্বাসী। ধর্ম্মের প্রয়োজন এই উভয় বিজ্ঞানীই অকপটে স্বীকার করলেন। বক্তব্যের সমর্থনে আরও বিজ্ঞানীর মতবাদ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

আমাদের প্রতীতি—শান্তি, চিত্তের প্রসন্নতা, পবিত্রতার জন্য দেবালয়ের প্রয়োজন যদি স্বীকার করতে হয়, তবে সেই দেবালয়গুলির পরমাশ্রয় যা' সেই বস্তুরও প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। ধর্ম্মের প্রয়োজন সেখানেই। বস্তুতঃ মানবিক সুবৃত্তিগুলির অনুশীলন এবং বিবর্দ্ধন ধর্ম্মের প্রশ্রয়েই সংসাধিত হতে পারে। অন্যত্র সম্ভব নয়। তাই বিজ্ঞানীকেও সকলের মঙ্গলবিধানের উদ্দেশ্যে সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গল যে মঙ্গলময় শ্রীভগবান্—তাঁর আরাধনার আশ্রয় খুঁজতে হবে। ঈশ্বরকে সম্মুখে রেখে ধর্ম্মবোধদ্বারা অনুপ্রাণিত হলে বিজ্ঞানী মানুষ মারার বিধ্বংসী অস্ত্র-নির্ম্মাণে, ঔষধ বা গ্যাস প্রস্তুতিতে উদ্যোগী না হয়ে সর্ব্বমানবের মঙ্গলবিধায়ক প্রয়াসে বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করবেন। তাই ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানকে সমস্তরকম কলুষমুক্ত হয়ে মানবকল্যাণমুখী হতে হবে। অশুভশক্তির নারকীয় বিলাসের ক্ষেত্র ধর্ম্ম বা বিজ্ঞান কোনটাই নয়। একথা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যত দ্রুত উপলব্ধি করবেন, তত দ্রুত পৃথিবী শান্তি, সুখ, সমৃদ্ধি এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং সৌহার্দ্যের অভয় নিকেতনে রূপান্তরিত হবে।

—শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ দাস,
আটুরিয়া (২৪ পরগণা উঃ)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—
(১) ধর্ম ও আজকের জিজ্ঞাসা : স্বামী সোমেশ্বরানন্দ
(২) ধর্মকর্ম : যুগান্তর

———

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত
শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রণীত

সৎক্রিয়াসার-দীপিকা
ও
সংস্কার-দীপিকা

['শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ'-সহ]

আগ্রহী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সংগ্রহ করুন।

শ্রীগুরু-চরণে প্রার্থনা-প্রসূনাঞ্জলি

জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিবামন।
জয় বাঞ্ছাকল্পতরু, পতিতপাবন॥
জয় জয় শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান-প্রেষ্ঠজন।
জয় সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভুবন-পাবন॥
ভক্তবৎসল প্রভু সদা হাস্যময়।
তব দর্শনে সবার চিত্ত পূত হয়॥
পরজগৎ হইতে তুমি আসি' এ ভূতলে।
আচার্য্য-রূপেতে বহু পাপী উদ্ধারিলে॥
সর্ব্বত্র বিদিত প্রভু আচার্য্য মহান্।
নাম-প্রেম দানি' কৈলে জীবের কল্যাণ॥
সকল শাস্ত্র-বাণীর সামঞ্জস্য করি'।
জানাইলে পরতত্ত্ব—গোলোকবিহারী॥
তুমি কৃষ্ণ-নিজজন, নহ ত' মানব।
তব কৃপা বিনা কৃষ্ণ-প্রাপ্তি অসম্ভব॥
'ন ভজনম্ অপেক্ষ্যতে'—বাণী অনুসারে।
অন্য কোন ভজনাঙ্গের অপেক্ষা না করে॥
শ্রীগুরু-সেবায় শীঘ্র সর্ব্বসিদ্ধি হয়।
জড় জগতের গন্ধ সেথা নাহি রয়॥
গুরু-মনোঽভীষ্ট সেবা ভজনের সার।
মাগি তাই তব পদসেবা-অধিকার॥
মোর দুর্ব্বাসনা যত করিয়া খণ্ডন।
তোমার সেবায় মোরে কর আকর্ষণ॥
এ শুভ বাসরে যাচি তোমার চরণে।
নিত্য যেন তব কৃপা পাই ক্ষণে ক্ষণে॥

শ্রীগুরুপূজা-বাসর
৮ নারায়ণ, ৫০৪ গৌরাব্দ

শ্রীগুরু সেবাভিলাষী—
—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮৮ পৃষ্ঠার পর]

সেই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীভগবান্ একাধারে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুররসে আরাধিত হন। সাধক-সাধিকা স্ব-স্ব ভাব ও অধিকারানুসারে প্রেমময় ভগবানকে আরাধনা করেন এবং সাক্ষাৎ সেবালাভে ধন্য হন। ভগবানের নিত্যধাম রয়েছে। সেই ধাম—আমাদের নিত্যবাসস্থান আমরা বর্ত্তমানে ভুলে গেছি। আমাদের নিত্যবসতিস্থলে ফিরে যাওয়াই আমাদের বুদ্ধিমত্তা।

সর্ব্বাবতারী—ভগবান্, আর যত অবতারের কথা বলেছেন শাস্ত্রে সে-সব অবতারই ভগবানের অঙ্গীভূত। কৃষ্ণের অঙ্গীভূত সকল অবতার। সেইকথা শাস্ত্রে বলছেন,—

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

আমি সেই আদিদেব গোবিন্দকে ভজনা করি। কে তিনি?—সকলের উপরওয়ালা। সকলের উপরওয়ালা যিনি তাঁকে ভজনা করি। রাম, নৃসিংহ, বুদ্ধ, কল্কি, বামনাদি যত অবতার আছেন, সমস্ত অবতারের অংশী তিনি, সেইজন্য তিনি অবতারী—Main Fountain Source। সুতরাং সেইভাবে তাঁকে বুঝতে হবে। ভগবান্ যেরূপ, As it is তাঁকে সেইভাবে বুঝব। তাঁর সম্বন্ধে কোন কষ্টকল্পনা করব না আমরা। ভগবান্ এই ছিলেন, ঐ ছিলেন, তা নয়। ভগবান্ যা ছিলেন, ঋষিগণ যেভাবে তাঁর স্বরূপ আমাদের বুঝিয়েছেন, তাঁদের Light-এ আমরা এটা বুঝবার চেষ্টা করব। আমাদের সীমিত বিচার-বুদ্ধি নিয়ে যখনই আমরা কিছু বুঝতে যাই, তখনই ভুল করে ফেলি। তখনই Misunderstanding—ভুল বুঝাবুঝি হয়ে যায় ভগবান্ সম্বন্ধে। ভগবান্ তাঁর তত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেভাবে বলেছেন, ঠিক সেইভাবেই তাঁকে বুঝতে হবে। সাক্ষাৎ ভগবানের মুখের বাণী রয়েছে, পরোক্ষবাদ বেদ রয়েছেন, সে-সব বিচার করে ভগবত্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা উচিত। এটাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আলোচনা।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তাঁদের নিজেদের জ্ঞান-গরিমা নিয়ে যে বিচারটুকু করেছেন, সে-সব বিচার বহু আগেই আমাদের সনাতন শাস্ত্রে খণ্ডিত হয়েছে—প্রতিবাদ করা হয়ে আছে। তাঁরা যা কিছু করেছেন, করছেন বা করবেন, তার সবটাই শাস্ত্রে মীমাংসা দেওয়া আছে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমাদের শাস্ত্র আলোচনা করা উচিত। তখন আমরা দেখব অবতারী বা কে, অবতার বা কে, জীব কে, সাধক কে, সাধিকা কে বা ভক্তগণই বা কে? ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে লাভ করতে হবে। ভক্ত ভক্তির দ্বারা ভগবানকে লাভ করবেন—এই কথা শাস্ত্র বলছেন। সেখানে অন্য কোন উপায় নাই। 'নাতঃ পরতরোপায়ঃ'—এছাড়া অন্য কোন গতি নাই, অন্য কোন পথ নাই। ভগবানকে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তির দ্বারা পেতে হবে। ভগবানকে জান্‌বার একমাত্র মাধ্যম হল 'ভক্তি'। ভক্তির দ্বারা পরম প্রেমময় ভগবানকে জানতে পারা যায়। তাই গীতায় বলছেন,—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

ভাগবত বলছেন,—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বাপাকানপি সম্ভবাৎ॥

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী॥"—ভক্তির দ্বারাই সেই ভগবানকে জানতে পারা যায়। তাঁর তত্ত্বদর্শন দুরতিগম্য হলেও সেটা বুঝবার বিষয় হয়। ভক্তি মহাদেবী ভগবানের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। সুতরাং ভক্তির মহিমাই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, ভক্তির মহিমাই সর্ব্বত্র বিঘোষিত রয়েছে। 'ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥'—ভক্তিপ্রিয় মাধব ভক্তির বশ। ভক্তি ছাড়া চলবে না। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ—ভক্তির যে Step-গুলি পর পর ব্যাখ্যা করেছেন শাস্ত্রে, এর প্রত্যেকটী প্রত্যেকটীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আলোচনা করবার সময় আমরা ভুল করে ফেলি অনেকে। কেহ বা নিজেকে কর্ম্মী, কেহ বা জ্ঞানী, কেহ বা যোগী, কেহ বা ভক্ত বলে দাবী করি। বাস্তব ক্ষেত্রে ভক্তি ছাড়া কর্ম্ম নিষ্ফল, ভক্তি ছাড়া জ্ঞান নিষ্ফল, ভক্তি ছাড়া যোগ নিষ্ফল। সেকথা ত' কৃষ্ণ ভাগবতে নিজমুখেই বলেছেন,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

আমার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাযুক্ত যে ভক্তি, তার দ্বারা আমি যেমন বশীভূত হই, নির্ব্বিশেষ চিন্তাদ্বারা—নির্ব্বিশেষ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির দ্বারা (তেমন) বশীভূত হই না। ভগবান্ একথা পরিষ্কার ভাষায় বলে দিচ্ছেন।

আপনারা সবাই গীতা আলোচনা করেন, গীতার প্রথম ছয় অধ্যায় হল কর্ম্মযোগ। কর্ম্মযোগ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে কৃষ্ণ কি বলতে চাচ্ছেন? দুটী শ্লোক ব্যবহার করেছেন কর্ম্মতত্ত্বটাকে বুঝাবার জন্য। সেখানে বললেন,— তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।

কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥

হে অর্জ্জুন! তুমি সেই যোগী হও—কর্ম্মীর থেকে যে যোগী শ্রেষ্ঠ; হে অর্জ্জুন, তুমি সেই যোগী হও—জ্ঞানীর থেকে যে যোগী শ্রেষ্ঠ; হে অর্জ্জুন, তুমি সেই যোগী হও—অষ্টাঙ্গ যোগীর থেকে যে যোগী শ্রেষ্ঠ। তাহলে কোন্‌টা বাকী থাকে? কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ তিনটে বলা হয়েছে। এর থেকে যেটা শ্রেষ্ঠ যোগ, সেই যোগ আশ্রয় কর। যদি বলেন, আমি কিছু কষ্ট কল্পনায় মানে করছি, তাহলে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের পরবর্ত্তী শেষ শ্লোকে আসুন,—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

'শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাম্'—যিনি আমাকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক, ভক্তিপূর্ব্বক সাধনা করেন, তিনি হলেন উত্তম যোগী, শ্রেষ্ঠ যোগী। এর মধ্যে কোন দ্বিমত নাই। সুতরাং সবিশেষভাবে বাস্তবক্ষেত্রে কর্ম্মই জ্ঞান, জ্ঞানই যোগ এবং যোগই ভক্তি। ঠিক সেইকথাই ব্যাখ্যা করেছেন শাস্ত্রে পর পর। বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে দিয়ে বুঝিয়েছেন। কর্ম্ম যখন আমার নিজের জন্য হয়, ঈশ্বরের প্রীতিকামনায় হয় না, তখন সেই কর্ম্মই বন্ধনের কারণ। কর্ম্ম যখন ভগবৎপ্রীতির জন্য হয়, তখন সেই কর্ম্মই মুক্তির কারণ। গীতায় বলছেন,— 'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।'—ঈশ্বরের প্রীতিকামনায় তুমি কর্ম্ম আচরণ কর সংসারে। ভগবান্ তুমি খুশী হও, এইজন্য সংসারে থেকে আমাদের কর্ম্মাচরণ করতে হবে। একবিচারে আমরা সবাই সংসারী।

পূর্ব্ববর্ত্তী একজন বক্তৃমহোদয় বলেছেন—'মিথুনীচারিণাং নৃণাম্'। আমি সেই কথাটী তুলে ধরছি। মিথুনীচারী কাকে বললেন? গৃহস্থ—তাঁরা ছেলেপুলে, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে সংসার করছেন। মিথুনীচারীর একটা বাস্তব ধারণা আমাদের থাকা প্রয়োজন আছে। এ সম্বন্ধে যদি কোন ধারণাই না থাকে, তাহলে আমরা কি করে জিনিসটা বুঝব? এগোব কি করে যদি

সিদ্ধান্ত না বুঝি, তত্ত্বদর্শনটা যদি আমাদের না জানা থাকে। Axiomatic Truth যদি আমাদের না জানা থাকে, Formula—সূত্র যদি আমাদের না মুখস্থ থাকে, তাহলে কি করে আমরা অঙ্কটা কষব? Formula ত' আগে জানতে হচ্ছে। সেইজন্য শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নির্দেশ আছে,—'সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।' এই সিদ্ধান্ত, তত্ত্বদর্শন যাকে বলা হয়েছে, তাকে বলে Axiomatic Truth। ওটার প্রয়োজন আছে। আমাদের জানতে, বুঝতে, শিখতে হবে। সনাতন ধর্মতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে বাস্তব সত্য আগে বুঝতে হবে। তার সূত্রগুলো, Theory-গুলো আগে জেনে নিতে হবে, শিখতে হবে। তবেই বুঝতে পারা যাবে কে অবতার, কে কৃষ্ণ, কে অবতারী, কে মায়া, কি জগৎ—এ সব সম্বন্ধে একটা ধারণা হতে পারে। তারপর গুরু-কৃপাবলে সাধন করতে করতে ঈশ্বরদর্শন এবং তাঁর সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা পরবর্ত্তিকালে আসবে, আগে নয়। তখন যে জ্ঞান, সেটা হল শিষ্ট 'জ্ঞান'—বাস্তব জ্ঞান। সেই জ্ঞানকে ঋষিগণ বলেছেন 'বিজ্ঞান'।

তত্ত্ববস্তু সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান—সাক্ষাৎ দর্শন যখন, তখন তাকে 'বিজ্ঞান' বলে অভিহিত করেছেন। তাই গীতার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে,—"জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।" কৃষ্ণ বলছেন—আমি বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান-তত্ত্ব তোমাকে বলছি, তুমি শোন। 'বিজ্ঞানসহ' মানে একটা জ্ঞান আমি জানি, বুঝলাম Theory, কিন্তু তাতে প্রবেশ নাই আমার। মুখস্থ করেছি মাত্র। কিন্তু যখন তার ভিতরে প্রবেশ হচ্ছে, যখন সেটা Theoretical থেকে Practical-এ আসছে, তখন তাকে বলা হচ্ছে 'বিজ্ঞান'। ঋষিগণ জ্ঞান এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে এইভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জ্ঞান যখন Practical একজনের জীবনে, তখন তাকে 'বিজ্ঞান'-শব্দে অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের এ সমস্ত বিচারগুলি শিখতে হবে, জানতে হবে। (ক্রমশঃ)

ভ্রম-সংশোধন

সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯ম	৩৪৪	২৬	অস্বীকার	স্বীকার
১০ম	৩৭১	২১	স্বয়ী	স্বীয়
"	৩৭৫	৩৩	'ব্যাসদেব'	'বাসুদেব'
"	৩৯৪	৬	পত্নীগর্ভে	পত্নীগর্ভে

শ্রীগুরুদেবে নিবেদন

কালের কুটিল চক্রে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
অবশেষে। পুঁহুছিনু এসে তব দেশে
দীনবেশে। বিচারিতে তোমা, মন্দমতি
আমি বাঁধা পড়ে গেনু—তব কৃপাডোরে—
মায়াডোরো পরে; জানি পরম আদরে
পিতৃবক্ষে পলায়িত শ্রান্ত পুত্র যেন
হায়! নারিল কাঁদিতে, অতি অভিমানে।
দাও গো সান্ত্বনা তারে, শোধন করিয়া॥
অভিমান নাহি সাজে বড় পাতকীরে—
নাহি শোভে দাবী; কিবা গরবে গরবী
হইবে বুনো করবী। যদি কোন দেব
লয় পূজা, কৃপাসিন্ধু জানি' তারে নমি
দূর হতে। তাই বলি,—শূন্য করি মলে
পদধূলি কর, তব বীরভদ্রে ছলে॥

—শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী (দশঘরা)

শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের একোনসপ্ততিতম শুভাবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে আসাম-প্রদেশস্থ ধুবড়ী-জেলার বিদ্যাপাড়া কলেজ রোডনিবাসী শ্রীকিশোরকৃষ্ণ দাসাধিকারী (শ্রীকিশোরীমোহন পাল চৌধুরী) প্রভুর বাসভবনে বিরাট্ ব্যাসপূজা মহোৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, আসাম-প্রদেশস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ

হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ এবং শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী মহোদয় ব্রহ্মচারিগণকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বদিবসে অর্থাৎ ৯।১২।৯০ তারিখে উপস্থিত হন।

শ্রীব্যাসপূজার পূর্ব্বদিবসে শ্রীল গুরু-মহারাজ যখন ধুবড়ীতে পদার্পণ করেন তখন উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনাদ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সন্ধ্যায় মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ অধিবাস কীর্ত্তনের দ্বারা ব্যাসপূজার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

গত ২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩৯৭, ইং ১০ই ডিসেম্বর সোমবার কৃষ্ণা-নবমী-তিথিতে অর্থাৎ শ্রীগুরুপূজা-দিবসে সকাল ৭টায় এক বর্ণাঢ্য নগর-সঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন করা হইয়াছিল। উক্ত নগর-পরিক্রমায় উপস্থিত ভক্তবৃন্দ ও ধুবড়ী সহরের বহু নর-নারী অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ধুবড়ীবাসিগণের মতে এই ধরণের নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ধুবড়ী-সহরে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হইল। স্থানীয় সরকারী প্রশাসন বিভাগ উক্ত নগর-পরিক্রমায় যথারীতি সাহায্য করায় আমরা তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

নগর-পরিক্রমার পর শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সংগৃহীত, শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কর্ত্তৃক সংশোধিত ও সারস্বত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ানুমোদিত 'শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ'-অনুসারে শ্রীগুরুবর্গের অর্চ্চনান্তে শ্রীল গুরু-মহারাজ পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীমদ্ বৈষ্ণব মহারাজ শ্রীগুরুপূজা সম্পাদন করেন। শ্রীগুরুপূজান্তে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ভক্তগণ এবং বিভিন্ন স্থান হইতে আগত শ্রদ্ধালু নর-নারীগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। পুষ্পাঞ্জলি অন্তে শ্রীবিগ্রহের মধ্যাহ্ন-ভোগ ও আরতি সম্পন্ন হয়। তৎপরে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে আহূত, অনাহূত, দ্রবাহূত প্রায় দ্বিসহস্রাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

সন্ধ্যায় শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে আয়োজিত মহতী ধর্ম্মসভায় প্রধান-অতিথি শ্রীবেণীন্দ্রনাথ বরা (D. C., ধুবড়ী-জেলা), শ্রীরামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য (অবসরপ্রাপ্ত সংস্কৃত অধ্যাপক, ধুবড়ী কলেজ), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমৎ বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমৎ যতি মহারাজ, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী প্রমুখ বক্তৃগণ "শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাসপূজা" সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর সভাপতির ভাষণে শ্রীল গুরু-মহারাজ

তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় মাননীয় প্রধান-অতিথি-প্রদত্ত ভাষণের (শ্রীমন্ত শঙ্করদেব মহাপুরুষের তথাকথিত মতবাদ সম্বলিত) প্রতিবাদ করেন এবং শ্রীরামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের চিন্তাকে ধূলিস্যাৎ করিয়া সকল ধর্ম্মের মধ্যে যে সমন্বয় অসম্ভব তাহা তাঁহার বক্তৃতায় পরিস্ফুট করেন। একমাত্র সনাতন ধর্ম্মেই যে সমন্বয় সাধিত হইতে পারে, তাহার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

পরবর্ত্তিদিবসে অর্থাৎ ১১।১২।৯০ তারিখের ধর্ম্মসভায় শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারীর বক্তৃতার পর শ্রীল গুরু-মহারাজ গত দিনের প্রতিবাদিত বিষয়বস্তুর উপর বিস্তারিত ভাষণ দান করেন। উক্ত কুসিদ্ধান্ত-নিরাসপর তুলনামূলক আলোচনা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন।

শ্রীকিশোরকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভু ও শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী প্রভু (শ্রীরমেশ চন্দ্র দে, জলপাইগুড়ি) এই উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া সমিতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীসমিতির সেবকবৃন্দের শ্রীগুরুপূজার প্রচেষ্টাও যথেষ্ট প্রশংসার্হ।

বাদলা গ্রামে শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত বাদলা-গ্রামে শ্রীপাদ ভজনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীর গৃহে গত ২৩শে অগ্রহায়ণ পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা-মহোৎসব শ্রীপাদ সব্যসাচী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ শুকদেব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ত্রিলোচন দাসাধিকারী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও সহযোগিতায় মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে আহূত এক মহতী ধর্ম্মসভায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিশিষ্ট প্রচারক প্রপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট বক্তা-হিসাবে শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় প্রধান-অতিথি বক্তৃতা শেষে তাঁহার স্ব-রচিত কবিতাদ্বয় পাঠ করেন। বহু ভক্ত ও শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে সভাটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

বলাবাহুল্য এই শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব সমিতির মূলকেন্দ্র ও সমস্ত শাখামঠ-সমূহেও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন : ২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাশীর্ব্বাদে উপরিউক্ত ঠিকানায় আগামী ১২ই ফাল্গুন, ১৩৯৭ (ইং ২৫/২/৯১) সোমবার হইতে ১৬ই ফাল্গুন, '৯৭ (ইং ১/৩/৯১) শুক্রবার পর্য্যন্ত পাঁচদিন ব্যাপী বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে শ্রীনবদ্বীপধামের অন্তর্গত নয়টী (৯টী) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান মাহাত্ম্যকীর্ত্তন ও নগরসঙ্কীর্ত্তন-মুখে ষোলক্রোশ শ্রীধাম-পরিক্রমা হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধবে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমাপঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—২৯শে পৌষ, ১৩৯৭

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে উক্ত সমিতির "সাধারণ-সম্পাদক"-এঁর নামে উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ১২ই ফাল্গুন (ইং ২৫।২।৯১), সোমবার ;—(১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, নৃসিংহপল্লী ; এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ১৩ই ফাল্গুন (ইং ২৬।২।৯১), মঙ্গলবার ;—(৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদ-সেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি ; এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর। (৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) ; এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৩। ১৪ই ফাল্গুন (ইং ২৭।২।৯১), বুধবার ;—(৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য) —রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা ; এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা মেঘার চড়, বেলপুকুর ; অতঃপর শহর নবদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা (প্রৌঢ়া-মায়াস্থান)। (৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্র-শেখর আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারী গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৪। ১৫ই ফাল্গুন (ইং ২৮।২।৯১), বৃহস্পতিবার ;—**শ্রীগৌরজন্মোৎসব**।

৫। ১৬ই ফাল্গুন (ইং ১।৩।৯১), শুক্রবার ;—**সাধারণ-মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)**।

জ্ঞাতব্য ঃ—পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু যাত্রিগণ হাল্কা থালা ও ঘটি এবং মশারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন ও **১১ই ফাল্গুন** (ইং ২৪।২।৯১) রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্ব্বেই কেহ মঠে আসিলে থাকার ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। পরিক্রমা **১২ই ফাল্গুন** (**ইং ২৫।২।৯১**), সোমবার **প্রাতঃ ৫টা হইতে** আরম্ভ হইবে।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পও সেই শ্রম॥

৭ বর্ষ | ১৪ গোবিন্দ, অনিরুদ্ধ, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ ৩০ মাঘ, বুধবার, ১৩৯৭, ইং ১৩।২।৯১ | ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীচতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মকৃতা শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তুতিঃ

[শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বৃন্দাবনখণ্ডে শ্রীনারদ-বহুলাশ্ব-সংবাদে ব্রহ্মস্তুতৌ নবমেঽধ্যায়ে]

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

৩৮। তস্মাৎ ক্ষমস্ব গোবিন্দ প্রসীদ ত্বং মমোপরি।
অগণয্যাপরাধং মে সুতোপরি পিতা যথা ॥ ৩৮ ॥

প্রভো! আমাকে ক্ষমা করুন। হে গোবিন্দ! পিতা যেমন পুত্রের অপরাধ গ্রহণ করেন না, তদ্রূপ আপনিও আমার অপরাধ উপেক্ষা করিয়া আমার উপর প্রসন্ন হউন ॥ ৩৮ ॥

৩৯-৪০। ত্বদ্ভক্তা রতা জ্ঞানে তেষাং ক্লেশো বিশিষ্যতে।
পরিশ্রমাৎ কর্ষকাণাং যথা ক্ষেত্রে তুষার্থিনাম্॥ ৩৯ ॥

ত্বদ্ভক্তিভাবে নিরতা বহবস্ত্বদগতিং গতাঃ।
যোগিনো মুনশ্চৈব তথা যে ব্রজবাসিনঃ।
দ্বিধা রতির্ভবেদ্বরা শ্রুতাচ্চ দর্শনাচ্চ বা ॥ ৪০ ॥

যাহারা আপনার অভক্ত হইয়া জ্ঞানে রত, পরিশ্রমপূর্ব্বক ক্ষেত্রকর্ষণ করিয়া তুষলাভকারীর ন্যায় তাহাদের ক্লেশ হওয়াই স্বাভাবিক ; কিন্তু আপনার প্রতি একান্ত ভক্তিযুক্ত ব্যক্তিগণ আপনাকেই প্রাপ্ত হন। গোপী, মুনি ও ব্রজবাসিগণের মধ্যেও জ্ঞানে ও দর্শনে দ্বিধারতি দৃষ্ট হয় ॥ ৩৯-৪০ ॥

৪১-৪২। অহো হরে তু মায়য়া বভূব নৈব মে রতিঃ ॥ ৪১ ॥
ইত্যুক্ত্বাশ্রুমুখো ভূত্বা নত্বা তৎপাদপঙ্কজৌ।
পুনরাহ বিধিঃ কৃষ্ণং ভক্ত্যা সর্ব্বং ক্ষমাপয়ন্ ॥ ৪২ ॥

অহো! হরির মায়ায় ভগবানের প্রতি আমার রতি হইল না!—ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়া অশ্রুপূর্ণমুখে তাঁহার পাদপদ্মে প্রণামপূর্ব্বক সর্ব্বাপরাধ ক্ষমার জন্য পুনরায় কৃষ্ণকে ভক্তিভরে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪১-৪২ ॥

৪৩। ঘোষেষু বাসিনামেষাং ভূত্বাহং ত্বৎপদাম্বুজম্।
যদা ভজেয়ং সুগতিস্তদা ভূয়ান্ন চান্যথা ॥ ৪৩ ॥

আমি গোপকুলে জন্ম লইয়া যেন আপনার পাদপদ্ম ভজনা করত সুগতি লাভ করিতে পারি, ইহার যেন অন্যথা না হয় ॥ ৪৩ ॥

৪৪। বয়ন্তু গোপদেহেষু সংস্থিতাশ্চ শিবাদয়ঃ।
সকৃৎ কৃষ্ণস্তু পশ্যন্তস্তস্মাদ্ধন্যাশ্চ ভারতে ॥ ৪৪ ॥

আমরা ব্রহ্মা, শিবাদি দেবতাগণ গোপরূপে যখন ভারতে গোপকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া একবার কৃষ্ণদর্শন করিয়াছি, তখন ধন্য ॥ ৪৪ ॥

৪৫। অহো ভাগ্যন্তু শ্রীকৃষ্ণ মাতাপিত্রোস্তব প্রভো।
তথা চ গোপ-গোপীনাং পূর্ণস্ত্বং দৃশ্যসে ব্রজে ॥ ৪৫ ॥

হে কৃষ্ণ! আপনার মাতাপিতা এবং গোপ-গোপীগণেরও কি সৌভাগ্য যে, তাঁহারা ব্রজপুরে আপনার পূর্ণরূপ দর্শন করিতেছেন ॥ ৪৫ ॥

৪৬। মুক্তাহারঃ সর্ব্ববিশ্বোপকারঃ
সর্ব্বাধারঃ পাতু মাং বিশ্বকারঃ।
লীলাগারঃ সুরিকন্যা-বিহারঃ
ক্রীড়াপারঃ কৃষ্ণচন্দ্রাবতারঃ ॥ ৪৬ ॥

সর্ব্ববিশ্বোপকার মুক্তাহার বিশ্বাকার সর্ব্বাধার লীলাগার দেবকন্যা-বিহার ক্রীড়াপার কৃষ্ণচন্দ্রাবতার আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৪৬ ॥

৪৭। শ্রীকৃষ্ণ-বৃষ্ণিকুল-পুষ্কর নন্দপুত্র
রাধাপতে মদনমোহন দেবদেব।
সম্মোহিতং ব্রজপতে ভুবি তেঽজয়া মাং
গোবিন্দ গোকুলপতে পরিপাহি পাহি ॥ ৪৭ ॥

বৃষ্ণিকুলের কমলস্বরূপ নন্দনন্দন রাধাপতি দেবদেব মদনমোহন ব্রজপতি গোকুলপতি গোবিন্দ মায়া-মোহাপন্ন আমাকে রক্ষা করুন—রক্ষা করুন ॥ ৪৭।

৪৮। করোতি যঃ কৃষ্ণ হরেঃ প্রদক্ষিণাং
ভবেজ্জগত্তীর্থফলঞ্চ তস্য তু।
তে কৃষ্ণ লোকং সুখদং পরাৎপরং
গোলোকলোকং প্রবরং গমিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহার সর্ব্বজগতের তীর্থফললাভ হয়। তিনি সুখদ পরাৎপর লোকপ্রবর পরম গোলোকধামে গমন করেন ॥ ৪৮ ॥

[লোকেশ ব্রহ্মা এইরূপে সুন্দর বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীগোবিন্দের স্তব করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কিছুকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া বৎস ও বৎসপালগণকে প্রত্যর্পণপূর্ব্বক পুনরায় প্রণামপূর্ব্বক নিজলোকে গমন করিলেন।]

মাৎসর্য্য

'মাৎসর্য্য'-শব্দের অর্থ ও নির্ম্মৎসর প্রেমধর্ম্মের অধিকারী নির্ণয়

'মাৎসর্য্য'-শব্দটী অনেকস্থানে অনেক অর্থ সংযুক্ত হয়। পরশুভ-দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, অসূয়া ও ঈর্ষা ইত্যাদি নানা অর্থ পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে যে যে-স্থলে মাৎসর্য্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই তদ্দ্বারা প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবকে বুঝিতে হয়। "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরম-নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্" —এই ভাগবত-বাক্যে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পরম ধর্ম্মের অধিকারী নিরূপিত হইয়াছে। প্রেম-রসই ঐ শাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট পরম ধর্ম্ম। যিনি নির্ম্মৎসর, তিনি

ঐ ধর্ম্মের অধিকারী। মাৎসর্য্যশূন্যতার নাম নির্ম্মৎসরতা। যদিও টীকাকার মহোদয় পরের সুখে দুঃখী ও পর দুঃখে সুখী হওয়াকে মৎসরতা বলিয়া অর্থ করিয়াছেন, তথাপি উক্ত শব্দের বিস্তীর্ণরূপ অর্থ প্রকাশ না করিলে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয় না।

কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌বর্গ এবং তাহাদের পরস্পর উৎপত্তির কারণ

অবিদ্যারূপ জীব ষড়্‌বর্গ-রূপ রজ্জুদ্বারা জড়ে আবদ্ধ হইয়াছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—ছয়টীকে ষড়্‌বর্গ বলে। ইহারা অবিদ্যা, অস্মিতা, অভিনিবেশ, রাগ ও দ্বেষরূপ পঞ্চ ক্লেশের অবস্থান্তর। জড়বস্তুতে অভিনিবেশ হইতে কামের উৎপত্তি। কাম সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে,— সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ (গীঃ ২।৬২-৬৩)

বিষয়াভিনিবেশ-রূপ সঙ্গ হইতে **কাম** উৎপত্তি হয়। কাম হইতে **ক্রোধ**, ক্রোধ হইতে **সম্মোহ** অর্থাৎ অন্যায়রূপে বিষয় **লোভ**, বিষয় লোভ হইতে **স্মৃতি-বিভ্রম** অর্থাৎ মোহ, মোহ হইতে **বুদ্ধিনাশ** অর্থাৎ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য **মদ**, মদ হইতে বিনাশ অর্থাৎ জীবের স্বরূপ-বিকৃতিরূপ **মাৎসর্য্য** হয়।

রিপু-দমনের উপায়

উপদেশ-স্থলে কথিত হইয়াছে ;—

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।

জহি শত্রুং মহাবাহো ! কামরূপং দুরাসদম্ ॥ (গীঃ ৩।৪৩)

বুদ্ধির অতীত যে চিদ্ঘন জীব, তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া নিশ্চয়াত্মিকা সিদ্ধান্তদ্বারা মনকে বশীভূত করত দুর্দ্ধর্ষ কামরূপ শত্রুকে জয় কর।

অন্য সমস্ত রিপুই মাৎসর্য্যের অন্তর্গত

এই সমস্ত উপদেশদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, স্ব-স্বরূপ-ভ্রম হইতে কামরূপ অঙ্কুর ক্রমশঃ মাৎসর্য্যরূপ বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া **'জৈবধর্ম্ম'** যে প্রেম, তাহাকে সুদূরবর্ত্তী করিয়াছে। **কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ—এই পাঁচটীই মাৎসর্য্যের অন্তর্ভুক্ত**। ক্রোধে কাম আছে। লোভে ক্রোধ ও কাম আছে। মোহতে লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে। মদে মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে। মাৎসর্য্যে মদ, মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে।

মদ শব্দে ধনমদ, রূপমদ, জাতিমদ, বিদ্যামদ প্রভৃতি ছয়প্রকার মদই বুঝিতে হইবে।

যাবতীয় ক্লেশই মাৎসর্য্যের অন্তর্গত ও 'জীবে দয়া'-হীন ব্যক্তি মাৎসর্য্যপর

জীবের সমস্ত ক্লেশই মাৎসর্য্যের অন্তর্গত। অবিদ্যা, পাপবাসনা ও পাপ, তথা অবিদ্যা, পুণ্যবাসনা ও পুণ্য—এই সমস্তই মাৎসর্য্যের অন্তর্গত। 'জীবে দয়া', 'নামে রুচি', বৈষ্ণবসেবা'-রূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম একদিকে এবং মাৎসর্য্য একদিকে অবস্থিতি করে। যিনি পরসুখে দুঃখী, তিনি কখনই জীবে দয়া করেন না। ভগবানের প্রতিও তাঁহার সরসভাব উদয় হয় না। বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহার নিসর্গজনিত ঘৃণা বা বিদ্বেষ থাকে।

মাৎসর্য্যশূন্য ব্যক্তিই 'তৃণাদপি' শ্লোকের তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ

যিনি মাৎসর্য্যশূন্য, তিনিই তৃণাদপি শ্লোকের তাৎপর্য্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন ;—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ। (শিক্ষাষ্টক—৩)

মাৎসর্য্যশূন্য ব্যক্তির ধনমদ, রূপমদ, জাতিমদ, বিদ্যামদ ও জড়ীয় বল-মদ থাকে না ; অতএব তিনি আপনাকে তৃণ অপেক্ষা হীন বলিয়া জানেন। মাৎসর্য্যশূন্য ব্যক্তির ক্রোধ, তীব্রতা ও পরহিংসা থাকে না। অতএব তিনি বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু অর্থাৎ পরম দয়ালু। জাতি-বিদ্যা মদাদি-রহিত নির্ম্মৎসর পুরুষ সমস্ত গুণসম্পন্ন হইলেও প্রতিষ্ঠাশা-শূন্য, অতএব তিনি অমানী। নির্ম্মৎসর পুরুষ পর-সুখে সুখী ও পর-দুঃখে দুঃখী ; অতএব সর্ব্বজীবে তিনি যথাযোগ্য মান বিধান করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ দয়া দ্বারা সর্ব্বজীবে সম্মান, সম্মানের দ্বারা ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবপ্রায়-ভদ্রজীবে তর্পণ ও চরণ পূজাদ্বারা বৈষ্ণব সেবা বিধান করেন।

নির্ম্মৎসর পুরুষের ১০টী লক্ষণ

১। নির্ম্মৎসর পুরুষ স্বভাবতঃ সাধুনিন্দা করেন না।

২। কৃষ্ণৈকান্তিক বুদ্ধিসহকারে অন্যদেবে পৃথগীশ্বর জ্ঞানশূন্য হইয়াও তত্তদেবের প্রতি অবজ্ঞা করেন না।

৩। গুরুজনের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা করেন।

৪। শ্রুত্যাদি ভক্তি-শাস্ত্রের সম্মান করেন।

৫। বৃথা তর্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক নাম ও নামীর একত্ব বিশ্বাসে নামকে পরমার্থ বলিয়া স্থির করেন।

৬। নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি করেন না।

৭। ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ প্রভৃতি অন্য শুভ-কর্ম্মকে নামের তুল্য শুভ মনে করেন না।

৮। শ্রদ্ধাশূন্য ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিবার যত্ন করেন কিন্তু যতদিন শ্রদ্ধা হয় নাই, তাহাকে নামোপদেশ করেন না।

৯। নাম-মাহাত্ম্য যাহা কিছু শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন।

১০। জড় সম্বন্ধে অহংতা-মমতা-শূন্য থাকেন।

হে পাঠকবর্গ! নির্ম্মৎসরতাই জীবের মুক্তি এবং মাৎসর্য্যই জীবের বন্ধন। অতএব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ;—

চৈতন্য-চরিত শুন শ্রদ্ধা-ভক্তি করি'।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া, মুখে বল 'হরি' 'হরি'॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১০।৩৬১)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বর্ষ-পরীক্ষা

শাস্ত্র বলেন, নশ্বর রাজ্যে অনিত্য ধামে মিশ্র প্রতীতিতে নিরন্তকুহক সত্যরূপ পরমেশ্বর স্বীয় নিত্য চিন্ময় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-ধাম হইতে অবতরণ করেন। ভগবৎপার্ষদগণও নিত্য চিদানন্দ ধাম হইতে অধিরোহ-বাদিদিগের মঙ্গলের জন্য প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। অধিরোহবাদিগণ নিজের প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদিকে সম্বল করিয়া উন্নত হইতে যত্ন করেন। যেকালে অক্ষজ-জ্ঞানবাদী অধোক্ষজ বস্তু শ্রীগুরুদেবের নিকট স্বীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান লইয়া উপস্থিত হন, তৎকালে তাঁহার চেষ্টাকে 'ভোগ' বলা হয়। ইহারই নামান্তর 'কর্ম্মবাদ'; ভগবদ্‌ভক্তিধারা তাহার বিপরীত। ইহা উচ্চ হইতে নিম্নে নামিয়া আসে। যখন সত্য বস্তু, চিদ্ বস্তু, ও আনন্দময় বস্তু নিত্য ধাম হইতে অনিত্য অচিৎ ও নিরানন্দ ধামে নামিয়া আসে, তখন কর্ম্মফল-ভোগী কর্ম্মবাদাবলম্বনে ভগবান্ বা ভক্তের সান্নিধ্যের সুযোগ পান। ভগবান্ বা ভক্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞান-মত্ত

কর্ম্মবাদীকে তাহার যোগ্যতানুসারে তাহার ভাষায় তাহার তাৎকালিক ব্যবহারের অনুকূলে ন্যূনাধিক সঙ্গ প্রদান করেন।

ভক্তিশাস্ত্রের মধ্যে গুরুগ্রহণ-বিচারে যে পদ্ধতি গৃহীত হয়, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, গুরুকে শিষ্য এক বর্ষকাল পরীক্ষা করেন এবং গুরুও শিষ্যকে এক বর্ষকাল তাদৃশ পরীক্ষা করেন। ইহাতে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা এই দোষচতুষ্টয়যুক্ত অক্ষম শিষ্য তাঁহার নিজ অসম্পূর্ণ জ্ঞানদ্বারা স্বীয় গুরুদেবের পরীক্ষা কি-প্রকারে করিবেন? এবং গুরুদেবই বা কেন নিরন্তকুহক-জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া শিষ্যকে পরীক্ষা করিবার জন্য, শিষ্যকে পাইবার জন্য এক বৎসরকাল কর্ম্মবাদীর ন্যায় অন্ধকারে হাতড়াইবেন? অধোক্ষজ-সেবাপ্রদাতা শ্রীগুরুদেব কেন অক্ষজজ্ঞানদৃপ্ত কর্ম্মবাদীর ন্যায় তাহাদের পথ অনুসরণ করিবেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই জানা যায় যে, যে কালে শিষ্য শ্রীগুরুদেবের পদপ্রান্তে উপনীত হন, তৎকালে শিষ্য অধোক্ষজ-সেবা-নিরত শ্রীগুরুদেব নহেন। তাঁহার চেষ্টায় আমরা কিরূপে পূর্ব্ব হইতেই ভক্তি-বৃত্তি—যাহা আত্মার নিত্যবৃত্তি—দেখিতে পাইব? শিষ্য অসংখ্য ফলভোগময়ী চেষ্টার অন্যতম-জ্ঞানে শ্রীগুরুদেবকেও তাঁহারই মত একজন মনে করিয়া ভোগের চেষ্টায় মত্ত থাকেন। শিষ্য গুরুদেবকে তাঁহারই অক্ষজ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তুবিশেষ বলিয়া মনে করেন। শিষ্য ইন্দ্রিয়জ্ঞানে ভোগ্য বস্তুর অন্যতম মনে করিয়া গুরুর সহিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলে তাহার ভোগময়ী বুদ্ধি শ্রীগুরুদেবের সঙ্গক্রমে ক্ষীণতালাভ করে। যখন শিষ্যের মলিনতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি শ্রীগুরুকৃপালাভে সমর্থ হন। শিষ্যের একবৎসর কাল অবস্থান-কাল তাহাকে বাস্তবিক শিষ্য হইবার উপযোগিতা প্রদান করে। তিনি ক্রমশঃ শ্রীগুরুদেবকে স্বীয় অক্ষজ-জ্ঞানে দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ নিরন্তকুহক-সত্য নয়নে দেখিবার সুযোগ পান। চিকিৎসকের অধীনে যে-সময় রোগী আত্মসমর্পণ করেন, তখন তাহার রোগ প্রবল আছে, জানিতে হইবে। রোগ প্রবল থাকাকালে কখনই তাহাকে নীরোগ বলা যাইতে পারে না। যেকালে জীব কর্ম্মভূমিতে ভোক্তা হইয়া বিচরণ করেন, সেকালে দশদিকেই তিনি ভোগের প্রার্থনায় চতুর্দ্দশ ভুবনে ঘুরিয়া বেড়ান। সৌভাগ্যক্রমে যদি কোন নিরন্তকুহক সত্য-প্রদাতার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হন, তখন শিষ্যরূপ জীব তাঁহার এক বৎসরকাল সেবা-নিরত হইবার সুযোগ করিয়া লইবেন। তাঁহার সঙ্গপ্রভাবে শিষ্যের কর্ম্মময়ী ভোগ-চেষ্টা ক্রমশঃ

ক্ষীণা হইলে তাঁহার শিষ্যব্রুব ধর্ম্ম শিষ্যত্বে পরিণত হইবে। আর শ্রীগুরুদেব শিষ্য হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিষ্যের অধিকার বিচার করিয়া এক বৎসর অক্ষজ-অধিরোহবাদীকে তাহার সঙ্গলাভ করাইবার সুযোগ দিয়া থাকেন।

গাছের তলায় গিয়াই বৃক্ষোপরিস্থিত সমগ্র ফল লাভ হইয়াছে, মনে করিলে কিছু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাদৃশ ফল লাভ হয় না, সেরূপ শিষ্যব্রুব গুরুর শিষ্য হইয়াছেন, মনে করিলেই শিষ্য হইতে পারেন না। যেকালে শিষ্যব্রুব আপনাকে-শ্রীগুরুদেবের নিত্যদাস জানেন, তখনই তাঁহার শিষ্যত্ব, নতুবা শিষ্য-ব্রুবত্ব হইতে পতন হইয়া অভিবাড়ি নামে উপসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া যান। তখন শিষ্য নিজগুরুর শিষ্যত্ব লাভ করিতে না পারিয়া গুরুদ্রোহিতা করিয়া ফেলেন এবং তাহাকেই ধর্ম্ম নামে চালাইতে থাকেন। যদি কোন গুরুব্রুব অক্ষজ-কর্ম্মবাদীকে নিজ শিষ্য বলিয়া অভিমান করেন, তাহা হইলে তিনি অচিরেই স্বীয় গুরুত্ব বিনাশ করিয়া গুরুব্রুবত্বে স্থাপিত হইবেন। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের মঙ্গল করিতে না পারিলে, দিব্যজ্ঞানে আলোকিত করিতে অসমর্থ হইলে, শিষ্যব্রুবের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে আর গুরুব্রুবত্বে স্থাপিত করিবেন না। তাহা হইলেই জানা যায় যে, গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই বর্ষকাল পরীক্ষা-বিধি কিছু গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করে নাই। তাহার পরবর্ত্তী সময়েই গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে। সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পর দিব্যজ্ঞানে আলোকিত শিষ্য, গুরু হইতে প্রাপ্ত নিরন্তকুহক সত্যের প্রতি সন্দিহান হইতে পারেন না। ভক্তিশাস্ত্রেও অভক্ত শিষ্যব্রুবের এরূপ আচরণ ভক্তির অনুকূল বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীরাধারাণীর ও শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে তুলসী-প্রদান সম্বন্ধে প্রশ্নদ্বয়

মেদিনীপুর সহরস্থ মাণিকপুর হইতে শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র সাঁতরা মহাশয় সদুত্তর প্রার্থনা করিয়া পত্রদ্বারা নিম্নলিখিত প্রশ্ন করিয়াছেন।

প্রথম প্রশ্ন ঃ—শ্রীরাধারাণীর শ্রীপাদপদ্মে তুলসী অর্পণ করা যায় কি না? যদি না যায়, তবে তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি এবং যাহারা দিয়া থাকেন, তাহাদের অপরাধ হয় কি না?

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ—শ্রীগুরুপাদপদ্মে তুলসী দেওয়া যায় কি না? অনেক জাতি-গোস্বামী নিজদিগকে ভগবানের স্বরূপ অভিমানে নিজপদে শিষ্যকর্ত্তৃক প্রদত্ত তুলসী গ্রহণ করেন। উদাহরণ-স্বরূপ এখানে শ্রীঅজিত গোস্বামী এবং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাটের গোস্বামী প্রভুগণ ঐরূপ করিয়া থাকেন। এই বিষয়ের সুমীমাংসা হইলে জগতের অনেক উপকার ও মঙ্গল সাধিত হইবে।

শ্রীশ্রীরাধারাণীর চরণে তুলসী-দান সম্বন্ধে
প্রথম প্রশ্নের উত্তর

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের অংশী। শ্রীমতী বার্ষভানবী দেবীও সকল শক্তিতত্ত্বের অংশিনী। সখীগণ তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপ; অতএব তাঁহার অভিন্না। তুলসী দেবী শ্রীমতী রাধারাণীর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করেন।

শ্রীঅনন্তসংহিতা গ্রন্থে এবিষয়ের এইরূপ যুক্তি দেখা যায়,—

পূর্ণাশক্তি-স্বরূপা চ শ্রীমতীবার্ষভানবী।
বৈভবরূপিণী তস্যা বৃন্দাদেবী প্রকীর্ত্তিতা॥
নিত্যং শ্রীতুলসীদেবী সেবতে বার্ষভানবীম্।
অন্যোন্যমেষ বিশ্রম্ভভাবস্তয়োরবস্থিতঃ॥
দদ্যাৎ শ্রীতুলসীং তস্মাৎ শ্রাদেব্যাঃ করপল্লবে।
শুদ্ধো হি বৈষ্ণবো নিত্যং পাদয়োর্ন কথঞ্চন্।
মোহাৎ প্রবর্ত্তমানস্তু ভবেত্তত্রাপরাধবান্॥

অর্থাৎ শ্রীমতী বার্ষভানবী স্বয়ং পূর্ণাশক্তিস্বরূপা। শ্রীতুলসীদেবী তাঁহারই বৈভবরূপিণী। তাঁহারা বিশ্রম্ভভাবে অবস্থিতা। তিনি নিত্যই শ্রীমতীর সেবা করেন। অতএব শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ শ্রীতুলসীদেবীকে শ্রীমতীর শ্রীকরপল্লবে অর্পণ করিয়া থাকেন। কারণ এক শক্তিকে অন্য শক্তির শ্রীচরণে অর্পণ করা যায় না। মোহবশতঃ কেহ ঐরূপ অন্যায় আচরণ করিলে অপরাধী হইয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে তুলসী-দান সম্বন্ধে
দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া শ্রীতুলসীদেবীকে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ অথবা শ্রীগদাধরাদি শক্তিতত্ত্বের শ্রীচরণে তুলসী দেওয়া হয় না। শ্রীগুরুদেবও গৌরশক্তিতত্ত্ব। যদিও তাঁহাকে ভগবদভিন্ন-তত্ত্ব বলা হইয়াছে, তথাপি প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীগুরুদেব সেবক-ভগবান্ এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেব্য-ভগবান্। সেবককে সেব্যের সহিত সমবিচারে গণনা করা অপরাধজনক।

এ বিষয়ে শ্রীমজ্জীবগোস্বামী প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত এই—শুদ্ধভক্তান্ত্বকে শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহাভেদদৃষ্টিং **তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে**। যথা—

বয়ন্তু সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।

সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্তমং ত্বাদ্য গতিং গতাঃ স্ম॥ (ভাঃ ৪।৩০।৩৮)

কোন কোন শুদ্ধভক্ত **শ্রীগুরু ও শ্রীশিবকে শ্রীভগবানের প্রিয়তম বলিয়াই তাঁহা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করেন**। যথা—হে ভগবন্! আমরা আপনার প্রিয়সখা, সাক্ষাৎ ভগবান্ ভবের ক্ষণকাল সঙ্গ-প্রভাবেই অদ্য দুশ্চিকিৎস্য ভব এবং মৃত্যুরূপ রোগের ভিষক্তম-স্বরূপ আপনাকে গতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। যিনি আপনার প্রিয়সখা, সেই ভবের (মহাদেবের), দুশ্চিকিৎস্য অর্থাৎ নিতান্ত অচিকিৎস্য, ভব (জন্ম) এবং মৃত্যুর ভিষক্তম্ (সদ্বৈদ্যস্বরূপ) আপনাকে গতি অর্থাৎ শরণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীশিবই এই বক্তৃগণের গুরু। (শ্রীভগবানের প্রতি প্রচেতাগণের উক্তি)। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয়ও শ্রীল জীবগোস্বামি-পাদের অনুসরণে গাহিয়াছেন,—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।

কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ (গুর্ব্বষ্টক—৭)

সমস্ত শাস্ত্রে শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ হরিরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও তদ্রূপ ভাবনা করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তব সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের প্রিয়। তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দে আমি প্রণাম করি।

অতএব শ্রীগুরুপাদপদ্মে তুলসী অর্পণ-সম্বন্ধে শ্রী অনন্ত-সংহিতার সিদ্ধান্ত এই—

তুলস্যা বিষয়ং তত্ত্বং বিষ্ণুমেব সমর্চ্চয়েৎ।

সা দেবী কৃষ্ণশক্তির্হি শ্রীকৃষ্ণবল্লভা মতা॥

অতস্তাং বৈষ্ণবীং দেবীং **নান্যপদে সমর্পয়েৎ**।

অর্পণে তত্ত্বহানিঃ স্যাৎ সেবাপরাধ এব চ॥

অতত্ত্বজ্ঞস্তু পাষণ্ডো গুরুক্রবস্য পাদয়োঃ।

অর্পয়ন্ তুলসীং দেবীমর্জ্জয়েন্নরকং পদম্॥

অর্থাৎ কৃষ্ণ-শক্তি তুলসীদেবী শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া। তদ্দ্বারা একমাত্র শ্রীবিষ্ণুরই অর্চ্চন করিতে হইবে। অন্য বৈষ্ণবপদে কদাচ অর্পণ করিবে না বা করিতে নাই। করিলে তত্ত্বহানি ও সেবাপরাধ হইবে। তত্ত্বজ্ঞানহীন পাষণ্ডগণ গুরুক্রবের পায়ে তুলসী অর্পণ করিয়া নরকের পথ প্রশস্ত করে।

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

———

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে

দীনের বিজ্ঞপ্তি

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীতি-নামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবী-দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥

হে প্রভু সরস্বতী! প্রেমের মহাজন।
রূপানুগবর তুমি গৌর-নিজজন॥
মায়াবাদ-রাহুগ্রস্ত দেখি' বিষ্ণুভক্তি।
অবতীর্ণ হইলে তুমি মূর্ত্ত-গৌরশক্তি॥
অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য-বলে খণ্ডি যত মত।
প্রচারিলে বিষ্ণুভক্তি শাস্ত্র-সুসঙ্গত॥
শ্রৌত-সিদ্ধান্ত-ধারা পুনঃ প্রবর্ত্তন।
করিয়া করিলে তুমি ভক্তির স্থাপন॥
শ্রীচৈতন্য-বাণীর তুমি মূর্ত্ত-বিগ্রহ।
ভক্ত-ভক্তি-সংরক্ষণে অপূর্ব্ব আগ্রহ॥
তব মুখ-বিগলিত ভক্তি-মন্দাকিনী।
প্লাবিত করিয়া পূত করিলে মেদিনী॥
অচেতন বিশ্বে তুমি চৈতন্য জাগাইয়া।
করিলে চৈতন্যময় জগতের হিয়া॥
বাণীর আলোকে দেখি চৈতন্য-মূরতি।
নাচয়ে চেতন-প্রাণ উল্লসিত অতি॥
দয়ার সাগর তুমি পতিতপাবন।
উদ্ধারিলে মায়া হ'তে শত শতজন॥

কত অপরাধ কৈনু চরণে তোমার।
স্নেহ করি' ক্ষমিয়াছ উহা বার বার ॥
কত যে করিলে তুমি আমা লাগি' যত্ন।
যাতে ছুড়ে নাহি ফেলি ভক্তি-মহারত্ন ॥
আপন শাবকে রক্ষে যেমতি পক্ষিণী।
তেমতি রক্ষিলে তুমি মোরে গুণমণি ॥
বল-বুদ্ধি যাহা মোর, সব ছিলে তুমি।
তুমি হারা আমি যেন মণিহারা ফণী ॥
কি করিতে পারে রথী শূন্যচক্র-রথে।
যদিও তূণভরা তীর-শর লাখে লাখে ॥
তোমার বিহনে দেখি সব অন্ধকার।
আবার কি শুনিব কানে মায়ার হুঙ্কার ॥
দয়া করি দিয়াছিলে দেবদুর্ল্লভ সঙ্গ।
ভাগ্যদোষে হ'ল উহা অকালেতে ভঙ্গ ॥
যদ্যপি স্বেচ্ছায় লীলা করিলে গোপন।
তথাপি প্রবোধ নাহি মানে মোর মন ॥
অভিন্ন বলদেব তুমি, মোরে সেবা দিতে।
এসেছিলে সপার্ষদ এই অবনীতে ॥
কিন্তু হতভাগ্য আমি অতি দুরমতি।
লেশমাত্র নাহি হল চরণেতে রতি ॥
অযতনে লভি ধন হারানু অযতনে।
এই দুঃখে মোর প্রাণ কাঁদে অনুক্ষণে ॥
তোমার স্নেহের কথা উদিত হইয়া।
শোকের সাগরে মোরে দিতেছে ডারিয়া ॥
কি করিব, কোথা যাব, কি হইবে গতি।
নাহি মনে শান্তি মোর, করমে শকতি ॥
আশীর্ব্বাদ কর প্রভু এই দীনহীনে।
যেন তব দত্ত সেবা করি প্রাণপণে ॥

তব প্রিয়জন যাহা করিবে আদেশ।
পালিব সতত জানি তোমার নির্দ্দেশ ॥
তাঁদের হইয়া যেন তোমার চরণ।
হৃদয়-মন্দিরে ধ্যান করি সর্ব্বক্ষণ ॥
প্রতি জন্মে করি আমি এই অভিলাষ।
যেন তব ভক্তসহ হয় নিত্যবাস ॥
এই মাত্র আশা মম চরণে তোমার।
অধম বৃন্দাবনে কর ভবসিন্ধু পার ॥

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিবেক বন (মহারাজ)
ধমধমা (আসাম)

গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি ?

নিজের সুখের জন্য যত্ন করলে ভোগী গৃহব্রত হয়ে পড়তে হয়। কৃষ্ণসেবার জন্য নিখিল প্রয়াস করলে মঙ্গল হয়। যাঁরা স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়ে সর্ব্বতোভাবে অনুক্ষণ কৃষ্ণভজন করছেন, তাঁহাদিগকে নানাভাবে সাহায্য বা সেবা করবার জন্য গৃহস্থ ভক্তগণ সর্ব্বদা যত্নপর থাকিবেন। তবেই গৃহস্থগণের মঙ্গল হবে, সংসারাসক্তি শিথিল হবে। যাঁরা পারমার্থিক গৃহস্থ অর্থাৎ গৃহস্থ বৈষ্ণব, তাঁরা নিজের স্ত্রী, পুত্র, কন্যার জন্য যেরূপ প্রচুর পরিশ্রম করেন, সেরূপ হরিসেবার জন্যও প্রচুর চেষ্টা করে থাকেন। নিজ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি ভগবদ্ভজন করছে জানলে তাদের পোষণ করেন, নতুবা দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষণ করেন না। তাদের সঙ্গ প্রতিকূল বা ভক্তিবাধক জেনে তফাৎ হয়ে যান।

আমি যখন প্রভু সাজতে চাই, অন্যের উপর প্রভুত্ব করতে চাই, তখনই মায়া বা প্রকৃতির বশীভূত হয়ে পড়ি। বর্ত্তমান বিপন্ন মানবজাতির একমাত্র মঙ্গলকর কৃত্য হচ্ছে—এই যে সংসার—এই যে বোকামীর হাতে পড়েছি, তা হতে উদ্ধার লাভ করে কৃষ্ণ-সংসারে প্রবেশ লাভ করা, অন্য উপায়ে হয় না।

যে গুরুদেবের কৃপায় সংসার থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, সেই গুরু কি অভক্ত, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, ছলনাময়, প্রচ্ছন্ন, নাস্তিক, নির্ভেদ জ্ঞানী বা যোগী হতে পারেন? পরমপুরুষ ভগবানে সর্ব্বতোভাবে ভক্তিবিশিষ্ট না হলে কি কেহ প্রকৃত গুরু হতে পারেন? গৃহস্থ বা বৈরাগী প্রত্যেকেরই গুরু-সেবাই প্রধান কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা সেবোন্মুখ কর্ণে পৌঁছিলে চক্ষুর অজ্ঞান-তিমির বিদূরিত হয়, তখন চক্ষু নির্ম্মল হয় এবং সেই নির্ম্মল চক্ষুতে কৃষ্ণদর্শন হয়ে থাকে।

আমার প্রভুত্বের ইচ্ছা আমার সর্ব্বনাশের কারণ। যদি স্বেচ্ছায় প্রেয়ঃ-পথে চালিত হই—সংসার করতে দৌড়াই—সংসার নিয়ে ব্যস্ত হই, তবে ত্রিতাপ-জ্বালা অনিবার্য্য। সুতরাং মনের কথা ও মনোধর্ম্মী লোকের কথা না শুনে যাঁরা সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবা করেন, তাঁহাদের উপদেশ সর্ব্বতোভাবে শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

—শ্রীমৎ উদ্ধবদাস বাবাজী মহারাজ

শ্রীগুরু-পূজারই নামান্তর—শ্রীব্যাসপূজা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪২১ পৃষ্ঠার পর]

অনেকে আবার ব্যাসপূজার তিথি নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া মহাফাঁপরে পড়িয়া যান। তাঁহারা গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহাকে জাতি-কুলাদির অন্তর্গত মনে করেন এবং তাঁহার শৌক্রজন্ম অপেক্ষা দৈক্ষ্য ও সন্ন্যাস-জন্মের অধিক প্রাধান্য স্বীকার করেন। যাঁহারা গুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিতে ব্যাসপূজা করেন, তাঁহারা তাঁহাদিগকে মূর্খ ও স্তাবক এবং নিজেদের প্রভুপাদের ধারার বাহক অভিমান করিয়া 'নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারিয়া' থাকেন। অপসিদ্ধান্তকারিগণ বলেন,—"বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা, উপশাখা, বিচ্ছিন্ন মঠ শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের নামে পরিচিত মঠাধ্যক্ষগণ পরমারাধ্য শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের তিরোভাবের পরে উচ্চবর্ণ বা অন্ত্যজবর্ণে পিতা-মাতা-কর্ত্তৃক উদ্ভূত গুরুদেবের শৌক্র জন্মলাভের দিনটিকে মূর্খ স্তাবকগণ দ্বারা আবির্ভাব তিথি-পূজা জাঁক-জমকের সহিত করিতেছেন। ইহা অযৌক্তিক ও অবৈধ বলিয়া

মনে করি। যদি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা বা ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসগ্রহণের দিনটিতে জন্মোৎসব করিতেন তাহা হইলে কিঞ্চিৎ ভক্তিসিদ্ধান্তের আলোক পাইতাম। শূদ্রের জন্ম-তারিখে আবির্ভাব উৎসব হওয়া কি সমীচীন ?"

প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মফলবাধ্য প্রাকৃত জীবের ন্যায় গুরু-বৈষ্ণবগণের কোন শৌক্রজন্ম নাই। তাঁহাদের এই জগতে আবির্ভাব-তিরোভাব হয় মাত্র। স্মার্ত্তগণই শৌক্রপদ্ধতির বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন, তাহা পারমার্থিকের আদরের বস্তু নহে। যেক্ষেত্রে বৈষ্ণবকে জাতি-কুলাদির অন্তর্গত বলিলে মহাপরাধ উপস্থিত হয়, সেইক্ষেত্রে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ গুরুদেবকে 'শূদ্র' বলিলে নরকের দ্বার পরিষ্কার করা হইবে না কি ? গুরু-বৈষ্ণবগণ উচ্চ বা নিম্নবর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন কেবলমাত্র কুলকে পবিত্র করিবার জন্য। এই প্রসঙ্গ চৈঃ ভাঃ আদি ৩০।৪৮, ২।৪৪-৪৫, ২।৪৯-৫১, চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৮।১৭৩-১৭৪, পাদ্মোত্তরখণ্ড ২৫৭।৫৭-৫৮ এবং অন্যান্য শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

দীক্ষাগুরু শিষ্যকে স্বয়ং দীক্ষা দিয়া নবজন্ম দান করেন, অতএব তাঁহার দৈক্ষ্যজন্মের কোন আবশ্যকতা আছে কি ? দীক্ষাগুরুর দৈক্ষ্যজন্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলে তাহা 'কোটীপতি একটী পয়সার জন্য রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন' এর ন্যায় নিরর্থক হইবে না কি ? শ্রীল গুরুপাদপদ্ম জগজ্জীবের কল্যাণার্থে ও শিক্ষার্থে দীক্ষাগ্রহণ ও ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণের অভিনয় করেন মাত্র। উহা লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ গুরুদেবের দৈক্ষ্য ও সন্ন্যাসজন্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে গিয়া নিজেদের মঙ্গলের পথ চিরতরে হারাইয়া ফেলেন। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু মাঘী পূর্ণিমা-তিথিতে লোকহিতার্থে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে এই ক্ষেত্রেও মহাপ্রভুর সন্ন্যাসজন্ম হইয়াছিল—এই কথা স্বীকার করিতে হইবে, তাই নয় কি ? তখন মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি অপেক্ষা সন্ন্যাসগ্রহণের তিথির গুরুত্ব অধিক বলিয়া বিবেচিত হইবে না কি ? শ্রীল প্রভুপাদের অনুগ অভিমান করিয়া প্রভুপাদের বিরোধী সিদ্ধান্ত প্রচার করা কি কোন বুদ্ধিমানের কার্য্য ? যাঁহারা প্রভুপাদের বিচারের স্রোতধারায় অহর্নিশ অবগাহন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে মূর্খ ও স্তাবক বিবেচনা করিয়া তাঁহারা নিজেদের দৈন্যদশাকেই অধিক পরিমাণে প্রকাশ করেন না কি ?

জগদ্‌গুরু শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে গুরুদেবের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথি সম্বন্ধে যে বিশেষ আলোকপাত করিয়াছেন,

তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শ্রীল কেশব গোস্বামী বলিয়াছেন,—"শ্রীগুরুদেব নির্গুণ বস্তু—ব্রহ্মবস্তু। পরম কারুণিক নির্গুণ গুরুপাদপদ্মের এরূপ মহিমা যে, তিনি গুণমধ্যে আবির্ভূত হইলেও তাঁহার অপ্রাকৃত সত্তা সর্ব্বদা রক্ষিত হয়। * * *। অপ্রাকৃত নির্গুণ বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। জন্ম ও মৃত্যু প্রকৃতির অন্তর্গত ধর্ম্ম। 'জন্ম' বলিলে যেমন প্রাকৃত চিন্তাধারা মানসপটে ভাসিয়া উঠে, 'আবির্ভাব' বলিলে ভাষা একটু মার্জ্জিত হয় বটে, কিন্তু তাহাও হৃদয়ে সন্দেহের সৃষ্টি করে। জন্ম-মৃত্যুতে হেয়তা, অবরতা বিদ্যমান। পার্থিব চিন্তাস্রোত হইতে বদ্ধজীবগণকে উদ্ধারের নিমিত্তই অপার্থিব নির্গুণ তত্ত্বের এ জগতে আবির্ভাব। নির্গুণ বস্তু নির্গুণ ক্ষেত্রেই বিচরণ করেন। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের আবির্ভাব ও আবির্ভাব-স্থান নির্গুণ ও অপ্রাকৃত।"

দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই জীবের ভয়, শোক ও মোহ উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়াভিনিবেশের কবল হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে অবশ্যই "সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ"—এই শ্রৌতবাণী অনুসরণে গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করা একান্ত প্রয়োজন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ই জীবকে একমাত্র নির্ভয় ও অশোক করিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে গুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন না করা পর্য্যন্ত জীবের যথার্থরূপে গুরুপূজা বা ব্যাসপূজা হয় না। এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ (চৈঃ ভাঃ ৫ম অধ্যায়ের অনুভাষ্য) বলিয়াছেন,—"যে মুহূর্ত্তে বিরাগ উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই জড়ভোগ বিরাম লাভ করিয়া ভগবৎসেবায় রুচি হইবে। তাহার কালাকাল বিচার নাই। জড়ভোগ নিবৃত্তি হইলেই জীব 'পরিব্রাজক' হইয়া আচার্য্যের চরণাশ্রয় করেন। সেই আচার্য্য-চরণাশ্রয়কেই ভাষান্তরে 'ব্যাসপূজা' কহে।" এই প্রসঙ্গে শ্রীল কেশব গোস্বামী তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীল কেশব গোস্বামী বলিয়াছেন,—"হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার জন্য শিষ্যের জীবনোৎসর্গ শ্রেষ্ঠ ব্রত। ইহা না করিলে বা না করিতে পারিলে শিষ্যের শিষ্যত্ব সাধিত হয় নাই, জানিতে হইবে। গুরুপাদপদ্মে যাবতীয় সমর্পণই শিষ্যের প্রকৃত লক্ষণ। কেবল নিজে নহে, জগতের সকলেই আমার গুরুদেবের সেবা করুক,—এই বিচার সৎশিষ্যের কাম্য। সৎশিষ্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুষ্পসকলকে গুরুসেবায় ডালি দিয়া থাকেন। এই আত্মসমর্পণের বৃত্তি—গুরুপূজা বা সেবা।"

গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ব্যতীত শিষ্যের কখনও কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই শিষ্যের নিজের লঘুত্ব বোধ হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"গুরুবাদ এক অখণ্ডতত্ত্ব—"মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।" আমার গুরু—সমগ্র জগতের গুরু। তিনি গুরুতত্ত্ব—সমগ্র জগতের গুরুতত্ত্ব; আমার গুরু-বিদ্বেষী—জগতের সকলের বিদ্বেষী—মনুষ্যমাত্রের বিদ্বেষী—জগদীশের বিদ্বেষী। নিষ্কপটে এই বিচারটা না আসিলে আমি গুরুপাদপদ্মের ভৃত্য হতে পারি না—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে পারি না—আমার নিজের লঘুত্ব বোধ হয় না—আমি 'তৃণাদপি সুনীচ', 'অমানী মানদ' হয়ে হরিকীর্ত্তন করতে পারি না।"

স্বীয় গুরুদেবের প্রতি নিষ্ঠা থাকিলেই শিষ্যের কৃষ্ণভক্তির দ্বার সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয়। নিজ গুরুদেবকে 'মদ্‌গুরুঃ জগদ্‌গুরুঃ' বলিতে গিয়া অন্য গুরুদেবের প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধি আসিলেই শিষ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী। শিষ্যের অন্য গুরুদেবের প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধি আসিলে বুঝিতে হইবে, তাঁহার নিজ-গুরুদেবের প্রতিও অপ্রাকৃত বুদ্ধির অভাব আছে। গুরুতত্ত্ব যেহেতু এক অখণ্ডতত্ত্ব, সেইহেতু প্রত্যেক সদ্‌গুরুতে অপ্রাকৃত বুদ্ধি থাকা অবশ্যই আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি ৯।১৮৬-এর অনুভাষ্যে বলিয়াছেন,—"যাঁহারা 'আমার গুরু' এবং 'তাঁহার গুরু' প্রভৃতি মর্ত্ত্যবুদ্ধিদ্বারা ভগবদভিন্ন গুরুতত্ত্বকে অসম্মান করেন, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রিয়তম-জনকে গুরুত্বে বরণ করেন নাই। (তাহারা) ব্যবহারিক জগতে মায়িক-বিচার-বুদ্ধিতে সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহ 'গুরুকে' ভোগের বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে। শুদ্ধ-ভক্তগণের সহিত এই সকল উপসম্প্রদায়ের একত্র সম্মিলন অসম্ভব।"

অতএব যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের বিচারধারাকে বহুমানন করিয়া নিজেদের জীবনকে ধন্যাতিধন্য করিতে চাহেন, তাঁহারা অতি অবশ্যই স্ব-স্ব-গুরুর আবির্ভাব দিনে বিশেষ সমারোহের সহিত ব্যাসপূজার অনুষ্ঠান করিবেন। 'ব্যাসপূজা' ব্যতীত ভগবৎপ্রীতি এবং নিজের আত্মকল্যাণ-লাভ অসম্ভব—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

———

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

বাংলায় তখন চলছিল হোসেন শাহের রাজত্বকাল। ভারতবর্ষ সাধকের দেশ। এই দেশে বহু মহামানব জন্মগ্রহণ করেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়েছিল একটী বিশেষ সময়ে, বঙ্গদেশ তখন কুসংস্কারের আন্দোলনে হাবুডুবু খাচ্ছে, চেতনায় এগোবার পথ দেখতে পাচ্ছে না। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে হিন্দুরা এগিয়ে যাচ্ছে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণের জন্য। তাঁর আবির্ভাবে দিশেহারা মানুষ যেন স্থিতিলাভ করল। তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন দোল পূর্ণিমার পূর্ণ তিথিতে। তাঁর পিতার নাম ছিল জগন্নাথ মিশ্র ও মায়ের নাম শচীদেবী। তাঁর জন্মের সময়ে নবদ্বীপ ছিল শিক্ষা-দীক্ষার প্রধান কেন্দ্র।

বাল্যকালে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল নিমাই। পরে যৌবনকালে নিমাইপণ্ডিত নামে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর গায়ের রঙ ফর্সা ছিল বলে তাঁকে গৌরাঙ্গও বলা হত। ছেলেবেলা থেকেই তিনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। বাল্যকালে তিনি খুব দুরন্ত হলেও শৈশবের মধ্যেই তিনি সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি নবদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে।

তাঁর কিছুতেই ঘরে মন বসে না দেখে মাতা শচীদেবী প্রথমে তাঁকে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সাথে বিবাহ দেন। কিন্তু তাঁর প্রথমা স্ত্রী সর্পদংশনে ইহলোক ত্যাগ করেন। ইতিমধ্যেই তিনি কৃষ্ণপ্রেমে আকৃষ্ট হন। কিন্তু তিনি তাঁর মায়ের ইচ্ছানুসারে দ্বিতীয়বার বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করেন এবং কিছুদিন গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করেন।

২৪ বছর বয়সে এক গভীর রাতে গৃহত্যাগ করেন। এরপর তিনি ঈশ্বরপুরীপাদের কাছ থেকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তারপর তিনি নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈত, শ্রীবাস-এর সঙ্গে নাম-সংকীর্ত্তনে মেতে ওঠেন। নবদ্বীপের কাজী সাহেব তাঁদের মৃদঙ্গ, করতাল ভেঙে কেড়ে নিয়ে নানা নির্যাতন করেন। পরে শ্রীচৈতন্যদেব কাজীসাহেবকে উদ্ধার করেন। এছাড়া তিনি ঐ সময়েই জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানা জায়গা ভ্রমণ করে তাঁর নিজের ধর্ম্মমত অর্থাৎ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি লৌকিক জাতিভেদ

মানতেন না। হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই সমান চোখে দেখতেন। তিনি নিজে রাধাভাবে ভাবিত ছিলেন, আর সবাইকেও ভাবিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধর্ম্মের মূলকথা ছিল—কৃষ্ণপ্রেম বা ভগবৎপ্রেমের দ্বারাই মানুষ ভগবানকে লাভ করতে পারে। কৃষ্ণনাম বা মহামন্ত্র—নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা তিনি সমাজের বৈষম্য দূর করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন,—ঈশ্বরপ্রেমের ক্ষেত্রে কোন জাতি-বর্ণের প্রশ্ন নেই। সব মানুষই কৃষ্ণের সন্তান, কাজেই সকলেই কৃষ্ণ-ভজনের অধিকারী। তাঁর ধর্ম্ম-অনুপ্রেরণায় গোটা হিন্দুজাতির মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার ঘটল। হিন্দুদের অন্য ধর্ম্মের প্রতি টান কমে গেল।

তাঁর আদর্শ অনুসরণ করেই মানুষ তার কুসংস্কার, ঈর্ষা, নিন্দা থেকে নিস্তার পেয়েছেন। তাঁর বাণীগুলি তখনকার বঙ্গসমাজে বিপুলভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। তিনি সকল জাতির মিলনের ধর্ম্ম অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন। জীবনের শেষ কয়েক বছর মায়ের ইচ্ছানুসারে তিনি পুরী নীলাচল বা জগন্নাথধামে অতিবাহিত করেন। ৪৮ বছর বয়সে এই নীলাচলেই তাঁর তিরোভাব ঘটে।

—শ্রীঅমিত সরকার (অষ্টম শ্রেণী)
শক্তিগড়, শিলিগুড়ি (জলপাইগুড়ি)

শ্রীল গুরু মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৫ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণ কে ?—Supreme Command, Supreme Lord, Omniscient Lord, Omnipresent Lord, Omnipotent Lord—সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্। তাঁর আকার আছে, গুণ আছে, লীলা আছে। তাঁর সবকিছু আছে, অস্বীকার করবার উপায় নাই। সেইকথা শাস্ত্রে বলছেন। ভগবানকে কি দেখা যায় ? তিনি কি Visible—দর্শনীয় আমাদের সামনে ?—হ্যাঁ, সেই ভগবানকে দেখা যায়—যেমন তুমি আমাকে দেখছ, আমি তোমাকে দেখছি, আমরা পরস্পর পরস্পরকে দেখছি, সেইরকম দেখা যায়। তাহলে দৃষ্টিটা কি ? কোন side-এ দেখব ? তাঁকে দেখতে গেলে একটা আলাদা চশমা লাগে। কি চশমা লাগবে ? কামলা রোগীর যে চশমা সেই চশমা

কি? যার কামলা হয়েছে সে একটা চশমা লাগায়। সাদা রঙের চশমা লাগালেও তার দুনিয়াটা হলুদ দেখা যায়। কোন্ চশমা লাগাতে বলছেন?—প্রেমচক্ষু। সেই উপচক্ষু—ধার করা চক্ষুর নাম উপচক্ষু। তার দ্বারা ভগবদ্দর্শন হয়, ভগবানের স্বরূপ দর্শন হয়। "প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।" প্রেমের কাজলমাখা যে চোখ, সেই চোখ দিয়েই সাধু-সন্তগণ প্রেমময় ভগবানকে দর্শন করেন। মাঝে মাঝে দর্শন করেন, মাঝে মাঝে অদর্শন হয়, এমন কি? না, 'সন্তঃ সদৈব' (সদা+এব) Continuously—সর্ব্বদা দর্শন করেন। কোথায়?—'হৃদয়েষ্বপি' শুধু হৃদয়ে? না, অনন্ত জীবাত্মায় ভগবদ্দর্শন, ভগবানে অনন্ত জীবাত্মার স্বরূপ-দর্শন। তাকে বলে সমদর্শন। সেই সমদর্শনের কথা শাস্ত্রে বলছেন,—

বিদ্যা-বিনয়- সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

সে সমদর্শী কে?—যিনি আত্মায় আত্মা দর্শন করেন, যিনি পরমাত্মায় আত্মা দর্শন করেন, জীবাত্মায় আত্মা দর্শন করেন, তিনি হলেন সমদর্শী সাধু। তার সংখ্যা খুবই নগণ্য। তাহলেও ব্যাপারটা আছে। সেই Percentage কষেছেন গীতার মধ্যে,—মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কদাচিৎ কোন ব্যক্তি তত্ত্বতঃ ভগবানকে জানতে ইচ্ছুক, আগ্রহী। ঐরূপ আগ্রহশীল হাজার হাজার মানুষের মধ্যে তত্ত্বতঃ কেউ আমাকে অবগত হতে পারেন। Percentage সেখানে খুব কম। তাহলে কি আমরা ঘাবড়ে যাব? আমরা ধর্ম্মপ্রচারক, বহু জায়গায় বহু লোক প্রশ্ন করেন,—মহাশয়! আপনাদের প্রচারের ফল কি? কত লক্ষ লোক আপনাদের সনাতন ধর্ম্ম embrace করেছেন? সেখানে আমাদের উত্তর এই,—গীতা-ভাগবতে এর উত্তর দিয়ে রেখেছেন। তোমাদের ঘাবড়াবার কোন কারণ নাই। কেন?—সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কদাপি কেহ আত্মকল্যাণের জন্য ব্রতী হন, ইচ্ছুক হন। 'যততামপি সিদ্ধানাম্'—সিদ্ধিলাভ করেছেন, Realised soul, এইরূপ হাজার হাজারের মধ্যে কদাচিৎ কেহ তত্ত্বতঃ আমাকে অবগত হতে পারেন, আমার যে স্বরূপ সে স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন ঠিক ঠিক ভাবে বাস্তবক্ষেত্রে। এরপরে শুনুন ভাগবতে হিসাব কষছেন,—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥

দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত কোটি কোটির মধ্যে। Percentage হিসাব করুন এবার। যদি বর্ত্তমানে আমরা ভারতবাসী ৮০-৮৫ কোটি ধরি, এর মধ্যে যদি ৮০-৮৫টী লোক পাওয়া যায় যথেষ্ট, তাহলে আমাদের যে পরিশ্রম, আমাদের যে চিৎকার, আমাদের যে প্রচার সেটা সফল। অতএব ঘাবড়াবার কি আছে? সুতরাং সনাতন ধর্ম্ম এত উদারনৈতিক ধর্ম্ম যার ভিতরে সকলকে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়েছে, কেহ বাদ যান যাই। অনন্ত বিশ্বের অনন্ত সৃষ্ট জীবকে ভগবান্ ভালবাসার অধিকার দিয়েছেন। তাকে বলে সনাতন ধর্ম্ম। সেই সনাতন ধর্ম্ম আলোচনা করবার জন্য এখানে আসর হয়েছে। এ ধর্ম্ম আলোচনার জন্য প্রত্যেকটী মানুষেরই সমান অধিকার আছে, কম-বেশী অধিকার নয়। শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে একটা শ্লোক দেখতে পাই আমরা। তার ভিতরে সাম্যবাদের কথা কিরকম বলেছেন, শুনুন আপনারা। হৃষীকেশ-স্তব করেছেন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী,—

কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কশা আভীরশুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

হে ভগবান্! তোমাকে নমস্কার করি। কে তুমি? অনন্ত বিশ্বের অনন্ত জাতি, Irrespective of Caste and creed সবাই তোমাকে ভালবাসতে পারে। তোমাকে ভালবাসার সুযোগ দিয়েছ, ক্ষমতা দিয়েছ, সমান অধিকার দিয়েছ। সেই সনাতন ধর্ম্ম যদি আমরা আলোচনা করি, তাহলে ঠিক ঠিক-ভাবে বুঝতে পারব—কে অবতার, কে অবতারী, কে কৃষ্ণ, কে শ্রীরামচন্দ্র। কারা বিষ্ণুতত্ত্ব, কারা ভক্ত, কারা জীবাত্মা, এই জগৎতত্ত্ব কি? এসব সম্বন্ধে একটা সম্যক্ ধারণা আসে। সাধন-ভজন ত' পৃথক্ জিনিস। সেটা যখন শুরু হয়, তখন সবই বাস্তবায়িত হয়, তার আগে নয়। কতকগুলো পড়া মুখস্থ করা যায়, আবার যখন সাধন-ভজনের ক্রম নিয়ে চলা যায় তখন ওটা বাস্তবে রূপায়িত হয়। ঠিক সেইভাবে জিনিসটা বুঝবার চেষ্টা করব।

সনাতন আর্য্যঋষিগণ আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন, সে শিক্ষার পরে চরম শিক্ষা আর কিছু হতে পারে না, হয় নাই, কেউ সেই শিক্ষা দিতে পারেন নাই, জগতের কেউ দিতে পারবেন না। তারপরে কোন শ্রেষ্ঠ বিচার নাই। 'যাহা নাহি বেদে তাহা নাহি পৃথিবীতে।'—ইহাই আর্য্যঋষিগণের বিচার। আর একথা প্রমাণিত কিসের দ্বারা?—পাশ্চাত্ত্য দেশের দ্বারাই। স্বয়ং শাস্ত্র যদি নিজে মহিমা-মাহাত্ম্যের কথা বলেন, তাহলে ওটা গ্রাহ্য হয় না; কেননা ওঁরা নিজেদের কথা নিজেরা বলছেন। অন্যে যদি বলে, তাহলে সেটা ঠিক হয়। যেমন কথাটা আছে,—

"আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়।
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়॥"

যদি তাই মেনে নেওয়া যায়, তাহলে পাশ্চাত্ত্য দেশের কথা আমাদের

মানতে হবে। তাঁরা কি বলছেন? সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁরা কি ধারণা পোষণ করেন, সেইটাই বুঝতে হবে। তাঁরা খুব সুন্দর কথা বলেছেন, আপনারা নিশ্চয় কথাটা শুনেছেন। পুনরায় আমি এখানে কথাটার পুনরুক্তি করছি,—"India guided by God can lead the world, back to sanity." পোপ নিজে 'World Congress of Faith' এর ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে একথা বলেছেন। কয়েক বৎসর আগেকার ঘটনা। তিনি বলছেন—'India guided by God'. ভারতবর্ষ, কোন্ ভারতবর্ষ? —ঈশ্বরকর্ত্তৃক পরিচালিত ভারতবর্ষ, অধ্যাত্ম ভারত can lead the world—সমগ্র পৃথিবীকে পরিচালনা করার ক্ষমতা রাখে। 'Back to sanity' তাহলে সমগ্র জগৎকে Insanity—পাগলামিতে পেয়ে বসেছে। সেই পাগলামিটা কি?—ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য্য, মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, রণোন্মাদনা। এই পাগলামিতে পেয়ে বসেছে সমগ্র দুনিয়াকে। এর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে অধ্যাত্ম ভারত, ধার্ম্মিক ভারত, ঈশ্বরকর্ত্তৃক পরিচালিত ভারত। তাহলে চিন্তা করুন—পাশ্চাত্ত্য দেশের একজন বিশেষ ব্যক্তি আমাদের সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করছেন।

এ সব কথা চিন্তা করে আমাদের শাস্ত্রীয় সমস্ত তত্ত্বসিদ্ধান্ত আলোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হব যে,—আত্মধর্ম্ম থেকে বড় জিনিস কেউ দিতে পারেন না। এজন্য পাশ্চাত্ত্য দেশও স্বীকার করছে, আমরা ভারতের কাছে ঋণী। আমরা ভারত থেকে যা কিছু পাওয়ার পেয়েছি। এখনও তাঁদের স্বীকৃতি রয়েছে। তাঁরা বলছেন একথা এবং এই নিয়ে আলোচনাও হয়েছে—'Where East and West can meet?' মিলনটা সম্ভব। কবি শুধু এক জায়গায় বলেছেন, তা নয়। 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।' 'হেথা একদিন বিরামবিহীন মহাহুঙ্কার ধ্বনি। হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি।' পাশ্চাত্ত্য দেশ এই জিনিসটা উপলব্ধি করে কিছুটা। অস্বীকার করবার উপায় নাই।

আমরা আমাদের নিজস্ব সম্পদ হারিয়ে ফেলেছি, ভুলে গেছি বর্ত্তমানে আমাদের ঋষিগণের নীতি-আদর্শ, ভাবধারা। পুনরায় এটাকে Revive করা দরকার। এর জাগরণ প্রয়োজন। তার জন্য আমাদের একতাবদ্ধ—সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন আছে। তাই বলিতেছি,—শ্রীজন্মাষ্টমী-তিথি ও শ্রীনন্দোৎসব—জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমগ্র মানব-গোষ্ঠীর অপূর্ব্ব মিলনোৎসব। আমরা সকলেই আত্মধর্ম্মে অধিষ্ঠিত হয়ে সাম্য-স্বাধীনতা-মৈত্রী নিয়েই বেঁচে থাকতে চাই।

শ্রীচৈতন্যে মর্ত্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯৯ পৃষ্ঠার পর]

"সত্যে দৈত্যকুলাধিনাশ-সময়ে স্ফূর্জ্জন্নরকেশরী-
স্ত্রেতায়াং দশকন্ধরং পরিভবন্ রামেতি নামাকৃতিঃ।
গোপালান্ পরিপালয়ন্ ব্রজপুরে ভারং হরন্ দ্বাপরে
গৌরাঙ্গঃ প্রিয়কীর্ত্তনঃ **কলিযুগে চৈতন্যনামা হরিঃ**॥"

—নৃসিংহ-পুরাণে

অর্থাৎ—"সত্যযুগে যিনি দৈত্যসম্রাট্ হিরণ্যকশিপুকে বিনাশকালে নৃসিংহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন; যিনি ত্রেতাযুগে দশানন রাবণ-বধের নিমিত্ত পরম মনোহর রাম-বিগ্রহরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; যিনি দ্বাপরে পৃথিবীর ভার হরণ ও গোপবালকগণকে পালন করিবার জন্য ব্রজধামে বিরাজ করিয়াছিলেন, তিনিই কলিযুগে কীর্ত্তনপ্রিয় শ্রীগৌরহরি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে বিখ্যাত।"

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" (ভাঃ ১১।৫।৩২)

অর্থাৎ—"যাঁহার মুখে সর্ব্বদা 'কৃষ্ণ'—এই দুইটী বর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর—সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সংকীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন।"

"ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেব-ঋষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তম্
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥" (ভাঃ ৭।৯।৩৮)

অর্থাৎ "(প্রহ্লাদ বলিয়াছেন —হে কৃষ্ণ!) তুমি এই প্রকার নর, তির্য্যক্, ঋষি, দেব, মৎস্য ইত্যাদিরূপে লোকদিগকে পালন কর এবং জগৎ-শত্রুদিগকে বিনাশ কর। হে মহাপুরুষ! কলিকালে যুগানুবৃত্ত নামকীর্ত্তনধর্ম্ম ছন্নভাবে প্রচার করিবে। **এইজন্য** তোমার নাম ত্রিযুগ।"

"কলৌ কৃষ্ণাবতারোঽপি গূঢ় সন্ন্যাসরূপধৃক্।" (জৈমিনি ভারতে)

অর্থাৎ—"কৃষ্ণাবতার হইলেও ইনি কলিযুগে প্রচ্ছন্নভাবে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন।"

বায়ুপুরাণে ভগবদুক্তি—,

"কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।
স্বর্ণদীতীরমাস্থায় নবদ্বীপে জনাশ্রয়ে।
তত্র দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠে শুদ্ধসত্ত্বে দ্বিজালয়ে।"

অর্থাৎ—"আমি কলিযুগে যুগোচিত নামসংকীর্ত্তন প্রচারের নিমিত্ত বহু জনসমাকীর্ণ, গঙ্গাতীরবর্ত্তী নবদ্বীপধামে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলে শচীদেবীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইব।"

ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—,

"অত্র ব্রহ্মপুরং নাম পুণ্ডরীকং যদুচ্যতে।
তদেবাষ্টদলং পদ্মসন্নিভং পুরমদ্ভুতম্॥
তন্মধ্যে দহরং সাক্ষাৎ মায়াপুর ইতীর্য্যতে।
তত্র বেশ্ম ভগবতশ্চৈতন্যস্য পরাত্মনঃ।"

অর্থাৎ—"এই উপনিষদে যাহা ব্রহ্মমণ্ডল বলিয়া কথিত হইতেছে, ইহাই অষ্টদলপদ্ম সদৃশ পরমধাম। তন্মধ্যে 'মায়াপুর'-নামক স্থানই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব স্থান।"

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সম্বন্ধে বহু প্রমাণ বৈদিক শাস্ত্রে থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে মানুষ বা অতিমানুষ বলিয়া চিন্তা করাই অপরাধ।

(৮) লেখক তাঁহার পুস্তকের ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"সেই সন্ন্যাসী চৈতন্যই আবার অন্যতম পার্ষদ-সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে গৌরীদাস পণ্ডিতের ভাই সূর্য্যদাস সরখেলের দুই মেয়ে বসুধা ও জাহ্নবীকে বিয়ে করবার জন্য আদেশ করেছেন। বস্তুত মনের দিক থেকে চৈতন্য কোনদিনই সন্ন্যাসী ছিলেন না।"

লেখকের নিত্যানন্দ সম্পর্কে উপরিউক্ত মন্তব্য সত্য নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে শুদ্ধভক্তি প্রচারার্থ গমনের আদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে (৫।২২৩-২২৯ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে,—

"প্রভু বলে,—'শুন নিত্যানন্দ মহামতি!
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ-প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজমুখে।
'মূর্খ-নীচ-দরিদ্র ভাসাব প্রেম-সুখে॥'
তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম্ম করি'।
আপন-উদ্দাম-ভাব সব পরিহরি'॥

তবে মূর্খ-নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার ??
ভক্তিরস-দাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে ??
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও॥
মূর্খ-নীচ-পতিত-দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর' গিয়া সবারে মোচন॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্ত আদেশ হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, কর্ম্মফলভোগী ইন্দ্রিয়াসক্ত জনগণের ও মুমুক্ষু জ্ঞানী নির্ব্বিশেষ মায়াবাদী-সম্প্রদায়ের অভক্তি ছাড়াইবার জন্য এবং সকলকে উন্নত বিচারে আনিয়া প্রেমধর্ম্মে আকৃষ্ট করাইবার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুকে গৌড়দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে বিবাহ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন,—ইহা বৃন্দাবনদাসকৃত চৈতন্যভাগবতের কোন্ পরিচ্ছেদে ও কোন্ শ্লোকে লেখক পাইয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিলেন না কেন? এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটী পয়ার উল্লেখ করিতেছি,—

"নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল,—যাও গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।৪২)

উহার অনুভাষ্যে পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীরূপানুগবর্য্য শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—নিত্যানন্দে আজ্ঞা,—প্রাকৃত-সহজিয়ার দল অভিন্ন-রোহিণীনন্দন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া বলিয়া থাকেন যে, 'শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে বংশ রক্ষা (?) করিবার জন্য শ্রীনীলাচল হইতে শ্রীগৌড়দেশে পাঠাইলেন।' শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে অপরাধ হইতেই এইরূপ পাষণ্ডবুদ্ধি উদ্ভূত হইয়াছে। এই শ্রেণীর লোকসকল যাবতীয় ঈশ্বরবিগ্রহ—বিষ্ণুতত্ত্বের মূল-আকর শ্রীনিত্যানন্দকে তাহাদের মতই একজন 'কুণপাত্মবাদী' এবং জড়ীয়ভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণরত যমদণ্ড্য মর্ত্ত্যজীবমাত্র জ্ঞান করিয়া নরকপথেরই পথিক হয়। ঐ সকল কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোভী, বণিকস্বভাব, স্বার্থপর ব্যক্তি স্বীয় উর্ব্বর মস্তিষ্কে এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ মত উদ্ভাবনপূর্ব্বক নিত্যানন্দের নাম করিয়া তাঁহার ঈশ্বর-চেষ্টাদ্বারা নিজেদের ব্যবসায়, নির্ব্বোধ-লোক-প্রবঞ্চন এবং দুরভিসন্ধিমূলে সর্ব্বত্র গর্হিত যোষিৎসঙ্গ-স্পৃহা ও গৃহব্রত বা গৃহমেধ-ধর্ম্মের অন্যায় ও অশাস্ত্রীয়ভাবে সমর্থন করিবার সুযোগ

অন্বেষণ করেন। প্রকৃতপক্ষে, কৃষ্ণপ্রেমদাতা মহাবদান্য শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক তৎপ্রকাশবিগ্রহ তদভিন্ন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে রজোগুণাশ্রিত প্রজাপতিবর্গের ন্যায় বংশবৃদ্ধিদ্বারা সৃষ্টি-রক্ষা, অথবা কৃষ্ণবিমুখ জীবের জড়ীয়ভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণ কার্য্য সমর্থন করিবার যন্ত্রবিশেষরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য ঐরূপ আদেশ প্রদান করিবার কথা কোন প্রামাণিক গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ নাই, থাকিতেও পারে না,—কেননা, উহা সর্ব্বথা অশ্রাব্য। ঐরূপ কথা প্রচার করিয়া প্রাকৃত যোষিৎ-সঙ্গি-সহজিয়াগণ আপনারাও পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হন, এবং সদসদ্‌বিবেকহীন জগৎকেও বঞ্চনা করিয়া জগতে অমঙ্গলই উৎপাদন করেন।"

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে

বন্দনা

আমি বন্দি তোমারে গুরু,
জীবন-সাগরে কাণ্ডারী তুমি,
হে মোর কল্পতরু।
আমি বন্দি তোমারে গুরু॥

হে মোর জীবনের ধ্রুবতারা,
আমি আঁধারে আঁধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
হয়েছিনু দিশাহারা।

তুমি যে জ্ঞানের প্রদীপ লইয়া,—
'ভয় নাই' বলি' পথ দেখাইয়া,
আগে আগে যাও, ফিরে ফিরে চাও,
বুঝিয়া আমারে ভীরু।
আমি বন্দি তোমারে গুরু॥

তুমি যে আমার পরম বন্ধু,
এ ভব-যাতনা সহিতে না পারি
অপার করুণা সিন্ধু।

জীবন পথের তুমি যে দিশারী,
হরিনাম-সুধা দিয়াছ নিঙ্গাড়ী,
আলেয়ার পিছে, ভ্রমিতেছি মিছে,
আমি যে তৃষিত মরু।
আমি বন্দি তোমারে গুরু ॥

—শ্রীব্রজেশ চৌধুরী
তুরা (মেঘালয়)

ভগবৎপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব

প্রাপঞ্চিক জগতের কোন বস্তু পাইতে বা সেই বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে হইলে যেরূপ উপযুক্ত প্রাকৃত মাধ্যম প্রয়োজন, তদ্রূপ পারমার্থিক জগতের অপ্রাকৃত ভগবদ্বস্তু প্রাপ্তির জন্যও পারমার্থিক মাধ্যম প্রয়োজন। সেই অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত মাধ্যমই—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সদ্‌গুরু-পদাশ্রয় বিনা ভগবৎ-প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই। সেই সদ্‌গুরু কিরূপ লক্ষণবিশিষ্ট, তাহা বর্ণিত হইয়াছে,—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি উত্তম এবং শ্রেয়বস্তু লাভের নিমিত্ত সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। যিনি শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি, পঞ্চরাত্র, পুরাণাদি শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ এবং যিনি ভগবদনুভূতিসম্পন্ন ও প্রাকৃত কোন ক্ষোভের বশীভূত নন, তিনিই সদ্‌গুরু।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসেও উক্ত হইয়াছে,—

কৃপাসিন্ধুঃ সুদংপূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদঃ।
সর্ব্বসংশয়-সংছেত্তাহনলসো গুরুরাহৃতঃ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৪৫-৪৬)

যিনি অপার করুণাময়, যাঁহার কোনরূপ অভাব নাই, যিনি সর্ব্বসদ্‌গুণ-বিশিষ্ট, সর্ব্বজীবের হিতসাধনে রত, নিষ্কাম, সর্ব্বপ্রকারে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যা—

ব্রহ্মবিদ্যা বা ভক্তিসিদ্ধান্তে সুনিপুণ এবং শিষ্যের সর্ব্বসংশয় ছেদনে সমর্থ ও সতত হরিসেবানিষ্ঠ, তিনিই 'সদ্‌গুরু' বলিয়া অভিহিত হন।

এইরূপ গুরুকরণে যথার্থ ভগবৎপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। যদি কেহ ব্যবহারিক বা লৌকিক গুরুকরণ করিয়া থাকেন, তবে তাহার গতি কিরূপ? শাস্ত্র বলেন,—

যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।১০১)

যিনি আচার্য্যবেষে অন্যায় অর্থাৎ সাত্বত-শাস্ত্র-বিরোধী কথা বলেন এবং যিনি শিষ্যরূপে অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন করেন। যদি কেহ শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐকান্তিকী ভক্তি প্রদর্শন করেন, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।২।৪৬)

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্রাদি বিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক যদি কেহ ভক্তির বাড়াবাড়ি করেন, তাহা উৎপাতেরই কারণ বলিয়া জানিতে হইবে। সেক্ষেত্রে করণীয় কি?—অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।

পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্‌গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৪।৩৬৬)

অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্রদ্বারা নরক-গমনের পথ প্রশস্ত হয়। তজ্জন্য পুনরায় শাস্ত্র-বিধি অনুসারে বৈষ্ণব-গুরুকরণ অবশ্য কর্ত্তব্য।

পরমার্থ-গুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক-গুর্ব্বাদি পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।

(ভক্তিসন্দর্ভ ২১০)

ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরুত্রব পরিত্যাগ করিয়া পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় কর্ত্তব্য।

পরমার্থলিপ্সু ব্যক্তি ব্যাকুল হইয়া যখন অপ্রাকৃত শ্রীগুরুদেবের নিকট আত্মকল্যাণসূচক সিদ্ধান্তসমূহ শ্রবণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল হইয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আসক্ত হয়।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া প্রশ্ন করেন,—

কে আমি, কেনে মোরে জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি, কেমনে হিত হয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০২)

শ্রীগুরুমুখ হইতে এই প্রশ্নের সদুত্তর পাইলে সকল সংশয় দূরীভূত হইয়া দৃঢ়বিশ্বাসের উদয় হয়। তখন শাস্ত্রীয় তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনেও আগ্রহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
যাহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।১১৭)

সম্যগ্ ভাবে সিদ্ধান্ত অবগত হইতে পারিলে উপাস্যতত্ত্ব-বিষয়ে অধিকতর নিষ্ঠার উদয় হয়। ইষ্টবস্তুর প্রতি নিষ্ঠার অভাব হইলে প্রয়োজন সিদ্ধিতে বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয়।

প্রাকৃত-সহজিয়া, স্মার্ত্ত, অপসম্প্রদায়িগণের অনেকেই বলেন,—আমরা অদ্বৈত-পরিবার, নিত্যানন্দ-পরিবার প্রভৃতি। সাধারণতঃ তাঁহারা শৌক্র বিচারেই আবদ্ধ ও গর্ব্বিত। শ্রীঅচ্যুতানন্দ ও বীরভদ্র প্রভুর শৌক্র-পরিচয় দান করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের মহিমা-মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হয় না।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রূপানুগগণের মহিমা কীর্ত্তন করিতে গিয়া জানাইয়াছেন,—

"হা হা প্রভু সনাতন! গৌর-পরিবার।
সবে মিলি বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার ॥"

কোন অপসম্প্রদায়ীর পক্ষে এই পদের গূঢ়ার্থ বোধগম্য বা অনুভবের বিষয় নহে। এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভাগবত-আম্নায়-পরম্পরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তে ভক্তশ্রেষ্ঠ নিজজনকে 'পরিবার' বলা হইয়াছে।

সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

সৎ সম্প্রদায়-স্বীকৃত আচার্য্যগণোপদিষ্ট মন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্রসকল বিফল। শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগুরুই জগৎ উদ্ধার করিতে পারেন। (১) 'শ্রী' সম্প্রদায়ে শ্রীরামানুজাচার্য্য 'বিশিষ্টাদ্বৈত' মতে ভক্তি প্রচার করেন। চিৎ ও অচিৎ দুই বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া একমাত্র ঈশ্বরই বস্তু। (২) 'ব্রহ্ম' সম্প্রদায়ে শ্রীমধ্বাচার্য্য 'শুদ্ধদ্বৈত' মতে ভক্তি প্রচার করেন। জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্ তত্ত্ব, কিন্তু ঈশভক্তিই তাঁহার স্বভাব। (৩) 'সনক' সম্প্রদায়ে শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য 'দ্বৈতাদ্বৈত' মতে ভক্তি প্রচার করেন। জীব ঈশ্বর হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। অতএব ভেদেরও নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। (৪) 'রুদ্র' সম্প্রদায়ে শ্রীবিষ্ণুস্বামী 'শুদ্ধাদ্বৈত' মতে ভক্তি প্রচার করেন। বস্তু এক হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্মতা ও জীবতা নিত্য পৃথক্। ইহাঁরা চারজনই শুদ্ধভক্তি-

প্রচারক। সকলেই ভক্তির নিত্যত্ব, জীবের নিত্যদাস্য ও চরমে প্রেমগতি স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা সকলেই মূলতত্ত্বে বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের মত পৃথক্ পৃথক্ থাকায় তত্ত্ব অসম্পূর্ণ। তাই সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া সেই অসম্পূর্ণতা দূর করত শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব জগৎকে শিক্ষা দেন। শ্রীমধ্বমতে যে 'সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ' স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাই এই অচিন্ত্যভেদাভেদের মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়কেই স্বীকার করিয়াছেন। মহাপ্রভু তাঁহার দশমূল-শিক্ষায় শ্রদ্ধাবান্ জীবগণকে উপদেশমুখে বলিয়াছেন,—

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎ প্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ।

প্রথমটী প্রমাণ এবং শেষ নয়টী প্রমেয়। যে-সকল বিষয় প্রমাণ করা যায়, তাহারাই প্রমেয় এবং যাহার দ্বারাই সেই প্রমেয়সকলকে প্রমাণ করা যায়, তাহার নাম প্রমাণ। "গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত বেদবাক্যই আম্নায়। বেদ ও তদনুগত শ্রীমদ্ভাগবতাদি স্মৃতিশাস্ত্র তথা তদনুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণই প্রমাণ। সেই প্রমাণ-দ্বারা নির্ণীত হয়—হরিই পরমতত্ত্ব, তিনিই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তিনিই অখিলরসামৃতসিন্ধু। মুক্ত ও বদ্ধ—এই দুইপ্রকার জীবই তাঁহার বিভিন্নাংশ। বদ্ধজীব মায়াগ্রস্ত, মুক্তজীব মায়ামুক্ত। চিদচিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্যভেদাভেদপ্রকাশ। ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র সাধ্যবস্তু।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও বলিলেন,—এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ই প্রাচীন। শ্রী-রুদ্র-সনক—এই তিন সম্প্রদায়ই ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে পর্য্যবসান লাভ করিবে। শাস্ত্রে উক্ত তিন সম্প্রদায় ব্যতীত ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের প্রণালী বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। যথা :—

কৃষ্ণ হইতে চতুর্ম্মুখ, হয় কৃষ্ণসেবোন্মুখ, ব্রহ্মা হৈতে নারদের মতি।
নারদ হইতে ব্যাস, মধ্ব কহে ব্যাসদাস, পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভ-গতি॥

* * *

এই সদ্‌গুরুই দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষাপ্রদাতা হন। শাস্ত্র বলেন,—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ২।৭)

যাহা হইতে জড়ভোগ-বাসনাত্যক্ত অপ্রাকৃত ভাব অনুভব হয়, সেই অনুষ্ঠানকেই বৈষ্ণবগণ দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা বলেন। ব্রহ্ম-মাধ্ব-সারস্বত-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক, ভাগবত পারম্পর্য্য বা গুরু-পরম্পরাসম্মত, পারমার্থিক, অপ্রাকৃত গুরুদেব দীক্ষা ও শিক্ষা-প্রদাতা। যদি কেহ ঈর্ষা-বিদ্বেষমূলে বলেন যে,—দীক্ষাগুরু দীক্ষা দিবারই অধিকারী, তিনি শ্রীনাম ও ভজন-শিক্ষা দিতে পারেন না, আর এহেন গুরুতে কাহারও যদি অষ্টাবক্র মুনির উক্তির ন্যায় দৈহিক আবরণের বিচার, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের বিচার এবং সাধারণ মনুষ্য-বুদ্ধি হয়, তদুত্তরে শাস্ত্রবাক্য,—

গুরুষু নরমতির্যস্য বা নারকী সঃ। (পদ্মপুরাণ)

যাঁহার শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্য বা মনুষ্যবুদ্ধি, সে ব্যক্তি নারকী।

যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয়॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।১৬০)

তাই—শ্রীগুরু কৃপায় ভেঙ্গেছে স্বপন, বুঝেছি এখন তুমিই আপন।
তব নিজ জন পরম বান্ধব সংসার কারাগারে॥
যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।১৪৪)

যাঁহার কৃপায় ভগবৎকৃপা লাভ হয়, সেই গুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের আদেশ-নির্দ্দেশ ও আনুগত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত বিচারে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের গুণগান ও সেবা, অন্যথায় সকল শ্রম ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ (ভাঃ ১।২।৮)

অনুধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরিকথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

যখন মানবগণের বর্ণাশ্রম পালনরূপ স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও ভগবৎ ও ভাগবত-মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তনে আসক্তিরূপা রুচির উদয় না করায়, তখন নিশ্চয়ই তাহা বৃথা শ্রমমাত্র। শ্রীল প্রভুপাদের উক্তি,—"বিষয় ও আশ্রয়কে 'অবলম্বন' বলে। বাসুদেব বিষয় ও তাঁহার ভক্ত আশ্রয়। বিষয়াশ্রয়-সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে যদি ভগবল্লীলা বর্ণনাদিতে রুচিরূপ ফল উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে পরিশ্রমই সার, ফল লাভ ঘটে না। কর্ম্মার্জ্জিত ফলরূপে পরিণত হয়। যদি হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনে রতি উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে অবলম্বনের অভাবহেতু প্রাকৃত ফলভোগময় রাজ্যে ভোক্তৃ-ভোগ্যভাবে দেহ-মনেরই পরিশ্রম করা হইল। হরি-সান্নিধ্য লাভ ঘটিল না। অনভিজ্ঞ সম্প্রদায় অবলম্বনের অভাবে যে স্মরণ করেন, তাহা ইন্দ্রিয়পরায়ণতা মাত্র। উহাতে সকল শ্রম ব্যর্থ হয়।

শ্রীগুরু-চরণই সার জানিয়া শ্রীগুরু-বন্দনা স্মরণ করি।—

আশ্রয় করিয়া বন্দোঁ শ্রীগুরু-চরণ।
যাহা হইতে মিলে ভাই কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥

* * *

মহিমায় 'গুরু' 'কৃষ্ণ' এক করি' জান।
গুরু-আজ্ঞা হৃদে সব সত্য করি' মান ॥
সত্যজ্ঞানে গুরুবাক্যে যাহার বিশ্বাস।
অবশ্য তাহার হয় ব্রজভূমে বাস ॥
যার প্রতি গুরুদেব হন পরসন্ন।
কোন বিঘ্নে সেই নাহি হয় অবসন্ন ॥
'কৃষ্ণ' রুষ্ট হ'লে 'গুরু' রাখিবারে পারে।
'গুরু' রুষ্ট হ'লে 'কৃষ্ণ' রাখিবারে নারে ॥
গুরু—মাতা, গুরু—পিতা, গুরু হ'ন পতি।
গুরু বিনা এ সংসারে নাহি আর গতি ॥
গুরুকে 'মনুষ্য'-জ্ঞান না কর কখন।
গুরু-নিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ ॥
গুরু-নিন্দকের মুখ কভু না হেরিবে।
যথা হয় গুরুনিন্দা তথা না যাইবে ॥

* * *

গুরু-পাদপদ্মে যার রহে নিষ্ঠা-ভক্তি।
জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি ॥
হেন গুরু-পাদপদ্ম করহ বন্দনা।
যাহা হৈতে ঘুচে ভাই সকল যন্ত্রণা ॥
(হেন) গুরু-পাদপদ্ম নিত্য যে করে বন্দন।
শিরে ধরি' বন্দি আমি তাহার চরণ ॥

* * *

নামশ্রেষ্ঠং মন্ত্রমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবদাসানুদাস—

—শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"** প্রতিবৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।

২। সাধারণ ডাকযোগে "শ্রীপত্রিকা" গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইলে বার্ষিক ভিক্ষা ২৫·০০ টাকা ও ষান্মাসিক ১৪·০০ টাকা এবং আজীবন সদস্যপক্ষে ১০০১·০০ টাকা অগ্রিম প্রেরিতব্য। ভারত ও বিদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রা দেয়। ভি. পি. তে লইতে হইলে অতিরিক্ত খরচ গ্রাহকগণের স্বীকার্য্য।

৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হয়।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড বাঞ্ছনীয়।**

৫। **শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।**

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-আলোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়।

৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **'কার্য্যাধ্যক্ষ'** অথবা **'প্রকাশক' শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়,** শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ; ২৮, হালদার বাগান লেন; **কলিকাতা-৭০০০০৪** ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম্), ৩। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক, ৪। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ, ৫। মায়াবাদের জীবনী, ৬। শরণাগতি, ৭। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী-চরিত, ৮। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণখণ্ড), ৯। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা, ১০। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্, ১১। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, ১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ১৩। জৈবধর্ম্ম (বাংলা ও হিন্দী), ১৪। বিল্বমঙ্গল ও সন্ন্যাসী, ১৫। শ্রীদামোদরাষ্টকম্, ১৬। অর্চ্চন-দীপিকা, ১৭। শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা, ১৮। শ্রীগৌরাঙ্গ; ১৯। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা, ২০। শ্রীএকাদশী-ব্রতকথা, ২১। শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, ২২। উদ্ধারের পথ, ২৩। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ, ২৪। শ্রীমনঃশিক্ষা, ২৫। শ্রীউপদেশামৃতম্, ২৬। তত্ত্বমুক্তাবলী (যুক্তিমল্লিকাসহ), ২৭। Shri Chaitanya Mahaprabhu, ২৮। The Bhagavat, ২৯। Nam-Bhajan, ৩০। The Vedanta, ৩১। Vaishnavism, ৩২। Rai Ramananda, ৩৩। শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী, ৩৪। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য।

Central Regd. No. R. N. 5111/57
Postal Regd No. W. B/NDA-13

SHRI
GOUDIYA-PATRIKA

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত

শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)।
২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ (হুগলী)।
৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, মথুরা পোঃ, (মথুরা), ইউ. পি.।
৪। শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ—দানগলি, বৃন্দাবন পোঃ, (মথুরা) ইউ. পি.।
৫। শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠ—রাণাপতঘাট, বৃন্দাবন পোঃ, (মথুরা) ইউ. পি.।
৬। শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ—সন্ন্যাস রোড্, কঙ্খল পোঃ, (হরিদ্বার) ইউ. পি.
৭। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাটসাহি, পুরী পোঃ, (পুরী), উড়িষ্যা।
৮। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ—২৮, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪।
৯। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ (ধুবড়ী), আসাম।
১০। শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ—অরবিন্দ লেন, পোঃ ও জেলা কোচবিহার।
১১। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র—রান্দিয়াহাট পোঃ, (বালেশ্বর) উড়িষ্যা।
১২। শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ—শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ, (জলপাইগুড়ি)।
১৩। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ ও পাদপীঠ—আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)।
১৪। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
১৫। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ, (কোকড়াঝাড়) আসাম।
১৬। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ—তুরা পোঃ, (ওয়েষ্ট গারো হিলস্) মেঘালয়।
১৭। শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ—মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি পোঃ, (দার্জ্জিলিং)।
১৮। শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠ—মাথাভাঙ্গা পোঃ (কোচবিহার)।
১৯। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—মণিপুর, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
২০। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
২১। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়াড়াপাড়া রোড্, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

BOOK-POST Sl. No.

To

From—
Shri Goudiya-Patrika Office Ph : 55-7227
SHRI BINODE BEHARI GOUDIYA MATH
28, Halder Bagan Lane
Calcutta-700004